হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি।

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বাবিংশ বর্ষ।

১৩২১ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২১ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

সত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutta.

at the Janma-Bhumi Press.

39 Manick Bose's Ghat Street,

CALCUTTA,

1915.

বার্ষিক মূল্য ১॥৽ দেড় টাকা।] [ডাঃ মাঃ ৵৹ ছয় আনা।

জন্মভূমির দ্বাবিংশ বর্ষের সূচীপত্র।

১৩২১ সাল।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
(অ)		
১। অম্বুবাচী	... ...	৮৯
২। অদ্ভুত আবিষ্কার	ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১১৯
৩। অভিলাস	" জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৬২
৪। অতীত	" রসময় লাহা	৪০২
(আ)		
৫। আমি ও আমার	শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত	৯৯
৬। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার গৌরব রক্ষার্থ কি উপায় অবলম্বনীয়	কবিরাজ " সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,	২০৭
(ই)		
৭। ইন্দুমতী	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১৩৫
৮। ইক্ষুজাত চিনি ও হৃদ্‌রোগ	"	২৬৩
(এ)		
৯। একাগ্রতা	শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ	

(ক)

১০। কীর্ত্তন — শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত — ১১৬
১১। কে তুমি সুন্দরী — ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত — ২৬, ৬৮
১২। কোথা যাও কাকা — ,, — ১৭৮
১৩। কার ভাগ্যে কে খায় ? — ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত — ২৫২
১৪। কথায় কথা — ,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত — ৩১৯
১৫। ক্ষমাপ্রার্থনা — ... — ৩৩৭

(খ)

১৬। খাদ্য ভাণ্ডারে মিষ্ট কি ? — ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত — ২৯৫
১৭। খোকা — ৺ বিভূতিভূষণ গুপ্ত বি, এ, — ২৬৫

(গ)

১৮। গীত — শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায় — ১০৮
১৯। গীত — ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত — ৭৮
২০। গীতোক্তধর্ম্ম — ,, নিতাইচাঁদ শীল — ৫৫
২১। গীতা — ... — ২৭৮
২২। গুরুপূজা — ,, বিধুভূষণ গুহ রায় — ৭৭
২৩। গ্রহবৈগুণ্য — ... — ২৩৩

(ঘ)

২৪। ঘটকালী — শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী — ৯৪

(চ)

২৫। চাইনা তাহারে — শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল — ১৮৪
২৬। চরিত্র — ,, রামগোবিন্দ রায় — ৪১৭

(জ)

২৭। জি: পেন বা জাপান দেশ — ,, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য — ২৪১
২৮। জননী আমার — ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত — ২৫১
২৯। জলবসন্ত ও মসুরিকায় পার্থক্য কি ?
কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস, ৩১১, ৪২৯

(ত)

৩০। তড়া আঁটপুর ,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৩১৪
৩১। তুমি সঙ্গীতাচার্য্য ,, দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী ১৮১
৩২। ত্রিধাতু—মানবদেহে তাহাদের ক্রিয়া
কবিরাজ ,, কাণুপ্রিয় গোস্বামী বিজ্ঞানতীর্থ ১৮৬

(দ)

৩৩। দরিদ্রের দুর্গোৎসব শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত ২২৩
৩৪। দ্বিভাষে প্রশ্নোত্তর ... ১৯১

(ধ)

৩৫। ধর্ম্মের বিচিত্রগতি শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী ১৯৩, ৩২৬ ৪২৩
৩৬। ধর্ম্মের ধাঁ—ধা ,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৪৩১

(ন)

৩৭। নাম বিতরণ ... ১৯১
৩৮। নূতন দশাবতার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, ১৬৯
৩৯। নারীধর্ম্ম কবিরাজ ,, বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন ২৮৯

(প)

৪০। পদ্মাবতী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন ১৫৩
৪১। পিয়ারীচাঁদ মিত্র ,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, ৩৫
৪২। প্রাতস্তোত্র ,, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ ১৪৫
৪৩। প্রাপ্তিস্বীকার ... ২০০
৪৪। প্রেম সঙ্গীতাচার্য্য ,, দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী ২২২
৪৫। প্রিয়া ঐ ২৩২
৪৬। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ... ২৪৬
৪৭। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ডাক্তার ,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৩৬৬
৪৮। প্রায়শ্চিত্ত পণ্ডিত ,, রামসহায় কাব্যতীর্থ ৪১৭

(ভ)

৪৯। ভারতীয় প্রজা ও নৃপতিবর্গের প্রতি শ্রীশ্রীমান্ ভারত—
সম্রাটের সম্ভাষণ ১৬৭
৫০। ভারত জননী শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, ২০৮
৫১। ভক্তের ভগবান „ বরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন

(ম)

৫২। মনুষ্য বিকাশ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি কাব্যতীর্থ ৮৩
৫৩। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে বঙ্গসাহিত্য
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত ২৭৩
৫৪। মহাজনের তিরোভাব ... ৮৬
৫৫। ময়দানব „ অম্বিকাচরণ গুপ্ত ১৬১
৫৬। মায়া „ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
২৮৫, ৩২১, ৩৬০, ৩৮২, ৪১২
৫৭। মনে পড়ে শ্রীমতী——— ৪৩১
৫৮। মনের রোগ ডাক্তার „ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৩০৫
৫৯। মৃত সৌন্দর্য্য „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত ৩০৯
৬০। মানস নূপুর শ্রীমতী— ৪০৩

(য)

৬১। যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ ৩৭৪

(র)

৬২। রসাভাস শ্রীযুক্ত পরিহাস রসিক রায় ২০, ৬৫, ১০৯, ১৮২, ২১৯, ২৬৬
৬৩। রামমোহন রায় „ ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, ১৬৮

(ল)

৬৪। ললাট লেখা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত ২১২

(ব)

৬৫। বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ ... ১
৬৬। বিবাহ ও পণপ্রথা শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, ১৩

৬৭। বিবিধ প্রসঙ্গ ডাক্তার „ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ২০৯
৬৮। বেদান্তমতে বায়ুর নিরুক্তি
কবিরাজ „ কাণুপ্রিয় গোস্বামী বিজ্ঞানতীর্থ ২৪৮
৬৯। বিরহিনী ,, হরিদাস গোস্বামী ২৮৪
৭০। বিপুলা ,, বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন ৩৪৫

(শ)

৭১। শুনিবে কি কথা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০
৭২। শাস্ত্রোক্ত নিষেধ ,, রামসহায় কাব্যতীর্থ ৪১
৭৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দির ... ৭৯
৭৪। শ্রীচৈতন্য ও বর্ণাশ্রম শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত ১২১
৭৫। শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবের তত্ত্বকথা „ শ্যামলাল গোস্বামী ২০১

(স)

৭৬। সরল জীবন শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ ২
৭৭। সংসার ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত ২৩৭
৭৮। সমালোচনা ৩৭, ৭৮, ১১৬, ১৫৯, ১৯৮, ২৩৯, ২৭২, ৩০৪, ৩৩৫, ৩৭৬, ৪০৮
৭৯। সংক্রামক ব্যাধি ও আয়ুর্ব্বেদ শ্রীযুক্ত কবিরাজ—
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস, ৪৪
৮০। স্বাস্থ্য রক্ষা ডাক্তার ,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৭৩
৮১। সত্যের জয় ,, বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন ৩৩১
৮২। স্বর্গীয় পিতৃদেব ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত ৩৩৮
৮৩। স্মৃতিচিহ্ন ... ৪০৯

(হ)

৮৪। হিতে বিপরীত শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র ৪৭
৮৫। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার টি, মুখার্জ্জী ৫৯, ৮৮, ১৪৭

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

দ্বাবিংশবর্ষ।

১৩২১ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২১ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

সত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রহ্মদাস দ্বারা

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutta.

at the Janma-Bhumi Press.

39 Manick Bose's Ghat Street,

CALCUTTA,

1915.

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।]　　[ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা।

জন্মভূমির দ্বাবিংশ বর্ষের সূচীপত্র।

১৩২১ সাল।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	(অ)	
১। অম্বুবাচী	... ...	৮১
২। অদ্ভুত আবিষ্কার	ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১১১
৩। অভিলাস	" জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	২৬২
৪। অতীত	" রসময় লাহা	৪০২
	(আ)	
৫। আমি ও আমার	শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত	৯৯
৬। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার গৌরব রক্ষার্থ কি উপায় অবলম্বনীয়	কবিরাজ " সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,	২০৭
	(ই)	
৭। ইন্দুমতী	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	১৩৫
৮। ইক্ষুজাত চিনি ও হৃদ্‌রোগ	"	২৬৩
	(এ)	
৯। একাগ্রতা	শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদ	

(ক)

১০।	কীর্ত্তন	শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত	১১৬
১১।	কে তুমি সুন্দরী	,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২৬, ৬৮
১২।	কোথা যাও কাকা	,,	১৭৮
১৩।	কার ভাগ্যে কে খায় ?	,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২৫২
১৪।	কথায় কথা	,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩১৯
১৫।	ক্ষমাপ্রার্থনা	...	৩৩৭

(খ)

১৬।	খাদ্য ভাণ্ডারে মিষ্ট কি ?	,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২৯৫
১৭।	খোকা	৺ বিভূতিভূষণ গুপ্ত বি, এ,	২৬৫

(গ)

১৮।	গীত	শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায়	১০৮
১৯।	গীত	,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৭১
২০।	গীতোক্তধর্ম্ম	,, নিতাইচাঁদ শীল	৫৫
২১।	গীতা	...	২৭৮
২২।	গুরুপূজা	,, বিধুভূষণ গুহ রায়	৭৭
২৩।	গ্রহবৈগুণ্য	...	২৩৩

(ঘ)

২৪।	ঘটকালী	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী	৯৪

(চ)

২৫।	চাইনা তাহারে	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল	১৮৪
২৬।	চরিত্র	,, রামগোবিন্দ রায়	৪১৭

(জ)

২৭।	জিঃ পেন বা জাপান দেশ	,, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	২৪১
২৮।	জননী আমার	,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২৫১
২৯।	জাতবসন্ত ও মসূরিকায় পার্থক্য কি ?	কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস,	৩১১, ৪২৯

(ত)

৩০। তড়া আঁটপুর ,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৩১৪
৩১। তুমি সঙ্গীতাচার্য্য ,, দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী ১৮১
৩২। ত্রিধাতু—মানবদেহে তাহাদের ক্রিয়া
কবিরাজ ,, কাণুপ্রিয় গোস্বামী বিজ্ঞানতীর্থ ১৮৬

(দ)

৩৩। দরিদ্রের দুর্গোৎসব শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত ২২৩
৩৪। দ্বিভাষে প্রশ্নোত্তর ... ১৯১

(ধ)

৩৫। ধর্ম্মের বিচিত্রগতি শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী ১৯৩, ৩২৬ ৪২৩
৩৬। ধর্ম্মের ধাঁ—ধা ,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৪৩১

(ন)

৩৭। নাম বিতরণ ... ১৯১
৩৮। নূতন দশাবতার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, ১৬৯
৩৯। নারীধর্ম্ম কবিরাজ ,, বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন ২৮৯

(প)

৪০। পদ্মাবতী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন ১৫৩
৪১। পিয়ারীচাঁদ মিত্র ,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, ৩৫
৪২। প্রাতস্তোত্র ,, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ ১৪৫
৪৩। প্রাপ্তিস্বীকার ... ২০১
৪৪। প্রেম সঙ্গীতাচার্য্য ,, দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী ২২২
৪৫। প্রিয়া ঐ ২৩২
৪৬। প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ... ১৪৬
৪৭। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ডাক্তার ,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৩৬৬
৪৮। প্রায়শ্চিত্ত পণ্ডিত ,, রামসহায় কাব্যতীর্থ ৪৭৭

(ভ)

৪৯। ভারতীয় প্রজা ও নৃপতিবর্গের প্রতি শ্রীশ্রীমান্ ভারত—
সম্রাটের সম্ভাষণ ১৬৭
৫০। ভারত জননী শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, ২০৮
৫১। ভক্তের ভগবান ,, বরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন

(ম)

৫২। মনুষ্য বিকাশ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি কাব্যতীর্থ ৮৩
৫৩। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে বঙ্গসাহিত্য
,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত ২৭৩
৫৪। মহাজনের তিরোভাব ... ৮৬
৫৫। ময়দানব ,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত ১৬১
৫৬। মায়া ,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
২৮৫, ৩২১, ৩৬০, ৩৮২, ৪১২
৫৭। মনে পড়ে শ্রীমতী——— ৪৩১
৫৮। মনের রোগ ডাক্তার ,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৩০৫
৫৯। মৃত সৌন্দর্য্য ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত ৩০৯
৬০। মানস নূপুর শ্রীমতী— ৪০৩

(য)

৬১। যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ ৩৭৪

(র)

৬২। রসাভাস শ্রীযুক্ত পরিহাস রসিক রায় ২০, ৬৫, ১০৯, ১৮২, ২১৯, ২৬৩
৬৩। রামমোহন রায় ,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, ১৬৮

(ল)

৬৪। ললাট লেখা শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত ২১২

(ব)

৬৫। বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ ... ১
৬৬। বিবাহ ও পণপ্রথা শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, ১৩

৬৭। বিবিধ প্রসঙ্গ ডাক্তার „ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ২০৯

৬৮। বেদান্তমতে বায়ুর নিরুক্তি
কবিরাজ „ কাণুপ্রিয় গোস্বামী বিজ্ঞানতীর্থ ২৪৮

৬৯। বিরহিনী „ হরিদাস গোস্বামী ২৮৪

৭০। বিপুলা „ বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন ৩৪৫

(শ)

৭১। শুনিবে কি কথা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০

৭২। শাস্ত্রোক্ত নিষেধ „ রামসহায় কাব্যতীর্থ ৪১

৭৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দির ... ৭৯

৭৪। শ্রীচৈতন্য ও বর্ণাশ্রম শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত ১২১

৭৫। শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবের তত্ত্বকথা „ শ্যামলাল গোস্বামী ২০১

(স)

৭৬। সরল জীবন শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ ২

৭৭। সংসার „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত ২৩৭

৭৮। সমালোচনা ৩৭, ৭৮, ১১৬, ১৫৯, ১৯৮, ২৩৯, ২৭২,
৩০৪, ৩৩৫, ৩৭৬, ৪০৮

৭৯। সংক্রামক ব্যাধি ও আয়ুর্ব্বেদ শ্রীযুক্ত কবিরাজ—
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস, ৪৪

৮০। স্বাস্থ্য রক্ষা ডাক্তার „ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৭৩

৮১। সত্যের জয় „ বরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন ৩৩১

৮২। স্বর্গীয় পিতৃদেব „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত ৩৩৮

৮৩। স্মৃতিচিহ্ন ... ৪০৯

(হ)

৮৪। হিতে বিপরীত শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র ৪৭

৮৫। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার টি, মুখার্জ্জী ৫৯, ৮৮, ১৪৭

ভারতেশ্বরী ও ভারতসম্রাট।



ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও ভারতসম্রাজ্ঞী মেরী।

শিশু প্রেস।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। { ১৩২১ সাল, বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ।

সর্ব্বমঙ্গলময় পরমপিতাপরাৎপর পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের জন্মভূমি পত্রিকা একবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিয়া,—এই নববর্ষের প্রথম মাসে দ্বাবিংশ বর্ষে প্রবেশ লাভ করিল, এক্ষণে সর্ব্বশক্তিমান করুণাময়কে প্রণাম করিয়া জন্মভূমির হিতৈষী গ্রাহক, পাঠক ও লেখক বন্ধুবান্ধব মহোদয়গণকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া নববর্ষে নবোদ্যমে জননী জন্মভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম। নববর্ষ প্রবেশের মঙ্গলাচরণে সেই মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণিপাত করি। গ্রহবৈগুণ্যবশে গত বর্ষে নানা বিঘ্ন সংঘটনে আমরা সময় সময় অবসন্ন হইয়াছিলাম; পরীক্ষাক্ষেত্রে বিঘ্নবিনাশন বিশ্বপিতার অপার করুণায় সেই সকল নিদারুণ পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি; এক্ষণে নববর্ষারম্ভের মঙ্গলাচরণে পুনরায় আমরা সেই বিশ্বময়ের শ্রীপদ্মকমলে শরণাপন্ন হইলাম। প্রার্থনা এই যে,—ভবিষ্যতের গর্ভে যাহা

আছে, তাহা থাকুক—যেন ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া যাহাতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি, যিনি সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা, সর্ব্বজ্ঞানদাতা, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা তিনি আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত করুন, প্রকৃতি উজ্জ্বল করুন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন করুন,—নববর্ষের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যেন আমরা সর্ব্বপ্রকার শুভানুষ্ঠানের সংকল্পিত মঙ্গল ফল লাভ করিয়া জন্মভূমির হিতাকাঙ্ক্ষি মহোদয়গণকে সুখী করিতে পারি, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে বিচলিত না হই, সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদানে সহায়তা করুন।

সরল জীবন।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

আমেরিকার ন্যায় বাণিজ্য প্রধান দেশেও আজকাল সরল জীবনের আদর্শ টার খুব আদর। কিন্তু মান্ধাতার আমল হইতেই প্রাচ্যদেশ বাসীরা জানেন যে, ইহলোকে ষোলআনা সুখ ও শান্তি উপভোগ করিতে হইলে সাদাসিদে ভাবে জীবন অতিবাহিত করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। পাশ্চাত্যগণ মনে করেন যে, ইহজীবনের উদ্দেশ্যই প্রভূত দ্রব্য-সম্ভার উপভোগ করা; প্রাচ্যগণ এরূপ মনে করেন না। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকের জীবনই অতিশয় আড়ম্বর পূর্ণ। তাঁহারা জীবিত কালের মধ্যে ধনী হইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ইহাতে তাঁহাদের বহুবিধ অভাব আসিয়া দেখা দেয়। এই সব অভাব তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত। তারপর, এই অভাব দূর করিবার, জন্য তাঁহাদিগকে একটা ঘোর অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অসংযত ইন্দ্রিয়, দুর্দ্দমনীয় বাসনা ও অতৃপ্ত বিলাসের বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পাশ্চাত্যদিগের চিত্ত উদ্বেগ ও অশান্তির গভীর নিখাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহারা বহুবিধ ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর অধীন হইয়া পড়েন। আমেরিকা একটী সুসভ্য মহাদেশ। এখানকার অধিবাসীরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ইঁহারা নিরন্তর উদ্যম ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকেন। ফলে, ইঁহাদের হৃদ্‌রোগ—ফুসফুস্ মূত্রাশয়, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সংক্রান্ত পীড়া জন্মিয়া থাকে। আধুনিক সভ্যতার এইগুলি কুফল। 'বাবুয়ানা' করিয়া জীবন

---

* স্বামী অভেদানন্দের ইংরাজী বক্তৃতা হইতে সংকলিত।—লেখক।

কাটান ও কতকগুলি অনাবশ্যক দ্রব্য-সম্ভার উপভোগ করতঃ জীবনটাকে জটিল করিয়া তোলাই ইদানীন্তন সভ্যতার চরম আদর্শ।

যুক্তরাজ্যের এই বাণিজ্য প্রধান রাজধানীর যেখানেই আমরা দৃষ্টিপাত করি, সেখানেই দেখিতে পাই, কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই অত্যধিক পরিশ্রম, উদ্বেগ, অ-বিশ্রাম পীড়া ও অশান্তিতে কাতর। যাঁহারা দরিদ্র তাঁহারা মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; যাঁহারা মধ্যবিত্ত, তাঁহারা ধনীদিগের সমান হইবার চেষ্টা করিতেছেন, লক্ষপতিগণ ক্রোরপতি হইবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ ব্যাপার। কোটি কোটি মুদ্রার অধীশ্বর হইলেও কেহ তৃপ্ত হয়েন না; তখন তাঁহার অন্য দেশের ও অন্য জাতির ধনসম্পত্তি অধিকার করিবার ইচ্ছা হয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষা এতই বলবতী যে, সমগ্র পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য পাইলেও সে তৃপ্ত হয় না। তখন সে চন্দ্রলোকে যাইয়া অধিকার বিস্তার করিবার কল্পনা করে। অর্জ্জন ও ব্যয় স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রচলিত 'ফ্যাসান' বা রীতি অনুযায়ী চলিতে যাইয়া প্রত্যেককে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিতে হইতেছে। ফ্যাসান দোরস্ত রাখিবার জন্য ইহাঁদিগকে সমাজের অনাবশ্যকীয় বহুবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ইহাঁদিগকে এরূপ অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইতেছে যাহা মাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর, অথচ ইহাঁদিগের ধারণা যে, ঐ সমুদয় দ্রব্য ব্যতীত জীবনই বৃথা।

অধিক দিনের কথা নহে, সংবাদপত্রে দেখিয়া ছিলাম যে, কোন এক বিশপ বৎসরে পঞ্চাশ হাজার ডলার (এক ডলার ৩/০) উপার্জ্জন করিয়াও তৃপ্ত নহেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আরও বেশী। তিনি নিজেকে অত্যন্ত দরিদ্র মনে করেন। তাঁহার অভাব অত্যন্ত বেশী বলিয়াই তিনি দরিদ্র। অভাব বলিয়াই তাঁহার প্রয়োজন। এ দেশেও (আমেরিকা দেশে) ঐরূপ বিশপ অনেক আছেন, উহাঁরাও আপনাদিগকে খুব দরিদ্র মনে করেন। যে ব্যক্তি দু'বেলা খাইতে পায়, সে তিনবার খাইবার ইচ্ছা করে। খাইতে বসিয়া যে দুইটী ব্যঞ্জন খায়, সে চারিটি পরে ছয়টীর ইচ্ছা করে। যে রুটি মাখন ও সামান্য কিছু নিরামিষ তরকারী খায়, সে (পশুর) মাংস খাইবার অভিলাষ করে। এ প্রকার মাংস প্রাপ্ত হইলে সে তখন পক্ষীর মাংস খাইতে ইচ্ছাকরে। যখন তাহাকে মুরগীর ছানা দেওয়া হয়, তখন তাহার ইচ্ছা হয় রাজহাঁস খাইব, তারপর ইচ্ছা হয় টর্কি (কুক্কুট) খাইব। যে ব্যক্তি মাত্র শীতল জল পান করিয়া থাকে, তাহার

শ্যাম্পেন নামক সুরার বাসনা করে। যে সকল দরিদ্র স্ত্রীপুরুষের বাসের ঘর খানি পর্য্যন্ত নাই, প্রথমে তাহারা একটু আশ্রয়ের বাসনা করে। যদি কোন দয়ালু ব্যক্তি তাহাদিগকে একটু আশ্রয় দেন তবে তখন তাহারা আর তাহাতেও তৃপ্ত থাকেনা; তখন তাহারা পোষাক পরিচ্ছদের অভাব বোধ করিতে থাকে। সাদাসিদে রকমের পোষাক প্রাপ্ত হইলে তাহারা মূল্যবান পোষাকের বাসনা করিতে থাকে। কিয়দ্দিন পরে সকল প্রকার বিলাস বাসনাই তাহাদের মনে জাগিয়া উঠে। তখন তাহারা থিয়েটার (রঙ্গালয়) কন্সার্ট (গায়ক দল) প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে থাকে। শেষে, ইহাতেও তৃপ্তি না পাইয়া তাহারা সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি পাইবার ইচ্ছা করিতে থাকে, তাহাদের ইচ্ছা হয়. দশজনে তাহাদিগকে গণ্যমান্য বলিয়া সম্মান করুক। কিন্তু এখনও আশার নিবৃত্তি নাই। ক্রমে অন্য দেশের ভদ্র সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে তাহাদের ইচ্ছা হয়। যে সকল ব্যক্তি বিলাস চরিতার্থ করাই ঐহিক জীবনের আদর্শ বলিয়া বুঝে, তাহারা এইরূপ স্বতপ্রসূত লালসার দাস। তাহারা অন্য কিছুর ভাবনা ভাবে না। আমাদের জীবন যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মে নিয়মিত ইহা তাহারা দেখেও না বা জানেও না। তাহারা ঐ নিয়ম বুঝিবারও চেষ্টা করে না। যখন অতৃপ্ত বাসনারূপ কর্কটরোগে তাহাদের আত্মার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিনষ্ট হওয়ায় তাহাদের জীবনী শক্তির অপচয় হইতে থাকে, তখন কিরূপে তাহারা সুখ ও শান্তির আশা করিতে পারে? খুব বেশীর ভাগ লোকই পান ভোজন, মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ ও সকল প্রকার বিলাস ও আমোদ প্রমোদ উপভোগকেই জীবনের লক্ষ্য মনে করে। তাহাদের এই অতৃপ্ত বাসনা তাহাদের সন্তানসন্ততিতে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়া থাকে। তাহারা মরিয়া গেলে ঐ সন্তান সন্ততিরা আবার তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে থাকে। সরল জীবনের উপদেশ তাহারা কখন প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনই শুনে নাই যে, আমাদের অভাব যতই পূর্ণ হইতে থাকে, ততই আবার বৃদ্ধি পায়। আহার সামগ্রী, পোষাক পরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদিগের যতই সুখ স্বচ্ছন্দ হইতে থাকে, ততই আবার ঐ ঐ বিষয়ের চিন্তাও প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া দাঁড়ায়। কেন না তোমরা দেখিতে পাইবে যে, যাহারা বেশ ভাল খাইতে পরিতে পায়, তাহারাই বেশী বেশী রকম খাওয়া পরার ভাবনা ভাবিয়া থাকে। আমাদিগের এই প্রকার অভাব ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের জীবনও জটিল হইয়া থাকে;

কেননা, সরল জীবন অতিবাহিত করিবার সরল পন্থাগুলি প্রতিযোগিতা রাক্ষসীর সহিত পারিয়া উঠে না। যাহারা সরল ও নির্দোষ, তাহাদিগকে এই রাক্ষসীর করাল কবলে কবলিত করিয়া নিরন্তর ধ্বংশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ব্যভিচার ও পাপ জটিল জীবনের নিত্য সহচর। আমরা যত দিন বাসনা, ইন্দ্রিয় ও অভাব নিচয়ের শাসনাধীন থাকিব, ততদিন আমাদিগকে উহাদের দাস স্বরূপ থাকিতে হইবে। ভালমন্দ যে কোন উপায়েই হউক আমাদিগকে ঐ প্রভুগুলির সেবা করিতে হইবে। তখন আমরা আমাদিগের উন্নত জীবনের উপযোগী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী দেখি না; তখন নানা অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াই সুখী হই। আমাদিগের জীবনের উপর তখন যেন এক খানি পুরু পর্দ্দা খাটান থাকে; তাই, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্য আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় না। শঠতা, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, অহঙ্কার, আত্ম গরিমা; উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ধনলিপ্সা বিদ্বেষ, ইন্দ্রিয় সুখ লালসা, ঈর্ষা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, কাম ও বিবাদ বিসম্বাদ বিলাসীদিগের অন্তঃকরণে প্রবল ক্ষমতা বিস্তার করিয়া থাকে; যাহারা জীবনে বিলাস পরায়ণ, তাহাদিগের কল্পিত অভাব এবং বাসনাও অধিক; সুতরাং তাহারাই উপরোক্ত দোষগুলির আকর। যে ব্যক্তি সরল জীবন যাপন না করে, তাহারই চরিত্র ঐ সকল দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে।

যে সভ্যতা ঐ সকল দোষের প্রশ্রয় দেয়, যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে লোক চরিত্রের উন্নতি না হয়; এবং যাহা সর্ব্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে কার্য্যতঃ পরিব্যক্ত হইবার সুবিধা প্রদান না করে, আমরা সে সভ্যতাকে সভ্যতা বলি না। বাণিজ্য নীতি এই তথা কথিত সভ্যতার ভিত্তি। ইহার কুফল অত্যন্ত ভয়ানক। অপর পক্ষে, প্রকৃত সভ্যতার মূল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ। ইহার প্রভাবে লোকের অন্তর প্রকৃতির উন্নতি সাধন হইয়া থাকে। লোকে সরল জীবন যাপন করিতে ও জীবনের উন্নতভূমি সুলভ নৈতিক আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী পালন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

মনুষ্যের মধ্যে মানবকায় বিশিষ্ট অতীব হিংস্র ব্যাঘ্র কিম্বা কুৎসিৎস্বভাব পশু কিম্বা বিষধর সর্প বিদ্যমান আছে। উহাদিগের শরীরে মহামূল্যবান পরিচ্ছদ থাকিলে তাহাতে কি সুফল ফলিয়া থাকে?

পাশ্চাত্য সভ্যতায় জটিল জীবনের সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। মানব জাতি উহাতে একটী শিক্ষাও পাইয়াছে। আবার, সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা

সরল জীবনের তথ্য সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন। সুস্থ, পবিত্র, নৈতিক, নিঃস্বার্থ ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে হইলে একটী লোক কত অল্পের মধ্যে পারে, সে কথারও মীমাংসা ভারতীয় সভ্যতা করিয়া দিয়াছেন। এ কথা পাশ্চাত্যদিগের মনে উদয় হয় না; কেন না, তাঁহারা মনে করেন সরল জীবনের অর্থই—দারিদ্র, এবং দারিদ্র বিধাতাপ্রদত্ত শাস্তি। কিন্তু ভারতে এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা দরিদ্র্যকে মহাসুখের অবস্থা মনে করেন; কেননা, যে দরিদ্র, সে সর্ব্বদা ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে; তাহার আত্মা অতীন্দ্রিয় ভূমিতে বিচরণ করিতে শিক্ষা করে।

আচ্ছা, নিজেদের মনের মধ্যে একটু ভাবিয়া দেখা যাউক খুব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে হইলে জড় জগতের কয়টী জিনিষ আমাদের আবশ্যক, ক্ষুধা তৃষ্ণা স্বাভাবিক বৃত্তি। উহা নিবারণের নিমিত্ত উত্তম পুষ্টিকর আহার্য্য ও নির্ম্মল জল আবশ্যক। শরীরকে আচ্ছাদিত করিবার জন্যও শীতাতপ হইতে উহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একটী সাদাসিদে পোষাক আবশ্যক। একটী স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, নির্ম্মল বায়ু ও মুক্ত বায়ুতে ব্যায়ামের প্রয়োজন। এই কয়টী লইয়া এখানকার কয়জন ব্যক্তি বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন? উপরোক্ত দ্রব্যগুলি যথেষ্ট পাইয়াছেন বলিয়া অন্য কোন প্রকার অভাব মনে করিয়া আর দুঃখ করেন না, এরূপ ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে কয়জন আছেন? সুন্দর স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তির পক্ষে উহাপেক্ষা আর কিসের প্রয়োজন হইয়া থাকে? যদি আমরা উহা লইয়া জীবন ধারণ করি, তবে আমাদিগের স্বাস্থ্য লইয়াই বা খুঁত খুঁত করিতে হইবে কেন? প্রকৃতি আমাদিগকে সুস্বাস্থ্য দিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার নিয়মাবলী লঙ্ঘন করিয়া থাকি। ঐহিক জীবনের পক্ষে নির্ম্মল বায়ু ও জল নিতান্ত আবশ্যক। প্রকৃতি আমাদিগকে উহা যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াছেন। যেরূপ খাদ্যে আমাদিগের শরীর সুন্দর রূপে পুষ্ট হয় এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ হইয়া থাকে, প্রকৃতি সেরূপ খাদ্যও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করিয়া থাকেন। যখন আমরা প্রকৃতি সুলভ দ্রব্যেই জীবন ধারণ করতঃ শান্তি উপভোগ করিতে পারি, তখন আমরা সুখী না হই কেন? না হইবার কারণ—আমাদিগের বাসনা। আমরা আমাদিগের বাসনানুরূপ নূতন নূতন রুচি গঠন করিয়া বসি। আমারা শুধু আমাদিগের দেহ পুষ্ট করিতে চাহি না; আমরা আমাদিগের অহঙ্কার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অহমিক স্বার্থপরতা এবং পাশবিক প্রবৃত্তিও পরিপুষ্ট করিতে চাহি। এই কারণেই

আমাদের অন্যান্য কতকগুলির জিনিষের অভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। উপরোক্ত দোষগুলির বশতাপন্ন হওয়ায় আমরা নির্ব্বোধের মত মনে করি যে ঐ সকল দ্রব্যগুলি খাদ্য ও বায়ুর মত অপরিহার্য্য। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে এক এক শ্রেণীর জন্য এক একটা খাদ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু মানবের কোন খাদ্যই নির্দ্দিষ্ট নাই। মনুষ্যগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব বাসনা ও অবস্থানুসারে বিশেষ বিশেষ রুচি গঠন করিয়া লইয়াছে। কেহ কেহ শুধুফল খাইয়া থাকেন; কেহ কেহ শাক সব্‌জী আবার কেহ কেহ বা শস্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন। কাহার কাহার মাংসের প্রয়োজন হয়। আবার এমন লোক বিস্তর আছে, যাহারা রাশি রাশি পশুমাংস ও প্রচুর পরিমাণে কাফি বা মদ্য না হইলে বাঁচে না। আবার এরূপ মনুষ্য বিস্তর আছে, যাহাদিগকে সর্ব্বভূক বলিলেও বলা যায়। কোনরূপ খাদ্য সংস্কার করা আমার অভিপ্রেত নহে। এক দল বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি আছে; তাহারা খাদ্য সংস্কার প্রচার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমি ঐরূপ ব্যক্তিবর্গের দলভুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বাসনা ও ধারণা অনুসারে লোকের রুচি কেমন পৃথক পৃথক রূপ হইয়া পড়ে, আপনাদিগকে এইটুকু বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। আমরা নিজেরাই আমাদের রুচি গঠন করিয়া লই, আর বলিয়া থাকি যে, উহা না হইলে আমরা বাঁচিনা। আমার মনে আছে, যখন আমি প্রথমে লণ্ডনে আসি, আমার বন্ধুগণ আমাকে কাফি খাইতে অনুরোধ করেন। ভারতে থাকা কালে আমি শুধু নির্ম্মল জল পান করিতাম বলিয়া কাফি খাইতে পারিলাম না। অনেক দিনের সাধনার ফলে আমি কাফি খাওয়া অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলাম এবং পরে বেশ বুঝিলাম যে, এই রুচিটী আমার স্বোপার্জ্জিত। আরও অনেক অনেক দ্রব্য আছে, তাহাও আমরা সর্ব্বদাই পানাহার করিয়া থাকি। ঐরূপ পানাহারের রুচিও আমাদের স্বোপর্জ্জিত, কৃত্রিম। উহা স্বাভাবিক নহে। ঐ সকল দ্রব্য যে কেন আমাদিগের আবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছে, যখন আমরা তাহা বুঝিতে পারি তখন উহা না হইলেও আমাদের চলে। আমি এমন অনেক ব্যক্তিকে জানি যাঁহারা কাফি, চা, মাংস পরিত্যাগ করতঃ বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেছেন।

সরল জীবনে ব্যয় বাহুল্য নাই। উহা কোন আড়ম্বর ও সজ্জিত গৃহের উপর নির্ভর করে না। আমাদিগের অভাব পূর্ণ করিতে ও ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রত্যহ সহস্র সহস্র নির্দ্দোষী প্রাণীর বধ-সাধন হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির পাকস্থলী

উঠিয়াছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ হিন্দু কৃষকদিগের করুণামূলক নীতি ও নির্ম্মল নিঃস্বার্থপরতা ভাবিয়া দেখ। উহারা ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় গো-মেষাদি পশুগুলিকে খাইতে দিয়া নিজেরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, তবুও তাহাদিগের মাংস খাইবে বলিয়া তাহাদের গলায় ছুরি দেয়নাই ভারতে হিন্দুরা অনশনে মৃত্যুমুখে পড়িলেও এই সকল বেচারা বোবা প্রাণীদিগকে হত্যা করেন না; কেননা, তাঁহারা ইহাদের জীবনকেও নিজেদের জীবনের মত প্রয়োজনীয় মনে করেন। ইহাদিগকে হত্যা করা অপেক্ষা বরং তাঁহাদের নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে খুব নির্ব্বোধ মনে করিতে পারেন; তাঁহারা অবশ্য মাংসপ্রিয়দের হিসাবে তাঁহারা নির্ব্বোধই বটেন। যদি আপনারা হিন্দুদিগের সম্বন্ধে বিচার করিতে চান, তবে মনুষ্যত্বের দিক দিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজের নিজের মাপ কাঠিতে মাপিতে হইবে। সরল জীবনের আদর্শ বুঝিতে হইলে জটিল জীবনের আদর্শ দ্বারা বুঝিতে গেলে হইবে না। ভারতে, সরলজীবনের শিক্ষা প্রচার করিবার প্রয়োজন হয় না; কেননা, খুব বেশী লোকই যেন সরল জীবনের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ; ভারতে, না ছিল আড়ম্বর, না ছিল বিলাসগৃহ (Saloon)। বিলাস-প্রসূত পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতবাসীর মধ্যে ঐ সকল কদভ্যাস প্রচলিত করিতেছে। সরল জীবনই ভারতবর্ষীয়দিগের আদর্শ স্থানীয় ছিল।

অন্য কোন জাতি হিন্দুগণকে সরল জীবন যাপন করিবার উপদেশ দিতে পারে না। হিন্দুদিগের নিকটে বসিয়া পাশ্চাত্যগণকে এতদ্‌বিষয়িণী শিক্ষা লাভ করিতে হয়। ধর্ম্ম প্রচারক ভারতে যাইয়া জটিল জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনই করেন। জটিল জীবন তাঁহাদের ধর্ম্মের ফল বলিয়া তাঁহারা গর্ব্ব অনুভব করেন। কিন্তু তাঁহাদের এ কথাটী স্মরণ থাকে না যে,তাঁহাদের ধর্ম্মের যিনি প্রবর্ত্তক তিনি একজন প্রাচ্যব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং অন্যান্য প্রাচ্য ধর্ম্মকার্য্যের ন্যায় ইনি সরল জীবন অতিবাহিত করিয়া ছিলেন এবং স্বীয় শিষ্য শাখার মধ্যে প্রচার করিয়া ছিলেন যে, সকলেরই সরল জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য, সঞ্চয়ের দিকে কাহারও লক্ষ্য রাখা উচিত নহে, ভগবানে সতত বিশ্বাস রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য, সকলেই তাঁহার সন্তান, তিনি স্বীয় সন্তানের আহার্য্য যোগাইতে সতত প্রস্তুত। তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন:—"আকাশের পাখী দেখ; উহারা শস্যাদি বপন করে না, কর্ত্তন করে না, গোলাঘর বাঁধিয়া শস্য সঞ্চয় করে না। তত্রাচ, তোমাদিগের স্বর্গীয় পিতা উহাদিগকে আহার প্রদান

করিতেছেন। তোমরা কি উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়?"—(মথি, ৬।২৬) "অতএব আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি যে, তোমরা স্ব স্ব জীবনের ভাবনা ভাবিওনা। দেহের ভাবনাও করিও না, কি পরিধান করিবে সে চিন্তারও প্রয়োজন নাই। জীবটী মাংসাপেক্ষা ও দেহটী পরিচ্ছদ অপেক্ষা কি অধিক নহে?" (মথি, ৬।২৫) যাঁহারা সঞ্চয় বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সরল জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারাই যথার্থ খৃষ্টান। যাঁহারা জটিল জীবন যাপন করেন অথচ আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা প্রকৃত খৃষ্টান নহেন। ভারতে তথা-কথিত পৌত্তলিকদিগের মধ্যে বিস্তর প্রকৃত খৃষ্টান দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য দেশের তথা কথিত খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রকৃত খৃষ্টান খুব কমই দেখা যায়।

যাঁহারা সরল জীবন অতিবাহিত করেন তাঁহারা পৃথিবীর গৌরব স্বরূপ (অর্থাৎ মহা উপকারী)। তাঁহারা সুখী। পুরুষই হউক বা স্ত্রীই হউক ভারতে যাঁহার অভাববোধ খুব কম, তাঁহাকে মুক্তির সন্নিকট বিবেচনা করা হইয়া থাকে। সেকারণে তাঁহাকে জাতির আদর্শ মনে করা হয়। সাধারণের চক্ষে, তিনি দেবতুল্য। কত কত রাজা, রাজপুত্র ও ক্রোর পতি সরল জীবন যাপন করিবেন বলিয়া রাজসিংহাসন, রাজপ্রাসাদ, ঐশ্বর্য্য, বিলাস-বিভব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐরূপ জীবনকেই তাঁহারা চরম আদর্শ বলিয়া মনে করেন। ভারতের শত শত স্ত্রীপুরুষ, যুবক বৃদ্ধ বাসনা সংযত করতঃ সরল জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু কয় জন আমেরিকাবাসী উহা করিতে পারেন?

সরল জীবন অর্থে সন্ন্যাস জীবন (Life of Retirement) বুঝিতে হইবে না। উহার অর্থ এরূপ নহে যে, আমাদিগকে সংসারত্যাগ করিয়া অরণ্য বা গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমাদিগের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনপথে নিয়মাবলিতে নিয়মিত সেই নিয়মের ষোল আনা পালনই সরল জীবনের অর্থ। ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই জীবনে জটিলতা আসিয়া পড়ে। জটিলতা কিনা বিলাস দেখা দিলেই ব্যাধি, চাঞ্চল্য, দুঃখভোগ, পাপ, অজ্ঞান, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অর্থলোলুপতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

সরলতা প্রকৃতির অভিপ্রেত। প্রকৃতি মানুষকে এমন করিয়া গঠন করিয়াছেন যে, মনুষ্য দ্বারা জীবনের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে। ঐ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ক্রমোন্নতি পদ্ধতির অন্ত পর্য্যায়ে সিদ্ধ হইতে পারে

না। যখন আমরা সেই লক্ষ্যটী বুঝিতে পারি, আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনে তাহার পরিচয় দিতে পারি। তখনই আমরা মানব নামের যোগ্য হইয়া থাকি। যে মনুষ্য জটিল জীবন যাপন করিয়া থাকে, তাহাকে মানুষ বলাও যায় না, পশু বলাও যায় না; সে তখন বারো চৌদ্দটা ভিন্ন ভিন্ন ইতর প্রাণীর সমবায় স্বরূপ। সে বাস্তবিকই একটী অদ্ভুত জীব। যত দিন মানুষ পাশবিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয়, বাসনা ও অভাবের দাসত্ব করে, ততদিন সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথ হইতে দূরে অবস্থিত থাকে। দেহ ও মনের উপর যাহাদের প্রভুত্ব আছে, তাহাদেরই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সরল জীবনের মূলে-সংযম আবশ্যক। এই আত্মসংযম বলিতে ইন্দ্রিয়, অভাব ও পাশবিক প্রবৃত্তির দমনও বুঝিতে হইবে। যেখানেই সরল জীবন, সেখানেই ষোল আনা আত্ম-সংযমের প্রকাশ হইয়া থাকে। সকল প্রকার সদ্‌গুণের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেখানেই আত্মসংযম, সেখানেই ভালবাসা সহানুভূতি, ন্যায়-পরতা, সত্যবাদিতা, স্বাধীনতা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি নিচয়ের অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, সরল জীবন বলিতে আমরা মাত্র পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর শূন্যতা, বিলাস বিহীন বাসগৃহ ও নিরামিষ খাদ্য বুঝি না। উহাতে আমরা আত্ম-সংযমের অনুশীলন বুঝিয়া থাকি। এই আত্ম-সংযমের বলে মানুষ ইন্দ্রিয়, বাসনা ও অভাবের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হয়। সরল জীবন ও দারিদ্র্য এক জিনিস নহে। উহাতে অজ্ঞতাও বুঝিতে হইবে না। মনের প্রকৃত শিক্ষা হইলেই এই সরল জীবন দেখা দেয়। যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী আমাদিগের উচ্চস্তরের জীবন পরিচালন করে এবং যাহা আমাদিগকে জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যের কথা বলিয়া দেয় উহার প্রভাবে আমরা সেই নিয়মগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। ইহা উচ্চতম শিক্ষার এবং আত্মার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্ফুরণের ফল। ইহাতে আত্যন্তিক ধন-পিপাসাসম্ভূত কৃপণতা বুঝায় না। বাস্তবিক একজন কৃপণ অতি সামান্য ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে; কেন না, সে নিজের জন্যও ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক। সে অনিচ্ছার মূলে তাহার ঘোর স্বার্থপরতা ও আসক্তি বিদ্যমান থাকে। সরল জীবনের প্রভাবে মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া উঠে ও ইহা অন্যের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা হৃদয়ে আনিয়া দেয়। আমরা নিজেকে যেমন ভালবাসি, নিজের ভাবনা যেমন ভাবিয়া থাকি, ইহা আমাদিগকে পরের ভাবনা সেইরূপ ভাবিতে, পরকে সেইরূপ ভালবাসিতে

শিক্ষা দেয়। তা'ছাড়া, ইহার প্রভাবে মানুষ সকলের প্রতি দয়ার্দ্র ও দানশীল হইয়া উঠে। ইহা হৃদয়কে পবিত্র করে এবং মানব জাতির মঙ্গলের জন্য তথায় আত্ম-ত্যাগ গুণটীকে জাগরিত করিয়া তুলে।

চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে সরলতাও সরল জীবনের অন্তর্গত। চিন্তা সমুদয় বাক্য ও কার্য্যের পশ্চাতে বিদ্যমান থাকে। হৃদয় (একটী চিন্তায়) পরিপূর্ণ হইলেই মুখ কথা বলিতে ও হস্ত কার্য্য করিতে থাকে। যে ব্যক্তি সরল ও অকপট চিন্তা করিয়া থাকে সে সেই চিন্তা দ্বারাও উপকৃত হয়; আবার সেই চিন্তা যাহাকে জ্ঞাত করান যায়, তাহা দ্বারাও সাহায্য প্রাপ্ত হয়। নিজের ভাবনা আমাদিগের বেশী ভাবিতে নাই। অন্যের ক্ষতি করিয়া আমাদিগের ধনী হইবার চেষ্টা করিতে নাই। অন্যের অনিষ্ট চিন্তা বা নিজের মঙ্গলের জন্য অন্যের সম্পত্তি হরণ করিয়া ভোগ করিবার মতলব আমাদিগের করিতে নাই। আমাদিগের প্রতিবাসীরা সৌভাগ্যশালী হইলে আমাদিগের তাহাতে সুখবোধ করা কর্ত্তব্য। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, সমগ্র মানব জাতি এবং জীব মাত্রেরই জন্য আমাদিগের শুভ চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, জীব মাত্রই সেই অখণ্ড বিরাট ব্রহ্মের সহিত সংস্পৃষ্ট। আমরা সকলেই তাঁহার অংশ। সুতরাং তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমরা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী।

ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর সরলতম বস্তু; তাঁহার জটিলতার লেশও নাই। যখন আমরা তাঁহার বিষয় চিন্তা করি এবং আমাদিগের অন্তঃকরণে তাঁহার সত্তা অনুভব করি, তখন আমাদিগের চিত্ত সরল হইয়া আইসে। সেই পরাৎপর সমস্ত প্রাণীরই হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই মহান্ সত্যটী মনে করিয়া অন্যান্য দেহস্থ ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। চিন্তা এইরূপ ভাবে সরল হইয়া উঠিলে নির্ম্মল শান্তি ও সুখ মনে দেখা দিবে এবং পরিশেষে আমরা নির্দ্দোষ ও ঐশী প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া উঠিব। চিন্তা সরল হইয়া উঠিলে কার্য্যে ও বাক্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমাদিগের এরূপ কঠোর বাক্য বলিতে নাই, যাহাতে কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় বা কাহার মনে বেদনা লাগে। আমাদের কথাগুলি যেন সকলের প্রতিই শুভাশীর্ব্বাদ স্বরূপ হয়। বাক্যের সরলতা অভ্যাস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাদীতা আসিয়া দেখা দিবে। ঐ দুটী গুণ এক সঙ্গেই বিচরণ করে। পৃথিবীতে সত্যের ন্যায় সরল আর কিছুই নাই। যেখানে মিথ্যাকথা সেই খানেই বাক্যের

বনা আমরা কখনই এরূপ কার্য্য করিব না। এইরূপ অন্যায় কার্য্যে বিরতি অভ্যাস হইলেই কার্য্যে সরলতা গুণ আমাদিগের আয়ত্ত হইবে। এইরূপে চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে সরল হইয়া সংসারে আমাদিগের বাসকরা উচিত। জীবনের সরল সরল কর্ত্তব্য গুলি পালন করিয়া সরল ও নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ গুলি উপভোগ করিয়া আমাদিগকে জীবন কাটাইতে হইবে। যেরূপ আমোদ প্রমোদে চরিত্র দুষিত হয় বা সুখ ভোগের তৃষ্ণা কিম্বা জড়জগতের ক্ষণ-ভঙ্গুর পদার্থের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেরূপ আমোদ প্রমোদ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। এরূপ অভ্যাসটী হইলে এবং ইন্দ্রিয়, বাসনা ও অভাবের উপর আত্ম-সংযমের ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিলে যথার্থ শান্তি আমাদিগের করায়ত্ত হইবে। সরল জীবনের গুণে আমরা সকল প্রকার অবস্থার উপযোগী হইয়া চলিতে সক্ষম হইব। তখন অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদিগকে আর স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত হইতে বা পাগলা গারদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না।

যিনি সরল জীবন অতিবাহিত করেন, তিনি যীশু খৃষ্টের ন্যায় মানব জাতির বন্ধু। তিনি অন্যের জন্যই জীবন ধারণ করেন এবং দেহ দ্বারায় তিনি যাহাই কেন করুন না সে সমুদয়ই পৃথিবীবাসীদের জন্য নিবেদিত হইয়া থাকে। মানব জাতির হিতার্থে উৎসর্গ করিবার জন্যই তিনি জীবন ধারণ করেন। পৃথিবীবাসীরা তাঁহার জীবনকে একটা শান্তির নির্ঝর মনে করে। তিনি মানব জাতির আদর্শ। তিনি যে শুধু মানব জাতিরই অকপট বন্ধু তাহা নহে, তিনি বুদ্ধেরমত ইতর প্রাণীরও মহা হিতৈষী। এক ব্যক্তি বলি দিবার উদ্দেশে একটি ছাগ লইয়া যাইতেছিল ; বুদ্ধ ঐ ছাগটীর জীবনের বিনিময়ে স্বীয় দেহ দিতে চাহিয়া ছিলেন, তিনি যে শুধু প্রাণী বৃন্দের দুঃখেই দুঃখিত হন, তাহা নহে, তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় যাবতীয় সজীব বস্তুর প্রতিই করুণার্দ্র হইয়া উঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঘাসের উপর দিয় হাটিতে পারিতেন না। তাঁহার কষ্ট বোধ হইত। যদি কেহ ঘাসকে পদ দলিত করিয়া যাইত বা কোন গাছের একটী পল্লব বা শাখা ছিন্ন বা ভগ্ন করিত, তবে তিনি তাহাতে মর্ম্মাহত হইতেন; কেননা, যে জাগতিক আত্মা সমুদয় স্থাবর জঙ্গমে পরিব্যাপ্ত আছেন, তিনি সেই আত্মার সহিত একীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রকৃত সরল জীবনের ফল এইরূপ। স্বর্গীয় পিতা যেরূপ নির্দ্দোষ, উহা ইহ

বিবাহ ও পণপ্রথা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

বিবাহে পণ প্রথার নিদারুণ নিষ্পেষণ ইদানীং এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহার ফলে সমাজের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে ঘরে করুণ রোদনের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। এমন পরিবার বঙ্গদেশে অতি কমই আছে যেখানে ইহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির বিকট দংষ্ট্রা দর্শন ভীতি কন্যা কর্ত্তার বদনে কালিমা অঙ্কিত করে নাই। স্বচক্ষে যে সব দুর্দ্দশার দৃশ্য দেখিয়াছি তাহাই এতৎ পক্ষীয় প্রমাণ স্বরূপে যথেষ্ট। ইহার বিরুদ্ধে নিপুণ নাট্যকার স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, 'বিবাহ বিভ্রাটে' আরদ্ধ হইয়া 'বলি দানে' তাহা পর্য্যবসিত হইয়াছে; কিন্তু এইসব নাট্যকারের কল্পনাশক্তিকে পরাস্ত করিয়া বাস্তব জগতে ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটি করুণ অভিনয় হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ও লোমহর্ষণ কর। 'বলিদানের' নিপুণ কবি কন্যাকর্ত্তাকেই এই পণ প্রথার যূপে বলিদান দিয়াছেন, অকলঙ্ক স্বর্গের কুসুম কুমারী বলিদানের কল্পনা বুঝিবা তাঁহার মস্তিষ্কেও উদিত হয় নাই, অথবা তাহা কল্পনা করিতেও বুঝি তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু স্নেহলতা স্বয়ং তাহা পূরণ করিয়াছে—কবির কল্পনা যাহা সাহস করে নাই, বঙ্গের কুমারী তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া সমাজের সমক্ষে যেমন তাহার নিজের মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন তেমনই সমাজের মুখেও দুরপণেয় কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছে! সমাজ তাহার উচ্চ পদগৌরব স্পর্দ্ধা লইয়া, উচ্চ শিক্ষার অভিমান লইয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুচীকির্ষা সাফল্য লইয়া যে জগতের সম্মুখে স্ফীত বক্ষে বঙ্গের প্রাধান্য ঘোষণ করিতেছিল তাহার সে দর্প চূর্ণ হইয়াছে, সে গর্ব্ববিলীন হইয়াছে সে আজ ক্ষোভে ধিক্কারে লজ্জায় হতমান হইয়া মুখ অবনমিত করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহার কোলে এখনও কুমারী বিবাহ দায়ে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়—বরের অভাব বলিয়া নহে—বরের অর্থপিপাসা শান্তির ক্ষমতার অভাবে পিতাকে অপমান লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইবার জন্য, পিতার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা দেখিয়া আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া সকল যন্ত্রণার, সকল লাঞ্ছনার অবসান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়, যাহার কোলে পণ যৌতুকের জ্বালাকর তাপে অস্ফুটস্ত কলিকা দগ্ধ হয়—তাহার আবার দর্প—তাহার আবার গর্ব্ব—তাহার আবার উচ্চপদের অভিমান; যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের

হইয়া থাকে তবে যতশীঘ্র এই তথাকথিত উচ্চ শিক্ষার মূল উৎপাটিত হয় ততই মঙ্গল! কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষোচিত সদ্‌গুণের বিকাশ— মানব চরিত্রের গঠন! এই চরিত্রগঠন যদি এইভাবে সাধিত হয় তবে সে শিক্ষা কি শিক্ষা? বি, এ, এম্, এ; পাশ হইয়াও যুবকগণ যদি শ্বশুরের রক্ত শোষণই অর্থোপার্জ্জনের মুখ্য উপায় বলিয়া মনে করেন তবে ধিক্ সে শিক্ষায়! ধিক্ সে উপাধি লাভে! দুঃখের বিষয় এম্, এ, বি, এল্ প্রভৃতি পাশওয়ালা পিতৃগণও স্বীয় স্বীয় পুত্রের বিবাহ প্রসঙ্গে অনেক সময় এইরূপ পীড়ন করিতে একটুও লজ্জিত হননা, অথচ তাঁহারাই দেশের নেতৃদলের আসন গ্রহণে সমুৎসুক—দেশের মস্তকরূপে পরিচিত—তাঁহারাই বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান।

কিন্তু আমরা বলিব যে, এই শিক্ষা হিন্দুর শিক্ষা নহে। এই অর্থের প্রতি অত্যন্তানুরক্তি, যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহের প্রবৃত্তি—ইহা হিন্দুর শিক্ষা নহে, ইহা হিন্দুর সাধনা নহে—ইহা নূতন আমদানী! অনেকে বল্লালীকেই ইহার জন্য দায়ী করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের নিকট একথা সমীচিন বোধ-হয় না। বল্লালীয় আর শতদোষ থাকুক বর্ত্তমান রীতির পণযৌতুক প্রথা বল্লালীয় আমলে ছিলনা। বল্লালীমতে কৌলিন্যরীতি অনুসারে সম্মান পাইবার যোগ্য কতকগুলি ঘর বাঁধা ছিল তাঁহারা স্বীয় স্বীয় বংশ মর্য্যাদা অনুসারে ৫১৲ কি ৩১৲ কি এরূপ একটা টাকা পাইতেন। অলঙ্কার তৈজস পত্রাদির চাপাচাপিও আদৌ ছিলনা। আমরাও বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, এইরূপ হৃদয় হীনতার সহিত দর-কসা-মাজার প্রথা সে সময় অন্ততঃ আমাদের পল্লীগ্রামে প্রচলিত ছিল না। বর্ত্তমান শিক্ষার মোহেই এই নিলামের দর ডাকিবার প্রথা সৃষ্টি হইয়া শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার বর্ত্তমান সংহার মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে রাজা জমিদার প্রভৃতির ঘরে বধূর আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে দরিদ্র ঘর হইতেই সুলক্ষণা কন্যা নির্ব্বাচিতা হইত। কন্যার সদ্‌গুণ ও সামুদ্রিক সুলক্ষণই যেন কন্যা বিবাহের প্রধান উপাদান ছিল। যে কন্যার যেরূপ সৌভাগ্য হইত, তাহার বিবাহের উপযুক্ত ব্যয় বরপক্ষই সানন্দে বহন করিতেন, কন্যার পিতার সেজন্য কিছুমাত্রও বেগ পাইতে হইতনা। আর যাহাদের সেরূপ ভাগ্য হইতনা তাহারা সমান ঘরেই সাধ্যমত ব্যয়ে বিবাহিতা হইত। নিষ্কুল ব্যক্তিগণকে বরং কন্যাকেই অর্থদ্বারা সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু কন্যাবিক্রয়ীকে সমাজ ভালচক্ষে দেখেন নাই। সমাজে তাঁহার স্থান অতি

মর্য্যাদাসম্পন্ন লোকের সহিত পংক্তি ভোজনের সম্মান হইতে বঞ্চিত হইতেন। আর রাজা জমিদার বা ঐরূপ উচ্চপদ সম্পন্ন ব্যক্তিগণের কন্যার জন্য সদ্বংশীয় সুপাত্র অনুসন্ধান করা হইত, পাইলে কন্যা জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ জায়গা জমি দিয়া 'দম্পতী' প্রতিষ্ঠিত করা হইত। এইরূপ দম্পতী প্রতিষ্ঠা একটা বিশেষ পূণ্য কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। এখনও বঙ্গের গ্রামে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ আনীত বা প্রতিষ্ঠিত দম্পতীর বংশ অপ্রাপ্য হইবেনা।

কিন্তু আজকাল কুলীন অকুলীন ভেদ নাই—সামাজিক হিসাবে যাহার বংশ মর্য্যাদা কিছুমাত্র নাই সেও একটু ইংরাজি লেখাপড়া জানিলে এখন নৈকষ্য কুলীনের ঠাকুর দাদা হইয়া পড়ে; তার কামড় কত। কন্যার রূপগুণ বিচারও এখন অতি গৌণ কর্ম্ম! টাকাই মুখ্য—টাকাই পরমার্থ! টাকার জোরে অতি কুরূপাও শ্রেষ্ঠ পাত্রীরূপে গৃহীতা—টাকার অভাবে অতি সুলক্ষণাও দুর্ভাগিনী।

সমাজের যাঁহারা উচ্চপদস্থ, তাঁহাদেরই মধ্যে এই দশা! ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেই এই দোষ মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, কেননা তাঁহারা যে সর্ব্ব বিষয়েই সমাজের আদর্শ স্থল। ধিক্ আমাদিগকে!

বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায়, আঢ্যপিতা কন্যার জন্য দরিদ্র সুপাত্র মনোনীত করিয়া তাহাকে নিজ অর্থব্যয়ে সুশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন; ইহাতে আমি কোন দোষ দেখিনা—প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশের স্বনামধন্য অনেকানেক মহানুভব মহোদয়কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা সাগ্রহেই কন্যার ভাবী সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য উপায় বিধান করিতে যত্নপর হন। তাঁহাদের এইরূপ কার্য্যে যেমন কন্যার প্রতি স্নেহের পরিচয় পরিস্ফুট, অন্যদিকেও এইসূত্রে কতকগুলি প্রতিভাবান্ যুবকের প্রতিভাবিকাশের সুবিধা হয়। হয়ত এইরূপ বৈবাহিক সুযোগ না ঘটিলে ঐসব যুবক সংসারে নিজের উন্নতির পথ পরিস্কার করিয়া লইতে পারিতেন না। দারিদ্রের নিস্পেষণে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া শিক্ষার্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া পিতামাতা প্রভৃতির পোষণের জন্য জীবিকার্জ্জনের উপায় অন্বেষণ করিতে হইত। কিন্তু এইরূপ সুযোগ ঘটাতে তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছেন; এরূপ কার্য্য প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য। ইহার মধ্যে পণপ্রথার রাক্ষসী মূর্ত্তির অস্তিত্বও নাই; বরং তদ্বিপরীত দেবভাবেরই সম্পূর্ণ বিকাশ ইহাতে দৃষ্ট হয়। ইহাই হিন্দুর ভাব, হিন্দুর শিক্ষা, হিন্দুর সাধনার দৃষ্টান্ত। আর যিনি অগাধ অর্থের মালিক হইয়াও ছেলের বিবাহে সোণারূপার বাসন ও হীরাজহরতের অলঙ্কারের ফর্দ্দের ভার

কন্যার পিতার মস্তকে চাপাইয়া দেন তাঁহার সেটা কোন্ রাক্ষসীবৃত্তি তাহা সকলে বিচার করুন।

এইরূপ ভয়ানক প্রথারও সমর্থনকারী আছেন, ইহা-শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়! আবার সেই সমর্থনকারী একজন দেশপ্রসিদ্ধ মহাত্মা ব্যক্তি ইহা শুনিলে আরও চমকিত হইতে হয়—স্বতঃই মনে হয় ইহাও কি সম্ভব?

সেদিন এই স্নেহলতার জীবন বলির উপন্যাস কোন বন্ধুর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিলেন,—'আর কথায় কাজ কি, স্বয়ং ডি, এল্, রায় যাহার তোমরা এত ভক্ত তিনিও এই প্রথার পরিপোষক!" আমি সজোরে বলিলাম "মিথ্যা কথা।" বন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—এই বছরের ১৩২০ সালের পৌষসংখ্যা "সাহিত্য" খানাতে দ্বিজেন্দ্র প্রসঙ্গ "পড়িয়া দেখিও।" বন্ধুরপরামর্শ মত অন্য এক বন্ধুর নিকট হইতে ঐসংখ্যার 'সাহিত্য' খানি আনিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিলাম এবং তাহাতে পণপ্রথার অনুকূলতার কয়েকটী ছত্র দেখিতে পাইলাম তাহা এই:—

"পণগ্রাহী লোভপরায়ণ পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "পণগ্রহণ আমি অন্যায় মনে করিনা। যেদেশে বাল-বিধবা ব্রহ্মচারিণী দেবীর অভাব নাই, সেদেশে যোগ্য পণ দানে অক্ষম দরিদ্র পিতার কুমারী কন্যা কেন যে দু দশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিবে না বুঝা যায়না। পিতার পক্ষে পুত্র ও কন্যা কেহই কম আদরণীয় নহে। কন্যাকে জন্মের শোধ ফাঁকিদিয়া পুত্রের জন্য সর্ব্বস্ব রক্ষা করা আমি গর্হিত ও অন্যায় মনে করি। কন্যাটীর আজীবন ভরণপোষণের ভার যে লইবে সে কেন যে ন্যায়তঃ পণগ্রহণ করিবেনা বুঝিয়া উঠা দুস্কর। এদেশে এ প্রথা আজ নূতন নহে, এবং বিলাতেও Free love বা অবাধ প্রণয় প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সেখানেও এই Dower System পণপ্রথা যে নাই এমন কথা কেহই বলিবেন না।" সমাজে বয়স্থা কন্যা গৃহে রাখিলে লোকে নিন্দা করে বলিলে তিনি শুদ্ধ তাঁহার স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গহাস্য করিতেন ও বলিতেন—"লোকনিন্দা! লোকনিন্দা! আগে সমাজের জন সাধারণ শিক্ষিত হউক। তার পর তাহাদের নিন্দায় কর্ণ-পাত করা যাইবে।"

এই প্রবন্ধের লেখক স্বনামপ্রসিদ্ধ সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় কেবল ৺দ্বিজেন্দ্র বাবুর উক্ত মতটী প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার

সুকবি ব্যক্তি যদি দ্বিজেন্দ্র লালের উক্ত মতটিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইতেন তাহা হইলেই বড় ভাল হইত, কারণ তিনি দ্বিজেন্দ্র বাবুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু; দ্বিজেন্দ্র বাবুর অশেষসৎগুণাবলীর সহিত তিনি সম্যক পরিচিত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু এখন পরলোকে; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতেও ঐ সংশয় সমাধান করিবার কোনই উপায় এখন নাই; আমি দ্বিজেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একরূপ অপরিচিত; কারণ একবার মাত্র ভাগলপুরে তাঁহার সহিত আলাপের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা বন্ধুর নিকট এবং তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থাবলী হইতে তাঁহার যে মহা প্রাণতার পরিচয় পাই তাহাতে তিনি বর্ত্তমান আকারের পণপ্রথার সমর্থক অথবা প্রকারান্তরে দরিদ্র কন্যার পিতার হৃদয়রক্ত বরপক্ষ কর্ত্তৃক ভ্যাম্পারার বাদুরের মত শোষিত হউক ইহাই তাঁহার মত—একথা কিছুতেই মনে স্থান দিতে প্রবৃত্তি হয়না। অথচ স্থূলদৃষ্টিতে উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে তাহাই মনে হয়। এজন্য ঐ কথা কয়টি আমি যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি তাহাই এখানে বিবৃত করিতে চেষ্টা পাইব। ৺দ্বিজেন্দ্র লাল স্বর্গ হইতে এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এখান হইতে বিচার করিবেন আমার ধারণা ঠিক কিনা?

পণগ্রহণ প্রথাটাই যে অন্যায় তাহা কেহই বোধ হয় মনে করেন না। যেখানে সমর্থ স্থলে স্বেচ্ছায় পণ প্রদত্ত হয় সেখানে তাহা গ্রহণ করাতে কিছুই অন্যায় হয় না। শাস্ত্রে বিদ্বান্ বরে ধনরত্ন সমন্বিতা কন্যা প্রদানের উপদেশ করা হইয়াছে। কন্যার পিতা সমর্থ হইলে কন্যাজামাতাকে আনন্দের সঙ্গেই অলঙ্কার অর্থ যৌতুকাদি দিবেন এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নাই। যদি কোন পিতা সমর্থ হইয়াও কন্যাকে বিবাহের সময় উপযুক্ত যৌতুকাদি না দেন তাহা হইলে সেটা কন্যার পক্ষেও বড়ই বেদনাজনক হয় এবং কন্যার পিতার পক্ষেও সেটা নিতান্তই কার্পণ্য চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত সুতরাং অশোভন এবং গর্হিত হয়। সেইরূপ পিতার পক্ষেই কন্যাকে জন্মের শোধ ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ আনা যাইতে পারে এবং তাহা অসঙ্গত নহে। যে পিতা স্বচ্ছল অবস্থাতেও কন্যার বিবাহে যৌতুকাদি না দেন, তাঁহার ব্যবহারে কন্যার প্রতি নির্ম্মমতার ভাবই প্রকাশ পায় সুতরাং সেটা গর্হনীয়। এইরূপ কন্যার পিতাকে লক্ষ্য করিয়াই ৺দ্বিজেন্দ্র লাল ঐ উক্তি করিয়াছেন। বিলাতের Dower System এর যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান পণপ্রথার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে না কারণ ঐ Dower System টা কন্যার পিতার

স্বেচ্ছাকৃত দান স্নেহপ্রবৃত্তির বাহ্য বিকাশ; বর পক্ষের দাবী অনুসারে তাহা নিয়মিত হয়না অথবা তাহা না হইলেও বিবাহ স্থগিত থাকেনা। বরং কন্যার পিতাই ভাবী জামাতা কন্যার যোগ্যতানুরূপ বৃত্তি সম্পন্ন না হইলে যে পর্য্যন্ত জামাতা সেইরূপ উপযুক্ত না হন সে পর্য্যন্ত ভাবীমঙ্গলের দিক বিবেচনায় বিবাহ স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল যে এই স্থূল প্রভেদটা জানিতেন না তাহা কখনই ভাবাও যাইতে পারেনা। এই Dower System এর তুলনা দিয়াই তিনি স্বীয় মনের ভাবটা পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। বিবাহে পণযৌতুক প্রথা আমাদের দেশেও পূর্ব্ব হইতেই আছে—আমাদের দেশে কেন ইহা সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার ভিত্তি হৃদয়ের স্বাভাবিকী স্নেহপ্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ‘মানসীর’ স্তম্ভে সামাজিক সমস্যা প্রসঙ্গে পণপ্রথার আলোচনায়ও আমি একথা বিশেষরূপে দেখাইয়াছি। আমরা যে নিন্দা করিতেছি সে পণপ্রথার নহে—পণপ্রথার বর্ত্তমান রাক্ষসী মূর্ত্তির! স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালও সেই স্বাভাবিক স্নেহ সমুদ্ভূত পণযৌতুক প্রদানের প্রথাকেই সমর্থন করিয়াছেন! দরিদ্র পিতার কুমারী কন্যার ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপদেশও তিনি আজীবনের জন্য দেন নাই দু-দশ বৎসরের জন্য, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত পিতা স্বীয় সামর্থ্যানুরূপ যোগ্য বর সংগ্রহ করিতে না পারেন—তিনি দরিদ্র পিতাকে বাস্তু ভিটা বিক্রয় করিয়া কন্যা বিবাহের অর্থ সংগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে বলিয়াছেন এবং তৎকাল পর্য্যন্ত কন্যাকে কুমারী রাখিতে বলিয়াছেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বর্ত্তমান প্রথার সংহারিণী মূর্ত্তির বিরুদ্ধে কন্যার পিতৃগণকে দণ্ডায় মান হইতে অনুরোধ করিয়াও এই প্রস্তাবই মানসীতে করিয়াছিল। যদি কন্যার পিতারা এইরূপ অন্যায় দাবী প্রদানে স্বীকৃত না হইয়া নিজ নিজ কন্যাকে কিছুকাল অবিবাহিতা রাখেন তাহা হইলে বধূর প্রয়োজনীয়তা বর পক্ষেরও হৃদয়ঙ্গম হইবে; কন্যার মূল্য আছে কি না তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। একটু বেশী দিন অবিবাহিতা থাকিলেই কন্যার চরিত্রে দোষ স্পর্শ করিবে এরূপ কথা বলা সমগ্র কন্যাগণের উপর ভয়ানক অপমান, তীব্র তিরস্কার! আমরা ইহার সমর্থন করিতে পারিনা!

প্রয়োজনস্থলে এরূপ করিলে লোকনিন্দার ভয়করা অনাবশ্যক! কারণ আস্থা বিবেচনায় লোকে সে নিন্দা করিবেনা আর করিলেও তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই।

কন্যার আজীবন ভরণ পোষণের ভার গ্রহণের জন্য বরপক্ষ পণের দাবী

করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী এইকথাটির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছিনা। কারণ দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত জ্ঞানী সদ্বিবেচক, সুবিচারদক্ষ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক পণ গ্রহণটা ভরণপোষণের মূল্য স্বরূপ বিবেচনা করিবেন এটা তো কিছুতেই বুঝিতে আসেনা। বধূকে ভরণপোষণ করি বটে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে কি আমরা কিছু পাইনা? সংসারে সে সেবা পরিচর্য্যায়, শৃঙ্খলাব্যবস্থায়, কি কিছুই দেয়না? হৃদয়ানন্দদায়ক সন্তান প্রদান কি সে ভরণ পোষণের সহস্র গুণ অধিক বিনিময় প্রত্যর্পণ করেনা?

এটা হয় তাঁহার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি বা শ্লেষ, অথবা অন্য কোন ভাব প্রণোদিত হইবে।

যাহা হউক দ্বিজেন্দ্রলাল পণপ্রথার বর্ত্তমান ভীষণ বিকৃত মূর্ত্তির পরিপোষক একথা কখনই আমরা মনেও স্থান দিতে পারিনা! আজ তিনি জীবিত থাকিলে এই স্নেহলতার জীবন কাহিনীর উৎসর্গ উপলক্ষে মন্দ্রস্বরে ধিক্কার জনক কবিতা সমাজকে উপহার দিতেন বলিয়াই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি।

অতএব স্থূলদৃষ্টিতে পাঠকরিয়া তাঁহারা ঐকথা গুলি যেন কেহ বর্ত্তমান শোষণ নীতির পরিপোষক বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার স্বর্গগত আত্মার অযথা নিন্দা না করেন এই আমার বিনীত নিবেদন।

পরিশেষে সকলের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ কুমারী স্নেহলতার এই শোচনীয় পরিণামে সকলেই দৃঢ়ব্রত হইয়া এই পণরাক্ষসীর করাল কবল হইতে সমাজকে রক্ষা করুন! যেন এ পাপ সমাজবক্ষে আসীন হইয়া আরও স্নেহলতাকে স্বীয় কুক্ষিগত না করে সে চেষ্টায় সকলেই সচেষ্ট হউন। ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষার পথ ধরিয়া পবিত্র বিবাহবন্ধনের মন্ত্র গুলির সুমহান্ ভাব হৃদয়ে ধারণ সমাজকে প্রকৃত হিন্দু সমাজে পুনরানয়ন করুন—যেন ইহাতে প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য আর দেখিতে না হয়। সঙ্গে সঙ্গে পণের টাকার পরিবর্ত্তে রূপের দাবিটা অসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি না পায় সেটাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সংসারে সকলেই সুরূপ লইয়া জন্মে না ভাল মন্দ সর্ব্বদেশে সকলের মধ্যেই আছে, ইহা ভুলিলে চলিবেনা।

রসাভাস।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পরিহাস রসিক রায়।

১। একজন বড মানুষ জমীদার সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন—"আমার একজন মোসাহেব চাই, চাটুকার্য্যে যিনি সুনিপুণ তাঁহারই প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। বেতন উপযুক্ততানুসারে দুইশত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবে, উত্তম গৃহে বাস করিতে পাইবেন, পরিচ্ছদ পোষাক উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র লোকের মত পাইবেন, আমি আপনি যাহা খাই, তেমনি খাওয়াইব, অদ্য হইতে পনর দিন মধ্যে কর্ম্মপ্রার্থীগণকে স্ব স্ব প্রশংসা পত্রসহ স্বয়ং আসিয়া প্রার্থনা জানাইতে হইবে।

কলিকাতা	স্বাঃ শ্রীঃ——
১৫ ভাদ্র, ১৩১৮ সাল।	জমিদার, রত্নপুর জেলা নমুনাপুর।

বিজ্ঞাপনটী সংবাদপত্রে প্রচারিত হইবামাত্র, জমিদারের কলিকাতার বাড়ীতে মোসাহেবের হাট বসিয়া গেল, অনেকেই জমদিারের সহিত সাক্ষাৎমাত্র খোসামোদের সেলামের কায়দা কারণ দেখাইতে না পারিয়া বিদায় পাইলেন, কেহ কেহ তাহাতে পারদর্শিতা দেখাইয়া কথাবার্ত্তা কহিবার অধিকার লাভে সমর্থ হইলেন।

জমিদার অগ্রেই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন—কেমন তুমি আমার মনের মত কথা সর্ব্বদাই বলিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে?

সকলেই উত্তর করিতে লাগিল—আজ্ঞা কেন পারিব না, আপনি যেরূপ কথা চান সেই রকমই পাইবেন।

জমি। তাও কি কেহ কখন পারে—আমারত বোধ না যে তুমি পারিবে?

প্রার্থী। আজ্ঞা হাঁ কেন পারিব না—আমি কত বড় বড় জায়গায় মোসাহেবী করিয়া আসিয়াছি, দিন কতক রাখিয়া দেখুন না কেন।

জমি। না—তোমার দ্বারা আমার মোসাহেবী করা চলিবে না।

প্রার্থী। আজ্ঞা হাঁ চলিবে।

পনর দিনের বার দিন কাটিয়া গেল এইরূপে—ত্রয়োদশ দিনের দিন একজন আসিল সে জমিদারের প্রশ্নমত উত্তর করিল—"আজ্ঞা আমার মুখে আপনার

একটী গুণের সহস্রগুণ ব্যাখ্যা শুনিতে পাইবেন, আপনার বিদ্যাবুদ্ধির বর্ণনায় বৃহস্পতি লজ্জা পাইবেন, সরস্বতী পলাইবার পথ পাইবেন না—রূপের বর্ণনায় কন্দর্প লজ্জা পাইবেন যেহেতু তিনি মিশমিশে কালো কৃষ্ণের বংশধর। চাঁদ কলঙ্কের রাশি বিচারে বিক্রমাদিত্য পরাভূত—যেহেতু তিনি ভূত প্রেতের কথায় চলিতেন। ইত্যাদি—

জমি। আচ্ছা আরও একটী দিন এখনও বাকী যদি তোমার অপেক্ষা ভাল লোক না পাওয়া যায়, তবে তোমাকে রাখাই স্থির। আর দুইটী দিনের পর আর একবার সাক্ষাৎ করিবে।

মোসাহেব ব্রাহ্মণ হইলেও শূদ্র জমিদারকে ভূমিষ্ঠ ভাবে প্রণাম করিয়া—কৃতঞ্জলিপুটে পিছু হাটিয়া বিদায় লইল।

পঞ্চদশ দিবসে আর একজন মোসাহেবীর উমেদার আসিয়া হাজির।

জমিদার তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন—কেমন হে তুমি আমার মোসাহেবী করিতে পারিবে?

উত্তর। আজ্ঞা হাঁ—কেন পারিব না, কত জায়গায় মোসাহেবী করিয়া রাশি রাশি প্রশংসা পত্র পাইলাম আর আপনার নিকটেও কেন সেইরূপ প্রশংসা পাইব না।

জমি। ওহে এখন মুখে বল্‌চ, কাজে তাহা হইয়া উঠিবে বলিয়াত মনে হয় না।

উত্তর। আজ্ঞা না—না—তাও কি হয়ে উঠে। আপনি কত বড় লোক আপনার মোসাহেবী করা কি আমার মত ক্ষুদ্র লোকের কাজ?

জমিদার সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—এমন না হইলে মোসাহেব—তুমিই উপযুক্ত ব্যক্তি—আগামী কল্য ১লা আশ্বিন—আজ হইতে তুমি আমার নিকট মাসিক দুইশত টাকা বেতন পাইবে। আমার সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইবে। আমার বামদিকে বসিয়া গাড়ীতে বেড়াইতে যাইবে। আমি যেমন পোষাক পরি তুমি সেইরূপ পোষাক পাইবে।

২। দুর্গোৎসবের অষ্টমী পূজার দিন পূজা বাড়ীতে পূজক দেবী মাহাত্ম্য পাঠ করিতেছেন—

"যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা" পূজয়িতা—তখন পূজা করিয়া পূজার দালানের একদিকে বসিয়া তামাকের ধূম পান করিতেছিলেন, পূজকের উপাধি বিদ্যালঙ্কার—তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন

"আহা—হা—হা কর কি কর কি বিদ্যালঙ্কার যা দেবী?" যে দেবীকে গললগ্নী কৃতবাসে জোড় হাতে বলিতে হইয়াছে—"ইহা গচ্ছ ইহাগচ্ছ আজি মহাষ্টমী পূজার দিন "যা—দেবী" বল "আসুন দেবি যা দেবী কি?"

৩। একব্যক্তি বড়ই নিন্দক—যে যাহা দেখে যাহা শোনে যে যাহা খাওয়া বা পরাণ তাহার কাছে কিছুরই সুখ্যাতি নাই—সে সকল বিষয়েরই নিন্দা করিত বলিয়া প্রতিবাসীরা নাম দিয়াছিল বিশ্বনিন্দুক। গ্রামের বা নিকটবর্ত্তী গ্রামের কাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইলে আহারাদির পর সকলেই বিশ্বনিন্দুকের মত জানিতে চাহিলে বিশ্ব নিন্দুক হয় গৃহস্বামীর আচরণ, না হয় ভৃত্যগণের পরিচর্য্যার, না হয় অনুষ্ঠিত খাদ্য দ্রব্যের একটা না, একটার নিন্দা করিত।

তজ্জন্য নিমন্ত্রিতেরা সকলেই তাহাকে একটু যত্ন করিত। একদা একটী ভদ্র লোকের পিতৃশ্রাদ্ধে তিনি নিকটবর্ত্তী সাত আট খানি গ্রামের লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বিশ্বনিন্দুকও ছিল। আহারে আপ্যায়নে কর্ম্মকর্ত্তা কিছুরই ক্রটী রাখেন নাই—ব্রাহ্মণদিগকে পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইয়া যিনি যাহা ছাঁদা চাহিয়াছেন, তাহাকে ততই ছাঁদা দিয়াছেন, পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণা চারি আনার বেশী কেহ দেননা, ইনি ব্রাহ্মণগণকে এক একটী টাকা, গরীব দুঃখী কাঙ্গালীকে আট আনা করিয়া দিয়াছেন—সহস্র মুখে সকলেই সুখ্যাতি করিতেছে, আহারে নিন্দা করিবার কিছু রাখেন নাই। এক ব্যক্তি বিশ্বনিন্দুককে জিজ্ঞাসিল—"কেমন ভাই কর্ম্মকর্ত্তার পিতৃশ্রাদ্ধে ত কেহ ভাল বই মন্দ বলিতেছে না—কিন্তু তুমি কি বল, শুনিতে চাই।"

বিশ্বনিন্দুক উত্তর করিল—"এতটা ভালই কি ভাল?"

৪। একটী স্ত্রীলোকের চারিটী পুত্র— স্বামী নাই, কষ্টেশ্রষ্টে আপনার পুত্রচতুষ্টয়ের ভরণপোষণ করে, একটী পুত্রের পীড়া হইল, কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্রটী মারা গেল—তাহার পরে আরও দুইটী পুত্রের পীড়া হইল সেই কবিরাজ মহাশয়ই চিকিৎসা করিলেন—সে দুটীও মারা গেল। শেষ পুত্রটীরও পীড়া হইল সেও সেই কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীন থাকিয়া গতাসু হইল। পুত্র চারিটীকে হারাইয়া স্ত্রীলোকটী যার পর নাই শোকাকুল। কবিরাজ মহাশয় তাহার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছেন দেখিয়া সে "কবিরাজ মশায় গো আপনি যে আমার চারিটী অভাগারই চিকিচ্ছে করেছিলে গো এমন চিকিচ্ছা শিখেছিলে বাবা যে একটীকেও

কবিরাজ উত্তর করিলেন, "বেটী মড়াকে তোর কোন্ ছেলেটা বেঁচেছে বলত যে এটা বাঁচিবে! আমার চিকিৎসার দোষ?"

৫। বৃদ্ধ দেবীদাস সেকালের লোক—বড় সাদাসিধা। জামাতার পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষায় গিয়াছেন। বৈবাহিকের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল—জামতা পিতৃশ্রাদ্ধে বেশ দশ টাকা খরচপত্র করিলেন, সকলেই তাহার সুখ্যাতি করিতেছে, কুটুম্ব সজ্জনেরা নানারূপ মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেছে। দেবীদাসকেও কিছু বলিতে হয়, তিনি জামতাকে বলিলেন—"সবই ভাল হয়েছে বাবা, কিন্তু শ্রাদ্ধটায় যদি বৈবাহিক মহাশয় জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে কত আহ্লাদের বিষয় হইত।"

কথাটা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

৬। দুঃখের জ্বালা বড় জ্বালা—এ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া কত লোক কত অকর্ম্ম করিয়া বসে—ভালমন্দ ভুলিয়া যায়। চারিজন গরিব ব্রাহ্মণ এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া পরামর্শ করিল—রাজা নূতন কবিতা শুনিয়া অর্থদান করেন, অনেকের দুঃখ ঘুচাইয়া থাকেন, আমরাও রাজার কাছে যাই—গিয়া কবিতা বলিলে নিশ্চিত কিছু না কিছু পাইব। এই যুক্তি স্থির হইল কিন্তু কাহার দ্বারা একটী পুরা কবিতা হইয়া উঠিল না, তিনজন এক একটী পাদ প্রস্তত করিলেন,—

একজন করিলেন—"প্রাতকালের সূর্য্য যেন তাম্রগাড়,"
দ্বিতীয় ব্যক্তি"—"ভাদ্র মাসের শেষে ফুল বক চক্ক চক্ক"
তৃতীয় ব্যক্তি—"চাউলে প্রস্তত হয় চরু।

চতুর্থ ব্যক্তি কিছুই করিতে না পারিয়া হতাশ মনে বসিয়া ভাবিতেছেন এমন সময় একজন সুকবি সেখান দিয়া যাইতেছিলেন, ব্রাহ্মণকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি আপন দুঃখের কথা সবিস্তার বর্ণন করিলেন আগন্তুক বলিয়া দিলেন—"ঠাকুর তুমি বলিবে :—

"আমরা চারি বামুন নয় চরনই গোরু।"

চারিজনে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া চারি জনেই আপনাপন্ রচিত চারিটি পংক্তি ব্যক্ত করিলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিনজনের প্রত্যেককে দুই দুইটী এবং শেষোক্ত ব্রাহ্মণকে চারিটী টাকা দিলেন।

৭। কোন চাসা ভুষার গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি গ্রামস্থ সকলেরই পুরোহিত, বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলেও গ্রামশুদ্ধ লোকে তাহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা

ভক্তি করিত, তিনি আপনার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার জন্ত কথোপকথনের অনেক শব্দেই অনুস্বার যোগ করিতেন। কোন চাসজীবী বড় একটী গৃহস্থ এক ঘর বড় মানুষের সহিত কুটুম্বিতা করিবার ইচ্ছায় ছোট খাটো একটী জমীদার গৃহে আপনার কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিল। বিবাহের দিন যতই নিকট হইতে লাগিল ততই আয়োজন অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। কন্যাকর্ত্তা পুরোহিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসিল—"পুরুত ঠাকুর বড় লোকের বাড়ী থেকে বর আসবে, সঙ্গে ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত অনেক আসবে, সভায় বিচার আচারের শাস্ত্রালাপের জন্যে কি ভিন্ন গাঁয়ের ভটাচয্যি আন্‌তে হ'বে না আপনা হইতেই হবে?"

পুরোহিত উত্তর করিলেন—ভিনগাঁ থেকে ভটচায্যি আনতে যে খরচ সেই টাকাটা আমাকে দিও, আমি তোমার কাজ উদ্ধার করে দিব।

কন্যাকর্ত্তা নিশ্চিন্ত রহিল। বিবাহের সময় বর যাত্রীরূপে দেশ মান্য বড় বড় অধ্যাপক উপস্থিত হইলেন। কন্যাকর্ত্তার সাহস আছে পুরোহিত ঠাকুর সভা জয় করিবার আশা দিয়াছেন। কার্য্যকালে কন্যাকর্ত্তা পুরোহিতকে বলিল—"ঠাকুর জিজ্ঞেস পড়া জুড়ে দাও।"

পুরোহিত উত্তর করিলেন—"ভাল ভাল উঁহাদিগকে শ্রান্তি দূর করিতে দাও।"

কিছুক্ষণ পরে কন্যাকর্ত্তা পুনরায় পুরোহিতকে তাগাদা করিল। পুরোহিত এরূপ সভা কখন দেখেন নাই, সেরূপ সজ্জন সমাগমও কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। সুতরাং কথা কহিতে মুখ চটু চটু করিতে লাগিল। পুরোহিত মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—কি অশুভ ক্ষণেই আজি রাত পুইয়েছিল। সারা জীবনটা কাটালুম, কই এমন বিভ্রাটে ত একদিনও পড়ি নাই। অনেক ভাবনা চিন্তার পর ব্রাহ্মণ সাহসে ভর করিয়া সভায় গিয়া বসিলেন। পুরোহিত ঠাকুরের একটী অনুজ ছিলেন, তিনি দাদাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন কারণ তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় নাই। বাল্যকালে তিনি অগ্রজকে লম্বা পুঁথি কান্ধে করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোলে হাজিরা দিতে দেখিয়াছিলেন। দাদাকে সভায় বসিতে দেখিয়া অনুজের আড়ম্বর আস্ফালনের সীমা নাই। চাষা ভূষাদিগকে তিনি বলিতে লাগিলেন, বড়কর্ত্তা ঐ যে দাঁড়ি নেড়ে বসেছে, সভা জয় না করে উঠবে না। বড় কর্ত্তার দাড়ি গোঁপ ছিল, আকার অবয়ব একটা একাণ্ড পণ্ডিতের ন্যায়ই বটে।

পুরোহিত ঠাকুর সভায় বসিয়া পূর্ব্ব পক্ষ করিলেন—"সনের্ঘা—নে´ পরে নে´ন সহ ষর্ঘাৎ" নশ্বাৎ হইল না কেন ?

সমাগত অধ্যাপকেরা কোন উত্তর না করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন—"এ অর্থঠিটা কোথা হতে এলো হে ?"

বরপক্ষীয় অধ্যাপকগণকে নিরুত্তর দেখিয়া পুরোহিতানুজ আপনার দল বল লইয়া হৈ চৈ করিতে করিতে অধ্যাপকগণকে বিদ্রূপ ব.ক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। বরযাত্রিদের সঙ্গেও পুরোহিতানুজের ন্যায় দুই এক জন গণ্ড মূর্খ দুষ্ট আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন পুরোহিত ঠাকুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিল—"মহাশয়ের পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর করা কি এসব ভট্টাচার্য্যের কাজ—আপনাকে দয়া করে আমাকে আপনার দাড়ির দুএক গাছি চুল দিতে হইবে আপনার চুল গুলির মাহাত্ম্য আছে—সর্ব্বসিদ্ধি প্রদ।"

পুরোহিত আপনার দাড়ির দুই চারিগাছি চুল ছিঁড়িয়া দিলেন। বর যাত্রিদের আরও একজন ঐরূপে চুল চাহিয়া লইল। গ্রামের চাসারা তাহা দেখিয়া ঐ দুইজনকে জিজ্ঞাসিল;—কেন আপনারা আমাদের পুরোহিত ঠাকুরের দাড়ির চুল চাহিয়া লইলেন।

তাহারা প্রথমে উত্তর না করিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। চাসাদের কৌতূহল বাড়িল। ব্রাহ্মণ দুইজন তাহাদের নির্ব্বন্ধ দেখিয়া তখন বলিল—"দেখো একথা প্রকাশ না পায়, পুরোহিত ঠাকুরের মাথার ও দাড়ির চুল ২।৪ গাছি সঙ্গে থাকিলে যে কোন কাজে যাওয়া যাইবে তাহাই সিদ্ধ হইবে। দেখো বাপু একথা প্রকাশ না পায়।

যে দুএক জন প্রথম একথা শুনিল তাহারা পুরোহিতের নিকট চুল চাহিয়া পাইল—শেষে পুরোহিত যখন চুল দিতে দিতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, আর দিলেন না, অথচ সকল চাসাই শুনিয়াছে যে ছেলেদের গা বাপসাইলে যদি ঐ চুল গলায় বাঁধিয়া দেওয়া যায় ছেলেদের ঘুংড়ি কাসি নষ্ট হয় তখন আর চাহিয়া লইবার অপেক্ষা করিতে পারিল না, আপনারাই পুরোহিতের মাথা ও দাড়ি হইতে চুল ছিঁড়িয়া লইতে লাগিল; পুরোহিত দাড়ি গোপ ও চুলের জ্বালায় অস্থির—রক্তারক্তির ব্যাপার।

সকল কথা শুনিয়া বরপক্ষীয় অধ্যাপক গণের একটা হাসির তরঙ্গ উঠিল।

কে তুমি সুন্দরী ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ভৈরবী ।

বিন্ধ্যাচল শিখরদেশে একটী মায়ামন্দির। যে মায়া বলিলে ইন্দ্রজাল অর্থ বুঝায়, সে মায়া নহে ; বহুকালাবধি দেবী মহামায়ার মুর্ত্তি সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ; সাধারণ লোকে মহামায়ার নামকে সংক্ষেপ করিয়া, মন্দিরের নাম "মায়া মন্দির" রাখিয়াছে। সেই মন্দিরে মহামায়া কালিকা দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি বিরাজমান।

কালীপ্রতিমা দর্শনার্থী একটী যাত্রী এক সময়ে হঠাৎ সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ক্ষুদ্র একটী ভৈরবী। ভৈরবীটি পরমা সুন্দরী। প্রতিমার বামপার্শ্বে করজোড়ে জানু পাতিয়া বসিয়া সেই সুন্দরী ভৈরবী ঘন ঘন ওষ্ঠ সঞ্চালন করিতেছে।

ভৈরবীটি পরমা সুন্দরী। এদেশে এখন সুন্দরী বলিলে, সর্ব্বাগ্রে গৌরবর্ণা মনে হয় ; এখানকার ভৈরবীটি গৌরাঙ্গী নহেন; কিন্তু ইহার সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে ; অতএব ভৈরবীটি পরমা সুন্দরী। এ ভৈরবীর অঙ্গের বর্ণটি কিরূপ বলিলে, পাঠক মহাশয় ঠিক বুঝিতে পারিবেন, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া মহাভারতের একটি চিত্র এইস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। পঞ্চাল রাজকুমারী দ্রৌপদীকে ব্যাসদেব সে প্রকার অপরূপ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, সেই চিত্র স্মরণ করিলেই বিজ্ঞপাঠক অবশ্য বুঝিবেন, এই ভৈরবীটি সেই প্রকার অপরূপ রূপে রূপবতী। স্থুল কথায় আমাদের ভৈরবীটি মহাভারতের দ্রৌপদীর তুল্য রূপবতী। বয়স অনুমান অষ্টাদশ কিংবা ঊনবিংশতি।

ভৈরবীর ঐ রূপ অপরূপ। কেবল একজন যাত্রীর পক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছে, ইহাতে ঐবর্ণনা ঠিক না হইতে পারে, ইহাও সত্য, কিন্তু যিনি সহসা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনিও সামান্য ব্যক্তি নহেন; অপরিচিত বীরবেশধারী একটী মহৎ বংশোদ্ভব রাজকুমার।

ভৈরবী সমভাবে করজোড়ে বসিয়া জপ করিতেছিলেন , চাহিয়া ছিলেন কিংবা নেত্র মুদিয়াছিলেন, যাত্রী তাহা বলেন নাই; রাজকুমার কিন্তু ভৈরবীর রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, বাহ্যজ্ঞান কিছু অল্প ছিল।

রাজপুত্র ডাকিয়া বলিলেন, ভৈরবী ! সুন্দরি ! এই তরুণ বয়সে কেন তুমি ভৈরবী সাজিয়াছ ?

ভৈরবীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। ভৈরবী চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে বীর মূর্ত্তি। পরম সুন্দর মনোহর রূপ। মুখ দেখিয়া ভৈরবীর মনে অকস্মাৎ পবিত্র ভ্রাতৃ-ভাবের সঞ্চার হইল। মনের ভাব গোপন করিয়া ভৈরবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন;—সুমধুর বীণার স্বরে কহিলেন, আজ আপনি আমার অতিথি, দয়া করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন।

রাজপুত্র চঞ্চল হইলেন। ভৈরবী তাহা বুঝিলেন। অসমাপ্ত পূজাকার্য্য সমাধা করিয়া, যুবতী ভৈরবী সচ্ছন্দে রাজপুত্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আশ্রমে চলিলেন। অদূরে বন মধ্যে একখানি আশ্রম কুটীর। ভৈরবী সেই আশ্রমে রাজপুত্রকে লইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভৈরবীর পরিচয়।

আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, ফল, মূল, জল ইত্যাদি আশ্রম প্রাপ্ত ভোজ্য পাণীয় ভৈরবী স্বহস্তে প্রদান করিলে, রাজপুত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া কুল্লমুখে জলযোগ করিলেন। তাঁহার মনে কি ছিল, কেন তিনি ভৈরবীর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, কেনই বা সাধারণ যাত্রীর গ্যায় চলিয়া যাইবার চেষ্টা পাইলেন না, পূর্ব্বে এক প্রকার এই তিন কথার পূর্ণ ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। আগন্তুক রাজ-কুমার এই ভৈরবীটিকে মনে মনে ভাল বাসিয়াছেন।

বিশ্রাম সময়ে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তোমার সন্ন্যাসিনী বেশ ? তুমি যুবতী, তুমি সুন্দরী,—অতুল সুন্দরী;—তুমি কেন বনবাসিনী ? আরও এক কথা তুমি সুন্দরী;—তোমার তুল্য অপরূপ সুন্দরী এ অঞ্চলে আমি একটীও দেখি নাই। বোধ হইতেছে; এ দেশে তোমার জন্ম নয়।

হাস্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও হাস্য না করিয়া, ভৈরবী উত্তর করিলেন, এই দেশ। এই স্বর্ণময় ভূমি যেমন সুখময়, ধর্ম্মে, প্রেমে পবিত্রতায়, ক্ষেত্রশোভায় সুসজ্জিত, পৃথিবীর কুত্রাপি এমন আর দ্বিতীয় দেশ নাই। এই দেশ সূর্য্যদেবের প্রচুর অনুগ্রহ; আমাদের দোষে এক এক বার সূর্য্যকর অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠে;—তাহাও স্বর্ণভূমির মঙ্গলের জন্য;— এদেশে মণিমুক্তা প্রবালাদির জন্ম;—এদেশে সর্ব্ব ঋতুতে সকল প্রকার চিত্তরঞ্জন বর্ণে সকল প্রকার সুগন্ধ কুসুম

হইয়া থাকে। এদেশের তুল্য—এই আর্য্যবর্ত্ত দক্ষিণাবর্ত্ত মিশ্রিত স্বর্ণভূমি ভারতের তুল্য গৌরবের দেশ আর কোথায়, এই দেশের এক কোনে এক অপ্রসিদ্ধ গ্রামে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। সে গ্রামের নাম এখন আমি আপনাকে বলিব না। না,—কোন কথাই বলিব না। আশ্রমে সে সকল ভয়ঙ্কর কথা বলা হইবে না। আর একটু ছায়া পড়ুক কানন মধ্যে একটি নির্জ্জন তরুকুঞ্জে বসিয়া, এই অভাগিনী নিজের হৃদ্‌কম্পন ইতিহাস আপনাকে আমুল শ্রবণ করাইবে।

ছায়া পড়িল। উভয়ে শীতল তরুকুঞ্জে গিয়া বসিলেন। ভৈরবী বলিলেন, "অগ্রে আপনাকে একটি ধর্ম্ম শপথ করিতে হইবে। আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার এই জন্ম কর্ম্ম কাহিনী আপনি এখন কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

রাজপুত্র ধর্ম্ম শপথ করিলেন। ভৈরবী বলিতে লাগিলেন, ভারতের এক খানি অপ্রসিদ্ধ গ্রামে আমার জন্ম। মহামায়ার মন্দিরে আমি থাকি; কোন ধর্ম্ম পালন করি, এই পরিচয়ে তাহা বুঝিয়া লইবেন। আমি এক অদ্ভুত কুমারী। আমার নিগূঢ় তত্ত্ব কেহই জানেনা। কোথায় আমি থাকি, কখন কিপ্রকার কার্য্য করি, কখন কোথায় চলিয়া যাই, দেশের কেহই তাহা অবগত নহে। আমার আশ্রম আছে, কিন্তু আশ্রমে আমি বাস করি না; সর্ব্বক্ষণ মন্দিরেও থাকি না, মা কালীর নিয়মিত সেবা সমাপ্ত হইলে, আমি স্বেচ্ছা বিহারিণী হই। আমার গতিক্রিয়া কিরূপ, কেহই তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। আমার প্রভু নাই, আমি নিজেই আমার প্রভু। আমার বিবাহ হইবে না, কে আমারে লালন পালন করিয়াছেন, তাহাও কেহ জানে না; আমিও তাঁহার সত্য পরিচয় জানিনা। সংসারে আমি এক অদ্ভুত কুমারী।

রাজপুত্র কহিলেন, তাহাই ত বুঝিতেছি। কেন তুমি এমন অদ্ভুত, তাহাই জানিবার জন্য আমার কৌতুহল। পর্ব্বতে বাস কর, মা কালীর সেবা কর, বনে বনে বিচরণ কর, আশ্রমে বাস করনা, অথচ একটী আশ্রম রাখ, সমস্তই আশ্চর্য্য। যুবতী তুমি, অনুপম সুন্দরী তুমি, রক্ষক নাই, সহচরী নাই, একাকিনী ইচ্ছাবিহারিণী, এমন অদ্ভুত অস্তিত্বের মূল কারণ কি, তাহাই আমি শুনিব।

ম্লান মুখে হাস্য করিয়া ভৈরবী কহিলেন, আমার জন্মই অদ্ভুত; কাজে কাজে কর্ম্মও অদ্ভুত। ক্ষুদ্র একটী ইতিহাস বলিলে, বোধ করি, তাহার কতক কতক আপনি বুঝিতে পারিবেন।

সুন্দরীর সুন্দর বদনে অনিমেষ নেত্র নিক্ষেপ করিয়া ঘলন্ত আগ্রহে রাজকুমার কহিলেন, নিজের পরিচয় বলিবার অগ্রে তুমি একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস বলিবে, তাহাতে আমি কতক কতক বুঝিতে পারিব, ইহাও বড় আশ্চর্য্য! দয়া করিয়া বল দেখি, কি সেই ইতিহাস?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভৈরবীর ইতিহাস।

ভৈরবী বলিতে লাগিলেন,—অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। এক রাজ্যে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম পদ্মরাগ। তাঁহার পিতা সৌরধর্ম্মের উপাসক। সূর্য্য পূজা ভিন্ন তিনি অন্ত দেবতার পূজা করিতেন না। দিনেশ্বরকেই তিনি পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের বংশের নিয়ম ছিল, পুত্র সন্তান জন্মিলে বিংশতিবর্ষকাল সেই পুত্রকে স্বতন্ত্র একটি নির্জ্জন নিকেতনে রাখা হইত, পুত্র সেইখানে ভিন্ন ভিন্ন, অধ্যাপকের নিকটে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন; সংসারের অন্য কোন ব্যাপারে অথবা অন্য কোন প্রকার আমোদে সেই রাজপুত্র মিলিত হইতে পারিতেন না। পাঠাগারের সংলগ্ন একটি মনোহর উদ্যান থাকিত, নির্দ্দিষ্ট অবসরে সেই উদ্যানে রাজপুত্রের সম্ভব মত ক্রীড়া বিহার হইত। কেবল এই পর্য্যন্ত; আর কিছুই না।

কুমার পদ্মরাগ বাল্যাবধি সেই দৃঢ় নিয়মের অধীন ছিলেন। বিশেষত্বের মধ্যে এই ছিল যে, কুল দেবতার পূজা না করিয়া রাজপুত্র জল গ্রহণ করিতেন না, নিত্য প্রভাতে পবিত্র হইয়া কুমার পদ্মরাগ সূর্য্য পূজা করিতেন। বংশের নিয়মে এই ব্যবস্থার উচ্চ সীমা বিংশতিবর্ষ; কিন্তু পদ্মরাগের সেই নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয় নাই। যখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশবর্ষ; সেই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়; অমাত্যবর্গ যত্নবান হইয়া সেই অষ্টাদশবর্ষীয় বালককে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। পদ্মরাগ পরমরূপবান, তাঁহার প্রকৃতিও বিনম্র, সেই কারণে প্রজারাও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়।

বালক রাজ পদ্মরাগ প্রজাগণের সেই অনুরক্তি স্থায়ী হইতে দিলেন না। অল্প বয়সে অতুল ঐশ্বর্য্যেশ্বর হইয়া তিনি ক্রমাগত অনিত্য ভোগ বিলাসে রত হইয়া পড়িলেন; রাজকার্য্যে মনযোগও দিলেন না, রাজকার্য্য শিক্ষাও করিলেন না;—দুষ্ক্রিয়াশক্ত কুচরিত্র বয়স্য বর্গের সহিত নিরন্তর সুরাপানে ও ইন্দ্রিয় বিলাসে মত্ত হইয়া পড়িলেন। স্বার্থপর অমাত্যেরাই রাজকার্য্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

ক্রমাগত দুই বৎসর এইরূপ। রাজকার্য্য সমস্তই বিশৃঙ্খল। যাহারা শাসন-ভার হস্তে ধারণ করিয়াছেন, আপনাদের লাভের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই সকল কার্য্যের বিশৃঙ্খল করিতে লাগিলেন, নানাদিকে নানাপ্রকার গোলোযোগ হইতে লাগিল; —নিত্য নিত্য অবিচার অত্যাচারে প্রজাপুঞ্জ প্রপীড়িত হইয়া নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। মনের দুঃখে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, বিধাতা কেন এমন বাম হইলেন? কেন আমরা এক দিনও রাজমুখ দর্শন করিতে পাইনা? তাদৃশ ধর্ম্ম পরায়ণ প্রজারঞ্জন রাজার পুত্র কেন এমন কুৎসিত আমোদে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন? রক্ষা করিবার উপায় কি?

প্রজারা এই প্রকার ভাবে, রাজা স্বীয় মঙ্গল কিছুই ভাবেন না; সুরাপান বিভোরা সুদীর্ঘনেত্রা, মনোহরা সুন্দরী নর্ত্তকীগণের হাব ভাব বিলাসে সর্ব্বদাই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া থাকেন; বিলাস ভবনে সর্ব্বক্ষণ বেনু বীণার ঝঙ্কারে, বিলাসিনিগণের অলঙ্কারধ্বনিতে সুন্দরীগণের মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত চিত্ত-বিমোহন সুমধুর বিলাস—সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হয়;—রাজাও মধুপানে প্রমত্ত হইয়া বিলাস শয্যার সহিত প্রায় দিবা নিশি অবিচ্ছিন্ন ক্রিড়া করেন। যত প্রকার দুর্লক্ষণ সম্ভবে, রাজা পদ্মরাগের তৎসমস্তই বিদ্যমান। রাজা পদ্মরাগের পিতার সুবিস্তৃত জমীদারি, অতুল ঐশ্বর্য্য, সমুচ্চমান সম্ভ্রম; তাঁহার জীবদ্দশায় একজন প্রতিবাসী প্রতিদ্বন্দী জমীদার সেই জমীদারির উপর লোভ করিতেন, রাজা বিদ্যমানে তাহার সেই দুষ্টস্পৃহা চরিতার্থ হইয়া উঠে নাই; রাজার সুবিচারে প্রজারা সকলেই পরিতুষ্ট ছিল, সুতরাং কোনও প্রকার অমঙ্গল ঘটে নাই, এখন শত্রুর পক্ষে শুভ অবসর উপস্থিত।

প্রতিদ্বন্দী রাজার নাম দুর্জ্জয়কেতন। রাজাপদ্মরাগের দুর্দ্দশা শ্রবণ করিয়া দুর্জ্জয়কেতনের আনন্দ বৃদ্ধি হইল, ঐশ্বর্য্য লাভের আশায় সাহসও বাড়িয়া উঠিল; ছলে বলে কৌশলে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজধানীর অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গোলযোগ হইল। রাজমন্ত্রিরা বিপক্ষ দলের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শত সহস্র লোক লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধ বাধিল। পদ্মরাগের প্রধান মন্ত্রি প্রধান কর্ম্মচারির উপর কর্তৃত্ব করিলেন, তাঁহার লোকজন একে একে সমর ক্ষেত্রে শয়ন করিতে লাগিল;—সমর ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তি যুদ্ধে শত সহস্র লোক বিকলাঙ্গ হইয়া গেল;—পদ্মরাগের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া রাজধানী মধ্যে পলায়ণ করিল;—বিশ্বাস ঘাতক অমাত্যেরাও প্রাণ লইয়া পলায়ণ করিলেন।

বিলাস বিহ্বল পদ্মরাগ ইতিপূর্ব্বে এই বিপদ বার্ত্তা কিছুমাত্র শ্রবণ করেন নাই, এই সময় তাঁহার কাছে পরাজয় সংবাদ পৌছিল;—বিজয়ী বিপক্ষ লোকজন মার্ মার্ শব্দে রাজধানীর দিকে ধাবিত হইতেছে, এই বার্ত্তাও পদ্মরাগ শুনিলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গ হইল। কেবল শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া শিক্ষালয়ে তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ অতিবাহিত হয় নাই, সেখানে তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে নানাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; ধনুর্ব্বাণ ধারণে, অসি সঞ্চালনে, এবং অশ্বারোহনে তাঁহার নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। ধনৈশ্বর্য্য যায়, সকলেই পরাজিত, বৈরীপক্ষ রাজধানী মধ্যে আগত প্রায় সেই শোচনীয় সংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র বিলাস বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরবেশে অস্ত্রগ্রহণ করিয়া; অশ্বারোহনে পদ্মরাগ যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। রাজাকে দেখিয়া পলাতক লোকেরা সাহস পাইল, তাহারাও পুনর্ব্বার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাজার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। পুনর্ব্বার যুদ্ধ। সে যুদ্ধেও পদ্মরাগের সম্পূর্ণ পরাজয়। বহুলোক প্রাণভয়ে পলায়ণ করিল, পরাজিত রাজা অশ্ব ছুটাইয়া নিকটস্থ একটা বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন, পাঁচজন বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। অশ্ব হইতে লম্ফদিয়া হতাশ হৃদয়ে বিষন্ন বদনে পদ্মরাগ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। অনুচরেরা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে পলায়ণ করিতে বলিল, তিনি কাহার কথা শুনিলেন না, নির্ব্বন্ধ সহকারে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া তিনি একাকী সেই বৃক্ষ তলেই রহিলেন;—কাঁদিতে লাগিলেন। আকাশে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন; সূর্য্যদেব! ভগবন্! আমার প্রাণ যায়। বিপক্ষেরা রাজ্য মারিয়া লইল! আমার পাপের উপযুক্ত প্রতিফল! আমি অনেক পাপ করিয়াছি, ভগবন্! সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? জীবন আহুতি দিয়া আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। দয়াময়! দয়া করিয়া এই সময়ে একবার দাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মরণ সার্থক হয়।

পদ্মরাগ চুপ করিলেন। সূর্য্যদেব সদয় হইলেন না। সাশ্রুনেত্রে বারবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভাগা রাজা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, হায়! হায়! সূর্য্যদেব সদয় হইলেন না। এখন দেখিতেছি, সূর্য্যদেবের পুত্র দয়া না করিলে পৃথিবীতে আর আমার শান্তি নাই!

সূর্য্যদেবের পুত্র! রাজা পদ্মরাগ সূর্য্যদেবের কোন্ পুত্রকে আহ্বান করিলেন, সকলে তাহা হয়তঃ বুঝিবেন না। সাধারণ সংস্কারে সূর্য্যপুত্র যম। রবিসুতা বলিলে আপাততঃ যমকে ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝায় না। সূর্য্যের আর পুত্র

আছে। নাম নির্দ্দেশ না করিয়া, উর্দ্ধমুখে চাহিয়া, রাজা পদ্মরাগ সূর্য্যপুত্রকে স্তব করিলেন;—দয়া করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

এইখানে একটু পৌরাণিক কথা আছে। ভৈরবী বলিলেন, রাজাপদ্মরাগ সূর্য্যপুত্রের স্তব করিলেন। সূর্য্যপুত্র সেই স্তব স্তুতি শুনিলেন। অবিলম্বে একটি বিভীষণ অন্ধকার মুর্ত্তি রাজার নেত্র গোচরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা অকস্মাৎ মুর্ত্তি দর্শনে কম্পিত হইলেন। দেবতাদের কোন মূর্ত্তিই তিনি দর্শন করেন নাই;—হতবুদ্ধি হইয়া মরিবার জন্য সূর্য্যপুত্রকে তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন সূর্য্যপুত্র আসিলেন, ইহাই তাঁহার ধারণা হইল, করজোড়ে তিনি বলিলেন, ধর্ম্মরাজ! যমরাজ! তপন তনয়! আমার রাজ্য গিয়াছে, মন্ত্রিবর্গ গিয়াছে লোক জনসব গিয়াছে, সংসারে আর আমার বাঁচিবার সাধ নাই! দয়া করিয়া তুমি আমাকে গ্রহণ কর?

সূর্য্যপুত্র বলিলেন, আমি যম নহি, আমি ধর্ম্মরাজ নহি, আমি গ্রহপতি শনিরাজ। আমি সূর্য্যদেবের প্রিয় পুত্র। আমি আসিয়াছি। বল, কি বর চাই?

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া রাজা বলিলেন, আমার ধনৈশ্বর্য্য গিয়াছে, বিপক্ষেরা মারিয়া লইয়াছে, যদি উদ্ধার হইবার উপায় থাকে, দয়া করিয়া আমাকে সেই বর দাও।

শনি।—উদ্ধার হইবে। সংসারে তোমার অনেক কার্য্য বাকি। তোমাকে মরিতে দেওয়া হইবে না। সংসারে আমি তোমাকে সুখী করিব।

রাজা।—(প্রণাম করিয়া) ঠাকুর! কি উপায়ে উদ্ধার হইব?

শনি।—ভয় নাই,—আমি উদ্ধার করিব। অশ্বারোহনে তোমার পার্শ্বে রণক্ষেত্রে অস্ত্রধারী হইয়া থাকিব। তুমি দেখিতে পাইবে, আর কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না। সমস্ত বিপক্ষ মনুষ্যগণকে আমি অবিলম্বে দূর করিয়া দিব। চিন্তা নাই। ভয়ত্যাগ কর। বিলম্ব করিও না। উত্থান কর। শীঘ্র শীঘ্র অভয় লাভ কর। তোমার বিপক্ষ পক্ষ বিজয়গর্ব্বে পরিস্ফীত হইয়া রাজপ্রসাদের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, বিলম্ব করিও না। উত্থান কর।

রাজা।—(প্রণাম করিয়া) প্রস্তুত।

শনি।—হাঁ,—উত্তম;—কিন্তু তোমাকে একটি অঙ্গীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার।

রাজা।—কি অঙ্গীকার প্রভু?

শনি।—তোমার ধর্ম্ম পত্নীর গর্ভের প্রথম সন্তানটি আমার নামে উৎসর্গ

করিয়া দিতে হইবে। তাহার উপর তোমার কোন অধিকার থাকিবে না। আমি যাহা বলিব, আমি যেমন উপদেশ দিব, তদানুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে। সে সন্তান কেবল আমার মতেই চলিবে। ফলকথা, তোমার প্রথম সন্তানটি আমার হইবে, তোমার নয়। আমি তাহাকে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে লইয়া রাখিব। ধর্ম্মকে সাক্ষী রাখিয়া, এই অঙ্গীকারটি তুমি কর।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া) ঠাকুর। সন্তানের বিনিময়ে আমি যদি আপনাকে আপনি শ্রীপদে উৎসর্গ করি, তাহাতে কি ধর্ম্মের অঙ্গীকার পালন করা হয় না ?

শনি।—না !—কিছুতেই না। প্রথম সন্তানটি না পাইলে কিছুতেই আমি তোমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিব না। সময় নাই।

রাজা।—(নতশিরে বিষন্ন বদনে) তবে তাহাই আমার অঙ্গীকার। আমার প্রথম সন্তানটী তোমাকে আমি দিব।

কথা সমাপ্ত হইবামাত্র রাজা পদ্মরাগের পলাইত অশ্বটি পূর্ব্বরূপ সজ্জাসক্ত ধীর কদমে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বোধ হইল যেন, মাটীর ভিতর হইতে উঠিল। শুভ লক্ষণ জানিয়া, বীরবেশ ধারী রাজা পদ্মরাগ তৎক্ষণাৎ শনিদেবকে নমস্কার করিয়া, একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করিলেন। শনিদেব অদৃশ্য হই-লেন। সুশিক্ষিত, রণনির্ভয়, প্রভুভক্ত, বেগবান অশ্ব যেন রাজা পদ্মরাগকে উড়াইয়া লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে রাজা দেখিলেন, রণবিজয়ী বৈরীপক্ষ রাজধানীর ভিতর রাজপুরীর অনেক নিকটে গিয়া পৌছিয়াছে। রাজা আর সে পথে অশ্ব চালনা করিলেন না;—অন্য একটা বক্র পথ ধরিয়া প্রচ্ছন্ন দ্বার পথে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটা লোক অশ্বারোহনে একাকী অন্য পথ দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল, বিজয়ী যুদ্ধার্থি লোকেরা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলনা। রাজা ওদিকে অশ্বটি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, প্রচ্ছন্ন পথে সবেমাত্র পুরীমধ্যে—দরবার মহলে প্রবেশ করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সেই মহলের সমস্ত লোক যেন মহা আত-ঙ্কের সঙ্গে নূতন সাহস প্রাপ্ত হইল। রণে ভঙ্গ দিয়া যাহারা রাজপুরী মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, রাজাকে অগ্রগামী দর্শন করিয়া তাহারাও হুমকার ছাড়িয়া নূতন যুদ্ধে চলিল। রাজার অন্তরোধে লুক্কায়িত মন্ত্রি মহাশয়রাও চলিলেন।

তাঁহারা রাজ পুরীর সম্মুখ দ্বার দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন, প্রচ্ছন্ন দ্বার দিয়া রাজা বাহির হইলেন, অশ্বটি সম্মুখে আসিল রাজা আরোহন করিলেন, পলকের মধ্যেই সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, আপন সেনা দলের অগ্রবর্ত্তি সেনা-

ঘোরতর যুদ্ধ হইল, অদৃশ্য ভাবে শনিদেব তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিলেন। যুদ্ধে পদ্মরাগের সম্পূর্ণ জয় হইল, বিপক্ষ পক্ষের বহুলোক মরিল, কতক লোক পলাইল, কতক লোক পদ্মরাগের সেনা দলে আসিয়া মিশিল। আক্রমণকারী দুর্জ্জয়কেশর বন্দী হইলেন।

দুইবৎসর অতীত। রণবিজয়ের দিন গভীর নিশাকালে শনিদেব আসিয়া পদ্মরাগের কর্ণে স্বপ্ন দিয়াছিলেন,—স্বপ্নই বলিতে হইবে,—কেননা পদ্মরাগ ভিন্ন আর কেহ শনিদেবকে দেখিতে পায়না। শনিদেব আসিয়া স্বপ্ন দিয়াছিলেন, "তোমার পুরাতন মন্ত্রি অমাত্য প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মচারিকে সমুচিত দণ্ডদিয়া বিদায় করিয়া দাও;—ভাল ভাল জ্ঞানবান, বিদ্বান, সাধু চরিত্র পাত্র নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সেই সকল পদে নিযুক্ত কর। এইকার্য্য করিলে ইহলোকে তুমি সুখী হইবে, তোমার মঙ্গল হইবে।"

সেই স্বপ্ন নিদেশ অনুসারে সমস্ত পুরাতন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়া, প্রধান মন্ত্রীকে এককালে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া রাজা পদ্মরাগ সেই সেই পদে নূতন নূতন ভাল লোক নিযুক্ত করিলেন। পরম সুখে পদ্মরাগ নির্ব্বিরোধে দুইবৎসর রাজত্ব করিলেন, দুইবৎসরের পর রাজহিতচিকীর্ষু, রাজা মঙ্গল অভিলাষী অধীনস্থ সরল চিত্ত বন্ধুগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, রাজা কেন এক দিনও বিবাহের কথা উত্থাপন করেন না? নিজমুখে উত্থাপন করিতে যদি লজ্জা হয়, বড় বড় পণ্ডিত নূতন নূতন মন্ত্রদাতা বৃদ্ধ বৃদ্ধ মন্ত্রী মহাশয়েরা, বড় বড় সভা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা প্রতিদিন অনেকক্ষণ রাজার কাছে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি কোন দিন প্রসঙ্গক্রমে শুভ বিবাহের মধুর কথা রাজার কর্ণে বর্ষণ করেন, তাহাতে রাজাইবা কি উত্তর দেন, অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায়। সেটি হয়না। পণ্ডিত মহাশয়েরা কেহই রাজার কাছে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। ভাব কি?

হিতৈষী লোকেরা এইরূপ বলাবলি করে। সেই কথা কোন সূত্রে তখনকার নূতন প্রধান মন্ত্রীর কর্ণগোচর হয়। মনে মনে লজ্জা পাইয়া প্রধান মন্ত্রির যেন কি একটা মহা ভ্রান্তির চমক ভাঙ্গিয়া গেল। যেদিন তিনি চমক হইতে জাগিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার পর রাজ সন্নিধানে উপবেশন করিয়া, প্রধান মন্ত্রি মহাশয় সুসময়ে বিবাহের কথা তুলিলেন।

হাস্য করিয়া পদ্মরাগ বলিলেন, আপনারা যতই ভাল বলুন, আমি বিবাহ

করিব না, বিবাহে সুখ নাই, ইহা আমি বুঝিয়াছি। আরও কি জানেন!— তেমন নিখুঁৎ সুন্দরী কন্তা পাওয়া যায় না।

এই উত্তর শ্রবণে মুন্ত্রী মহাশয় তখন আর তৎপ্রসঙ্গে কোন তর্ক তুলিলেন না; অল্পক্ষণ সেখানে থাকিয়াই, রাজার অনুমতি লইয়া আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।

প্রধান মুন্ত্রির গৃহ রাজ গৃহের স্থায় সমৃদ্ধিশালী। এই প্রধান মুন্ত্রী একজন প্রসিদ্ধ ধনবানের পুত্র, মন্ত্রীত্ব লাভের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ঐ বাড়ী তাঁহাদের সেখানে আছে। মন্ত্রি মহাশয়ের নাম কর্ত্তিকমল। ইহাঁর বংশেও পুরুষা-নুক্রমিক রাজ উপাধি আছে। রাজা কার্ত্তিক মল রাজা পদ্মরাগকে বিবাহে অসম্মত দেখিয়া কিছু ভাবিত হইলেন, আপন গৃহের একটি সুসজ্জিত কক্ষে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া রাজা কর্ত্তিক মল কেবল ঐ এক বিবাহের কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

কার্ত্তিকমলের এক অপরূপ বুদ্ধি জন্মিল। রাজার মুখের শেষের কথাটি বোধ হইয়াছিল কিছু আশাপ্রদ। নিখুঁৎ পরমা সুন্দরী কন্তা পাওয়া যায় না, যাহাতে পাওয়া যায়, তাহা আমি করিব। এই সংকল্প করিয়া মুন্ত্রিমহাশয় উদ্বেগে উদ্বেগে সে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই কার্ত্তিকমল একটা মহৎ কার্য্যে বসিয়া গেলেন। রাজ্য মধ্যে যতগুলি চিত্রকর ও চিত্রকরী আছে, রাজ সংসারের খাতায় তাহাদের নাম লেখা ছিল। মুন্ত্রি মহাশয়! স্বহস্তে তাহাদের নামে এক এক পত্র লিখিয়া, তৎকাল প্রচলিত সওয়ার ডাকে ভিন্নভিন্ন দিকে প্রেরণ করিলেন। আহ্বান পত্র। মন্ত্রি মহা-শয়ের নিজ বাড়ীতেই দেখা সাক্ষাৎ হইবে, রাজ বাড়ীতে হইবে না, পত্রে এ কথাও লেখা রহিল।

যাহারা যেখান হইতে রাজধানীতে আসিতে যতদিন লাগে, ততদিনে ক্রমে ক্রমে প্রায় দুইশত চিত্রকর চিত্রকরি আসিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের মনোরঞ্জন ভবনে উপস্থিত হইল। মন্ত্রী মহাশয় সেই দিনেই তাহাদিগকে উপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত করিয়া, উপযুক্ত পাথেয় দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। উপদেশ রহিল, যে রাজ্যে যে রাজার যত অবিবাহিতা সুন্দরী কুমারী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইয়া আসিবে। যে সকল চিত্রকরি নৈপুন্য অধিক তাহারা এক এক শ্রেণীর প্রধান হইবে, অবশিষ্টেরা তাহাদের সহকারী অথবা সহকারিণী হইয়া থাকিবে। চিত্রকরীরা প্রত্যেক রাজার

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যাগণের প্রতিরূপ লিখিয়া লইবে, চিত্রকরেরা ঠিক ঠিক বর্ণ মিলাইয়া বর্ণ ফলাইয়া চিত্রগুলি সম্পূর্ণ করিয়া দিবে।

ছয়মাস প্রায় একশত সুন্দরী রাজকন্যার চিত্রপট মুন্ত্রি সদনে আসিয়া পৌছিল। মুন্ত্রি সেই গুলি রত্ন মণ্ডিত করিয়া, আপন অট্টালিকার একটি প্রশস্ত গৃহের দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিলেন। মুন্ত্রির একটি নাচঘর প্রায় শত হস্ত দীর্ঘ, সেই নাচ ঘরের দুইদিকের ভিত্তিতে হস্ত ব্যবধানে এক এক খানি মনোহর চিত্রপট শোভা পাইতে লাগিল। নাচ ঘরটি বন্ধ রহিল।

কোন দেশের কোন্ রাজার কোন্ কন্যা, চিত্রকরেরা এক একটী চিহ্ন দ্বারা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া একখানি দীর্ঘ লিপি মুন্ত্রীর হস্তে প্রদান করিল, অনন্তর উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া বিদায় হইয়া গেল। একমাস পরে বুদ্ধিমান প্রধান মুন্ত্রী রাজা কার্ত্তিকমল একদিন নিশাকালে, রাজা পদ্মরাগকে এবং সমস্ত অমাত্যগণকে আপন ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলে সমবেত হইলে মহাসমারোহে ভোজের আয়োজন হইল। ভোজনান্তে সকলে একসঙ্গে উপবিষ্ট হইলে একজন প্রাচীন সভাসদ্ উত্থাপন করিলেন, এদেশের শিল্পের কথা। চিত্রবিদ্যায় রাজা কার্ত্তিকমলের উৎসাহ, ভাল ভাল চিত্রপট সংরক্ষণে তাঁহার সবিশেষ যত্ন, তাঁহার গৃহে যত প্রকার সুন্দর সুন্দর ছবি সংগৃহীত আছে, তত আর কাহার গৃহে নাই, সর্ব্ব সমক্ষে একথাও তিনি বলিলেন।

রাজা পদ্মরাগের মহা কৌতূহল উদ্দীপিত হইল। তিনি সেই সকল চিত্রপট দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেন। চিত্র শালার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মুন্ত্রী মহাশয় কৌতুহলী রাজাকে সেই গৃহে লইয়া গেলেন। প্রত্যেক ছবির মস্তকে মস্তকে অত্যুজ্জ্বল সুগন্ধি বাতি জ্বলিতেছিল, আলোক দীপ্তিতে রত্ন মণ্ডিত ছবিগুলি অধিকতর প্রদীপ্ত হইতেছিল। রাজা পদ্মরাগ তাহা দেখিলেন। কেবল সারি সারি সুন্দরী সুন্দরী যুবতী কামিনীর ছবি; পুরুষের ছবি এক খানিও নাই। রাজা বিমুগ্ধ হইলেন। প্রত্যেক ছবির নিকটে নিকটে দুই তিন বার দণ্ডায়মান হইয়া ছবিগুলি তিনি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন; পরিশেষে নির্ব্বাচিত একখানি ছবির বক্ষঃস্থলে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া গাঢ় অনুরাগে তিনি বলিয়া উঠিলেন, এই সুন্দরী কি সত্য সত্য পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে? যদি থাকে, আমি এই সুন্দরীকে বিবাহ করিব।

সমালোচনা।

কাঞ্চন জড়িত জ্যোতিষ্মান্ মহামূল্য মণি দর্শনে, সুরতরঙ্গিনী তটসংলগ্ন কলধৌতময়ী সোপান শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইয়া মলয় মারুত হিল্লোলে কাহার শরীর পুলকিত না হয়,—তাহার সহিত কলকণ্ঠ কোকিলের কুহুস্বরে কে না শ্রুতিসুখ অনুভব করে! আর অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কবির কল্পনা ক্রীড়া দেখিয়া কে না মোহিত হয়! কে বলে লক্ষ্মীর বর পুত্রের প্রতি বাগ্দেবীর কৃপা থাকেনা। বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ মহতপ্ মহারাজাধিরাজ কে. সি. এস. আই; কে, সি, আই. ই; আই, ও, এম, বাহাদুর সম্প্রতি যে আট খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাদের এক এক খণ্ড জন্মভূমির সম্পাদক উপহার প্রাপ্ত হইয়া আমাকে এই সকল পুস্তকের সমালোচনার ভার দিয়াছেন, এভার আমার পক্ষে দুর্বহ। মহাকবি কালীদাস রঘুবংশের আরম্ভে বলিয়াছেন—"কঃ সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ কঃ চাল্প বিষয়া মতিঃ।" আমার পক্ষেও ভেলা দ্বারা সাগর উত্তরণের চেষ্টা।

১। কমলা কান্ত।— ইতিহাস মূলক নাটক, সাধক প্রবর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্নীর চিতা নির্ব্বাণকালের সেই সর্ব্বজন পরিচিত " কালী সব ঘুচালি লেঠা " গীতটী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অন্তিম কালের

"কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।

আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ ল'ব ॥"

পর্য্যন্ত এই নাটকের শেষ ইহার মধ্যে ওড়গ্রামের ডাঙ্গায় দস্যুহস্তে পতিত হইয়া—

"আর কিছুই নাই শ্যামা মা তোর দুটী চরণ রাঙ্গা।

শুনিতাম নিয়েছে ত্রিপুরারী

দেখে হ'লাম সাহস ভাঙ্গা ॥ "

এই গীত গাইয়া তাহাদিগকে মোহিত করা ও আপনার অব্যাহতি লাভ, অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের প্রচলিত প্রবাদ—সঙ্গম রায় মহারাজ তিলক চন্দ রূপে এবং তিলক চন্দ মহারাজ মহাতাপ্ চন্দ্ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্য্য সুখ ভোগ করিয়া গিয়াছেন—ইহাও অতি সুন্দর হইয়াছে। মহারাজ তেজ চন্দ্র বাহাদুর শক্তি সাধক ছিলেন, শক্তি সাধনার জন্য তিনি

পুত্র কুমার প্রতাপ চন্দ্ কে কমলাকান্তের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন,—কুমারের পানদোষ মাত্রা অতিক্রম করা প্রযুক্ত তাঁহাকে অকালে দেহত্যাগ করিতে হয়—সেই সংবাদ পাইয়া মহারাজ তেজচন্দ্ বাহাদুর বিচলিত হইলেন, তাহার প্রিয় পক্ষী (লাক চিড়িয়া নামে অভিহিত) পাছে চঞ্চল হয় তজ্জন্য—"খবরদার, লাল ঘব্ড়াবে গা "বলিয়া শোক চাপিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বজ্রাগ্নি কি আতপত্রে আটকায়? মহারাজ বালিশে মাথা রাখিলেন, অশ্রুজলে তাঁহার চক্ষু ভাসিয়া গেল, মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের শোকোক্তিতে যেন তিনি মহারাজ আব্তাপ্ চন্দ্র রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আর মহারাজ কুমার প্রতাপচন্দ্রও যেন আবির্ভূত বলিয়া বুঝা যায়, অন্যত্র প্রতাপের উক্তিও তদনুরূপ। ইহার অপেক্ষা আর সুখের বিষয় নাই, একথা গ্রন্থকার যতটা বুঝিতে পারেন, আমরা কি ততটা বুঝিব? জীবন্মুক্ত পুরুষগণেরই পূর্ব্বজন্ম জ্ঞান হয়। মহারাজ কুমার প্রতাপ শক্তি সাধক ছিলেন। আমরা তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাই—পূর্ব্ব জন্মের ইষ্ট দেবতা জন্মান্তরেও সাধককে পরিত্যাগ করেন না, সেই মুর্ত্তিতেই সাধককে কৃতার্থ করিয়া থাকেন যথা,—

"মৃতমপ্যনুগচ্ছেত বিদ্যা মন্ত্রো বিশেষতঃ।
এবমেব মনুষ্যস্য পূর্ব্ব কর্ম্মণি শংসতি॥" গুপ্ত দীক্ষা তন্ত্র।

বিদ্যা ও মন্ত্র মৃতব্যক্তির অনুগামী হয় এবং পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের প্রতিপাদন করে।

নাটকের চিত্রগুলি ক্ষুদ্র হইলেও যেন মিনিয়েচার জ্ঞান গ্ল্যাস ধরিয়া দেখিলে সমস্ত সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা সর্ব্বত্র নাট্যোক্ত ব্যক্তি গণের উপযুক্ত এবং চিত্তস্পর্শিণী। গ্রন্থকার মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের রচিত গীত গুলির ভাষা ও ভাব মনোজ্ঞ হইয়াছে।

মহারজাধিরাজ বাহাদুর দুর্ব্বহ রাজকার্য্যের ভার বহনেও যে অসাধারণ কাব্যানুরাগী, ও সঙ্গীত প্রিয় ইহা বড়ই প্রশংসার কথা। পুস্তকের প্রথমেই ধিরাজ বাহাদুরের যে প্রতিমূর্তিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা যেন সজীব, এরূপ চিত্র এদেশে হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল না—পুস্তকের ছাপা ও কাগজ অতুলনীয়।

২। মানস লীলা।—বিজ্ঞানমূলক নাটক, এই ক্ষুদ্র নাটিকা খানিতে প্রধানতঃ তিনটী চিত্র—রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ, উক্ত রাজর্ষির যোগাশ্রমের দুইটী সেবিকা—কমল কুমারী ও মানস লীলা তদতিরিক্ত জনৈক

যুবক, উদাসীন, দ্বার পাল, দণ্ডী ইত্যাদি। নাটকের নান্দী রূপে ধ্যানমগ্নবেশ, রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ গাহিতেছেন,—

"আঁধার জীবনে তুমি যে গো আলো,
জ্যোতির্ম্ময় তুমি, আর সব কালো
তোমা বিনা কিছু, নাহি প্রাণে ভাল
লাগে গো বিধাতা, দাতা, পাতা, তাতঃ।
লহ বুঝে বিভু, এই রাজ্য তব,
ছেড়ে দাও মোরে ওহে' ভবধব
বাসনা অন্তরে যেতে মায়া পারে
ডাকে হে পাতকী, তাই অবিরত।"

রাজর্ষির সাধনা সংসার মায়া অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য। মায়া নানা নামে অভিহিতা—প্রকৃতি, শক্তি, অজা, প্রধান অব্যক্ত মায়া অবিদ্যা ইত্যাদি। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম প্রকৃতি দ্বারা আবরিত প্রকৃতি যাহাতে আপন পারে লইয়া ব্রহ্ম দর্শন ঘটাইয়া দেন, তজ্জন্য প্রকৃতির সাধনা—প্রকৃতি আবার সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব গুণের প্রতিকৃতি রাজর্ষির প্রিয় পত্নীর—যদিও তিনি অভিনয় ক্ষেত্রে (সংসারে) উপস্থিত নহে, তথাপি তাঁহার কার্য্য পরম্পরা তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিতেছে—কমল কুমারী রজোগুণের ছবি—এবং মানসলতা তমোগুণের জাজ্বল্যমান চিত্র। রাজর্ষি উভয় সেবিকাকেই নির্ম্মল প্রেম শিক্ষা দ্বারা সাধনার উপযোগিনী করিবার চেষ্টায় ছিলেন, সেই পবিত্র প্রেম বিস্তার ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই বেদান্তের—

"ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মান ভূবংহি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে। পঞ্চদশী।

এই জ্ঞানই আত্মা এবং আত্মাই পরমানন্দ স্বরূপ কেন না ইনিই পরম প্রেমের আধার। নিজের অস্থায়িত্বে অনিচ্ছা এবং স্থায়িত্বে ইচ্ছাই আত্ম প্রেমের পরিচায়ক। আত্ম বা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভার্থ সেই পবিত্র প্রেম বিস্তারের প্রয়োজন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপেক্ষা পূজা ভক্তি স্তব স্তুতি দ্বারা প্রকৃতির প্রসন্নতা লাভ সহজ তাঁহার কৃপায় অনায়াসেই সংসার মায়া অতিক্রম করা যায় বলিয়া তান্ত্রিকের প্রকৃতি পূজা—কমল কুমারী রজোগুণ প্রধানা সুতরাং সহায়তা করিল, কিন্তু তমোগুণান্বিতা মানসলীলার তাহা ভাল লাগিল না, সে তমো-গুণের ধারা ধরিল, তাহার সংসার লিপ্সা বলবতী, সে সংসারের মোহে মজিল, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য রাজর্ষির নিকট হইতে ধনরত্ন লইয়া সংসার মদে মত্ত

হইল, তাহাতে যাহা হইবার তাহাই হইল—প্রবঞ্চিত, প্রতারিত—সর্ব্বস্বান্ত।

মানসলীলাকে ধনরত্ন দিয়া বিদায় কালে চন্দ্রজিতের গীতটী বড়ই হৃদয়স্পর্শী,—

"কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট, কিসের মিছে ভাবনা।
কেনবা ক্ষোভ, কেনবা রোষ, কেনবা এত যাতনা॥
যখন আমি আছি তোমাতে, তখন কেন দাও আসিতে,
মানসে গ্লানি, মানস রাণী, মানস-কমল-আসনা।
মধুর ভাবে মধুর ক্লান্তি, মধুর প্রেমে মধুর শান্তি,
মধুরে তোরে ধ্রুবতারারে সতত রাখিতে বাসনা॥

সাংসারিকের যাহা হয় শেষে সেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া রাজর্ষির আশ্রয়ে আসিল, কমলকুমারী এই লীলাক্ষেত্র হইতে অপসৃতা। রাজর্ষি মানস লীলাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি আপনাকে শিব, এবং তাহাকে শক্তি (পত্নী) রূপে গ্রহণে সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। মানসলীলারও অন্তিম কাল হইল; সেও স্বস্থানে প্রস্থান করিল—প্রস্থান কালে আত্মহারার ন্যায় বলিল—"প্রাণের দেবতা, মানসপতি। দাসী সব ভুলেছে। দাসীর সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এখন মৃত্যুকে আর ভয় করিনা। * *

চন্দ্রজিৎ হৃদয় দেবতা! বল আবার বল, আমায় ক্ষমা করেছ। বল আমি মরে তোমায় পাব। বল অনন্ত কাল তুমি আমার পতি, তুমি আমার গতি, তুমি আমার মুক্তি হবে।"

তদুত্তরে চন্দ্রজিৎ যাহা বলিলেন তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলেন—"লীলা যা হবার নয়, তা কখন হবে না, যা হবার তা নিয়ত হবে। যা ছিল না, তা থাকবে না, যা আছে তা যাবে না।"

সতো হস্তিত্বস্ত নামসত্তা নাস্তিত্বে সত্যতাকুতঃ।
ইতি গারুড়তশ্চৈবং সদসত্ব ব্যবস্থিতে॥ সাখ্যং সার।

ইহা ষোল আনা সত্য। এই অপূর্ব্ব নাটক রচনার জন্য ধিরাজ বাহাদুরকে আমরা সহস্রবার ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। দর্শনে নাটক রচনা অতিদুরূহ ব্যাপার। এরূপ নাটক পূর্ব্বে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

রাজর্ষির তখনও সিদ্ধি লাভের বিশ্বাস ছিল, তিনি রহিলেন। এই রূপেই "মানস লীলা" নাটকের শেষ। মানসলীলার চিত্র বেশ ফুটিয়াছে। কমল কুমারীও অস্ফুটস্ত নহে—তাহার যতটুকু কর্ত্তব্য সে তাহা করিল, রাজর্ষি চন্দ্রজিৎকে ভাল করিয়া ফুটাইবার জন্য "চন্দ্রজিৎ" নাটক রচনা।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ। ২য় সংখ্যা।

শাস্ত্রোক্ত নিষেধ।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

১। ধর্ম্মবিরোধী অর্থ,—ধর্ম্মার্থ বিরোধী কাম কদাপি চিন্তা করিবে না, ধর্ম্ম অর্থ ও কামের মধ্যে কোনরূপ সঙ্ঘর্ষ না হয়—এইরূপে ত্রিবর্গের সেবা না করাই গৃহস্থের অধর্ম্ম। যে, ধর্ম্মসমাজবিরুদ্ধ, আচারবিরুদ্ধ, অসুখকর, সেরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না।

২। যেস্থানে লোক চলাচল হয়, পদচিহ্ন দেখা যায়, আপনার ছায়ার উপর, গৃহের ছায়ার উপর সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নির অভিমুখে কদাপি মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নহে। হলাদি কৃষ্ট-ভূমিতে, নদীতীরে, শ্মশানে, জলমধ্যেও মলমূত্র ত্যাগ বিধেয় নহে। বল্মীক, আর্দ্র, গৃহলেপ মৃত্তিকা দ্বারা শৌচকার্য্য কর্ত্তব্য নহে।

---

* বিষ্ণু পুরাণাদি হইতে সঙ্কলিত।

৩। অতিথির জন্য অপেক্ষা না করিয়া কখন আপনি খাইবে না; অতিথি আসিলে প্রথম আগত প্রশ্ন, পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, আসন প্রদান, মিষ্টবাক্য—দ্বারা অভ্যর্থনা না করিয়া ভোজনের ব্যবস্থা করিবে না। এক গ্রামবাসীকে অতিথিবৎ পূজা করিবার প্রয়োজন নাই।

৪। পর্য্যুসিত, উচ্ছিষ্ট, পাপীজন বা নিম্নবর্ণপ্রস্তুত অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। পাপীর মনোবৃত্তির ছায়া অন্নে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

৫। কুলটোপা শুষ্ক খাইতে নাই, মধু অম্ল দধি, ঘৃত, (শক্তু (ছাতু পায়সের অবশিষ্ট রাখিতে নাই। কথা কহিতে কহিতে রন্ধন বা ভোজন করিতে নাই, (প্রথমতঃ নিষ্ঠীবন পড়িয়া অশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, দ্বিতীয়তঃ একাগ্রতা নাশ পাইবে)। ম্রক্ষণাবশিষ্ট তৈল মাথা অবিধেয়।

৬। সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত কালে পীড়িত ভিন্ন কাহারও শয়ন করিতে নাই। রাত্রে ভোজনান্তে পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা ভালরূপ না মুছিয়া শয়ন করিবে না। ছিদ্রযুক্ত শয্যায় শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। মলিন ও অনাবৃত শয্যা ভাল নয়।

৭। পশ্চিম ও উত্তর শিরা হইয়া শয়ন করিবে না। ইহাতে শারীরিক ক্ষতি হয়—ইহা আধুনিক বিজ্ঞান কর্ত্তৃক প্রমাণিত। প্রতিকূলা, কুপিতা গর্ভিনী, পীড়িতা, রজঃস্বলা, অন্যকামা, ক্ষুধার্ত্তা অতি ভোজনার্ত্তা স্ত্রীকে সম্ভোগ নিষিদ্ধ। বিশেষণ গুলি যে সময়ে দৃষ্ট হইবে, নিষেধ সেই সময়ের জন্যই। স্নাত, মাল্যগন্ধদ্রব্যভূষিত; প্রীত, সকাম, সানুরাগ হইয়া সম্ভোগ কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, দ্বাদশী, পর্ব্ববার, রবিবার মাংস ভোজন ও স্ত্রীসম্ভোগ বর্জ্জন করিবে। প্রাঙ্গণে, জলমধ্যে, উপবনে মলমূত্ররোধ অবস্থায়, ভূমিতলে, এবং দিবাভাগে রাক্ষসী বেলায় বা শেষ রাত্রে সম্ভোগ শাস্ত্র গর্হিত।

৮। কেশ সর্ব্বদা চিকণ ও পরিষ্কার রাখিবে, কদাপি অপরিষ্কৃত রাখিবে না। প্রত্যহ তাম্বুল চর্ব্বণ করিবে, শুধু গুবাকু (সুপারি) খাইবে না। স্রোতস্বতী নদীর স্রোতরহিত জলে স্নান কর্ত্তব্য নহে। কর্ণ আচ্ছাদন না করিয়া ডুব দিবেনা। ব্রহ্মচারীরা অবগাহন স্নান করিবে না। পরের পুষ্করিণী হইলে তিনমুষ্টি মাটী জল হইতে তুলিয়া উপরে ফেলিয়া না দিয়া সন্ধ্যাদি বিধেয় নহে।

৯। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, নাসিকা কুঞ্চন, মুখ আবৃত না করিয়া জৃম্ভন ত্যাগ

(হাইতোলা) মুখ ঢাকিয়া শ্বাস বা কাস ত্যাগ করিবে না। উচ্চ হাসি হাসিয়া বা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে কহিতে অধোবায়ু নিঃসরণ, নখবাদ্য, নখদ্বারা তৃণচ্ছেদ বা ভূমি লিখন করিবে না।

১০। অশুদ্ধ অবস্থায়, তৈলাক্ত দেহে, প্রণাম লইবে না, বা করিবে না। শব দেখিয়া, শবগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃণা করিবে না।

১১। শ্মশ্রুচর্ব্বণ, লোষ্ট্রমর্দ্দন, উদয়াস্ত কালীন সূর্য্য দর্শন, উলঙ্গ অবস্থায় কাহাকে দর্শন নিষিদ্ধ। পূজ্যব্যক্তি, দেবতা, ধ্বজা, তেজঃ পদার্থের ছায়া অতিক্রম কর্ত্তব্য নহে। কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র দ্রব্য, বহ্নি, ভস্ম, তুষ ও স্নানজলার্দ্র ভূমি দূরোতো পরিত্যাগ কর্ত্তব্য।

১২। নিদ্রাভঙ্গের পর অধিক সময় দাঁড়াইয়া থাকিবে না। উলঙ্গ হইয়া স্নান বা আচমন বিধেয় নহে। উত্তরীয় না লইয়া হোম দৈবপূজা, আচমণ, দেবপূজা জপ, সন্ধ্যাদি নিষিদ্ধ। কাছা খুলিয়াও এ সকল কার্য্য করা শাস্ত্র গর্হিত। স্নানান্তে হস্ত বা বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন, কেশকম্পন অকর্ত্তব্য। পদদ্বারা পদ আক্রমণও অকর্ত্তব্য। দণ্ডায়মাণ হইয়া প্রস্রাব করা অত্যন্ত দোষের। শ্লেষ্মা মলমূত্র, রক্ত উল্লঙ্ঘন করা অনুচিত। আহার কালে দেব পূজা, ছোয়া দৈবকার্য্যে শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবে না, হাঁচিবে না।

১৩। বর্ষা বা রৌদ্র সময়ে ছত্র ব্যবহার না করা, শরীর রক্ষণে উদাসিনতা প্রকাশ করা পাদুকা ব্যবহার না করিয়া পথচলা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। পার্শ্ব বা দূরবর্ত্তী স্থান দেখিতে দেখিতে যাইবে না, যাইবার সময় সম্মুখে চারিহাত দেখিতে দেখিতে যাইবে।

১৪। যে স্থলে সত্যকথা কহিলে কাহারও অনিষ্ট হয়, সে স্থলে মৌন থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রিয়বাক্য হিতকর যুক্তিসঙ্গত না হইলে ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। হিতবাক্য অপ্রিয় হইলে না বলাই শ্রেয়। (কেবল মুখে নহে, ভাবে ইঙ্গিতে, তাৎপর্য্যতঃ, মিথ্যাপ্রকাশ মাত্রই মিথ্যা কথন জানিবে।)

১৫। বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যাপনকারী, দেবল, বেদত্যাগী প্রভৃতি শ্রাদ্ধে স্থান পাইবেন না। দক্ষিণা না দিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। শ্রদ্ধা না থাকিলে শ্রাদ্ধই হয় না, দেবপূজাদি সফল হয় না। অশ্রদ্ধালু অবিশ্বাসীকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে না।

১৬। যিনি ঐহিক কামনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে

সমর্থ হইয়া যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিহিত কার্য্য না করে, তিনি পাপী।

১৭। নিরর্থক-রূপধারী, বৃথাশক্তিসঞ্চক, মণ্ডিত মস্তক শৌচহীন, সন্ধ্যা তর্পনাদিতে পরাঙ্মুখ, স্বধর্ম্ম ত্যাগী, দেবাতিথি ভোজন না দিয়া নিজ উদর পূরিতে রত, এমন ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণাদি সংস্পর্শ রাখিবে না। নীচসঙ্গ—মহৎকে নীচ করে।

১৮। দাতা যে বস্তু গ্রহীতাকে দিবে, তাহা যদি গ্রহীতার ব্যবহার্য্য না হয়, তবে ঐ দানের ফল হয় না। মিষ্টবাক্যের সহিত দান না করিলে ফল অর্দ্ধেক হয়।

সংক্রামক ব্যাধি ও আয়ুর্ব্বেদ।

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাতীর্থ কবিরাজ—

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তাঁহাদিগের পুস্তকে সংসর্গজ বা সংক্রামক ব্যাধির একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন :—

সুশ্রুতের মতে নিম্নলিখিত ব্যাধি সকল এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত যথা,—

১। কুষ্ঠ

২। জ্বর

৩। শোষ

৪। নেত্রাভিষ্যন্দ এবং

৫। ঔপসর্গিকরোগ সকল।

ডল্লন ঔপসর্গিক রোগের অর্থ করিয়াছেন,

শীতলিকাদি রোগ,

শ্রুত এবং ডল্লনেরস্থ কথাগুলি এই—

সুশ্রুত :—

"প্রসঙ্গাদ্গাত্র সংস্পর্শান্নি শ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাশনাচ্ছাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম॥

ডল্লন :—

প্রসঙ্গাৎ—গাত্র সংস্পর্শাদিতি

প্রসঙ্গাৎ—ইতি প্রসঙ্গেন কৃতাভ্যাসেন কৃতাৎ

পুনঃ পুনঃ কৃতাদিতীর্থঃ।

ইদং বিশেষণংগাত্রসংস্পর্শনাদিভিঃ

সর্ব্বৈঃসহ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে।

সহ শয্যাসনাদিভি :—একশয্যাস্থিতত্বাদিভিঃ সহ।

মাল্যং—পুষ্পন্

ঔপসর্গিকরোগাঃ—শীতলিকাদয়ঃ

সংক্রামন্তি—আবিশন্তি।

ইহাদের মতে—পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ, গাত্রসংস্পর্শ, সহভোজন এক শয্যায় শয়ন, ব্যবহৃত বস্ত্র মাল্য এবং গন্ধাদি অনুলেপন হইতে কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ এবং শীতলিকাদি ঔপসর্গিক রোগ এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। অর্থাৎ যাহাদের এই রোগ আছে, তাহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপ পুনঃ পুনঃ সংসর্গ হইতে সুস্থদেহ ব্যক্তিরও ঐ রোগ হইয়া থাকে।

ভাবমিশ্র তাহার গ্রন্থে সুশ্রুতের এই শ্লোকটি—

কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন—

সংসর্গজান্ রোগানহি—

"প্রসঙ্গাদগাত্র সংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।

একশয্যাশনাষাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥

কণ্ডু কুষ্ঠোপদং শাশ্চভূতোন্মাদব্রণজ্বরাঃ।

ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥

ম্রিয়তে যদি কুষ্ঠো পুনর্জ্জাতস্য তেবেৎ।

অতো নিন্দিত রোগোঽয়ং কুষ্ঠং কষ্টং প্রকীর্ত্তিম্॥"

ভাবপ্রকাশের টীকায় আছে—

প্রসঙ্গ :—মৈথুনম্

ফলতঃ সংক্রামক রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সুশ্রুত যাহা যাহা বলিয়াছেন, ভাবপ্রকাশে—ঠিক সেই সমস্ত উপদেশই আছে,—অধিকন্তু ভাবমিশ্রের সংক্রামক রোগের তালিকায় নিম্নলিখিত রোগগুলি অব্যাহত দেখিতে পাওয়া যায়

১। কণ্ডু
২। কুষ্ঠ
৩। উপদংশ
৪। ভূতোন্মাদ
৫। ব্রণ
৬। জ্বর এবং
৭। ঔপসর্গিকরোগ

ভাবপ্রকাশে শোষ নেত্রাভিষ্যন্দ যদিও সংসর্গজ রোগের তালিকা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে কণ্ডু উপদংশভূতোন্মাদ এবং ব্রণ সংক্রামক রোগের মধ্যে নূতন করিয়া পরিগণিত হইতে পরিদৃষ্ট হয়।

বাগ্‌ভট বলেন, স্পর্শাদি হেতুবশতঃ প্রায় রোগমাত্রেই সংক্রামক হয়, তবে নেত্ররোগ এবং ত্বগ্‌ গত বিকার বিশেষ ভাবে সংক্রামক তাহার কথা গুলি এই—

স্পর্শৈকাহার শয্যাদি সেবনাৎ প্রায়শোগদাঃ
সর্ব্বে সঞ্চারিণো নেত্রত্বাদ্বিকারা বিশেষ।

অরুণদত্ত এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

স্পর্শৈক হাবেতি—
সর্ব্বে রোগা প্রায়শো-বাহুল্যেন
সঞ্চারিণঃ—সঞ্চারণ শীলাঃ
কুতঃ ?
একে চতে আহার শয্যাদয়শ্চ
একাদায় শয্যাদয়ঃ
আদি শব্দেনা সনাদীনাং গ্রহণম্।
স্পর্শঃ—সংশ্লেষঃ
স্পর্শশ্চ একাদীয় শয্যাদয়শ্চ তেষং
সেবনং—ভজনং
তস্মাৎ।

নেত্রের ত্বক্‌র—নেত্রত্বক তত্র বিকারস্তাদাস্তে বিশেষো সঞ্চারিণঃ।

মনুসংহিতার টীকাকার কল্লুক ভট্টরমতেও রোগমাত্রেই সংক্রামক ইহাতে শোষ সংক্রামক ব্যাধির তালিকায় পরিগণিত হইয়াছে।

কেবল প্রাচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে নহে; প্রত্যাচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানেও সংক্রা-

মক ব্যধির তালিকার প্রায় ঐ সকল রোগ পরিগণিত হইতে পরিদৃষ্ট হয়। অধিকন্তু প্রতীচ্য চিকিৎসাবিদ্‌গণ বহু গবেষণার দ্বারা স্থির করিয়াছেন, কতিপয় উদ্ভিজ্জীবন বা জীবাণু। এক কথায় ভূতবিশেষ রোগীর শরীর হইতে সুস্থদেহে সংক্রমণ করিয়া ঐ সকল ব্যাধি সমুৎপাদন করে। ডাক্তার অসলার কুষ্ঠকে (Leprosy) স্পষ্টতঃ এই সংক্রামক ব্যাধির তালিকাভুক্ত করিয়ছেন, তাঁহার মতে শোষ (Tuberculosis) ও এই তালিকাভুক্ত।

হিতে বিপরীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র।

(১)

সত্য! জানিনা, কেন আমি তোমায় ভালবাসি, তোমাকে না দেখিলে, আমার মন যেন কেমন করিতে থাকে! যতক্ষণ তোমায় সহিত কথাবার্ত্তা হয়, তোমার কাছে বসি, আমার কোন ভাবনা চিন্তা থাকেনা, অনন্ত আনন্দ সাগরে ভাসিয়া যাই! তুমি কি বলিতে পার—কেন আমার এমন হইয়াছে? সাদর সম্ভাষণে শ্রীনাথ সৌদামিনীকে উল্লিখিত কথা কয়েকটী জিজ্ঞাসা করিল। তদুত্তরে সৌদামিনী বলিল, " এ প্রশ্নের আমি কি উত্তর দিব? অনেক দিন হইতে উভয়ের দেখা শুনা, আলাপ পরিচয়। আমি অকপট চিত্তে তোমাকে মনের কথা ব্যক্ত করি, তুমিও মনের ভাব আমার নিকট গোপন কর না। মনে মনে এই মিলনই এ সম্ভাবের কারণ, তুমি প্রতিদিন আমাদের বাটীতে আইস, আমি তোমার নিকট যাইয়া সংসারের যখন যাহা হয়, তোমাকে জানাই, এরূপ সম্বন্ধে উভয়ে উভয়ের উপর অনুরাগ জন্মিয়াছে। "

শ্রীনাথ। এ আলাপে লাভ কি? তুমি লক্ষপতির দুহিতা, বিলাসভোগে পালিতা। চোখের নেশায় ভালবাসিয়া আমি আমার নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। তোমার পিতা আমার অন্নদাতা, সেইসূত্রে তিনি আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন; অন্ন জলের বরাত যে কয়েক দিন আছে, অবশ্য তাঁহার অনুগ্রহে দিনপাত হইবে। কিন্তু সে কয় দিনের জন্য? প্রভু কোন কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইলেই, তোমার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘুচিয়া যাইবে, এরূপ স্থলে আমি তোমাকে ভালবাসিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছি, ঈশ্বরের কৃপায় তুমি ভাগ্যবানের কন্যা, পিতা তোমাকে

যোগ্যবরে সম্প্রদান করিবেন, তুমি আদরের পুতুল আদরেই কালযাপন করিবে, আর আমার অদৃষ্টে পরিতাপ ভিন্ন কিছুই নাই। সত্য! বলিতে কি, আমি তোমায় না দেখিতে পাইলে, মনটা কেমন কাঁকা কাঁকা বোধ করি, কাজ কর্ম্ম কিছুই ভাল লাগেনা। কর্ম্মস্থলে আমার পক্ষে এ এক বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনের ভাব তুমিই বুঝিয়াছ, এ কথা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার আমার সাহসে কুলায় না, মনের কথা মনেই মিলাইয়া যায়।

সৌদামিনী। পিতা আমার ব্যবসায়ী। যাহাতে মুলধনের উত্তরোত্তর সমধিক বৃদ্ধি হয়, এই লইয়াই তিনি ব্যস্ত। সংসারের সকল দিক দেখিতে তাঁহার অবসর হয় না। কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে, সে সকলে তাঁহার লক্ষ্য ও নাই। এরূপ অবস্থায় তোমার মনের ভাব তিনি কিরূপে বুঝিবেন?

শ্রীনাথ। আমার ভাব গতি তিনি বুঝিতে পারিলে, এত দিনে আমায় কর্ম্মস্থল হইতে বিচ্যুত হইতে হইত। আমারই সম্পূর্ণ দোষ, নতুবা গরীবের ছেলে আকাশের চন্দ্রে দৃষ্টি কেন? সৌদামিনী! তুমিই আমার এ অশান্তির মূল কারণ, আমি তোমাকে দেখিয়াই এরূপ আত্মহারা হইয়াছি, তোমায় আমায় যদি দেখা সাক্ষাৎ না হইত, তাহা হইলে আমাকে এ বিপদে পড়িতে হইবে কেন? শয়নে স্বপনে তোমার ওই হাসি মাথা মুখখানি মনে পড়িয়া আমি আপনাকেই ভুলিতে থাকি। ঈশ্বর আমাকে চক্ষু দুইটী দিয়াই এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন, আমি জন্মান্ধ হইয়া পৃথিবীতে আসিলে, এ কষ্ট কদাচ ভোগ করিতে হইত না! সকলই অদৃষ্টের দোষ!

সৌদামিনী। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। গত বিষয়ের আন্দোলনে কোন ফল নাই। এখন যাহাতে কোন পক্ষে অনিষ্ট না হয়, এইরূপ উপায়ের প্রয়োজন। আমি তোমার নিকট পাঠাভ্যাস করি, পিতার অনুমতিক্রমেই তোমাতে আমাতে দেখা হইয়াছে, তুমি পিতার কর্ম্মচারী, তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যাদি যথাযথ সমাধান করিয়া অবসর সময়ে আমাকে পাঠাধ্যয়ণ করাও, তোমায় আমায় গুরু শিষ্য সম্বন্ধ। তোমার যে ভাবান্তর ঘটিয়াছে, এ কথা প্রকাশ্য ভাবে না জানাইলে, অন্যে কিরূপে বুঝিতে পারিবে?

সৌদামিনীর পাঠগৃহে বসিয়া শ্রীনাথ ও সৌদামিনীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল, সে কথা সেই দুইজন ব্যতীত অন্য কেহ জানিতে পারিল না।

অষ্টাদশ বর্ষে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অবস্থার প্রতিকূলতা প্রযুক্ত শ্রীনাথ চাকুরী স্বীকার করিতে বাধ্য হন, আত্মীয় স্বজন মুরুব্বী সহায় না থাকিলে সহসা ভাল চাকরী জুটে না, অগত্যা নিঃসহায় শ্রীনাথ রমাকান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

(২)

রমাকান্ত দত্ত পাটের কারবারে দশ টাকার সংস্থান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার কারবারের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি, মুহুরী, যাচনদার ওজন সরকার, খাজাঞ্চী, বিলকলেক্টার দ্বারবান বেহারা প্রভৃতি ব্যবসার জন্য যে সকল শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন, দত্ত মহাশয়ের সকল দিকেই সুব্যবস্থা হইয়াছে। ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতায় রমাকান্ত দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছেন। সংসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও একমাত্র অবিবাহিতা কন্যা সৌদামিনী। দত্তমহাশয় দুহিতাকে বড় ভালবাসেন, স্নেহের পুত্তলি কন্যাকে সর্ব্বদাই সুসজ্জিতা রাখেন, সংসারে অন্য বালক বালিকা না থাকায় সৌদামিনী পিতার বড় আদরের। শ্রীনাথ লাহা রমাকান্তের একজন কেরাণী। প্রভু ও কর্ম্মচারী উভয়েই এক জাতীয়, একারণ কর্ম্মস্থলের অবকাশের সময় শ্রীনাথকে দত্তমহাশয় কন্যাকে শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, লাহা মহাশয় সে জন্য স্বতন্ত্র বেতন পাইয়া থাকেন।

সৌদামিনী এক্ষণে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইয়াছে, ধনশালীর গৃহে পুত্র কন্যা পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে স্বভাবতঃ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া থাকে, বলা বাহুল্য সৌদামিনী বয়সে অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলেও পূর্ণ যুবতীর সর্ব্বলক্ষণ তাহার অবয়বে বিকাশ হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা এরূপ কন্যাকে জন সমাজে বাহির করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, কিন্তু এক্ষণে বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মানুসারে ইহা দূষ্য বহিয়া ধর্ত্তব্য হয় না। দত্ত মহাশয়ের বাটীতেই কর্ম্মস্থান, লোকজন তাঁহার বহির্ব্বাটীতেই কাজ করে, আফিস গৃহের সংলগ্ন গৃহ সৌদামিনীর পাঠাগার। মসী-জিবী কর্ম্মচারীগণের অবসরের সহিত শ্রীনাথের ছুটি, কিন্তু প্রভুকন্যাকে পড়াইবার জন্য তাঁহাকে গৃহান্তরে উপস্থিত হইতে হয়, তথায় সৌদামিনী আসিয়া তাঁহার কাছে লেখা পড়া শিখে। একে সৌদামিনীর দেহে যুবতীর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাহার দিব্য কান্তি দর্শকের মনোহারী। শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত হইলেও শ্রীনাথ সৌদামিনীকে অন্য চক্ষে দেখেন। সৌদামিনী শিক্ষক মহাশয়ের ভাব ভক্তি বুঝিয়া তাহাতে প্রশ্রয় দিয়া থাকে

ছাত্রী ও গুরুর যে এরূপ ভাব দত্ত মহাশয়ের সংসারে আর কেহ তাহা অবগত নহে।

সময়ে সময়ে রমাকান্ত পুত্রীকে লেখা পড়া সম্বন্ধে দুই একটী প্রশ্ন করেন, সৌদামিনী তাহার যথাযথ উত্তর দেয়, শ্রীনাথ কর্ম্মস্থানে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, শিক্ষকতায় তাঁহার সে প্রশংসা হ্রাস না হইয়া অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে, দিনে দিনে ছাত্রী শিক্ষকের সহায় স্থানীয়া হইয়াছে।

মনোনয়নে শ্রীনাথ সৌদামিনী পরস্পর আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু একে নিঃস্ব, অন্যে ঐশর্য্যশালীর কুমারী, এরূপ স্থলে উভয়ের বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া এক কালে অসম্ভব। শ্রীনাথ প্রথম আলাপেই সম্যক বুঝিয়াছে যে, তাহার অদৃষ্টে এ সংযোগ ঘটিবে না, তথাচ প্রণয় আবেগে অভাগা যে আশালতা হৃদয়ক্ষেত্রে স্বহস্তে আরোপিত করিয়াছে, কোন প্রাণে সে লতিকা স্বয়ং উৎপাটিত করিতে পারে।

কথা প্রসঙ্গে শ্রীনাথ ছাত্রী সমীপে সকল কথা জ্ঞাপন করিয়াছে, আপনার পরিচয় প্রদানে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। স্পষ্টই জানাইয়াছে যে, দৈব প্রসাদ ভিন্ন তাহার মনোরথ পূর্ণ হইবার নহে।

দত্ত মহাশয়ের ধনের অভাব নাই, তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে সুযোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, বিলাসময়ী সৌদামিনী ধনশালীর পুত্রবধূ হইবেন, বিলাস ভোগে আজীবন তাহার কাটিবে, কিন্তু দরিদ্র শ্রীনাথের মনের আশা মনেই মিলাইবে, ইহজীবনে সে আশা তাহার পূরণ হইবে না। উদ্বেগ পূর্ণ চিত্ত শ্রীনাথ সৌদামিনীকে বলিলেন; "সহু! তোমার পিতার ধনের অভাব নাই, আমি গরীব, উভয়ে স্বর্গ মর্ত্ত ব্যবধান; তিনি প্রভু আমি তাঁহার ভৃত্য। এমন কোন কাজ নাই যাহাতে তাঁহাকে এককালে সুপ্রসন্ন করিয়া তোমার পাণিপীড়নের জন্য আকিঞ্চন করি?" তদুত্তরে সৌদামিনী বলিল, "পিতা আমার সদাশয়। তিনি অল্পে তুষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু সে সুযোগ সময় সাপেক্ষ।" "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ প্রাণ থাকিতে উদ্দেশ্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইব না, ঈশ্বর কৃপা দৃষ্টি করেন— মনোরথ পূর্ণ হইবে, নতুবা যে ভাবে দিন কাটিতেছে, এই রূপেই কাটিয়া যাইবে।" এই কথা বলিয়া শ্রীনাথ সৌদামিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এক্ষণে শ্রীনাথের সৌদামিনীই ধ্যান জ্ঞান, অহোরাত্র তাহার কথাই শ্রীনাথের তোলাপাড়া হইয়াছে, সেই চিন্তায় সে বিভোর। যাহা না করিলে

নয়, অনিচ্ছাসত্ত্বে শ্রীনাথ তাহা করিয়া থাকে। দুর্ভাবনায় শ্রীনাথের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছে বলিলেই হয়। মনের উদ্বেগ অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া সে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু এ দুরভিসন্ধি অপরে জ্ঞাত হইলে, তাহার ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টেরই সম্ভাবনা, একারণ অভাগা সে অন্তর্জ্জ্বালা অন্তরেই সহ্য করে।

(৩)

সংস্থানের প্রতি যাহার সম্যক দৃষ্টি, অনেক সময়ে তাহাকে সময় ও সমাজোচিত অশন বসনের পরিপাট্যে অমনো-যোগী থাকিতে হয়। রমাকান্ত স্বোপার্জ্জনে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, বহুল মূলধন লইয়া তাঁহার সুবৃহৎ পাটের কারবার চলিতেছে। যে সকল আসবাব থাকিলে, সংসারে বড় বলিয়া গণ্য হওয়া যায়, ভগবানের কৃপায় রমাকান্তের সে সকলেরই সুব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু নিজের সাজ সজ্জায় তিনি এককালে দৃষ্টিহীন, কার্য্যসূত্রে সাহেব সুবোর সহিত দেখা করিতে হইলে যেরূপ বেশ ভূষার আবশ্যক, সে সকলই দত্ত মহাশয়ের আছে, অথচ সচরাচর ব্যবহারে তিনি সামান্য লোকের মত পরিচ্ছদই ধারণ করিয়া থাকেন।

শ্রীনাথের একমাত্র উদ্দেশ্য কোন প্রকারে দত্ত মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার কন্যারত্নের সহিত বিবাহ সূত্রে মিলিত হইবে, কিন্তু সাধ্য সাধনায় তাহার সে সাধ মিটিতেছে না। এক দিন পদব্রজে দত্ত মহাশয় রাজপথ দিয়া আসিতেছেন, সে দিন তাঁহার বেশভূষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, অকস্মাৎ তিনি একখানি দ্রুত গতিশীল মটরকারের সম্মুখীন হইলেন, শকটখানি দত্ত মহাশয়ের অঙ্গস্পর্শ করে নাই কয়েক হাত অন্তর উপস্থিত হইবা মাত্র শশব্যস্তে শ্রীনাথ প্রভুর দেহ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে স্থানান্তর করিতে চেষ্টা পাইল, যে উদ্দেশ্যে শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়কে রক্ষা করিতে যাইল, তাহা পূরণ হইলেও পথিপার্শ্বস্থ কর্দ্দম মধ্যে রমাকান্তের স্থূল দেহ নিক্ষিপ্ত হইল, দত্তমহাশয়ের পোষাক পরিচ্ছদ ধূলি কাদা লিপ্ত হইল, শ্রীনাথ প্রভুর নিকট পুরস্কার বিনিময়ে তিরস্কৃত হইল।

দৈব দুর্ব্বিপাকে উদ্ধার করিয়া প্রভু সমীপে শ্রীনাথ সমাদৃত হইয়া তাহার আশা পূর্ণ করিবার কথঞ্চিৎ সুযোগ পাইবে ভাবিয়াছিল কিন্তু সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। তিনি প্রভুর অনুরাগ ভাজন হইতে প্রয়াসী হইয়া বিরাগ ভাজন হইয়াছেন,

সাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছিলেন. ভাগ্যদোষে তাহার সে উদ্যম বিফল হইয়াছে. তিনি লজ্জা ঘৃণায় সমধিক মৃয়মাণ হইয়াছেন, তথাচ প্রণয়ের কি মোহিনী শক্তি! কোন সূত্রে প্রভুকে মোহিত করিয়া তিনি সৌদামিনীর স্বামী হইবেন, ইহাই তাঁহার একান্ত বাসনা, সে উদ্দেশ্য সাধনে তিনি হাস্যাস্পদ ও প্রভুর অপ্রিয় হইয়াও এখনও নিশ্চেষ্ট হন নাই।

অন্য এক দিন কর্ম্মস্থলের অবসরের পর কর্ম্মচারীগণ যে যাহার বাসায় চলিয়া গিয়াছে, এমত সময়ে কার্য্য সূত্রে শ্রীনাথকে প্রভুর বাটীর অভিমুখে আসিতে হইয়াছিল, তিনি দেখিলেন কর্ম্মস্থানের কোষাগারের লৌহদ্বার উন্মুক্ত, যে লৌহ আলমারায় প্রভুর যথা সর্ব্বস্ব রক্ষিত থাকে, তথায় এক বিকট বেশধারী পুরুষ দণ্ডায়মান. স্বয়ং রমাকান্ত ভিন্ন সে আলমারি অন্য কাহারও উন্মোচন করিবার অধিকার নাই, অথচ এই ভীষণ মুর্ত্তি অপরিচিত ব্যক্তি অবশ্য মন্দ অভিপ্রায়েই আলমারির সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এই অনুমানে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া শ্রীনাথ দেখিল, আলমারির দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, তিনি কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া সজোরে সেই আলমারির দরজা বন্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই আগন্তুকও আলমারিজাত হইল।

শ্রীনাথের আনন্দের আর সীমা নাই, এত দিনে তাহার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। দত্ত মহাশয় এতাবৎ কাল পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, সকলই সেই আলমারিতে স্থান পাইয়াছে, তিনি যথা সময়ে উপস্থিত না হইলে নিশ্চয়ই আগন্তুক সমস্তই আত্মসাৎ করিত। দত্ত মহাশয়ের মস্তকে বজ্রাঘাত হইত, এ সুযোগ শ্রীনাথের বহু সৌভাগ্যের পরিচয়। তিনি তথা হইতে সবেগে বাহির হইয়া দ্বারবান বেহারা কাহারও কোন তত্ত্ব না লইয়া এক কালে সৌদামিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, অসময়ে শিক্ষক মহাশয়কে দেখিয়া বালিকা সাগ্রহে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল। সোৎসাহে শ্রীনাথ উত্তর করিল "এতদিনে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। বহুদিনাবধি আমি প্রভুর মনোরঞ্জন জন্য চেষ্টিত ছিলাম, এক্ষণে যে কাজ করিয়াছি, তাহাতে তিনি অবশ্যই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। শ্রীনাথকে বাক্যের আড়ম্বর করিতে দেখিয়া সৌদামিনী বলিল, "আর কথার প্রয়োজন নাই, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহাই শুনিতে চাই।"

শ্রীনাথ। এখন আমি এই দিকে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, সহসা কোষাগারের প্রতি আমার ...

প্রভুর যে লৌহ আলমারিয় যথা সর্ব্বস্ব রক্ষিত থাকে, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, এরূপ বীভৎস ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না, অগ্রসর হইয়া বুঝিলাম, আগন্তুক বাই আলমারির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে এবং সংরক্ষিত রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে, সে সময়ে অন্য কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আমিই সজোরে সেই আলমারি বন্ধ করিলাম, সেইসঙ্গে তস্কর আলমারিভুক্ত হইয়াছে।

শ্রীনাথের কথা শুনিয়া সৌদামিনী স্তম্ভিতা হইল, অবিলম্বে দ্বারদেশের রক্ষককে তিনি ডাকাইলেন, প্রভুকন্যার ডাকে দ্বাররক্ষক তথায় উপস্থিত হইলে, সৌদামিনী সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোষাগারের দ্বার মুক্ত, লৌহ আলমারি খুলিয়া তস্কর টাকাকড়ি সমস্ত আত্মসাৎ করিতেছিল, মাষ্টার মহাশয় উপস্থিত হইয়া সেই বদমাইসকে আলমারি রুদ্ধ করিয়াছেন, এ সংবাদ তোমরা কি কিছু অবগত নহ?

সৌদামিনীর এরূপ সংবাদে প্রহরী বিস্মিত হইল, ইতঃ পূর্ব্বে প্রভু কোষাগারে প্রবেশ করিয়াছেন, সে সবিশেষ অবগত ছিল, আশঙ্কার কোন কারণ নাই নিশ্চয় জানিয়া সে বলিল, "এইমাত্র প্রভুকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি, এখন তিনি কোথায়?"

দ্বারবানের মুখে এরূপ ব্যপার শুনিয়া সৌদামিনী অতিশয় চঞ্চলা হইলেন, অবিলম্বে সেই আলমারি খুলিবার জন্য চেষ্টিতা হইলেন, কিন্তু তাহার ডালা এরূপ চাপিয়া পড়িয়াছে যে, সমস্ত দ্বারবান ও আর আর সকলে সেই আলমারি খুলিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা পাইল, কিন্তু কেহই কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারিলনা, ইতি মধ্যে সৌদামিনী যে দোকান হইতে সেই আলমারি ক্রয় করা হইয়াছিল, তথায় লোক পাঠাইয়া দিলেন, তাহাদের কর্ম্মচারী সত্বর দত্ত মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া সাধ্যমত সেই আলমারি খুলিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

এই গোলযোগে দত্ত মহাশয়ের গৃহ লোকজনে পূর্ণ হইয়াছিল, স্থানীয় কর্ম্মকার গণও তথায় আসিয়াছিল, সম্ভবতঃ গৃহকর্ত্তা আলমারি বদ্ধ হইয়াছেন, অবিলম্বে ইহা মুক্ত করিবার উপায় করিতে না পারিলে, তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা এই আশঙ্কায় যন্ত্রদ্বারা আলমারির গাত্রে কয়েকটী ছিদ্র করিয়া দেওয়া হইল এবং কিছুক্ষণ পরে তাহার টানা কপাটও খুলিয়া

উপস্থিত সকলেই দত্ত মহাশয়ের বিপাকে সহানুভূতি দেখাইল, সমাগত সকলেই সাধ্যমত তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিল. কিন্তু শ্রীনাথ মাষ্টার সেস্থান হইতে তৎপূর্ব্বেই সে অন্তর্ধান হইয়াছে তাহার আর সাক্ষাৎ হইল না, অভাগা অবশ্য যে এই দুষ্কার্য্য স্বয়ং করিয়াছে, উপস্থিত সকলেই এ কথা বুঝিতে পারিল, তাহার সন্ধানে লোক প্রেরণে বিলম্ব হইল না। এদিকে সৌদামিনীর ও সাধারণের সেবা সুশ্রূষায় রমাকান্ত অবিলম্বে চৈতন্য লাভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরও সুস্থ হইল।

(৪)

ঈশ্বর যাহার প্রতি প্রতিকূল, সে সাধ্যমত চেষ্টিত হইয়াও কার্য্য সাফল্যতা লাভ করিতে পারে না। অদৃষ্ট দোষে অভাগা শ্রীনাথ এক্ষণে প্রভু ও অপরাপর সর্ব্বসাধারণের বিরক্তিকর ও অপ্রিয় হইয়াছেন, তাঁহার কলঙ্কের কথা হাটে বাজারে সর্ব্বস্থানেই প্রকাশ পাইয়াছে, জনসাধারণে তাহাকেই প্রকৃত অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। শ্রীনাথের এযাত্রা আর নিস্তার নাই, সে ধনে প্রাণে মারা পড়িল, স্থির জানিয়াছে, প্রাণের দাবে শ্রীনাথ প্রভুর বাটী হইতে পলায়ন করিয়াছিল। বহুকষ্টে শ্রীনাথ নিজ আবাসে উপস্থিত হইয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, দুই চারি দিবস সভয়ে কাল যাপন করিতে না করিতে সন্ধানকারীগণ তাহাকে প্রভুর সম্মুখে হাজির করিয়া দিবে, পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য রমাকান্ত তাহার উপর অসন্তুষ্ট রহিয়াছেন, এক্ষণে তাহার যে গুরুতর দোষ হইয়াছে সে অপরাধে নিস্তার নাই। লজ্জায় ভয়ে শ্রীনাথ দত্ত মহাশয়ের দেশ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ইংরেজের মুল্লুকে নির্দ্দোষীর ক্ষমা ও দোষীর শাস্তি অবধারিত, স্থানান্তরে যাইয়া শ্রীনাথ যে আইনের ধর্ম্ম সহিত সুক্ষ্ম হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে, সুসভ্য দেশে সেরূপ অবৈধ ব্যবস্থা নাই।

অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীনাথ লাহা হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইল, রাজ দ্বারে বিচারে সে নিজেই অপরাধী বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইল। প্রভু কন্যার পাণি গ্রহণে শ্রীনাথ একান্ত আসক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার পক্ষে কঠোর পরিশ্রম সহ সুদীর্ঘকাল কারাগারে যাপনের ব্যবস্থা হইল।

গীতোক্তধর্ম্ম ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল ।

জ্ঞান ।

অধ্যাত্ম-বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। এইবিদ্যা পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারত-বর্ষীয়েরাই জানিতেন, কেবলমাত্র এই বিদ্যার প্রাধান্য লাভ করিয়াই তাঁহারা এই জরা মরণ-সঙ্কুল সংসার হইতে পরম পদ লাভ করিতেন। এবং এই বিদ্যার প্রভাবেই বিদেহাত্মা হইয়া পরকায় প্রবেশ প্রভৃতিও করায়ত্ব করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া সত্বগুণাশ্রয়ী না হইলে এই বিদ্যালাভ করা যায় না; শম দম তিতিক্ষাদির জন্য সত্বগুণই অবলম্বনীয়।

সত্বগুণাশ্রয়ী জ্ঞানী জানেন যে, ব্রহ্মই কেবলমাত্র সর্ব্বশক্তিমান, তিনিই কেবল সচ্চিদানন্দ, নিত্য, পূর্ণ এবং অব্যয়। এই সর্ব্বব্যাপী আত্মায় যাহা বিদ্যমান নাই. তাহা অন্যত্র কোথাও নাই, ইহাই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, এবং ইহাই শ্রীভগবান অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণ, এই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের শক্তি সমূহ সর্ব্বদিকেই বিকসিত। দাহিকা শক্তি আছে, বলিয়াই যেমন অনলের অনলত্ব, স্পন্দন শক্তি আছে, বলিয়াই যেমন বায়ুর বায়ুত্ব, দ্রবশক্তি আছে, বলিয়াই যেমন সলিলের সলিলত্ব, তেমনই পরব্রহ্মের চিৎশক্তি ভুতশরীর অর্থাৎ জীবদেহে আছে বলিয়াই জীবের জীবত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে; জ্ঞানী জানেন এই জগৎটা মায়ারই বিকাশ মাত্র; মুলে সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম, কর্ম্মবাদে বলিয়াছি তো যে, কেবল জ্ঞানিই অনাশক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারেন, অজ্ঞানী পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জ্ঞানলাভ না হইবে; ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেহীর দেহাত্ম বোধ অনিবার্য্য।

সদ্‌গুরুর দ্বারা বা শম দম তিতিক্ষাদির পরে আত্মানুশীলন ব্যতীত এই জ্ঞান লাভ করা কাহারও সাধ্য নাই, এই জ্ঞান লাভ হইলে জ্ঞানী বুঝিতে পারেন যে, সত্বরজ এবং তমোগুণাশ্রয়ে শক্তি বা প্রকৃতিই কার্য্য করেন. ঘটে যাহা আকাশ আছে. উহা কার্য্যতঃ মহাকাশ, এক্ষণে ঐ মহাকাশ ঘটের ভিতরে অবস্থান করিলেও ঘটটীই কিন্তু মহাকাশাংশকে অবরোধহেতু খণ্ডিত করিয়াছেন, নতুবা আকাশের খণ্ড হইতে পারে না, উহা যে অপরিচ্ছিন্ন .সেই অপরিচ্ছিন্নই সর্ব্বত্র এক্ষণে সেই ঘট মধ্যস্থ আকাশ যদি মনে করে যে, আমি ঘট হইয়াছি, তবে সেই ঘটটী ভগ্ন হইলে বা কোন ছিদ্র হইলে আকাশ কি দুঃখ করিবে যে

আত্মার নাশ বিবেচনাই অজ্ঞানতা, দেহঘটে মহাকাশ তুল্য অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড আত্মা বিরাজমান দেহঘট নহেন, যেহেতু আত্মা ও দেহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, জ্ঞানী জানেন একমাত্র অখণ্ড আত্মাই খণ্ডরূপে দেহধারী আমি, আর অজ্ঞানী জানে দেহটাই আমি। অজ্ঞানীর এই দেহাত্মাভিমান আছে বলিয়াই মনের অভিমান প্রযুক্ত সর্ব্বদা শোক দুঃখাদিতে অভিভূত হইয়া জগতে শোক দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, জ্ঞানীর কিন্তু এ দুঃখ নাই।

শ্রুতি বলিতেছেন—

"পূর্ব্বমেক মেবাহদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ।
তস্মাদব্যক্ত মেকাহক্ষারম। তস্মাদক্ষরান্মহৎ।
মহতোঽহঙ্কারঃ। তস্মাদহঙ্কারাৎ।
পঞ্চতন্মাত্রাণি। তেভ্যো ভূতানি।
একমেব দ্বিতীয়াম্।"

আদিতে এক ব্রহ্মই ছিলেন, তাঁহা হইতে মায়া বা শক্তি, এই অব্যক্ত মায়া হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এতদনন্তর ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম্ — পঞ্চভূত।

এই মায়া বা শক্তিও ত্রিগুণময়ী "মায়া সা ত্রিবিধা প্রোক্তা সত্বরাজসতামসী" এই সাত্বিক হইতে মন রাজস হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং তামস হইতে সূক্ষ্মতন্মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে।

একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে কর, তুমি গভীর নিদ্রিত, এ সুষুপ্তিতে তোমার মন বুদ্ধি অহঙ্কার কিছুই নাই, থাকিলেও ক্রিয়া শূন্যতা হেতু কোন প্রকার উপলব্ধি নাই, লোক চক্ষেও তুমি শবতুল্য দেহ ব্যতীত আর কিছুই নাই, হঠাৎ তোমার ঘুমভাঙ্গিল, এই ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই কি তোমার "আছি" এই জ্ঞান আসিবে না? তবেই হইল যে, তোমার সুষুপ্তি বা আচ্ছন্ন অবস্থাটাই অব্যক্ত "আছি" এই জ্ঞান এই অনুভব করার নাম বুদ্ধি, মহতত্ত্ব ঐ বুদ্ধিরই নামান্তর মাত্র, এই মহতত্ত্ব বা বুদ্ধিই "আছি" সাব্যস্থ করিয়া দেয়। আমার আছির সঙ্গে সঙ্গেই অতর্কিত ভাবে অহং ভাব জাগিয়া উঠে। অর্থাৎ আমি আছি এই বোধ আনাইয়া দেয়, ইহারই নাম অহংতত্ত্ব বা আমিত্বোপলব্ধি, এই মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও দর্শেন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম বিভাগ যিনি সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন; তিনিই কর্ম্মতত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ জ্ঞানী, অতএব বুঝাগেল যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণসংঘটিত বিভাগ যিনি না জানিয়াছেন, তিনিই [illegible]

ব্যাপারে; আমি আমার এই অজ্ঞানতা ত্যাগ করা অজ্ঞানীর পক্ষে একেবারে সাধ্যাতীত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা এবং ত্রিগুণের গুণ ক্ষোভ বা বৈষম্যই সৃষ্ট্যারম্ভ, তবেই হইল সৃষ্টি আরম্ভ হইলেই প্রকৃতি বা শক্তি জনিত গুণেরও পরিণাম আরম্ভ হইল, সুতরাং পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রকৃত তত্ত্বই ব্রহ্ম, এবং প্রকৃতি বা শক্তির পরিণাম জনিত তত্ত্বই ত্রিগুণ শবলিত বা মায়িক, যাহা মায়িক তাহার পরিণামও অসংখ্য।

শক্তি যখন শক্তিমানে মিশিয়া থাকেন, তখন কেবল মাত্র এক অদ্বৈত পরম পদার্থই বিদ্যমান, তখন পর্য্যন্তও কিন্তু অহং এর লেশমাত্র নাই, যেহেতু কোন সৃষ্টিও নাই, তারপর যেমন শক্তি হইতে শক্তিমানের ভেদ হইতে আরম্ভ হইল, তখন হইতেই গুণক্ষোভ বা বৈষম্য ঘটিতে লাগিল ব্রহ্মের সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তিই যে এই গুণ বৈষম্যের কারণ, এ কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, তথাপি এ কথা পুনর্ব্বার বলিবার আবশ্যক এই যে ব্রহ্মের এই ইচ্ছাশক্তিই তাহার সঙ্কল্প সঙ্কল্পটী কি, না "অহং বহুস্যাম" যদি বল যে ব্রহ্মের এ সঙ্কল্প করিবার উদ্দেশ্য কি? ইহার উত্তর এই যে এই ইচ্ছাশক্তি বা সঙ্কল্পের কোন কারণ সাব্যস্ত করা মানব বুদ্ধির অতীত; যেহেতু ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র নহেন বা কোনও প্রকার কারণেরও অধীন নহেন, কেন না স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্ব কারণের কারণ—যিনি, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে কোন তর্ক আসিতে পারে না, স্বাধীনের ইচ্ছায় কোন কারণ নাই; তবে সঙ্কল্প কালে তিনি সগুণ ব্রহ্ম নতুবা নির্গুণ এই পর্য্যন্ত।

সগুণের এই সঙ্কল্প হেতু মায়ার বা প্রকৃতির কার্য্য আরম্ভ হইলেই অহং কর্ত্তা এই অভিমান জাগিয়া উঠে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অহং অভিমান ব্রহ্মেরও নহে বা মায়ারও নহে, ইহা ব্রহ্মোপরিভাসমান শক্তির ছায়া, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন দর্পণের নিকট লালবর্ণ বিশিষ্ট কোন দ্রব্য রাখিলে লালবর্ণই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, আবার উহা সরাইয়া লইলে দর্পণ স্বপ্রকৃতিতে অবস্থান করে, সুতরাং বুঝা যাইতেছে দর্পণে লালবর্ণ নাই, তদনুরূপ দর্পণে লোহিতাভ প্রতিবিম্বের ন্যায় ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির যে বিভাগ, যাহাকে মায়াশবলিত ব্রহ্ম বলা যায় তিনিই পুরাণের সগুণ ঈশ্বর বা মায়াধীশ শ্রীভগবান্, ইনিই

থাকিতে পারে না, থাকে মায়াধীশ ঈশ্বরে এবং জীবে, তবে এইটুকু মাত্র প্রভেদ যে অহং অভিমান মায়ধীশে আয়ত্বাধীন, কিন্তু জীবের তাহা নহে, জীব ইহাতে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ, কেন না ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন সঙ্কল্পে সৃষ্ট্যাদি হয়, আবার যখন তিনি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করেন, তখন তিনি সমাধিমগ্ন অর্থাৎ নির্গুণ একমেবাদ্বিতীয়াম্। কিন্তু জীব সঙ্কল্প করিয়াই তাহাতে বদ্ধ হয়, তবে হাঁ, জীব সেই দিন এই বদ্ধাবস্থা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারে, যে দিন প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ করিয়া এই সঙ্কল্পকে সম্পূর্ণ-রূপ আয়ত্ব করিতে পারে, এই সঙ্কল্পকে আয়ত্ব করিতে পারিলেই জীব শিবত্ব লাভ করিবে, এই পুরুষার্থ প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা জীবের আছে, তবে সঙ্কল্পকে আয়ত্ব করিবার মূলেও কিন্তু সেই মনোজয় যাহার পরিণাম অধ্যাত্ম-চিত্ত। কেন না অধ্যাত্ম চিত্ত না হইলে চিত্ত স্বাধীন হইয়া জ্ঞান কর্ম্মের অপব্যবহার করিবেই, অধ্যাত্ম চিত্ত হইতে পারিলেই পরমপদ লাভ করা সুদূরপরাহত হইবে না।
গীতা বলিতেছেন,—

"নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিসম্॥"

যাবতীয় কামতৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগোপকরণ বিরহিত মহাপুরুষ শরীর রক্ষা (শরীর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাহাকে রক্ষা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য না করিলে ঘোর প্রত্যবায় মহাপাপ শাস্ত্রে বলেন "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং) অর্থাৎ শরীর স্থিতি প্রয়োজনে (এই প্রয়োজনও আবার কর্ত্তৃত্বাভিমান শূণ্য হইয়া) কর্ম্ম করিলেও কেমন প্রকারে পাপভাগী হয়েন না। পাপকর্ম্ম সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী পুণ্যকেও ভোগ বলিয়া মনে করেন। কেন না পুণ্যও তো কর্ম্ম তদ্বারাও ভোগায়তন দেহ ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সুতরাং পুণ্য কর্ম্মকেও জ্ঞানী কষ্টভোগ বলিয়া মনে করেন। এই বিশ্বাসে পুণ্যকার্য্য করিলেও আবদ্ধ হয়েন না বলিয়া আর জরামরণ সঙ্কুল সংসারে বা স্বর্গাদিতে গমন করেন না, মুক্তি লাভই করিয়া থাকেন।

আসল কথা হইতেছে, যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া দৃঢ়তম রূপ ধারণ করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন তিনিই কেবল এ জগতে বিহিত অবিহিত উভয় বিধ কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হয়েন না। দেহত্মে

যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগ না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভে চেষ্টা করা বাতুলের কার্য্য। এই কর্ম্মার্পণের প্রথমে আত্ম বিচার, সে বিচার এই যে, কি করিয়া কর্ম্মত্যাগ হইবে, এই বিচারে বুঝিতে পারা যাইবে শ্রীভগবানে প্রগাঢ় বিশ্বাসই কর্ম্মত্যাগের প্রথম এবং সহজ উপায়, তৎপরে মনে মনে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে হইবে, প্রথমেই মনে বিচার উঠিবে যে আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম, কেন আসিলাম, আপনি আসিলাম? না কেহ আমাকে পৃথিবীতে লইয়া আসিল? এই বিচারে মনে হইবে আমিত্বটা কি? আমি দেহ নহি, আমি মন নহি, তবে আমি কি? এই বিচার এবং ধারণার অভ্যাসেই কর্ম্মারম্ভ হইবে, তারপর এই বিচার এবং এই অভ্যাসেই অধ্যাত্ম চিত্ত হওয়া যাইবে, ইহার বলেই কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলত্যাগ উভয়ই হইবে, ক্রমে ক্রমে সংসারের সকল বন্ধন ঘুঁচিয়া যাইবে। তবে এই সকল বিচার কেবলমাত্র শুধু মনে মনে করিলেই হইবে না, ইহার জন্য নিত্য শ্রীভগবানের চিন্তা করিয়া তাঁহাকে ডাকা চাই, প্রার্থনাই জ্ঞান লাভে পরম পদ প্রাপ্তির প্রথম সোপান।

(ক্রমশঃ)

হোমিওপ্যাথিক।

চিকিৎসাতত্ত্ববারিধি।

লেখক,—ডাক্তার টী, মুখার্জ্জী।

প্রকৃত হোমিওপ্যাথি কি এবং কি ভাবে পরীক্ষিত হইল।

ডাক্তার সামুয়েল হ্যানিম্যান স্বয়ং ও কতিপয় ডাক্তারের সাহায্যে পূর্ব্ব-প্রচলিত কতকগুলি চিকিৎসাপ্রণালীকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া নূতন চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করেন। তাঁহারা দুই রকমে ঔষধ সকলের পরীক্ষা করেন, কতকগুলি ঔষধ নিজেরা ও কতকগুলি ঔষধ জীবজন্তুকে সেবন করাইয়া ঔষধ সকলের প্রধান প্রধান লক্ষণ সংগ্রহ করেন, এবং শরীর আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির বিকৃতির লক্ষণ সকল জীবজন্তু হইতে সংগৃহীত হয়;

প্রধান লক্ষণ, প্রত্যেক ঔষধ হইতে বিভিন্ন, যেমন সকল গাছের পাতার রসের রং সবুজ বর্ণ. কিন্তু প্রত্যেকটীর গুণ বিভিন্ন প্রকারের। হ্যানিম্যান রোগ আরোগ্য করিতে ঔষধের ডাইলুসন করিয়া ব্যবহার করিতে লিখিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, কোনও একটী সুস্থব্যক্তিকে বিষ মাত্রায় একটী ঔষধ সেবন করাইয়া, কতকগুলি প্রধান লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা যাইল. অপর একটী রুগ্ন ব্যক্তির ঐ সকল লক্ষণ আছে, সেই কারণ দেখা যাইতেছে যে, রোগের লক্ষণ ও ঔষধের লক্ষণ উভয়েই সামঞ্জস্য হইল, এবং সেই সাদৃশ্যতা হেতু ঐ ঔষধের উচ্চ ডাইলুসনের এক মাত্রা ঐ রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম হইবে এই প্রণালীর চিকিৎসাকে "সমঃসমং সময়েতি সুত্র" বলে, এবং ইহাই প্রকৃত হোমিওপ্যাথি।

পীড়া ও পীড়ার উৎপত্তির কারণ।

পীড়া দুই প্রকার আছে, নূতন ও পুরাতন, নূতন পীড়া সকলের কোনও একটী আকস্মিক কারণ হইতে উৎপত্তি হয়, এবং পুরাতন পীড়াকে হ্যানিম্যান সাহেব তিন প্রকার বিষ হইতে উৎপত্তির কারণ বলেন।

১ম সোরা বিষ অর্থাৎ খোষ পাঁচড়া জাতীয় এক প্রকার বিষ।

২য় সাইকোসিস্ বিষ অর্থাৎ দোষস্থ মেহবিষ।

৩য় সিফিলিটিক বিষ অর্থাৎ উপদংশ নামক বিষ, এই শেষ দুইটী বিষ বেশ্যালয় হইতে উৎপত্তি হয়। এই সকল বিষ শরীরের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিয়া নানা প্রকার কষ্টসাধ্য পীড়া উপস্থিত করে, তন্মধ্যে অষ্টমাংশের সপ্তমাংশ রোগ সমূহ সোরা বিষ হইতে উৎপত্তি হয়, এবং অবশিষ্ট এক অংশ রোগ সিফিলিস্ অর্থাৎ উপদংশ ও সাইকোসিস্ অর্থাৎ মেহবিষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই উপদংশজ বিষ, শরীরে বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে ঐ বিষ রূপান্তর পাইয়া গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট করিয়া ফেলে। সাইকোটিক বিষ অর্থাৎ মেহ বিষ শরীরের মধ্যে বহুকাল থাকিলে নানাপ্রকার পীড়া আনায়ন করে। সাইকোটিক বিষে বাতরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি আরও অনেক রোগ আনায়ন করিবার ক্ষমতা আছে, ইহা ব্যতীত আরও তিন রকম বিষ আছে—সোরা ও সাইকোসিস্ মিশ্রিত; সোরা ও সিফিলিস্ মিশ্রিত; এবং সোরা সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ মিশ্রিত। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার পীড়া আছে, সে গুলি কীটাণু হইতে উদ্ভূত হয়, যেমন প্লেগ, বসন্ত, হাম, কলেরা টাইফয়েড ইত্যাদি।

রোগীর ধাতু।

সাধারণতঃ মনুষ্য দ্বাদশ প্রকারের ধাতু বিশিষ্ট হয় ; ১ম রক্ত প্রধান ধাতু। ২য় দুর্ব্বল ধাতু। ৩য় পিত্তপ্রধান ধাতু। ৪র্থ এপোপ্লেক্সিক ধাতু। ৫ম বায়ুপ্রধান ধাতু। ৬ষ্ঠ শুষ্ক ধাতু। ৭ম শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু। ৮ম বাতশ্লেষ্মা প্রধান ধাতু। ৯ম ক্ষয় ও গণ্ড মালা ধাতু। ১০ম চক্ষুরোগ বিশিষ্ট ধাতু। ১১শ পিত্ত শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু। ১২শ ত্রিদোষজ।

১। রক্তপ্রধান ধাতুর লোক বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সবল, রক্ত অত্যন্ত জোরের সহিত শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হয়, অত্যন্ত তেজী, কান্তি বিশিষ্ট, কর্ম্মিষ্ঠ, আমোদ প্রিয়, মাংসপেশী সুদৃঢ়, শরীরের উত্তাপ অধিক ও নাড়ী পূর্ণ বেগবতী, এই ধাতুর লোক নূতন প্রদাহ বিশিষ্ট পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়, অথবা স্থানীয় বা সাধারণ রক্তাধিক্য হইয়া থাকে।

২। দুর্ব্বল ধাতুর লোক সহজেই ক্লান্ত হয়, সামান্য পরিশ্রমে কষ্ট হয়, শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা কম, আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির সামান্য মাত্র ব্যাভিচারে আঘাত প্রাপ্ত হয়, মাংসপেশী শিথিল, মলাদি নিঃসরণ কখনও কম, কখনও বেশী হয়, সহজেই নির্জ্জীব বা উত্তেজিত হইয়া থাকে, ইহাদের নাড়ী দুর্ব্বল ও মৃদু, ইহারা সহজেই যান্ত্রিক পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হয়, যথা উৎকাশী অতিসার ইত্যাদি।

৩। পিত্তপ্রধান ধাতুর লোক সহজেই যকৃৎ রোগাক্রান্ত হয়, তাহাদের হয় উদরাময় না হয় কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, ইহাদের মুত্রের রং ঘোরাল, সচরাচর অর্শের পীড়া হইয়া থাকে, নাড়ীর গতি তারবৎ, ও মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল।

৪। এপোপ্লেক্সিস্ ধাতুর লোক খর্ব্বকায়, বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট ইহাদের অস্থি সকল ছোট ও মোটা, নাড়ী রক্তপ্রধান ধাতুর ন্যায়, মস্তকে সহজেই রক্তাধিক্য হয়, এই ধাতু বিশিষ্ট লোকের সচরাচর মৃগী রোগ হইতে দেখা যায়।

৫। বায়ুপ্রধান ধাতুর লোক অস্থিরচেতা, কখন কি কার্য্য করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না, কোনও কার্য্যে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারে না, উগ্র প্রকৃতির নাড়ীর গতি পরিবর্ত্তন শীল, বিচারশক্তি কম, দুটী বস্তুর তুলনা করিতে সহজে পারে না, ইহাদের বাতব্যাধি এবং ফিক্‌বেদনা হয় ও

৬। শুষ্ক ধাতুর লোক, ইহা বায়ুপিত্ত ধাতুর একত্র যোগ মাত্র—ইহারা পাতলা ও লম্বা, সেই জন্য অস্থিসমূহের জোড়গুলি উচ্চ দেখায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ও দ্রুতগামী হয়।

৭। শ্লেষ্মপ্রধান ধাতুর লোকের শরীরের গঠন সুগোল সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, শরীরের উত্তাপ অল্প, কোনও প্রকারের পীড়া হইলে সহজে আরোগ্য হয় না, অতিশয় শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়, এবং শ্লেষ্মাজনিত শরীরের নানাস্থানে ফোলাফুলি রোগ হয়।

৮। বাতশ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুর লোকের উভয় প্রকার ধাতুর একত্র সম্মিলনের লক্ষণাদি থাকে, তাহারাও ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না।

৯। ক্ষয় ও গণ্ডমালা ধাতুর লোকেরা পাতলা, সহজেই শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় আক্রান্ত হয়, দেহের নানা স্থানের গ্রন্থি সকল বড় বড় থাকে, গ্রন্থি সকলে বেদনা, পুঁজ, ঘা ইত্যাদি হয়। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না।

১০। চর্ম্মরোগ বিশিষ্ট ধাতুর লোকের, খোব পাঁচড়া, দদ্রু ইত্যাদি চর্ম্মরোগ, প্রায়ই থাকে, এই সকল লোক সাধারণ পীড়া লইয়া বহুদিন কষ্ট পায়।

১১। পিত্তশ্লেষ্মা ধাতুর লোকের, উভয় ধাতুর মিশ্রিত লক্ষণাদি প্রকাশ পায় সাধারণতঃ ইহারা আরোক্ত জ্বরাদিতে আক্রান্ত হয়।

১২। ত্রিদোষজ ধাতুর লোক অতি বিরল, এই ত্রিদোষ মিশ্রিত পীড়া উপস্থিত হইলে, জীবন সংশয়াপন্ন হয়।

চিকিৎসা প্রণালী।

চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে, যে কারণে পীড়ার উৎপত্তি হয়, তাহার অনুসন্ধান করা, দ্বিতীয়তঃ সেই পীড়ার জন্য শারীরিক যন্ত্রাদির বৈলক্ষণ্য বিষয় জানা। ৩য় সেই পীড়ার জন্য স্থানীয় বা সার্ব্বাঙ্গিক যে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিরাকরণ। পুরাতন পীড়ার চিকিৎসা করিতে হইলে রোগীর ধাতু, প্রকৃতি, অবয়ব, নাড়ীর গতি ইত্যাদি দেখিয়া ও রোগী কি প্রকারের পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া লওয়া।

১। স্বভাবের আরোগ্যকারী শক্তির অনুকরণ করা, যেমন একজনের সর্দ্দি হইয়াছে, যখন সে সর্দ্দি আপনা হইতেই আরোগ্য হয়, প্রায় দেখা যায় যে অত্যন্ত ঘাম হইয়া সর্দ্দি আরোগ্য হইয়া যায়; স্বাভাবিক আরোগ্যকারী

শক্তির অনুকরণ করিতে হইলে, এমন একটী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক যাহাতে স্বাভাবিক শক্তির মত ঘাম হয়।

২। রোগের বৃদ্ধি হইবার সময় অস্বাভাবিক উপায়ে বাধা দেওয়া যথা:— অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে, এ সময় ঠাণ্ডাজলে ডুবাইয়া রাখিয়া শরীরের উত্তাপ কমান বা মাথায় রক্ত উঠিয়া অত্যন্ত ভুলবকা এবং হস্তপদাদির আক্ষেপ হইতেছে এমন সময়ে মাথায় বরফ দিয়া নিবারণ করা।

৩। শরীরের রোগাক্রান্ত যন্ত্র বা যন্ত্র সকলের তন্তু বা তুন্ত সকলের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে স্থির বিশ্বাসের সহিত সাহায্য বা উত্তেজিত করিলে সুস্থ অবস্থার ক্রিয়াকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে পারা যায়; এবং তজ্জন্য রোগের লক্ষণ ও বিলুপ্ত হয়। যেমন যকৃতের পিত্তনিঃসরণ ক্রিয়া বন্ধ হইয়া, যকৃৎ বৃদ্ধি প্রদাহ ও বেদনা ইত্যাদি হইয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ঔষধের দ্বারা যকৃতের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে সাহায্য বা উত্তেজিত করিলে পিত্ত নিঃসরণ হইয়া যকৃতের প্রদাহ ইত্যাদি বিলোপ করিবে।

৪। এ রকম একটী ঔষধ প্রয়োগ করা, যে ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে তাহার আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে, যদিও কি প্রকারে, সেই ঔষধটী রোগ আরোগ্য করে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অহিফেন পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে উচ্চ শক্তির এক মাত্রায় কতকগুলি রোগে অহিফেনের বিষ ক্রিয়াবৎ লক্ষণ সমূহকে দুরীভূত করিয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে দুরীভূত করিতে সক্ষম হইল তাহা অনুভব করা যায় না।

এতদ্ব্যতীত মহাত্মা হ্যানিম্যান, চিকিৎসা আরও চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; ১ম আশু উপশম কারী ২য় আরোগ্যকারী, ৩য় মূলোচ্ছেদকারী, ৪র্থ প্রতিষেধক।

১। আরোগ্যকারী চিকিৎসা যথা:—কোনও একটী লোকের রেমিটেন্ট ফিবার অর্থাৎ অবিরাম জ্বর হইয়াছে, জ্বর প্রত্যহ প্রাতে ১০৩ ডিগ্রি ও বৈকালে ১০৫ ডিগ্রি (ফারন্‌হিট্) হইতেছে, রোগী শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুর, ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, ঠাণ্ডায় জ্বর বৃদ্ধি হয়, কাশী শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি হয়, শরীরের কোনও স্থান অনাবৃত থাকিলে কাশী বা জ্বর বৃদ্ধি হয়, এমন কি আকাশে মেঘ হইলেও তাহার পীড়ার বৃদ্ধি হয়, প্রাতে ও সন্ধ্যার পর সমস্তলক্ষণ বৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়াদির চৈতন্যাধিক্য থাকে, অত্যন্ত রাগী বা খিট্‌খিটে স্বভাব ও কোষ্ঠবদ্ধ আছে, এই সকল লক্ষণ দেখিয়া, উচ্চ শক্তির ১মাত্রা হিপার সলফর সেবন করাইলে,

হয়, রোগ প্রত্যাবর্ত্তনের লক্ষণ পুনরায় দেখা যায় না, ইহাই আরোগ্যকারী চিকিৎসা।

২। আশু উপশমকারী চিকিৎসা—কোনও একটী শিশুর কর্ণের মধ্যে বেদনা বা কট্ কট্ করিতেছে, তজ্জন্য শিশু অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছে, কোনও রকমে স্থির হয় না, ১০ মিনিট স্থির থাকে, পুনরায় অত্যন্ত ক্রন্দন করে, ইহাতে অনুমান করা যায় যে, বেদনা থাকে-থাকে ভয়ানক বৃদ্ধি পায় এই রকমের বেদনায় ২০০ শক্তির বেলেডোনা ১ মাত্রা সেবন করাইলে শিশু সুস্থ হইয়া নিদ্রা যায়। ইহাই আশু উপশমকারী চিকিৎসা।

৩। নির্ম্মূলকারী চিকিৎসা যথা:—কোনও এক ব্যক্তির উপদংশ অর্থাৎ গর্ম্মির ঘা হইয়াছে, অনেক দিবস চিকিৎসা দ্বারা ঘা আরোগ্য হইল, কিন্তু উপদংশজ বিষ শরীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিল, ঐ বিষ শরীরাভ্যান্তরে থাকার সময় তাহার একটী পুত্র হইল, পুত্রটী জন্মিবার পর হইতেই দেখা যাইতেছে যে, তাহার গাত্রে উপদংশজ ঘা ইত্যাদি হইতেছে, কিছুতেই আরেগ্যে হইতেছে না, এরূপ স্থলে প্রমাণ হইতেছে যে, এই উপদংশ বিষ শরীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, নির্ম্মূল হয় না। এই বিষ পঞ্চম পুরুষ অবধি দেখা যায়, হোমিওপ্যাথি মতে এই বিষ শরীর মধ্য হইতে মার্কিউরিয়াস সলিউভিলিস ঔষধের দ্বারা সমূলে নির্ম্মূল হইতে দেখা গিয়াছে। কোনও একটী রোগীর ঠিক উপরোল্লিখিত প্রকারের উপদংশজ বিষ শরীর মধ্যে ছিল তাহার প্রথম পুত্রের উপদংশজ বিষের লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়াতে সেই রোগীকে মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস উচ্চ শক্তির ১ মাত্রা প্রত্যেক ১৫ দিবস অন্তর সেবন করাইয়া দেখা গিয়াছে যে কিছুদিবস এই প্রকার চিকিৎসার ফলে ঐ উপদংশজ বিষ শরীর হইতে সমূলে উৎপাটীত হইয়াছে, এবং পরে তাহার অন্য সন্তানাদি কাহারও ঐ বিষের চিহ্নাদি পাওয়া যায় নাই, ইহাই প্রকৃত নির্ম্মূলকারী চিকিৎসা।

৪। প্রতিষেধক চিকিৎসা যথা:—কোনও বাড়ীতে অনেক পরিবার আছে, তন্মধ্যে এক জনের বসন্ত হইয়াছে, অপর কাহারও হয় নাই, এরূপ ক্ষেত্রে যাহাদের বসন্ত হয় নাই, তাহাদের সকলকে ভেরিওলিনাম উচ্চ শক্তির ১ মাত্রা করিয়া সেবন করাইলে আর কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইল যে, ভেরিওলিনাম নামক ঔষধটী বসন্ত রোগের প্রতিষেধক রূপ কার্য্যকারী।

পিয়ারীচাঁদ মিত্র।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ।

'সাগর' সম্ভূত রত্নে ভূষিত যে বেশ,
হেরিয়া প্রসন্ন নহে হৃদয় তোমার,
কল্পনা কাননে তাই করিয়া প্রবেশ,
গাঁথিলে স্বভাবজাত কুসুমের হার।
জননীর পদাম্বুজে করিলে প্রদান,
'মধুরে মধুর' হ'ল অপূর্ব্ব মিলন ;
হাসিল সুধীন্দ্র কত আনন্দিত প্রাণ—
সাহিত্যে দেখিয়া পুন নবীন কিরণ।
রতন-সম্ভব বিভা, গন্ধ পরিমল—
একাধারে বিরাজিত দেখাতে ভাষায়,—
তবপরে হ'য়েছিল সাধনা সফল—
অপার্থিব বঙ্কিমের দিব্য প্রতিভায়
প্রণমি পিয়ারীচাঁদ বঙ্গের দুলাল।
তব স্থান অতি উচ্চে রবে চিরকাল॥

রসাভাষ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত পরিহাস রসিক রায়।

আজি কালি ব্রাহ্মণ জাতি, ব্রাহ্মণ সমাজ লইয়া কলিকাতা সুদূর মফঃস্বলে বড়ই আন্দোলন চলিতেছে। এখন যে দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে কে কার শ্রাদ্ধ করে, খোলা কেটে বামুন মরে। ইহাই ষোল আনা সত্য বলিয়া মনে করি ;—পূর্ব্বকালে যখন সমাজে কুলীনের বড় আদর ছিল, স্বঘরে কন্যাদান করিতে না পারিলে ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা পাইত না, তখন একজন নাপিত, আপন ব্যবসায়ে দুঃখ ঘুচিবার উপায় না দেখিয়া কুলিন ব্রাহ্মণের পরিচয় শিখিয়া দেশ ত্যাগ করিল, দেশান্তরে এক ব্রাহ্মণের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিল, ব্রাহ্মণের ১৮।১৯ বছরের এবং ১৫।১৬ বছরের দুইটী অবিবা-

হিতা কন্যা ছিল, ব্রাহ্মণ অতিথির পরিচয়ে জানিলেন; তিনি তাঁহার স্বঘর,—তাঁহাকে কন্যা দুইটি সম্প্রদান করিলে জাতি রক্ষাপায়, যারপর নাই সমাদরে নাপিতের আতিথ্য সৎকার করিয়া কন্যা দুইটী গ্রহণ জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতিথি অতি বিরক্ত ভাবে উত্তর দিল—"মহাশয় বিবাহের জ্বালায় অস্থির হইয়া আমি দেশ ত্যাগ করিয়া কাশী যাইতেছি, কি করি, ভদ্রলোকদিগকে কন্যাদায়ে উদ্ধার করিতে গিয়া একুশটী স্ত্রীলোকের অন্ন বস্ত্রের ভার মাথায় পড়িয়াছে। তখন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ভগবানের কৃপায় আমার ধনের অভাব নাই, কন্যা দুইটী এবং তুমি চিরদিন আমার বাড়ীতে থাকিবে, রাজার হালে রাখিব। অতিথি যেন দায়ে পড়িয়া কন্যা দুইটীর পাণি পীড়ন করিল। কিয়দ্দিন গত হইলে ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠা কন্যা বয়স্থা হইলেন, পুত্র কন্যায় তিন চারিটী প্রসব করিলেন, তখন জামতার অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন—জামাই আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর যত্ন করেন না, কনিষ্ঠা তখন পূর্ণ যৌবনা—এখন তাহাতেই ঘোরতর অনুরক্ত। জ্যেষ্ঠার তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল, এক এক দিন পতি হস্তের প্রহার পর্য্যন্ত তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়। একদিন মধ্যাহ্নে জামতার গ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণ তাহাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, নাপিত তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইবামাত্র সদ্ভাব করিলেন—ব্রাহ্মণ পাছে জামতাকে নাপিত বলিয়া পরিচয় দিয়া ফেলে, এই ভয়ে নাপিত ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া বাড়ীতে বসাইয়া—তাঁহাকে আপনার গুরু বলিয়া পরিচয় দিল, বাড়ী বর্দ্ধমান সেই জামাতগুরুর আদর অভ্যর্থনা আরম্ভ করিল। নাপিত জামতা প্রকাশ করিল—গুরু ঠাকুর বড় শুদ্ধ সত্ব ব্রাহ্মণ কাহার হাতে খান না অন্তঃপুর মধ্যে গুরুর পাকের ব্যবস্থা হইল। তিনি পাক করিতে পাক শালায় গমন করিলে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠা কন্যা পাকের অনুষ্ঠান করিয়া দিতে লাগিলেন, গুরুর বড় মান সম্বর্দ্ধনা দেখিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা ভাবিলেন, গুরুকে ধরিলে বোধ হয়, তিনি শিষ্যকে বলিয়া দিলে তাঁহার দুঃখ ঘুচিতে পারে এই ভাবিয়া তিনি গুরুকে আপন দুঃখের কথা জানাইলেন এবং প্রতীকারের উপায় প্রার্থনা করিলেন। গুরু বলিলেন—

"মা এই মন্ত্রটী অভ্যাস করিয়া নিও, যখন তোমার পতি রুক্ষ ভাব অবলম্বন করিবেন; তখনই মন্ত্রটী বলিলে সে তোমার গোলাম হইয়া

"জাতধর্ম্ম কর্ম্ম কেমন।
তুমি না এমন এমন ?"

ব'লে বাঁম হাতের উপর ডাইন হাতের চেটোটী ঘুরাইবে। এই বলিয়া গুরু আহারান্তে বিদায় লইবার কালে জামাতা চারিটী টাকা প্রণামী দিল।

রাত্রিকালে জামাতা শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া বড় পত্নীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলে জ্যেষ্টা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বাম হাতের উপর দক্ষিণ হাতের চেটোটী ঘুরাইয়া নাপিতেরা কামাইবার সময় ক্ষুর গাছটী যেমন বাম হাতের উপর ঘুরাইয়া লয়, তেমনি করিলে, জামতা প্রণয়িণীর প্রেমে যেন মুগ্ধ হইয়া বলিল,—"তুমি আজ হ'তে আমার প্রাণের প্রাণ, তোমাকে প্রাণের মত ভাল বাসিব, যা বলিবে তাই করিব। একথা আর কাহাকেও বলিও না।"

জামাতা শয্যা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে চোখে পাতা, বুজিতে পারিল না, কেবলি নিশাবসানের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে কাক কোকিল ডাকিল, পূর্ব্বদিক ফরসা হইবামাত্র জামতা শয্যা ত্যাগ করিয়া পলায়ন পর; তাহা দেখিয়া তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নী পিতার নিকটে গিয়া বলিল—"বাবা আপনার জামাই পলাইলেন।"

ব্রাহ্মণ কন্যার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া বুঝিলেন—জামাই নাপিত, তখন তিনি জামতার পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে একটু নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, বাবা ফিরিয়া এস ভয় নাই,—

"ভাবচো যা ভেবোনা তা।
আমি আবার তেরেকিটী তা॥"

অর্থাৎ আমি মুচি। তখন শ্বশুর জামতায় কোলাকুলি। জামাইও ফিরিলেন, শ্বশুর জামতায় নীরবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

"এখন এক ভস্ম আর ছার।
দোষ গুণ কবো কার॥"

এখন আর গোলমাল না করিয়া নীরব থাকাই ভাল। সবাই সবাইকে চিনিয়াছে। এখন সময়ের স্রোতে সমাজরূপ ডিঙ্গী খানি ভাসাইয়া দিউন—যেথানে গিয়া লাগে লাগুক, আর সমাজ সমাজ করিয়া কাজ নাই।

কে তুমি সুন্দরী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

বিবাহ করিবেন না, ইহাই যাঁহার প্রতিজ্ঞা, নিখুঁৎ সুন্দরী কামিনী পাওয়া যায় না, ইহাই যাঁহার ধারণা, ছবিতে একটি সুন্দরী দেখিয়া বিমুগ্ধ চিত্তে তিনি আপনা হইতেই বলিলেন, "এই সুন্দরীকে আমি বিবাহ করিব।" যাঁহারা তাঁহার মুখের কথা শুনিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে কতখানি আনন্দ, সহজেই তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। অগ্রবর্ত্তী হইয়া করপুটে মুন্সীমহাশয় কহিলেন, "যাহার ছবি সেই আসল কামিনী বাঁচিয়া আছে, কিন্তু নিকটে নাই; এক মাসের পথ।"



কুমারী অমলা সুন্দরী।

রাজা পদ্মরাগ বিবাহ করিতে অসম্মত কেন ছিলেন? নিখুঁৎ সুন্দরী পাওয়া যায় না, সত্যসত্য ইহাই কি সেই সঙ্কল্পের কারণ? না তাহা নহে।

শনিদেবের ভয়। বিবাহ করিলেই সন্তান জন্মিবে, প্রথম সন্তানটি শনিদেবকে দিতে হইবে, প্রাণ ধরিয়া তিনি তাহা পারিবেন না, সেই জন্যই বিবাহ করিতে নারাজ। ছবিদর্শনে সেকথা তিনি ভুলিলেন, ভয়টা তখন মনে আসিল না, ছবির সুন্দরীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল।

যে রাজ্যের রাজকন্যা, মন্ত্রীমহাশয় সেই রাজ্যের রাজার নিকটে পত্র লিখিয়া দুইজন রাজভট্ট পাঠাইলেন। পাত্রীকে স্বভবনে আনিয়া বিবাহ করা রাজা পদ্মরাগের বংশের কুলপ্রথা; রাজভট্টেরা সেই রাজ্যে গিয়া কন্যার পিতাকে সেই কথা জানাইলেন।

কন্যার পিতার উপাধি ছিল রাজা, ধনে মানে কিন্তু তিনি একজন ছোট জমীদার। একজন বড় রাজা তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহেন, শুনিয়া তিনি মহাগৌরভ মনে করিলেন; মহামূল্য যৌতুক সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং ভট্টদ্বয়ের সহিত কুমারী সমভিব্যাহারে পদ্মরাগের রাজধানীতে আসিলেন। কুমারীর নাম অমলা।

বারবার তিনবার।—ভৈরবী কহিলেন, "বারবার তিনবার! ইতিপূর্ব্বে দুইবার দুইটি কন্যা আনিয়া রাজা পদ্মরাগকে দেখান হইয়াছিল, তিনি সে দুটিকে পছন্দ করেন নাই;—বারবার তিনবার। এবারে আর পছন্দ না করিবার বিন্দুমাত্র হেতু থাকিল না;—অমলার অবয়বে তিনি কিছুমাত্র খুঁৎ বাহির করিতে পারিলেন না। নকল চিত্র অপেক্ষা আসলরূপ অধিক উজ্জ্বল, রাজা তাহা দেখিলেন; শুভদিনে শুভক্ষণে অমলার সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল।

দুই বৎসর গেল, অমলা গর্ভবতী। সকলেই আনন্দিত, কেবল রাজা পদ্মরাগ সর্ব্বদা বিষন্ন। পূর্ণ দশমাসে রাজ্ঞী অমলা একটি সুন্দরী কুমারী প্রসব করিলেন। বার্ত্তা পাইয়া রাজা পদ্মরাগ সূতিকাগারে কন্যামুখ দর্শন করিতে গেলেন না; হৃদয়ে তাঁহার চিন্তাসাগর উথলিল। রাণী কিছুই জানেন না, রাজা আসিয়া কন্যা দর্শন করিলেন না, সেই অভিমানে অভিমানিনী রাণী অত্যন্ত বিষাদিনী হইয়া রহিলেন।

রাজা সেইরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, শনিদেব আসিয়া বলিতেছেন, চিন্তা নাই। কন্যাটি আমার হইল, কিন্তু এখন আমি সেটিকে লইয়া যাইব না; পঞ্চদশ বৎসর তোমাদের কাছেই থাকুক। রূপ যৌবন যখন বাড়িবে, তখন আমি

রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিষাদের উপর অনেক পরিমাণে প্রবোধ আসিল। পঞ্চদশ বৎসর চক্ষে দেখিয়া কন্যাটিকে পালন করিতে পারিবেন, ইহাও যেন একটা সুখ। এই মনে করিয়া তৎপর দিবসে সূতিকালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক নব কুমারীর চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিলেন। কন্যাটী অপরূপ সুন্দরী হইয়াছে। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমে একন্যা আর তাঁহাদের থাকিবে না. সেইকথা স্মরণ হওয়াতে রাজার নয়নে দুইবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। মনে ব্যথা পাইয়া রাণী তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজ্যে যুদ্ধ ঘটনা অবধি শনিদেবের দর্শন ও স্বপ্ন বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজা তখন রাণীর নিকট পরিচয় দিলেন। রাণী বিশ্বাস করিলেন না।

রাজা বাহিরে আসিলেন। মন্ত্রীজনেরা মন্ত্রণা দিলেন, নবজাত রাজকন্যার মঙ্গলের জন্য রাজ্যমধ্যে উৎসব করা কর্ত্তব্য, রাজ্যের কারাগারে যাহারা যে যে অপরাধে বন্দী আছে, তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করিয়া মুক্তি দেওয়া উচিত।

রাজা তাহাই করিলেন। বন্দিগণের মধ্যে রাজবৈরী দুর্জ্জয়কেতন রাজবন্দী ছিলেন, সেই উৎসবে তিনি মুক্তি পাইলেন। কন্যাটি ক্রমে ক্রমে তিন বৎসরে পড়িল। নাম হইল কলিন্দ কুমারী।

এই গল্পের রাজার নাম পদ্মরাগ, রাণীর নাম অমলা সুন্দরী, কন্যার নাম কলিন্দকুমারী। বিন্ধ্যাচলের মায়ামন্দিরে ভৈরবী দর্শন করিয়া যিনি ভৈরবীর নিকট গল্প শুনিতেছিলেন, তাঁহার নাম জয়ন্তকুমার। গল্পের ঐ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া, মনে মনে অত্যন্ত অধীর হইয়া কুমার জয়ন্ত কুমার সহসা ভৈরবীকে বলিলেন, "দিব্য একটী মনোরঞ্জন উপাখ্যান শ্রবণ করা গেল; কিন্তু তোমার নিজের পরিচয় কই? আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম, এই তরুণ বয়সে সংসার ত্যাগিনী ভৈরবী, কে তুমি সুন্দরী? কই, আমার সে প্রশ্নের উত্তর পাইলাম কই?"

বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভৈরবী বলিলেন, "আছে,—আছে, সে প্রশ্নের উত্তম উত্তর আছে। মনোরঞ্জন উপাখ্যান নয়,—মর্ম্মভেদী দুঃখের হৃদকম্পন উপাখ্যান। আমি সেই কন্যা। আমি সেই অভাগিনী কলিন্দ-কুমারী।"

কুমার জয়ন্তকুমার অকস্মাৎ যেন বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অন্তরে আঘাত লাগিল, অথচ কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল। ব্যগ্রভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ছারখার।

ভৈরবী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নেত্র মার্জ্জন করিয়া বাস্পরুদ্ধ গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "তাহার পর সর্ব্বনাশ। আমার বয়স তিন বৎসর। একরাত্রে আমার পিতা একাকী শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘরে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। একটা সন্ন্যাসীর ছিন্নশীর্ষদেহ সেই রক্তের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসী সেখানে কেন আসিয়াছিল, কেইবা তাহাকে খুন করিল, পিতা তাহা কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। ঘরের ভিতর খুন, কাহাকেও ডাকিয়া দেখাইতে তাঁহার সাহস হইল না। ছিন্নদেহটা একখানা কম্বলে জড়াইয়া তিনি স্বয়ং সকলের অলক্ষিতে নিকটস্থ উদ্যান মধ্যে লইয়া গেলেন, একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুতিয়া রাখিবেন, এই অভিপ্রায়। রাত্রি অন্ধকার। উদ্যান পালকের গৃহ হইতে একখানা কোদাল বাহির করিয়া পিতা স্বহস্তে গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। অভ্যাস নাই, পারিলেন না। কোদাল খানা ফেলিয়া রাখিয়া, কম্বলটা স্কন্ধে লইয়া, অন্ধকারে উদ্যান হইতে বাহির হইলেন। অদূরেই এক নদী। অন্ধকারে অন্ধকারে মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া রাজা সেই নদীতীরে গিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকার, অথচ কিঞ্চিৎদূরে শ্বেতবসনাবৃত এক মনুষ্য মূর্ত্তি তাঁহার নেত্র গোচর হইল, আতঙ্কে কাঁপিয়া স্কন্ধের বোঝাটা পিতা সেইখানে ধুপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন, দূরের লোকটা ছুটিয়া আসিয়া ভয় কম্পিত পিতার দুইখানি কম্পিত হস্ত বজ্রহস্তে ধারণ করিল। কম্পিত স্বরে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

গভীর গর্জ্জনে লোকটা উত্তর করিল, আমি যে হই, একটু পরেই জানিতে পারিবেন, কিন্তু একি? যে বস্তু আপনি এইখানে ফেলিলেন, শব্দে বুঝিলাম তাহা কোন ধাতু দ্রব্য নহে, আর কিছু। উহা আমি দেখিব।

ভয় পাইয়া পিতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" লোক উত্তর করিল, পরিচয় একটু বিলম্বে হইবে, অগ্রে আমি ঐ বস্তু দর্শন করিব। বোধ হয় আপনি খুন করিয়াছেন, খুনটা নদীর জলে ভাসাইয়া দিতে আসিয়াছেন, আমি আপনাকে ছাড়িব না।

পরিচিত লোক। সন্দেহে সন্দেহে বলিয়া উঠিলেন, "কে? কলিঞ্জর?"—গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, হাঁ মহারাজ। আমি সেই কলিঞ্জর। আমার হস্তে আজ রাত্রে আপনার প্রাণ। আপনি যদি শপথ করেন, আগামী কল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আপনার নূতন মন্ত্রীদলকে জবাব দিয়া সাবেক মন্ত্রীদলকে পুনরায় বাহাল করিবেন, তবেই নিস্তার, নতুবা এই নদীকূলে এই রাত্রে নিশ্চয় মৃত্যু।

বিনাদোষে উপকারী মন্ত্রীগণকে কি বলিয়া জবাব দিবেন, কি বলিয়াইবা পুরাতন দুষ্ট মন্ত্রীগণকে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিবেন, বিপাকে ঠেকিয়া পিতা অনেকক্ষণ তাহা ভাবিলেন। প্রাণের মায়া বড় হইল। তিনি নিরস্ত্র, অন্ধকারে লোকটা অস্ত্রধারী, অস্বীকার করিলে নিশ্চয়ই তাহার হস্তে প্রাণ যাইবে সেই ভয়ে রাজা অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

লোকটা কে?—আমাদের সেই পুরাতন বিশ্বাস ঘাতক কুচক্রি রাজদ্রোহী নির্ব্বাসিত প্রধান মন্ত্রী সেই দুর্দ্দান্ত কলিঞ্জর। পিতার অঙ্গীকার আকর্ষণ করিয়া কলিঞ্জর বলিল, "কল্য প্রাতঃকালে আপনি অঙ্গীকার পালন করিবেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ আপনার অঙ্গুলির একটী অঙ্গুরী আমার হস্তে প্রদান করুন।" ভয়ে ভয়ে পিতা তাহাই করিলেন। দুষ্ট কলিঞ্জর এক পদাঘাতে সেই কম্বলাবৃত দেহটা নদীর জলে ফেলিয়া দিল। দিয়াই পিতাকে পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া কলিঞ্জর সে রাত্রে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃদেব গৃহের দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক স্বহস্তে গৃহ তলের রক্তধারা বিধৌত করিলেন। আমারে লইয়া মাতা অন্যঘরে ছিলেন,রাত্রের ঐ সকল কাণ্ডের কিছুই তিনি জানিলেন না। রজনী প্রভাত হইল। রাজবিদ্রোহী হওয়াতে পূর্ব্বেকার যে সকল দুষ্ট মন্ত্রী আর অসৎ রাজ-কর্ম্মচারি রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, সেই রজনী প্রভাতে সেই সকল দুষ্টলোক আপনাদের দলবল লইয়া হঠাৎ রাজধানীতে উপস্থিত হইল। নির্ব্বাসিত পদচ্যুত, প্রধান মন্ত্রী বিজয় গর্ব্বিত বদনে পিতার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কর্ণে কি একটা নির্ঘাৎ কথা বলিল;—গতরাত্রের প্রতিজ্ঞার কথা শুনাইল। স্বয়ং খুন করেন নাই, খুনের তত্ত্ব কিছু জানেনও না, তথাপি পিতার মনে ভয় ছিল। তিনি চিন্তিত হইলেন; কিন্তু কাতর হইয়া বলিলেন, "অকস্মাৎ নির্দ্দোষী লোক গুলিকে কি বলিয়া বিদায় করি, তুমি আমাকে একমাস সময় দাও।"

কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা,—তাহাই হইবে।"—শ্লেষোক্তিতে জিগীর্ষা বসে এই কথা বলিয়াই মন্ত্রী স্বগর্ব্বে দ্রুতপদে পিতার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

বেলা প্রায় একপ্রহর। কোতোয়ালীর জন কতক লোক রাজ বাড়ীতে আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। এক জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পিতা সম্মত হইলেন। সেই একজন আবার গোপনে। তাহাই ঠিক। গোপনে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সহর কোতোয়াল সভায় চকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চুপি চুপি কম্পিত কণ্ঠে রাজাকে বলিল, "মহারাজ! সর্ব্বনাশের সূত্রপাত। দুই ধীবর আজ প্রাতঃকালে নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, এক জালে একটা মরা মানুষ উঠিয়াছে! সন্ন্যাসী মানুষ! কম্বলে বাঁধা!"

পিতার সর্ব্বশরীর কাঁপিল। সেই দুষ্ট মন্ত্রী আমাকে নষ্ট করিবার মতলবে এই কার্য্য করিয়াছে। সে নিজেই এক পদাঘাতে দেহটা জলে ফেলিয়া দিয়াছিল। যেখানে ফেলে সে যায়গাটা তাহার মনে ছিল। নদীতে স্রোত নাই, যেখানকার দেহ, সেই থানেই ছিল। অদ্যই সেই দুষ্ট মন্ত্রীকে পূর্ব্বপদে পদস্থ করিতে আমি অসম্মত, সেই রাগে সেই দুষ্ট মন্ত্রী স্বয়ং ধীবর ডাকিয়া সেই মৃত্যুদেহ তুলিয়া আনিয়াছে। হত্যাকারী বলিয়া আমার নামে অভিযোগ দিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। পিতা কল্পনায় ইহাই ভাবিলেন।

যাহা তিনি ভাবিলেন, তাহাই ঠিক হইল। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই নগরময় প্রচার হইয়া গেল, গতরাত্রে রাজ বাড়ীতে একটা খুন হইয়াছে, পিতা স্বয়ং অন্ধকারে সেই মৃত্যুদেহ স্কন্ধে লইয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, জেলেরা তুলিয়াছে। রাজাই হয়ত খুন করিয়াছেন।

প্রজালোকেই মনে করিল। রাজা যদি খুন করেন নাই, তবে কে খুন করিল; আজ বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত রাজার মুখে সেই গুপ্ত হত্যার উচ্চবাচ্য শোনা গেলনা কেন? রাজ বাড়ীতে খুন, রাজার ঘরে খুন, কে খুন করিল, শীঘ্র তাহার সবিশেষ তদন্ত লওয়া কি রাজার কর্ত্তব্য নহে? তদন্ত লওয়া দূরে থাকুক, প্রভাতে উঠিয়া অবধি এত বেলা পর্য্যন্ত সামান্য গল্পচ্ছলেও সে কথার প্রসঙ্গ মাত্র করেন নাই। ইহাতেই বোধ হয়, রাজা নিজেই অপরাধী।

ক্রমে পিতার কর্ণে এই সকল কথা প্রবেশ করিল। পিতা অত্যন্ত উতলা

পদস্থ করিলে যদি এই কলঙ্ক দূর হয়, তাহাও আপাততঃ মঙ্গল। পিতা এইরূপ মঙ্গল ভাবিলেন।—ভাবিলেন আর করিলেন। রাজভক্ত সদাশয়, সর্ব্বহিতৈষী অভিনব মন্ত্রীগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে রাজ প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন, পুরাতন বর্ব্বরেরা গোঁপ দাড়ি ফুলাইয়া আপনাদের পূর্ব্ব আসন পরিগ্রহ করিল। ভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইল যেন, পিতাকে অবজ্ঞা করিতে তাহারা প্রস্তুত।

পিতা ভাবিলেন, প্রজাদের এই ষড়যন্ত্রে যোগ আছে। রাজার কথাই সত্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উপস্থিত। পিতাকে হীনবীর্য্য দর্শন করিয়া দুষ্ট মন্ত্রীদল তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে প্রজাদলন আরম্ভ করিল। প্রজারা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটী বিকট নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভৈরবী যেন কাঁদিলেন;—নেত্র মার্জ্জন করিয়া কিঞ্চিৎ ভগ্নস্বরে কহিলেন, "রাজকুমার! এই আমার সর্ব্বনাশের আরম্ভ! প্রজারা দিন দিন দলিত হইতে লাগিল। পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিল। করিলে কি হয়;—ভগবান যাহা ঘটান, তাহাই ঘটে। একমাস পার হইতে না হইতেই সেই বিপক্ষ রাজা দুর্জ্জয়কেতন নানা ষড়যন্ত্র করিয়া আমার পিতার বিপুল জমীদারি আক্রমন করিলেন;—বন্দী হইবার ভয়ে পিতা আমাকে আর আমার মাতাকে লইয়া গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন।

পলায়ন করিয়া যান কোথা?—বনে।—লোকালয়ে আর মুখ দেখাইবার ইচ্ছা নাই, অতুল ঐশ্বর্য্যেশ্বর এখন কন্যা মহিষী লইয়া বনবাসী হইলেন। আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে, সেই সকল দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই আমি অনেক দিন বাঁচিব! বনফল খাইয়া, বন নদীর জল পান করিয়া, মাতৃপিতৃ স্নেহে দুই বৎসর আমি বন বাসিনী হইয়াও পরম সুখে ছিলাম।

বলিতে বলিতে কাঁদিয়া, যুগল হস্তে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া; ভৈরবী পুনর্ব্বার ভগ্নস্বরে বলিতে লাগিলেন, দুই বৎসর পরে মাতাপিতা হারাইলাম! জগত সংসার অন্ধকার দেখিলাম, জন্মাবধি যাঁহাদের ছাড়া আর কিছু আমি জানিতাম না, বনবাসে যাঁহাদের ছাড়া আর কিছু আমি দেখিতাম না, তাঁহারা নাই! এখন আমি যাই কোথা? এখন আমি করি কি? বাঁচিব কি মরিব?

আকুল হইয়া ভাবিতেছি,—আকাশ পাতাল, কতই কি ভাবিতেছি

সাধু পুরুষ আমার সম্মুখে আসিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার তখন পাঁচ বৎসর বয়স;—যতদূর জানি, পরিচয় দিলাম। দয়া করিয়া তিনি আমারে আশ্রমে লইয়া গিয়া অনেক দিন কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছেন, তিনিই আমারে ভৈরবী সাজাইয়া কালিকাদেবীর সেবায় আমারে ঐ মন্দিরে রাখিয়াছেন, শনিদেব মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া কত কথা শুনাইয়া যান, কত কি শিখাইয়া যান, কিছুই আমার মনে থাকে না;—মনে ধরে না। অনেক দিন আমি কালিকা ব্রতে ব্রতবতী আছি।"

শ্রোতা রাজকুমার এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ মনে মনে কি চিন্তা করিলেন। অবশেষে মৃদুস্বরে কহিলেন, "শনিদেব কি তোমারে মুক্ত করিয়া দিতে চাহেন না? দেবতা তিনি, পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেই দেবতাদের দয়া হয়।"

ভৈরবী বলিলেন, "আমি কাঁদিয়াছিলাম। কি জানেন রাজকুমার! সকল কার্য্যেরই প্রতিবিধান আছে, সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। রাজকুমার! তুমি কে, তাহাও আমি জানি না। রাজপুত্র বলিলেন, "তুমি রাজকন্যা, ইহা আমি জানিয়াছি।"

রাজকন্যা লজ্জায় নতমুখী হইলেন। রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চিরদিন ভৈরবী থাকিবে?"

নত মুখেই ভৈরবী কহিলেন, সেই কথাই ত বলিতেছিলাম। সকল কার্য্যেরই প্রতিবিধান আছে, "সেই জন্যই বলিতেছিলাম, তুমি কে, তাহাও আমি জানি না। শনিদেব আমারে বলিয়া রাখিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যের রাজ কুমার জয়ন্ত কুমার যদি কখন তোমারে দেখিতে পান, যদি তিনি ধর্ম্মতঃ সত্য সখিভাবে,—অন্যভাবে নয়, সত্যসখীভাবে তোমারে ভাল বাসেন, তাহা হইলে তোমার উপর আর আমি কোন অধিকার রাখিব না।"

দুঃখিনী এই পর্য্যন্ত বলিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, ভৈরবী স্বগতঃ বাক্যে বলিলেন, "বৃথা আকিঞ্চন! ইনি দাক্ষিণাত্যের রাজকুমার নহেন, নামও—কি জানি কি—নামও জয়ন্তকুমার নয়। বৃথা আকিঞ্চন!"

কুমার জয়ন্তকুমার দুঃখিনীভৈরবীর স্বগতঃ বাক্যের একটু একটু আভাষ বুঝিয়া নিশ্চয় বুঝিলেন, ভৈরবীটি সত্য সত্যই দুঃখিনী।—কতক উল্লাসে, কতক সংশয়ে জয়ন্তকুমার বলিলেন, "ভৈরবি! রাজকুমারি! আমি জয়ন্ত

ভৈরবী বসিয়াছিলেন, স্বচমকে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সলজ্জভাব প্রগাঢ় হইল। হইতেও পারে, মনে লয়, তথাপি কিছু কিছু সংশয়। ভৈরবীর দুই তিন বারের কটাক্ষ ভঙ্গীতে রাজপুত্র সেই সংশয় ভাবটি বুঝিয়াছিলেন;— আপনি কটিবন্ধ হইতে রত্ন মণ্ডিত স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত একখানি স্বর্ণময় পদক বাহির করিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ ভৈরবীর হস্তে অর্পণ করিলেন। পদকে যাহা অঙ্কিত ছিল, নিমেষমাত্র তাহা দর্শন করিয়াই ভৈরবী একধারে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলেন।

ইহার পর তাহাদের উভয়ে কি কি কথা হইল, কাহার কিরূপ কার্য্য হইল, সে সকল বিবরণ শ্রবণ করিতে পাঠক মহাশয়ের ইচ্ছা হইবে না, কুমার জয়ন্তকুমারের সহিত ভৈরবীর মিলন হইল, সংক্ষেপে কেবল এইকথা বলাই ভাল।

প্রায় এক প্রহর বেলা থাকিতে কুঞ্জমিলন আরম্ভ হইয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াই সে দিনের সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। বনভূমি অন্ধকার হইল। অন্ধকারে ভৈরবীর কি ভয়? ভৈরবী স্বচ্ছন্দে জয়ন্তকুমারের হস্ত ধারণা করিয়া মায়ামন্দিরে গমন করিলেন সন্ধ্যাবন্দনাদির পর বিন্ধ্যাচলের মায়া-মন্দিরে কালীপ্রতিমার সম্মুখে মা কালীকে সাক্ষী করিয়া কুমার জয়ন্তকুমারের সহিত রাজ নন্দিনী কলিন্দ কুমারীর শুভ বিবাহ হইল। ভৈরবী আর ভৈরবী রহিলেন না,—একটি সুপ্রসিদ্ধ রাজ গৃহের কুলবধূ হইলেন। ঘটনাটি যেন সমস্তই ইন্দ্রজাল বলিয়া সকলে অনুভব করিল।

গীত।

রাগিনী—পরিতোষ, আড়াঠেকা।

কালীকৃষ্ণ অভেদাত্মা, যোগীভাবে ধ্যানে জ্ঞানে।
তুমি জান কৃষ্ণের খেলা, তোমার খেলা কৃষ্ণজানে॥
পড়িয়ে ভব সাগরে, ঘুরিতেছি মায়া ঘোরে,
তোমরা দু-জন দয়া করে, ত্রাহিমে মহাতুফানে॥
যেদিন আমার দিন ফুরাবে, প্রাণ-পক্ষী উড়ে যাবে,
সেই দিনে মা কৃপা করে শান্তি দিও আমার প্রাণে॥

গুরুর পূজা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গুহ রায়।

গুরো,

কল্পনা কানন কুঞ্জে—
কত তুচ্ছ ফুল ফোটে,
কিন্তু তব পদ যোগ্য
একটীও নাহি জোটে ;

তাই শুধু আন মনে
চিন্তিতেছি অনিবার
কোন ফলে, কুতূহলে,—
অর্চ্চিনিব পা' তোমার।

অর্চ্চনার উপচার—
বিভ্রমে বিহীন আমি,
কি দিয়ে পূজিব তবে,
তোমারে হে অন্তর্য্যামী।

কল্পনা কানন স্থিত
ক্ষুদ্র, শুষ্ক বৃক্ষ হতে,
যদিও দু' একটী ফুল
পারি আমি সংগ্রহীতে ;

কিন্তু কোথা পাব দেব,
পূজার সম্ভার আর—
পাদ্য, অর্ঘ্য, চন্দনাদি
মন মত উপচার।

যদিও না পাই কিছু
তবু সদা চাহে মন,
উল্লাসে ভকতি ভরে
পূজিবারে শ্রীচরণ

তাই গুরো, হৃদাবেগে
লয়ে এই ফুলাঞ্জলী
এসেছি পূজিতে পদ
হয়ে অতি কুতূহলী।

হৃদিবন পুষ্পচয়

ভক্তি চন্দনে মাখি
করিব পদ-অর্চ্চনা।
এই ভিক্ষা তব পদে
হে দেব করুণাময়
লয়ো এই দীন পূজা
ঠেলিয়ে ফেলনা পায়।

——)o(——

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া।— শ্রীরসিক মোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত। শ্রীসতীশচন্দ্র শেঠ ও শ্রীঅতুলচন্দ্র পাল দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা। নিত্যধাম নিবাসী শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নামে প্রকাশকদিগের দ্বারা উৎসর্গিত। শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর চরিত কথা এই গ্রন্থে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দ্বারা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর শ্রী চরিত কথা অনেক গ্রন্থেই আছে, বিষ্ণুপ্রিয়ার মধুময়ী চরিত কথা এরূপ বিস্তৃতভাবে অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বিরহ বর্ণনা বড়ই মর্ম্মভেদিনী লেখক এরূপ ভক্তি গ্রন্থ রচনায় সিদ্ধ হস্ত তাঁহার ভাষা অতি মধুর নির্দ্দোষ। এই গ্রন্থ রচনায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ কৃতিত্ব আছে, পুস্তকখানি ৪৩৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, প্রকাশক শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র শেঠের রচিত নিম্নোক্ত গীতটী এস্থানে উদ্ধৃত হইল। বাসুদেব ঘোষাদির রচিত অনেক গীত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা মহাজন পদবাচ্য সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু সতীশচন্দ্রের এই সুমধুর গীত রচনায় সমালোচক আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করেন, সতীশকে বাল্যকালে শিক্ষা দান তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

"গভীর নিশায় চাঁদ আকাশের গায়।
ঐ দাসীর মত একা ধীরে চলি যায়॥
নাহি কোথা সাড়া শব্দ, সমস্ত নদীয়া স্তব্ধ,
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শুধু আছেন জাগিয়া,
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, ঘুম নাহি দুনয়নে,
ঝরিছে হৃদয় ধারা নয়ন গলিয়া॥
হিয়া করে আন্‌চান, নিয়ত বিদরে প্রাণ,
কপাট খুলিয়া দেবী এলেন বাহিরে।
শোকাকুলা যার লাগি, নীরবে থাকয়ে জাগি,

নেহারিলা অনিমেষ অনন্ত আকাশে।
হইয়া মূর্চ্ছিত প্রায়, পড়িয়া ভূমিতে হায়,
বজ্রাহত স্বর্ণলতা ভাবের আবেশে॥
"হা নাথ হা নাথ" বলি, থেমে গেল শেষ বুলি॥
ছুটিল অনন্ত পানে সে ধ্বনি ঝঙ্কার।
ব্যাকুল উন্মাদ প্রায়, আসিয়া শ্রীগোরা রায়,
বলে প্রিয়ে এই দেখ আমিগো তোমার॥
শ্রীপ্রভু কোমল করে, ধরি প্রিয়াজীর করে,
তুলিলা সোহাগ ভরে মেলিলা নয়ন।
বিরহিনী বিষ্ণুপ্রিয়া, নেহারিলা চমকিয়া,
বলিলেন, প্রাণনাথ সত্য কি স্বপন।
সযতনে করে ধরি প্রিয়াজির কর।
প্রবেশিলা গৃহ মাঝে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥

কবিতাটী সরল ভাষা মনোন্মাদিনী ভাব সুগভীর এরূপ কবিতা বঙ্গ সাহিত্য সংসারে প্রশংসার যোগ্য না হইবে কেন? শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির।

সাহায্য প্রার্থনা।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম এই বিংশ শতাব্দীতে জানিতে বোধ হয় ভারতবর্ষের কাহারও বাকি নাই। শুধু ভারতবর্ষ বলি কেন, সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকার সহস্র সহস্র অধিবাসীগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, এমন কি নিত্য পূজাও করিয়া থাকেন। ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম্মের সকল মতে নিজে সাধনা করিয়া যে মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র দেশবাসীর সকল জাতির, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সেই সর্ব্বজনপূজনীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাস্থি কলিকাতার কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে সমাহিত হইয়াছে। আজি অষ্টাবিংশ বর্ষ হইল, শ্রীযোগোদ্যানে তাঁহার নিত্যপূজা ও মহোৎসবাদি হইয়া আসিতেছে। সেই সমাধিস্থলে যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সামান্য ও অতি ক্ষুদ্র গৃহমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণের উদ্যোগে তাহার সম্মুখে যে নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে সে সামান্য ভগ্নোন্মুখ গৃহ আদৌ শোভা পায় না। সেই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা দর্শকমাত্রেই প্রাণে

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি স্থান পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এই তীর্থে জন্মাষ্টমীর দিনে সহস্র সহস্র ভক্ত সমবেত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে ও বহু সহস্র অভ্যাগতদিগকে মহাপ্রসাদ দিয়া আনন্দের হাট বসাইয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন, সেই স্থান—বৃন্দাবন—মহাতীর্থস্থানে পরিগণিত হইয়া হিন্দুদিগের আদরণীয় ও পূজনীয় হইয়াছে। সতীর দেহ বিষ্ণুচক্র কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়া যে ৫২টী স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহাই ৫২ পীট বলিয়া চিরকীর্ত্তিত। বুদ্ধের সমাধিস্থানে এবং তাঁহার লীলাস্থানের অন্বেষণ করিয়াও কত কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সেই ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে স্থানে তাঁহার দেহাস্থি রক্ষিত, সে স্থানে সুন্দররূপে একটী মন্দির নির্ম্মিত করাইবার চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা করা অস্বাভাবিক বা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া কেহই মনে করিবেন না, ইহাই আমাদিগের ধারণা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনও জাতি-বিশেষের, কোনও ধর্ম্মবিশেষের বা কোনও সম্প্রদায়বিশেষের নহেন এবং ভারতবর্ষও চিরদিন কীর্ত্তিস্থাপনে পরাঙ্মুখ নহেন। তাই আজ আমরা ভারতবর্ষের দানবীর মহাত্মাগণের নিকট, মহাপুরুষের কীর্ত্তি স্থাপনের সহায়তাকারিগণের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, এই মন্দির-নির্ম্মান-কল্পে তাঁহারা সকলে সহায়তা করুন। সর্ব্বসাধারণের সমবেত সহায়তায় যেরূপ অর্থ সঙ্কলিত হইবে, সেই ভাবেই এই মন্দির নির্ম্মিত হইবে। আমাদের অনুমান, অন্ততঃ পাঁচ সহস্র মুদ্রায় এই মন্দির কোন প্রকারে নির্ম্মিত হইতে পারে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় কাষ্ঠবিড়ালীও আপনাপন শক্তিমত সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই; সুতরাং যিনি যেরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন, তাহাই নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে। শ্রদ্ধার পয়সা লক্ষাধিক মুদ্রার স্বরূপ, ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র।

স্বামী যোগবিনোদ, শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির মঠ,
যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাছী, পোঃ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

অথবা

ব্রহ্মচারী বিমল তত্ত্ব-মঞ্জরী-শাখা কার্য্যালয়,
২৬ নং মধুরায়ের লেন, সিমুলিয়া; কলিকাতা।



স্বামী বিবেকানন্দ।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। | ১৩২১, আষাঢ়। | ৩য় সংখ্যা।

অম্বুবাচী।

অম্বুবাচীতে পৃথিবী সম্পূর্ণ জলপূর্ণ হন; এইজন্য ইহার নাম অম্বুবাচী হইয়াছে। অম্বুবাচী প্রতি বৎসরেই আষাঢ় মাসের ৭ই তারিখে আরব্ধ হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব যে দিন যে সময়ে বৃষরাশি হইতে মিথুন রাশিতে গমন করেন, অম্বুবাচী প্রায়ই পর সপ্তাহে সেই দিনে এবং সেই সময়ে হইয়া থাকে। এজন্য জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

"যস্মিন্ বারেসহস্রাং সূর্য্যংকালং মিথুনং চরেৎ।
অম্বুবাচী তবেত্তত্র পুনস্তৎ কালবারয়োঃ॥"

অর্থাৎ যে বারে সূর্য্যদেব যে সময়ে মিথুন রাশিতে গমন করেন, অম্বুবাচী সেইবারে এবং সেই সময়ে অথবা পর সপ্তাহে হইয়া থাকে।—

"মৃগশিরাসি নিবৃত্তে রৌদ্রপাদেঽম্বুবাচী
ঋতুমতিখলু পৃথ্বী বর্জ্জয়েৎ শ্রীণ্যহানি।

যদি বপতি কৃষাণঃ ক্ষেত্রমাসাদ্য বীজং
ন ভবতি ফলভাগী শস্য চাণ্ডালপাকঃ॥"
ইতি জ্যোতিষে।

অর্থাৎ সূর্য্যদেব মৃগশিরা নক্ষত্র ভোগাবসানে যখন আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে প্রবেশ করেন তখনই অম্বুবাচী প্রবৃত্তি হয়। এই সময় পৃথিবী ঋতুমতী হন; এজন্য তিন দিন, অর্থাৎ অম্বুবাচী যতক্ষণ না নিবৃত্তি হয়, পৃথিবী খননাদি করিবে না। যদি কোন কৃষক শস্য ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, তাহা হইলে সে ফলভাগী হয় না, এবং উৎপন্ন শস্য চাণ্ডালান্ন সদৃশ হয়। বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বারটী রাশি মেষ বৃষ ইত্যাদিতে অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্র সমবিভাগে ভুক্ত হয়। সুতরাং এক একটি রাশিতে ২।০ সওয়া দুইটী করিয়া নক্ষত্র ভোগ হয়। এজন্য অশ্বিনী ভরণী এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রে প্রথম চতুর্থাংশ মেষরাশি ভুক্ত; এইরূপ কৃত্তিকা নক্ষত্রের শেষ তিন পাদ চতুর্থাংশ রোহিণী নক্ষত্রে এবং মৃগশিরা নক্ষত্রের প্রথম অর্দ্ধ বৃষরাশি ভুক্ত; আর মৃগশিরা নক্ষত্রের শেষার্দ্ধ, আর্দ্রা এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের প্রথম তিন পাদ মিথুনরাশি ভুক্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একমাসে ২।০ অর্থাৎ নয় পাদ নক্ষত্র ভোগ হয়। এজন্য একপাদ নক্ষত্র ভোগ হইতে এক মাসের নয় ভাগের এক ভাগ দিন অর্থাৎ প্রায় ৩.০ দিন লাগে, মোটামোটি হিসাবে ধরিতে গেলে মৃগশিরার শেষার্দ্ধ ভোগ করিতে আষাঢ় মাসের কিঞ্চিদধিক ৭ দিন লাগিবে। সুতরাং আষাঢ় মাসের ৭ই তারিখেই প্রতিবৎসর অম্বুবাচী আরম্ভ হয়। তবে সূক্ষ্ম গণনাতে দণ্ড পল স্থির হইয়া থাকে।

অম্বুবাচীতে যতি বিধবাদির পক্কদ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে কথিত আছে :—

"যতিনোব্রাতিনশ্চ বিধবাচ দ্বিজস্তথা।
অম্বুবাচী দিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ॥"
ইতি বিষ্ণুরহস্যে।

অর্থাৎ যতি ব্রহ্মচারী বিধবা এবং ব্রাহ্মণগণ অম্বুবাচী সময়ে পাক করিয়া ভক্ষন করিবে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাঁহারা স্বয়ং পাক করিয়া না পারুন; কিন্তু অন্য ব্যক্তি যদি পাক করিয়া দেয়, তাহা হইলে খাইতে পারিবেন কি না? শাস্ত্রে তাহাও নিষেধ করিয়াছেন :—

"স্বপাকং বা অম্বুবাচী দিনে তথা।
ভোজনং নৈব কর্ত্তব্যং চাণ্ডালান্ন সমাস্মৃতং॥"

অর্থাৎ আপনি পাক করিয়া ভোজন করিবে না, অথবা পরে পাক করিয়া দিলেও ভোজন করিবে না। অম্বুবাচী সময়ে পক্ব অন্ন চাণ্ডালান্ন সদৃশ বলিয়া কথিত।

এই সময়ে সর্পভয় নিবারণ জন্য দুগ্ধ পান করিতে হয়। এবং অধ্যয়ন অথবা বীজ বপনাদি করিতে নাই। যথা :—

"তস্যাং পাঠো বীজ বাপো নাহিতীহ্ দুগ্ধ পানতঃ॥"

ইতি জ্যোতিষে।

অর্থাৎ অম্বুবাচীতে পাঠ, বীজ বপন করিবে না। এবং দুগ্ধ পান করিলে সর্পভয় নিবারণ হয়। আরো কথিত হইয়াছে :—

"কাম্যং নৈমিত্তিকঞ্চৈব যাত্রাং মন্ত্রক্রিয়াস্তথা।
ঋতুমত্যাং ন কুর্ব্বীত পূর্ব্বসঙ্কল্পিতাদৃতে॥"

ইতি সংস্কারমুক্তি মহোত্তরে।

অর্থাৎ কাম্য যাগাদি, নৈমিত্তিক সংস্কারাদি যাত্রা, অথবা মন্ত্রগ্রহণ, পৃথিবী ঋতুমতী হইলে অর্থাৎ অম্বুবাচী সময়ে করিবে না। তবে যদি অম্বুবাচীর পূর্ব্বে সংকল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কার্য্য করিতে পারে।

উপরোক্ত বিবরণাদি হইতে বোধ হয়, পাঠকমহোদয়গণের অম্বুবাচী সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ হইতে পারে।

মনুষ্য-বিকাশ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সাতকড়ি কাব্যতীর্থ।

পূর্ব্ব জন্ম লইয়া আমাদের কোন গোলযোগ নাই, তন্ত্রে স্পষ্ট করিয়া শিব বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃত দুষ্কৃত গুণে সুখ দুঃখ হইয়া থাকে, ইহ জন্মে আমরা যে সময় মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়া থাকি, সে সময় আমাদের ঊর্দ্ধ দেশে পদ এবং অধঃদেশে মস্তক থাকে, সে স্থান অন্ধকারময় দর্শন করিয়া থাকি।

"ততঃ সর্ব্বং সফলং জ্ঞাত্বা ঊর্দ্ধপাদস্ত্বধোমুখঃ।

যদিও মাতা অন্নপানাদি মুখে ভোজন করেন, গর্ভস্থ জীবগণ মাতৃ-নাভি দেশে মুখ দ্বারায় ঐ অন্নপানাদির অংশ পান করিয়া থাকে, এবং এইরূপে গর্ভে জীবগণ জীবিত থাকে।

"আস্থা নাভিদেশে তু মুখং দত্তা পিস্বত্যখৌ।"

সেই সময় জীবগণ মনে করে, যদি গর্ভ হইতে বহির্গত হইতে পারি তাহা হইলে সংসার সাগরতারণ জ্ঞানরূপ শিবকে অভ্যাসের দ্বারায় সাধনা করিব।

"যোনিদ্বারন্তু সংবর্ণেৎ যদি মে নির্গমং ভবেত
অভ্যাসাম্মি শিবং জ্ঞানং সংসারার্ণব তারণং।"

এবংপ্রকার অনেক ভাবিয়া থাকে, তথন শিবযোগী হইয়া শিব আরাধনায় মনঃসংযোগ করিবে। এ কেবল গর্ভ-সঙ্কটে পড়িয়া হয়, ভগবতী-গীতায় ভগবতী বলিয়াছেন, ভূমিষ্ট মাত্রে জীব মায়ায় মুগ্ধ হয় এবং পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প সকল বিস্মৃত হয়।

"ততো তন্মায়য়া মুগ্ধস্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ
অকিঞ্চিৎ করতাং প্রপ্যমাংস পিণ্ডেহবস্থিতঃ।
গর্ভ হতে যথন জীব ধরা প্রবেশে
মম মায়া তথনি তাহারে ধরে কেশে।
অনন্তর ধরাধর জীব মুগ্ধ হয়
মায়া সঙ্গে রহে রঙ্গে ত্যজি ক্লেশ ভয়।
মম মায়া দূরত্যয়া অঘটনা ঘটিনী
তারে পেয়ে মুগ্ধ হয় জীব অভিমানী।
পূর্ব্বজ্ঞান ভুলে হায় ভাবে গর্ব্বে যত
কিছু কাল চলে তাহা মাংস পিণ্ডে স্থিত।"

এই দেহ নানারূপ ধারণ করিয়া থাকে। প্রথমে বালক, শিশু, কিশোর যুবক; প্রৌঢ়, অতি প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, পালিত মরণ, ইহার নাম দশ দশা, এবং মরণ কালে অতিবাহিক দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে।

"বালকশ্চ শিশুশ্চৈব হস্ত কৈশোরকস্তথা
অতপরস্তু যুবকঃ পৌঢ়শ্চৈব ততঃ পরং।
পালিতং মরণঞ্চৈব অবস্থা পরিকীর্ত্তিতা

অন্য প্রাণিগণের অতিবাহিক দেহ হয় না, মাত্র কেবল মনুষ্যেরা প্রেত দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে আর সন্দেহ নাই; অর্থাৎ মৃত্যুর পর হইতে প্রেতদেহ বলিয়া গণ্য করা হয়।

"কেবলং তৎ মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ
প্রেত দেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেতেন সংশয়ঃ।"

তার পর বান্ধব, পুত্র প্রভৃতি দ্বারার পূর্ণ সম্বৎসরের অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এ প্রেতত্ব পরিহারে মৃত্যুর পূর্ণ সম্বৎসর সকলের ভোগ করিতে হয়, সপিণ্ডীকরণ বিধির দ্বারায় সেই প্রেতত্ব পরিহার হইয়া থাকে; এবং কোন বিধি উপলক্ষে পূর্ণ সম্বৎসর না হইলেও তিনি উক্ত বিধির পূর্ব্বে পিতা মাতার সপিণ্ডীকরণ করিলে তিনি সেই সময় প্রেত দেহ ত্যাগ করিবেন।

"ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স্বকৃতে নরৈঃ
পূর্ণে সম্বৎসরে দেহ মতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে।"

তার পর স্বকর্ম্মদ্বারায় স্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত, বা দেবত্ব মানুষ্যত্ব পশুত্ব বা পক্ষিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গ বা স্বেন কর্ম্মণা
দেবত্বমন্য মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা।"

জন্ম কর্ম্মের দ্বারায় কৃমিত্ব স্থাবরত্ব জঙ্গমাদি ও পক্ষি পশু, নর সকল হইয়া থাকে।

"কৃমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ জায়ন্তে জন্মকর্ম্মভিঃ
স্থাবরাজঙ্গমাদ্যাশ্চ পক্ষিনঃ পশবো নরাঃ।"

সংসার সাগরে নরগণের কর্ম্ম জন্যই মৃত্যু হয় ও কর্ম্ম জন্যই জন্ম হইয়া থাকে, কর্ম্মের দ্বারায় জন্তু হইয়া থাকে, এবং কর্ম্মের দ্বারায় প্রণয়কে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"জায়তে চাম্রিয়ন্তে চ সংসার দুঃখ সাগরে।
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মৈর্নৈব প্রণীয়তে॥"

এ দেহ মৃত্যুতে বিনষ্ট হয়, পুনর্ব্বার কর্ম্ম দেহকে লাভ করিয়া থাকে। ধেনু সহস্র থাকিলেও বৎস্য যেমন নিজের মাতাকে প্রাপ্ত হয়,—তদ্রূপ দেহ বিনষ্টে পুনর্ব্বার চর্ম্মদেহ লাভ করিয়া থাকে।

"দেহে বিনষ্টে তত কর্ম্ম পুনর্দ্দেহঃ প্রলভ্যতে।

সেইরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগমন করিয়া থাকে, প্রাক্তন (পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত) বলবৎ যে কর্ম্ম তাহা অন্যথা কে করিতে পারে।

"তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি।
প্রাক্তন বলবৎ কর্ম্ম যোঽন্যথা তৎকরিষ্যতি॥"

মহাজনের তিরোভাব।

বৈষ্ণবগণ যাঁহাকে "বৈষ্ণব সমাজ মুকুটমণি" বলিতেন এবং যাঁহাকে "বর্ত্তমান কালের বৈষ্ণব মহাজন" বলিয়া সংজ্ঞিত করিতেন, সেই পরম ভাগবত বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি মহাত্মা শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, গত ৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার দ্বিতীয় প্রহর সময়ে নিজোপাস্য গোলোক বৃন্দাবন ভূমি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর উলা নামক গ্রামে ১৭৬০ শকাব্দে ১৮ই ভাদ্র তারিখে কলিকাতা হাটখোলার দত্ত বংশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় তদীয় মাতৃস্বস্রা-পতি বিখ্যাত ইংরাজী লেখক ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবস্থান করিয়া তদানীন্তন হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীগণের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত টি, পালিত ও ৺কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর উড়িষ্যা প্রদেশে কিয়দ্দিবস শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিয়া অব-শেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সহ সবরেজিষ্টার অব এসিউরেন্স (Sub. Regr of Assnrance) এবং ১৮৬৮ খৃঃ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে ব্রতী হন। সেই কার্য্যে বহু দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া ১৮৯৪ খৃঃ অবসর গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে ১৮৭১ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে পুরুষোত্তমের শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে কার্য্যভার সম্পাদন করেন এবং তৎ-কালে রাজ বিদ্রোহী বিষকিশনের 'দুষ্প্রবৃত্তি দমন করতঃ সমুচিত দণ্ডবিধান

রাজকার্য্যে ব্রতী থাকিয়াও তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উর্দ্দু, পার্শী, ইংরাজী, সংস্কৃত, উড়িয়া ও বাঙ্গলা ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার ছিল। এই সকল ভাষায় তদীয় বর্ণিত গ্রন্থাবলীই তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

তাঁহার উচ্চতম আদর্শজীবন বাস্তবিকই অতুলনীয়। নৈতিক ধর্ম্মশাস্ত্রাদি, বিচারপূর্ণ দর্শন শাস্ত্রসমূহ ও পরিশেষে শ্রীচৈতন্য দেব প্রদর্শিত ভক্তিমার্গ তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজের উন্নতি বিধান কল্পে তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী উদ্যম পরিলক্ষিত হয়।

১৮৯১ খৃঃ শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে ভারতব্যাপী বিশেষতঃ বঙ্গদেশের নানাস্থানে প্রচার কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন কল্পে স্বয়ং ব্রতী হন।

বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রশস্তি কল্পে তিনি ১৮৮০ খৃঃ প্রথম সাময়িক বৈষ্ণব পত্র "সজ্জনতোষণী" প্রচার আরম্ভ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার স্বর্গীয় মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি তাঁহারই উৎসাহ বলে শ্রীগৌর কথা দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের আংশিক সহায়তা করেন। বস্তুতঃ এই মহাত্মার আন্তরিক চেষ্টা ফলে বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্মকে আদর করিতে শিখিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট কালের নবদ্বীপ নগর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ায় ব্রহ্মদ্বীপের অপর পারস্থিত কুলিয়া গ্রামকে অনেকেই ভ্রম বশতঃ নবদ্বীপ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু এই মহাত্মার অধ্যবসায় বলে বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও শিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজ শ্রীধাম মায়াপুরকেই প্রকৃত প্রাচীন নবদ্বীপ নগর বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। ইহাঁরই অনির্ব্বচনীয় চেষ্টায় তথায় শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম ভিটায় তদীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ ও দৈনন্দিন সেবা সাধিত হইতেছে।

১৯০৭ খৃঃ শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত ভজনোদ্দেশে তিনি চতুর্থাশ্রমাতীত শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শ্রীভাগবত পরমহংস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদুচিত ভিক্ষুবেশ ধারণ করেন।

তাঁহার অলৌকিক সরলতা, ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রীতি, ভগবদ্বিষয়ক সূক্ষ্ম দার্শনিক অনুভূতি, শ্রীগৌর পার্ষদবর্গের অকৃত্রিম দাস্য, নিজ প্রতিষ্ঠার বৈরা-
সীন্য, কৃষ্ণসেবা বিষয়ে একান্ত [illegible]

পরতঃ পূর্ণ বিশ্বাস, কৃষ্ণেতর অনুশীলনের অকর্ম্মণ্যতা ও কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ ব্যতীত অপর সঙ্গ রাহিত্য তাঁহার জীবনের প্রতি অনুষ্ঠানেই জাজ্জ্বল্যমান ছিল। এই মহাত্মার দ্বারা গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব জগৎ যে কি পরিমাণ প্রকৃত লাভবান হইয়াছেন ও হইবেন তাহা প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকটেই গভীর গবেষণার বিষয়।

হোমিওপ্যাথিক।

চিকিৎসাতত্ত্ববারিধি।

লেখক,—ডাক্তার টী, মুখার্জ্জী।

ঔষধপ্রয়োগ প্রণালী।

রোগের লক্ষণের সহিত ঔষধের অধিকাংশ লক্ষণের সামঞ্জস্য হইলে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

চিকিৎসা দুই রকমে করা যায়, সাধারণ ও ধাতুগত, সাধারণ চিকিৎসায় উপস্থিত প্রধান কষ্টদায়ক লক্ষণ দেখিয়া, ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়, সেই সকল লক্ষণ সাধারণ রোগে পরিবর্ত্তনশীল হয়, এবং সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ পরিবর্ত্তনেরও আবশ্যক হয়; যেমন ওলাউঠা রোগে অবস্থার পরিবর্ত্তনানুযায়ী ঔষধের পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

প্রত্যেক ধাতুগত পীড়ায় ঔষধে রোগের নানা রকমের বৃদ্ধির অবস্থা আনায়ন করে, কখন ঐ বৃদ্ধি ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে, কখনও এক সপ্তাহ উপকারের পর, কখন বা দীর্ঘকালস্থায়ী উপকারের পর আরম্ভ হয়।

ঔষধ নির্ব্বাচনে ভুল হইলেও রোগ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাতে আরও কতকগুলি নূতন লক্ষণ প্রকাশ পায়, ঐ লক্ষণগুলি ঠিক ভুল ঔষধদ্বারা আনিত কি না, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি ঔষধ নির্ব্বাচনে ঠিক ভুল হইয়া থাকে তাহা হইলে ডাক্তার হ্যানিম্যান সাহেবের মতে, রোগীর প্রধান কষ্টদায়ক ও নূতন আনিত লক্ষণ সমূহকে সমষ্টি করিয়া দেখিতে হইবে যে, অন্য কোন্ ঔষধের সহিত অধিকাংশ প্রধান লক্ষণের সামঞ্জস্য হইয়াছে এবং সেই মত ঔষধ নির্ব্বাচন কর্ত্তব্য, যদি

নির্ব্বাচিত ঔষধে, রোগের উপসর্গের অনেক উপকার হইলেও কতকগুলি নূতন লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, এরূপ ক্ষেত্রেও বুঝা আবশ্যক ইহা এক-প্রকার ঔষধের বৃদ্ধি; ২।৪ দিন অপেক্ষা করিলেই আপনা হইতে কমিয়া যাইবে।

পুরাতন ধাতুগত পীড়ায় নির্ব্বাচিত ঔষধে রোগের বৃদ্ধির অবস্থা আনয়ন করিলেও হঠাৎ প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ অনেক সময় ঐ বৃদ্ধি এক সপ্তাহের পর অবধি থাকিয়া ক্রমে উপশম অবস্থা আনয়ন করে।

(ক) যদি ১০।১২ দিন বৃদ্ধির পর হইতে ২।৪ দিনের মধ্যে ঐ পীড়ার কিছু উপশম হইতেছে অনুমান হয়, শরীরের যন্ত্রাদির বৈলক্ষণ্য অবস্থা বা নাড়ীর অবস্থা বা সর্ব্বাঙ্গিন অন্যান্য অবস্থা ইত্যাদি পাঁচ রকমের মধ্যে তিন রকম অবস্থাও যদি রোগী, রোগীর সুশ্রূষাকারী বা চিকিৎসক ইহারা অনুমান করেন যে, উপসর্গের কিছু উপশম অবস্থা আনয়ন করিয়াছে, এরূপক্ষেত্রে পুনরায় ঔষধ না দিয়া ঔষধের কার্য্যকারী শক্তির নির্দ্ধারিত দিবস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(খ) যদি ঐ বৃদ্ধি ১০।১২ দিন মধ্যে উপশম না হয়, ও বৃদ্ধির লক্ষণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়, তখন প্রতিষেধক ঔষধের প্রথমে আঘ্রান (হ্যানিম্যানের মতে ৪।৫টী সূক্ষ্ম প্রতিষেধক ঔষধের বটিকায় এক ফোঁটা রেক্টিফায়েড্ ইস্পিরিট দিয়া আঘ্রাণ (লওয়া বিধেয়) লইলে বৃদ্ধির লক্ষণ কমিয়া যায়, যদ্যপি তাহাতে উপশম না হয়, তাহা হইলে প্রতিষেধক ঔষধের ২টী সূক্ষ্ম বটিকা সেবন, তাহা সত্ত্বেও যদি বৃদ্ধির অবস্থার নিবৃত্তি না হয়, তখন ধাতুগত ক্ষত, খোস, পাঁচড়া ইত্যাদি বিষের প্রতিষেধক ঔষধ চিকিৎসক যাহা উপযুক্ত বিবেচনায় নির্ব্বাচিত করিবেন, তাহা সেবন করা কর্ত্তব্য, এবং তৎপরে বৃদ্ধির লক্ষণ সমুদয় অন্তর্হিত হইলে, পুনরায় পূর্ব্ব ঔষধের আরও উচ্চশক্তির এক মাত্রা সেবন করা উচিত; দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত ঔষধে বৃদ্ধির অবস্থা আনয়ন করিতে প্রায় দেখা যায় না, যদি দেখা যায়, তাহা ২।১ দিন মাত্র থাকে; যদি পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভয়ানক বৃদ্ধির অবস্থা আনয়ন করে, তখন মনে করিতে হইবে যে ঔষধ নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই।

(গ) যদি ঐ নির্ব্বাচিত ঔষধ এক মাত্রা সেবনের পর ২।১ সপ্তাহ বা ২।১ মাস

অবস্থা আনয়ন করে, তখন স্থির করা উচিত যে, এই ঔষধ ঘনীভূত ধাতুগত রোগের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করিতেছে, এ রকম ক্ষেত্রে কোনও প্রতিষেধক ঔষধ না দেওয়াই কর্ত্তব্য, কারণ অনেক সময় দেখা যায়, ঠিক ঐ বৃদ্ধির পরই রোগ সমূলে উৎপাটিত হয়।

(ঘ) ঔষধ প্রথম মাত্রা ব্যবহারের পর রোগের লক্ষণগুলি দূরীভূত হইয়াও আবার দেখা দিতেছে, এ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম শক্তির ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়; পুনরায় আরোগ্য হইয়া আবার উপস্থিত হইলে, আরও নিম্ন শক্তি, এইরূপে রোগ সম্পূর্ণ দূর করিতে অনেক সময় ৩য় শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহারেরও আবশ্যক হয়।

পুরাতন পীড়ার চিকিৎসা কালীন অনেক রোগীকে দেখা যায়, অমিত আহারের জন্য আরোগ্য হইতে পারিতেছে না, এরূপ ক্ষেত্রে রোগীর লঘু পথ্য ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য, অমিত আহারের জন্য কতকগুলি নূতন রোগের লক্ষণ-প্রকাশ পাইলে পূর্ব্বে উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা নূতন লক্ষণগুলি তাড়াইয়া আবার ধাতুগত পীড়ার ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

চর্ম্ম রোগ গ্রস্থ রোগী কোনও নূতন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, এবং লক্ষণ দেখিয়া উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়াও রোগ আরোগ্য না হইলে, তাহাকে ২ মাত্রা উচ্চশক্তি সালফার্ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইয়া ২।৩ দিন অপেক্ষা করার পর পুনরায় পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত ঔষধ ব্যবহার করাইলে সে সত্বর আরোগ্য লাভ করে।

কোন কোন রোগীকে দেখা যায় যে, তাহার পুরাতন পীড়ার চিকিৎসার পর রোগ অর্দ্ধেক আরোগ্য হইয়া, অর্দ্ধেক থাকিয়া যায়, কাহারও বা দেখা যায়, আরোগ্য হইয়াও সময় সময় পূর্ব্ব পীড়ার ২।১টী লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, সেই সকল রোগীকে তাহার ধাতুগত ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করা কর্ত্তব্য, নচেৎ সেই ধাতুগত পীড়া আবার পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি পাইতে পারে। যদি কোনও পুরাতন ব্যাধি, অন্য কোনও মতের চিকিৎসা দ্বারা দুশ্চিকিৎস্য না হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত ধাত্বানুযায়ী নির্ব্বাচিত ঔষধ দ্বারা ২।১ বৎসরের মধ্যে ঐ পুরাতন পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়; যদি অন্য মতে দুরারোগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আরোগ্য করিতে অনেক দিন সময় লাগে। ধাতু গত পুরাতন পীড়া সকল প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন না কোন ভয়ানক বিষ হইতে উৎপন্ন,

হইয়া এরূপ ঘনীভূত হয়, যে, সে সকল বিষকে শরীর মধ্য হইতে বিদূরীত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, সেই সকল রোগী অন্য কোনও মতের চিকিৎসা দ্বারা তাহার সেই ঘনীভূত পীড়াকে কখনই সমূলে উৎপাটন করিতে পারে না, এবং আরোগ্য করিতে নানা রকম ঔষধ সেবন করায় সেই ঔষধ সকলের ক্রিয়াও শরীর মধ্যে হইতে থাকে, পূর্ব্ব বিষও তথায় বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ঔষধ জনিত আরও অন্য প্রকার পীড়ার সূত্রপাত হয়, এইরূপে তাহার ব্যাধি জটিল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এ অবস্থায় সে সকল ব্যাধি একরূপ দুশ্চিকিৎস্য হয়, এক প্রকার বিষ আছে শরীর মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে বংশপরম্পরা পর্য্যন্ত থাকে, এরূপ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত যে কোন এক প্রকারের বিষ হইতে উৎপন্ন এরূপ রোগকে সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করিতে যদি ২।১ বৎসর সময় লাগে, ইহা খুব অধিক দিবস বলা যায় না। একটী পুরাতন পীড়া সমূলে উৎপাটন করিতে ১ মাত্রা হইতে প্রায় ৪০ মাত্রা পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিতে হয়, কিন্তু ঔষধের নির্দ্ধারিত ক্রিয়ার দিবস অন্ত করিয়া, বা ঔষধের ক্রিয়া না থাকিলে ব্যবহার করিতে হইবে। পুরাতন পীড়াগ্রস্থ বলিষ্ঠ যুবাদিগের সম্পূর্ণরূপে ঐ পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিতে ৬ মাস হইতে ১ বৎসর সময় লাগে, বৃদ্ধদিগের দীর্ঘকাল সময় লাগে।

ধাতুগত পুরাতন পীড়ার চিকিৎসা না করিয়া কেবল ভয়ানক বৃদ্ধি কমাইবার জন্য, কতকগুলি কষ্টদায়ক উপসর্গ দূরীভূত করিতে আশু উপকারী ঔষধ ব্যবহারে, কিছু দিনের জন্য উপকার করে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব সঞ্চিত ক্ষয়কারী এবং কষ্টকর লক্ষণ সকল সম্পূর্ণ তিরোহিত না হইলে, রোগীর অবস্থা আবার সংশয়াপন্ন হয়।

ধাতুগত ক্ষত রোগগ্রস্থ রোগীদের সময় সময় এরূপ কোষ্টবদ্ধ হয়, যাহা অনেক সময় ঔষধের দ্বারা উপকার হয় না, গরম জলের পিচকারী বা ডুস ব্যবহারের আবশ্যক হয়, যাহাদের বহুকালের কোষ্টবদ্ধ রোগ আছে, এবং কোন প্রক্রিয়া বা কোন ঔষধের দ্বারা উপকার হইতেছে না, তখন উচ্চ ডাইলুসনের সালফার এক মাত্রা সেবন করার পর যদি কোষ্টবদ্ধ রোগ দূর না হয়, তাহারা এক মাত্রা উচ্চ শক্তির লাইকোপোডিয়াম্ সেবন করিলে

রোগ- বিষ প্রতিষেধক ঔষধ আছে, যে সকল ঔষধ উত্তমরূপ নির্ব্বাচিত হইলে বিশেষ সুফল ফলে।

মহাত্মা হ্যানিম্যানের আবিস্কৃত ক্ষত দোষ গ্রস্থ ধাতুকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নাই, হোমিওপ্যাথিক মতে ধাতুগত ক্ষত রোগগ্রস্থ রোগী শতকরা ৯০ জন দেখা যায়, তজ্জন্য কি নূতন কি পুরাতন যে কোনও পীড়াকে সমূলোৎপাটন করিতে সেই ক্ষত প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, যাহারা মহাত্মা হ্যানিম্যানের নিয়মানুসারে ধাতুগত পীড়ায় চিকিৎসা করেন, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে পুরাতন পীড়া আরোগ্য করিতে পারেন। মহাত্মা হ্যানিম্যানের লিখিত "অরগ্যানন অব দি আর্ট অব হিলিং" অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ধাতুগত পীড়ার চিকিৎসা প্রণালী ও সূত্র নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, ধাতুগত ক্ষত বিষ প্রচ্ছন্ন ভাবে শরীর মধ্যে থাকে, তাহার লক্ষণ প্রায় পাঁচ শত। ঐ বিষ শরীর মধ্য হইতে দুরীভূত করা দুঃসাধ্য।

পুরাতন পীড়ায় উত্তমরূপ নির্ব্বাচিত ঔষধ ব্যবহারের পর যদি দেখা যায় যে, রোগের লক্ষণ আশাতীত হ্রাস হইয়াও শরীরাভ্যান্তরীন্ ও মানসিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে স্থির করা উচিত যে, রোগীর জীবনী-শক্তি হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু ঔষধ তাহার কেবল মাত্র নিজগুণ প্রকাশ করিয়াছে ; এরূপ স্থলে পুনরায় ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া ব্যবহার করিবার পর অনেক সময় রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে, দেখা গিয়াছে।

গত ১৯১১ সালের মার্চ্চ মাসে এক ব্যক্তিকে দেখিতে যাই, তাহার বয়স ৭৬ বৎসর, তিনি পুরাতন পেটের পীড়া ও শোথ রোগে ভুগিতে ছিলেন, তাহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, ডাক্তার ইউনান্ সাহেবকে চিকিৎসার পরামর্শের জন্য আনা হইয়াছিল, তিনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ২০০ শক্তির ক্যালকেরিয়া কস্ নামক ঔষধের একমাত্রা ব্যবস্থা করেন, সে ঔষধের কার্য্যকারী শক্তির গুণে তাহার পীড়ার অন্যান্য সমুদয় উপসর্গ দুরীভূত হইয়াছিল, কেবল দিবসে দুইবার পাত্‌লা দাস্ত হইত, ১বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে থাকিয়া পুনরায় ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহার অরাতিসার ও সর্ব্বাঙ্গের শোথ বৃদ্ধি পায়, জ্বরের তাপ সমস্ত দিন ১০১ ডিগ্রি থাকিত, বৈকাল ২টার পর

পিপাসা অত্যন্ত অধিক ছিল, কিন্তু এক ঢোক মাত্র জল পানে পিপাসার নিবৃত্তি হইত, আবার এক মুহূর্ত্ত পরেই পিপাসা বাড়িত, এরূপ প্রকারে রোগীকে ক্রমাগত জল পান করিতে হইত, গাত্রে সর্ব্বদা আবরণ রাখিতে হইত, কারণ অনাবৃত অবস্থায় শীত পাইত, দিবা রাত্রে ১০।১২ বার পাতলা দাস্ত হইত, তাহাকে আর্সেনিক এলবম্ নামক ঔষধের উচ্চ শক্তির এক মাত্রা সেবন করাইবার পর তাহার রোগের সমুদয় লক্ষণ দূরীভূত হইয়াছিল, কিন্তু রোগী প্রকাশ করিত যে, যদিচ আমার রোগের লক্ষণ সমুদয় আশাতীত হ্রাস হইয়াছে, তত্রাপি আমি নিজে কোনওরূপ সুবিধা বুঝিতেছি না, সম্ভবতঃ আমাকে শীঘ্রই মরিতে হইবে; তাহার অল্প দিন পরেই পুনরায় রোগের লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, নাড়ী অসমান হয়, পেট ফাঁপিয়া উঠে, গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করিতে থাকে, হস্ত পদাদি মৃত ব্যক্তির মত শক্ত হয়, এবং রোগীর জ্ঞান লোপ পায়, অন্যান্য ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়েরা সকলেই সেই রোগীর গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থা করেন, সেই রোগীকে কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্ নামক ঔষধের ২০০ শক্তি এক মাত্রা সেবন করাইবার পর, আবার তাহার শরীরে বল বাড়ে, জ্ঞান ফিরিয়া আসে, এবং সমুদয় উপসর্গ ভাল হয়; পূর্ব্ব ঔষধ সেবনে যদিচ সেই রোগীর রোগের সমুদয় উপসর্গ দূর হয়, তত্রাপি রোগী শরীরাভ্যন্তরীণ এবং মানসিক অবস্থার কিছুই উপশম বুঝিতে পারেন নাই, তাহার পর আবার যখন নূতন করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা হয়, তখন সেই ঔষধ ব্যবহারে আবার জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায় ও উপসর্গ সহ রোগ শীঘ্র অন্তর্হিত হয়, সেই রোগীকে সুস্থাবস্থায় ৬ মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

পুরাতন ধাতুগত পীড়ার ঔষধ সকলের কার্য্যকারী শক্তি ২০।৩০।৪০।৫০।৬০ দিন পর্য্যন্ত থাকে, সেই সকল ঔষধ ব্যবহার কালে, তাহাকে তদনুরূপ সময় দেওয়া আবশ্যক, ও ক্রীয়া কালীন সেই ঔষধ বা অপর কোনও ঔষধের দ্বারা তাহার ক্রিয়া শক্তিকে বাধা দেওয়া উচিত নয়; যদি দেখা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিছুদিন উপকার করিয়া আর করিল না, তখন ঐ পরীক্ষিত ঔষধের আরও উচ্চশক্তির একমাত্রা সেবন করান উচিত, ঐ পরীক্ষিত ঔষধকে কার্য্য করিতে সময় না দিয়া পুনঃ পুনঃ তাহা সেবন করিলে তাহাতে রোগী কখনও আরোগ্য হইবে না।

ক্রমশঃ।

ঘটকালী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

(১)

সে আজ অনেক দিনের কথা—তখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে পড়ি। একদিন বৈকালে গোলদীঘিতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তখন বর্ষার ভরা মেঘ আকাশ ঢাকিয়াছে। আকস্মিক বৃষ্টিপাতাশঙ্কায় দ্রুতপদে বাটী ফিরিতেছিলাম। সঙ্গে ছাতা নাই,—কারণ স্কুল কলেজের ছাত্রদের ছাতা ব্যবহার একটা অসভ্যতা—রৌদ্রে পুড়িয়া মরিবে, জলে ভিজিবে সেও স্বীকার—তথাপি ছাতা ব্যবহার করিবে না। আমি প্রথম প্রথম ছাতা ব্যবহার করিতাম, কিন্তু বন্ধুবর সতীশ চন্দ্রের বিদ্রূপ বাণে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যাহা হউক যখন হ্যারিসন রোডের চৌমাথায় আসিলাম,—দেখিলাম, এক স্থানে অত্যন্ত জনতা হইয়াছে। জনতা দেখিয়া অত্যন্ত কৌতূহল হইল। সেইস্থানে যাইয়া দেখিলাম একটী ভদ্রলোক মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। দুই চারিটা লাল পাগড়ী ও একটা সার্জ্জন যে ছিল তাহা বলা বাহুল্য।

জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ভদ্রলোকটী গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান হইল। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকটে যাইলাম। দেখিলাম তাঁহার মুখখানা যেন চেনা চেনা। তাঁহাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া কেন জানি না হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। আমি সাহেবকে বলিলাম,—"যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে ভদ্রলোকটীকে গাড়ী করিয়া বাটীতে রাখিয়া আসি।" এ কথায় সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "যদি বলেন ত এই বালক আপনাকে বাটী রাখিয়া আসে।"

তিনি আমার দিকে তাকাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখনই একখানা গাড়ী ডাকাইলাম ও তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া, আমিও একদিকে বসিলাম। কোথায় যাইতে হইবে, তাহা তিনি কোচম্যানকে বলিয়া দিলেন। গাড়ীতে তাঁহার সহিত বেশ আলাপ হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বোধ হয় আপনার বড় লেগেছে।" তিনি বলিলেন, "না ততটা লাগে নাই, হঠাৎ ধাক্কা লাগিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলাম। তাঁহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, তাহা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলাম, হঠাৎ তাঁহাকে বলিলাম,—"আপনি কি গত শনিবারে ২—৩০ ট্রেনে বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন?"

দের গাড়ী, সিমলা ষ্ট্রীটে একখানি সুন্দর বাটীতে আসিয়া লাগিল। গাড়ীর দরজা খুলিয়া তিনি আমাকে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

তিনি বরাবর আমাকে লইয়া একটী সুন্দর সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম, গৃহখানি ইংরাজি ধরণে সজ্জিত। চেয়ার, কৌচ, টেবিল ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই। গৃহমধ্যে একটী রমণী ও একটী নয় দশ বৎসরের বালিকা বসিয়া ছিলেন। আমরা গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার সেই প্রকার বেশ দেখিয়া বালিকা,—"বাবা আপনার কি অসুখ করেছে;" বলিয়া—কুঞ্চিত কেশদাম দুলাইয়া দৌড়িয়া আসিল; কিন্তু পরক্ষণেই আমাকে পশ্চাতে দেখিয়া নিবৃত্ত হইল। তিনি—না মা অসুক করে নাই বলিয়া রমণীকে বলিলেন,—" দেখ আজ গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া বড়ই আঘাত লাগিয়াছে, এই ছেলেটী বড়ভাল আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে।"

ভাবে বোধ হইল, তিনিই ঐ বাটীর গৃহিণী ও উক্ত ভদ্রলোকটীর পত্নী। তিনি আমার প্রতি এক কোমল কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—"বস বাবা বস।"

আমি সেইস্থানে বসিলাম, এমন সময় একটী সাত আট বৎসরের সুন্দর বালক দৌড়িয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া সে গৃহিণী ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা এ কে?"

তিনি আমার নাম জানিতেন না,—কিন্তু উক্ত ভদ্রলোকটী বলিলেন—"ওর নাম বিজয়।"

তখনই বালক চির পরিচিতের ন্যায় আমার হাত ধরিয়া বলিল,—" আসুন বিজয় বাবু আমার কুকুর দেখ্‌বেন আসুন।" তাহার টানাটানিতে আমি তাহার সহিত চলিলাম। একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি,—একটী ছোট কুকুর বন্ধন দশায় পতিত হইয়া চিৎকার করিতেছে।

শীঘ্রই বালকটীর সহিত বেশ বন্ধুত্ব হইল। বুঝিলাম, বালকটীর নাম সরল কুমার। ছবি দেখাইয়া, বই দেখাইয়া, সেই সুকুমার বালক আমার হৃদয় অধিকার করিল।

গৃহিণী ঠাকুরাণী এই সময় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন,—"বাবা বিজয় একটু জল খাবে এস।" আমি যদিও বলিলাম,—"না—না জল খাবনা, কিন্তু আমার নূতন বন্ধু সরলকুমারের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া জল খাইলাম। কর্তার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া ...

যাইবার সময় তিনি আমাকে এক একবার আসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি কতকটা নূতন বন্ধুর অনুরোধে কতকটা সেই বালিকার সুন্দর মুখ খানি মনে করিয়া আনন্দের সহিত অনুরোধ গ্রহণ করিলাম।

(২)

রজনীকান্ত বন্দোপাধ্যায় একজন গৃহস্থলোক। কলিকাতা সহরে তাঁহার চারি পাঁচ খানি বাটী আছে। তাহার ভাড়াতেই তাঁহার সংসার বেশ চলে। তাঁহার বড়বাজারেও একখানি বেশ বড় রকমের লোহার দোকান আছে। সংসারের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র সরলকুমার, কন্যা হেমন্ত কুমারী, একটী ঝি ও একটী চাকর।

উক্ত পরিবারের সহিত আমার বেশ ঘনিষ্টতা হইল। বিশেষতঃ সরল কুমারের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব। প্রায়ই রজনীবাবুর বাটী যাই। সরলকুমার আমাকে তাহার পড়া দেয়। তাহার পড়িবার সময় সেই সুন্দরী বালিকাটী অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিত। সে পড়িতে ইচ্ছা করিত বলিয়া মাঝে মাঝে তাহার সহিত আমাদের সরলকুমারের বড় কলহ হইত।

পাঠে তাহার প্রবল ইচ্ছা জানিয়া আমি হেমন্তকে পড়াইতে আরম্ভ করিলাম। বুদ্ধিমতী বালিকা নিজের মেধা গুণে সরলকুমারের সঙ্গ লইল। তাহাতে সরলকুমারের আরও ঈর্ষা বাড়িয়া গেল। পড়িবার সময় সে তাহাকে অত্যন্ত জ্বালাতন করিত। কিন্তু হেমন্ত সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া একাগ্রচিত্তে পাঠ অভ্যাস করিত।

(৩)

এইরূপে সুখে দুঃখে বুকের উপর দিয়া ৪টী বৎসর কাটিয়া গেল। আমি এখন বি, এ, পড়ি। হেমন্ত এখন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া। তাহার রূপ যেন উথলিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে আমি তাহাদের বাটী যাইলে হাসিয়া হাসিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার পড়া দিত, এখন আর সে চাঞ্চল্য নাই। কি যেন একটা গম্ভীরতা তাহার মুখে সর্ব্বদাই বিরাজমান। আমারও আর তাহার দিকে তাকাইতে সাহস হয় না। কি যেন একটা লজ্জা আসিয়া আমার বদনকে আনত করিয়া দেয়।

একদিন যখন তাহাদের বাটী যাইলাম; দেখিলাম বাটীতে কেহ নাই। একেবারে উপরে উঠিয়া গেলাম। দেখিলাম, একটী গৃহে বসিয়া গৃহিণী ও কর্ত্তা কথা কহিতেছেন। কেন জানি না সে কথা শুনিবার

কৌতুহল হইল। আমি দ্বার পার্শ্ব হইতে শুনিলাম, গৃহিণী বলিতেছেন,—"কেন বিজয়ের সহিত হেমের বিবাহ দাও না?"

কর্ত্তা বলিলেন— সে উপায় থাকলে ত এখনি দিতাম।

গিন্নী।— "কেন?"

কর্ত্তা।— ওদের ঘরের সহিত আমাদের মিল নাই ওরা, আমাদের অপেক্ষা নীচুঘর— কুলীন নয়।

আর আমি শুনিলাম না, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটীয়া রাস্তায় বাহির হইলাম। ধিক্ ধিক্ বল্লাল সেন কি কুক্ষণে ভারতে কৌলীন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ধিক্ হিন্দু সমাজ। মনে মনে বল্লাল সেনকে ও সমাজকে শত সহস্র গালি দিতে দিতে চলিলাম। কোথায় যে যাইতেছি, তাহার কোন স্থিরতা নাই। অবশেষে ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলাম। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সূর্য্যদেব রক্তিম ভাব ধারণ করিয়া পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সেই মনোরম স্থানে বসিয়া ঘোর চিন্তামগ্ন আছি, এমন সময় কে আসিয়া আমার পৃষ্ঠে হস্তার্পন করিয়া বলিল,—"বিজয়"—

আমি তাকাইয়া দেখিলাম, আমার বন্ধু যোগেন। তাহাকে পাইয়া হৃদয় অনেকটা আশ্বস্ত হইল। খুব খানিকটা ইংরাজি বাঙ্গলা মিশ্রিত বক্তৃতা দিলাম, কি যে বলিলাম, জানি না।

যোগেন বলিল,—এস বাড়ী এস্।

তাহাকে হৃদয়ের কথাগুলি একে একে বলিলাম। শুনিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আচ্ছা দেখা যাক্।

কিছুক্ষণ পরে সে চলিয়া গেল। তখন আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। সত্যই আমি হেমন্তকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম। কিন্তু কিরূপ ভাল বাসিতাম, তাহা জানি না। তবে তাহার অদর্শনে হৃদয়টা যে হু হু করিত তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতাম। হায়, এখন কি করি,—হে ঈশ্বর উপায় বলে দাও।

(৪)

বি, এ পরীক্ষা দিয়া গ্রীষ্মের সময় বাটী আসিলাম। মনে করিয়াছিলাম বাটী আসিয়া হৃদয় কতকটা শান্ত হইবে। তাহার বিপরীত হইল।

হঠাৎ একদিন বাবা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম ১৪ই জ্যৈষ্ঠ

যাহা হউক, বিবাহ করিতেই হইবে। যাহা কখন করি নাই, আজ তাহা করিব না। কখনও পিতা মাতার অবাধ্য হই নাই, আজও হইব না। যাহাকে পাইবার আশা নাই,—তখন পিতা মাতার অবাধ্য হইয়া তাঁহাদের মনে কষ্ট দিব না।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ আসিল। বর বেশে সজ্জিত হইয়া বিবাহ করিতে যাইলাম। যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। যখন শুভদৃষ্টি হয়, তখন একবার চমকাইয়া ছিলাম। ওহো এ যে হেমন্ত—না—না হেমন্ত কি করিয়া হইবে? তারপর বাসর ইত্যাদি যাহা কিছু ছিল, সবই হইয়া গেল। মনে করিয়াছিলাম,—বাসরে নব বিবাহিতা বধুর মুখ খানি একবার দেখিব। কিন্তু আমার দুরাদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। কান মলার চোট সব ভুলিয়া গেলাম, বলিতে কি তাহা আজও আমার মনে আছে।

বিবাহ করিয়া বাটী ফিরিলাম। আজ ফুলশয্যা। দেখিলাম আমার শয়নগৃহে এক দল স্ত্রীলোক। যাহা হউক, তাঁহাদের বাক্যবান এড়াইয়া শয়ন করিলাম। ধীরে ধীরে বধুর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলাম। স্তিমিত প্রদীপালোকে দেখিলাম, সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আনন্দে লাফাইয়া উঠিলাম। হেমন্ত হেমন্ত বলিয়া দুই তিন বার সম্বোধন করিলাম। বুঝিলাম এসব যোগেন বাবুর কাণ্ড। আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলাম "Three cheers for Jogen Babu for his match-making."

সমস্ত রাত্রি খুব ঘুমাইয়াছিলাম। সকালে চাহিয়া দেখিলাম, অত্যন্ত বেলা হইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইয়া দেখি, ঘটক চূড়ামণি যোগেন্দ্রনাথ বাবার সহিত কথা কহিতেছেন।

আমাকে দেখিয়া বাবা বলিলেন—"এইমাত্র যোগেন আসিয়াছে। তুমি প্রশংসার সহিত (Honor এ) বি,এ পাশ হইয়াছ। বস আমি আস্‌ছি বলিয়া বাবা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।"

যোগেন বলিল,—"দেখ্‌লে কেমন বৌয়ের গুণ তোমার বিয়ে হল তুমিও বি, এ পাশ করলে। এখন ঘটকালী করেছি ঘটক বিদায় কর।"

আমি তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম,—"কেমন করে তুমি ঘটকালী করলে। যোগেন বলিতে লাগিল, যখন তোমার নিকট সমস্ত কথা শুনিলাম, তখন রজনী বাবুর নিকট যাইয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। আরও বলিলাম, যে আপনি সমাজ ছাড়িয়া একবার কন্যার দিকে দেখুন। দুই

অনেই দুইজনের প্রতি আকৃষ্ট। আপনার উপরই কন্যার সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে। আমার কথাগুলি তিনি মনযোগ পূর্ব্বক শুনিলেন। তিনিও বুদ্ধিমান, তিনি আর কৌলীন্যের দিকে না দেখিয়া রাজি হইলেন। তোমার বাবাকে সহজেই রাজি করিলাম। তখন একটু রহস্য করিবার জন্য তোমাকে কিছুই জানিতে দিই নাই।"

Three cheers for Jogen Babu বলিয়া লাফাইয়া উঠিলাম।

যোগেন বাবু বলিলেন— Three cheers for the marriage of Bejoy Madhob Roy with Sreemati Hemanta Kumrri. Long live this beautiful couple. Hip, hip, Hurrah.

আমি ও আমার।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

গৌরীকান্ত কলিকাতা কমিশেরিয়েট্ আফিশে চাকরী করেন, বেতন দুই শত টাকা—বাসা [illegible], সংসারে পত্নী বসন্তবালা বই আর কেহ নাই, সুতরাং সংসার ছোট, বসন্ত বালার বয়স একুশ বাইশ কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই। একদিন গৌরী আপিস হইতে আসিয়া হাসিতে হাসিতে পত্নীকে বলিলেন—"আমাকে উপরবর্ম্মায় বদলি করিয়াছে, সেখানে একটা লড়াই বাঁধিয়াছে আমাকে একটা পল্টনের সঙ্গে যাইতে হইবে। তোমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব আসিবার সময় তাই ভাবিতে ছিলাম। বেতন একশ টাকা বেশী পাওয়া যাইবে।" পত্নী বসন্ত বালা বলিলেন,—"একাকী কোথায় যাইবে, আমাকে সঙ্গে লইতে হইবে।"

সেখানে যদি বেশি দিন থাকিতে হয়, তখন বরং তোমায় লইয়া যাইব। তোমার মা মাসদুইয়ের জন্যে তোমার কাছে আসিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

বস। দুদিন আগে তাঁহার পত্র পাইয়াছি—বড় বৌ আটমাস অন্তঃস্বত্বা, কেমন করিয়া এখানে আসিবেন।

গৌরী। তবে কি হয়?

বসন্ত বালা স্বামীর হাত পা মুছিয়া দিতে দিতে বলিলেন,—শর্ব্বরী দিদি

গৌরী। কেমন করিয়া বলিব সে আজ দুই মাস বিধবা হইয়াছে, স্বামী শোকে কাতর—সে কি তোমার কাছে থাকিতে পারিবে, তাহা না হইলে, সে তেমন নয়, আমাদিগকে যেমন ভালবাসে তাহাতে আমাদের বাড়ীতে থাকা যে একবারেই অসম্ভব এমন নয়।

বস। তুমি বলিলে বোধ হয় রাজি হইতে পারে।

গৌরী। বলিলে মুখ এড়াইতে পারিবে না, কিন্তু বলাই ত মুস্কিল।

বস। দায়ে পড়িয়া মানুষ কিনা করে।

গৌরী। আচ্ছা দেখা যাবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ময়দা ভিজান ছিল বসন্ত ষ্টোভটী নিকটে লইয়া এক এক খানি করিয়া লুচি ভাজিয়া দিতে লাগিলেন, আর গৌরীকান্ত খাইতে আরম্ভ করিলেন।

শর্ব্বরীর পিতা রামনারায়ণ চৌধুরী পেশোয়ারে কমিশেরিয়েটের বড় বাবু ছিলেন, অল্প বয়সে গৌরী বাবুর পিতামাতার মৃত্যু হইলে তাঁহার নিকট আত্মীয়েরা কেহ তাঁহার অন্নবস্ত্রের ভার লয়েন নাই, তাঁহাকে নিরাশ্রয় হইতে হইয়াছিল, রামনারায়ণ গৌরী বাবুর দূর সম্পর্কিত কুটুম্ব, পূজার সময় বাড়ী আসিয়া গৌরীর পিতৃমাতৃবিয়োগের কথা শুনিয়া আপনার বাড়ীতে তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া যতদিন আপনি বাড়ীতে রহিলেন ততদিন তাঁহাকে আপনার কাছেই রাখিলেন, পেশোয়ার যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

পরোপকারীর অভাব হইলে সংসার অচল হইত, ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা পাইত না, তাই তিনি মনুষ্যের মনে পরদুঃখকাতরতা দিয়াছেন, পরের দুঃখ দেখিলে কেহ তাহা সহ্য করিতে পারে না, আপনার অবস্থার অনুকূল না হইলেও বিপন্নের অশ্রুমোচনে হস্ত প্রসারিত করে। রামনারায়ণ মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন পাইতেন, তাঁহার পক্ষে এক জনের ভরণপোষণ ও লেখা পড়া শিখাইবার খরচ কিছুই নহে। পেশোয়ারে গিয়া গৌরীকান্ত রামনারায়ণের পরিজনের মধ্যে পরিগণিত হইলেন—গৌরীকান্ত তাঁহাকে কাকা বলিতেন, অনেকেই গৌরীকে রামনারায়ণের আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মনে করিত, কেবল যখন রামনারায়ণের কন্যা শর্ব্বরীর বিবাহের সময় হইল, তখন গৌরীর বিবাহের কথা কাণাকাণিতে শুনিয়া সকলে বুঝিয়াছি যে, গৌরী রামনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বা জ্ঞাতি গোত্রজও নহে। শর্ব্বরী বাল্যকালে গৌরীকে দাদা বলিত, সর্ব্বদা তাহার কাছে পিঠে থাকিত, খাবার হইলে ডাকিয়া খাওয়াইত

যখন গৌরী একাকি বৈঠকখানায় বসিয়া লেখা পড়া করিত তখন সে কখন তাহার কাছে বসিয়া থাকিত, কাগজ খানি বাতাসে উড়িয়া পড়িলে না বলিতে বলিতে তাহা কুড়াইয়া দিত, কোন কোন দিন মেম সাহেব তাহাকে পড়াইতে না আসিলে সে গৌরীর কাছেই পড়া লইত। পেশোয়ারের স্কুলে এন্‌ট্রেন্স পাশ হইলে রামনারায়ণ তাহাকে আপনার আপিসে চল্লিশ টাকা বেতনে একটী চাকরী করিয়া দেন, সেই সময়েই দিন কয়েক লোকে গৌরীর সহিত শর্ব্বরী সুন্দরীর বিবাহের কথা কানাঘুষা করিত। কিন্তু সে কথার কোন ভিত্তি ছিল বলিয়া মনে হয় নাই। অন্য পাত্রে শর্ব্বরীর বিবাহ হইয়া গেল—জামাতা এন্‌ট্রেন্স পাশ না করিলেও রামনারায়ণ তাহাকে আপন আপিসে একটী ভাল চাকরী করিয়া দিলেন। কালক্রমে রামনারায়ণ পরলোকে প্রস্থান করিলেন, গৌরীকান্তও পদোন্নতি পাইয়া কলিকাতায় বদলী হইয়া আসিলেন। কিছু দিন পরে শর্ব্বরীর স্বামীও কলিকাতা আপিসে বদলী হইয়া আসিলে শর্ব্বরী তাহার গৌরীদাদার কাছে বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিত। শর্ব্বরীর স্বামী হেমেন্দ্র নাথ গৌরী অপেক্ষা কম বেতন পাইতেন না, তবে অমিতাচারী ছিল বলিয়া কিছু রাখিয়া যাইতে পারে নাই, কেবল শর্ব্বরীর গায়ে তিন চারি হাজার টাকার গহনা মাত্র সম্বল ছিল, একটী মাত্র ৩।৪ বৎসরের পুত্র, বসিয়া খাইলে ৩।৪ হাজার টাকায় কত কাল চলিতে পারে! গৌরী আপনার বদলির কথা শর্ব্বরীকে শুনাইবামাত্র সে বসন্তবালার কাছে থাকিতে সম্মত হইল, গৌরী বলিলেন, "আমার বদলি বলিয়া নহে যতদিন তোমার পুত্রটী উপায়ক্ষম না হয়, ততদিন তোমরা আমার সংসারেই থাকিবে। আমি তোমার পিতার প্রতিপালিত, অপর কেহ নহে! আমার কাছে থাকায় কোন দোষ জন্মিতে পারে না।

(২)

তখন প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া রেঙ্গুনের মেলষ্টীমার যাইত, আর একটি বার মাত্র সেখান হইতে আসিত—মঙ্গলবার রাত্রিকালে কলিকাতার কয়লা ঘাটে জাহাজে উঠিয়া থাকিতে হইত, বুধবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জাহাজ ছাড়িয়া যাইত। গৌরীকান্ত বড় শিষ্ট শান্ত ও সচ্চরিত্র যুবক, তাঁহার যৌবনসুলভ কোন প্রকার কদভ্যাস ছিল না—তামাকটী পর্য্যন্ত নয়, মাসকাবারের প্রথম দিনে পূর্ব্ব মাসের বেতন পাইলে সমস্ত টাকা গুলি আনিয়া পত্নী বসন্ত বালার

মনি ব্যাগটী পূর্ণ করিয়া দিতেন, তাহাতেই তাঁহার সকল খরচ কুলাইত, এই দশটি টাকায় তাঁহার সেয়ারের গাড়ীতে আপিশ যাওয়াআসা—বেশীর মধ্যে ছিল পড়া—তাহার জন্য দুই এক খানা পুস্তক খরিদ আর গরীব দুঃখীকে দান। পুস্তকের মূল্য বেশী হইলে কোন কোন মাসে দুএকটি টাকা বেশী লাগিত, তাহা না হইলে টাকাটা সিকাটা বাঁচিত। ফলে বসন্ত ৫।৭ দিন অন্তর মনিব্যাগটী খুলিয়া দেখিতেন—কারণ তাহা খালি হইলেও গৌরী কিছু চাহিতেন না, হয়ত হাঁটিয়াই আপিশ যাইতেন।

দেখিতে দেখিতে মঙ্গলবার নিকট হইল, বসন্ত পেট পুরিয়া খাইতে পারেন না, শুইলেও চক্ষে ঘুম আসে না, ক্রমে মঙ্গলবার আসিল—গৌরীকে সন্ধ্যাকালে গিয়া জাহাজে উঠিতে এবং তিনদিন জাহাজে থাকিতে হইবে। তজ্জন্য শর্ব্বরী দাদার জন্য বেশী করিয়া লুচি নিমকী ও কচুরী ভাজিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল, ফল পাকড়ও কিছু সংগ্রহ করিয়া দিল, আর বলিয়া দিল—"দাদা আজকাল ত পাঁওরুটীটা অসুখ বিসুখে বামুন পণ্ডিতেও খান, এ সকল খাবার যদি খারাপ হইয়া যায়, টাটকা পাঁওরুটীই না খাইবে কেন, জাহাজে সকল রকম খাবারই টাটকা পাওয়া যায় হিন্দুস্থানী হালুইকরে তৈয়ারি করিয়া বেচে তাও খাবার ত কোন দোষ দেখি না ,,।

বসন্ত বালা সপ্তাহ কাল কেবলই চোখ মুছিতে ছিলেন, শর্ব্বরীকে আপনার বলিয়াই জানিতেন। যাত্রাকালে বিছানা বালিশ কম্বলের মোট বাঁধা হইল, একটী ট্রাঙ্ক পড়িবার পুস্তক, পরিধেয় বস্ত্রে পূর্ণ হইল,—গেলাশ বাটী থালাও তাহার ভিতর দেওয়া এবং জাহাজের সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিটও একখানি ক্রয় করা ছিল, মনিব্যাগে, নোটে টাকায় সিকি দুআনি আধুলিতে একশ টাকা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে গৌরীকান্ত সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া আহার সারিলেন, ঝি একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ি ডাকিয়া আনিল গৌরীকান্তের বিদায়কালে বসন্তর চক্ষে উৎসধারা বহিতে লাগিল—তাহার কণ্ঠ রোধ হইল তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, শর্ব্বরী বলিল—বৌ দাদার যাত্রা কালে চোখের জল ফেলো না, অকল্যাণ হবে, কে চিরদিন ঘরে থাকিতে পায়—আজি ... শিকার সরকারী চাকরীতে প্রবাসকে ভয় করিলে চলে না, কাজের ভেস্নালে দাদা সব ভুলিয়া কাজ লইয়া থাকিবেন, আমাদিগকে হয়ত মনে করিবারও অবকাশ হইবে না।"

ভাল ছিল, বিবাহের পর একদিনও যে আমি উঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি নাই, পিতা মাতাকে দেখিবার সাধ হয় নাই—কেমন করিয়া থাকিব;”—আর মুখে কথা আসিল না। আহা ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাকেই যাহারা দাম্পত্য সুখের সার মনে করে তাহাদের সহিত পশুর অতি নিকট সম্পর্ক। সে সুখের অবসানেও যে দম্পতির পূর্ব্বপ্রেম অধিকৃত এবং সুখে দুঃখের সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহারাই প্রকৃত প্রেমিক। তাঁহাদের প্রণয় স্বর্গীয়—ইহলোকে তাহা বড়ই বিরল। সেরূপ দম্পতির জীবন দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা—জীবনে মরণে সমান—পত্নীর পতি প্রাণতার পরীক্ষা দারিদ্র্যদুঃখে—অঙ্গে অলঙ্কার নাই, উদরে অন্ন নাই, সে জন্য স্বামী সংক্ষুব্ধ,—কিন্তু পত্নী তাহা জানিতে পারিলে মর্ম্মান্তিক দুঃখে দ্রবীভূতা এরূপ পত্নী পতিবিয়োগে অনুমৃতা হয়েন, পতিকে রাখিয়া পরলোক পাইলে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। হিন্দুর গৃহে এরূপ পত্নীর অভাব না হইলেও, নাই এমত নহে :—সেদিনের কথা, বৈদ্যকন্যা জগত্তারিণী পতিবিয়োগে যেন যোগে দেহত্যাগ করিয়া পতির চিতায় দগ্ধ হইলেন। ইহা অপেক্ষাও জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পতিনিন্দায় সতীর প্রাণত্যাগ। এ দৃষ্টান্ত দক্ষরাজ গৃহে। সে স্বামী আবার শ্মশানবাসী। হিন্দুর গৃহে এ দৃষ্টান্ত আছে বলিয়াই এরূপ হিন্দুর গৃহ সুখ শান্তির আশ্রম বসন্ত শর্ব্বরীর কথায় ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুছিলেন, আর স্বামীকে বলিয়া দিলেন—“রেঙ্গুনে পৌছিলেই পত্র দিতে ভুলিও না”—পতি বলিলেন,—“তোমার একথা বলাই বাহুল্য।”

(৩)

তিনদিনের দিন রেঙ্গুন পৌছিয়া গৌরীকান্ত শুনিলেন তাঁহাকে উপর বর্ম্মার ভামো যাইতে হইবে, তৎক্ষণাৎ তিনি কলিকাতায় পত্র লিখিয়া পত্নীকে তাহা জানাইলেন, ভামো পৌছিয়াও সংবাদ পাঠাইলেন, বসন্তবালা কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, সেদিন তিনি পতির পত্রে অবগত হইলেন যে, তাঁহার একটী ভৃত্য মিলিয়াছে সে তাঁহাকে বেশ শ্রদ্ধাভক্তি ও যত্ন করে তখন তাঁহার মনে অনেকটা আহ্লাদ জন্মিল। ভামোয় থাকিয়া গৌরীকান্ত নিয়মিত সময়ে আপিশ যান, আপিশের কাজকর্ম্ম সারিয়া বাসায় আসেন, আদর যত্নও আহারাদির কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, কিন্তু বসন্তবালার অভাব মিটে না—সে এক আদর, সে এক যত্ন, সে এক ভালবাসা—সে সকলের প্রতিনিধি বা নকল আছে, কিন্তু আসল নাই—সুতরাং সে অভাব কিছুতেই মিটিল না; কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটু

দোষ নাই—দোষ অবস্থার—অবস্থা সকলই আপনার অনুযায়ী করিয়া লয়, গৌরীকান্তকেও সেইরূপ করিয়া লইল। কিন্তু অতীতের স্মৃতি বড়ই নিষ্ঠুর, বড়ই মর্ম্মচ্ছেদ; এজন্য সময়ে সময়ে তদ্দ্বারা পীড়া জন্মিত। মনুষ্য যাহা চায় যদি তাহা পায়, তাহা হইলে সংসারে আর দুঃখের নাম থাকিবে কেন ?

কলিকাতায় বসন্তবালার আপিশের খাদ্য প্রস্তুতের তাড়া নাই—সংসারের কাজ-কর্ম্মও কমিয়া গিয়াছে—যাহা কিছু আছে তাহাও তাঁহাকে করিতে হয় না—শর্ব্বরী আছে সেই সব করে, তাঁহার আছে কেবল আহার ও অনুধ্যান। বসন্তের অবস্থার অস্থি ভেদিনী যাতনা, একটু একটু করিয়া সহ্য পাইতে লাগিল কিন্তু স্মৃতি সর্ব্বদাই সন্তাপ দিতে ছাড়িল না। বৈকালে তাঁহার মনে হইত—"এমন সময় তিনি আপিশ হইতে আসিতেন, পা—হাত মুখ মুছাইয়া আসন পাতিয়া বসাইতাম, লুচি পরটা কচুরী হালুয়া যেদিন যাহা বলিতেন, প্রস্তুত করিয়া দিতাম, তিনি আহার করিতেন, আমি মুখটী পানে চাহিয়া যেন স্বর্গের সুখ ভোগ করিতাম—সেখানে তাঁহাকে কে তেমন করিয়া খাওয়াইতেছে। ভালবাসা আদর যত্ন অর্থে বিকায় না—অর্থের সঙ্গে চাকরের সম্বন্ধ—অর্থ না পাইলে সে অন্য প্রভুর সেবা করে। অর্থ দিয়া সব জিনিষই কেনা যায়—কিনিলে তাহা আপনার হয়,—হয় না কেবল মানুষের মন—অনুরাগ যে কিসে জন্মে, কে জানে—অর্থে নয়, কথায় নয়, যে অর্থের দাস সে অনুরাগী নয়—অন্ততঃ আমারত আপাততঃ এইরূপই মনে হইতেছে।"

এইরূপে দিনের পর দিন যায়—ছয় মাস কাটিয়া গেল—ভামো হইতে স্বামী লিখিয়া পাঠাইলেন—যদিও আমার আহারাদির কোন কষ্ট নাই, জলবায়ুও নিতান্ত মন্দ নহে, আপিশে যাই কাজ কর্ম্ম করি, বাসায় আসিয়া খাইদাই ঘুমাই, কিন্তু তথাপি কিছুতে যেন শান্তি নাই—সর্ব্বদাই মনে হয় কি যেন নাই, তাই মনে করিতেছি শীঘ্রই তোমাকে এখানে আনিব, সঙ্গে আসিবে শর্ব্বরী কিন্তু দুটী স্ত্রীলোক জলপথে কেমন করিয়া আসিবে, ইহাই ভাবনার বিষয় একজন পুরুষ ব্যতীত আনা চলে না; আপনি যে গিয়া আনিব তাহারও সুযোগ নাই, এখান আপিশের নূতন পত্তন হইতেছে ছুটী মিলিবে না, চাহিয়া দেখি নাই বটে, কিন্তু বুঝিতেছি তাহা মিলিবার নহে, তবে উপরওলাকে বৃথা উত্যক্ত করায় কাজ কি—যদি তোমার দাদা কিছু দিনের জন্য ছুটী পান তোমাদের দুজনকে সঙ্গে আনিয়া রাখিয়া যান তবেই তোমাদিগকে এখানে আনা হয়—

আমি গিয়া সেখান হইতে তোমাদিগকে লইয়া আসিতে পারি। তোমার দাদাও ত কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিয়াছেন, মনে করিলেই তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিতে পার।"

পত্র পড়িয়া যেন বসন্তের মনে একটা নূতন সুখ জন্মিল,—এরূপ সুখ জীবনে কখন ঘটে নাই, তিনি সেই দিন তাঁহার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা জানাইলেন, বধূকে অনুরোধ করিলেন, মাকে শুনাইলেন, এত উদ্যোগ অনুষ্ঠানে তাঁহার দাদা অমত করিতে পারিলেন না—সম্মত হইলেন। কিন্তু মনিবালী কাজ—ছুটী মিলিলে যাইতে পারিবেন বলিয়াদিলেন। যথাকালে গৌরীকান্তের নিকট বসন্তর পত্র পৌছিল, তিনিও লিখিয়া পাঠাইলেন—আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে রেঙ্গুনে গিয়া তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব, পাথেয় পাঠাইবার কোন কথাই নাই - কারণ তাঁহার হাতে কেবল মাসিক ৫০টী টাকা খরচ বাদে সমস্ত টাকাই বসন্তকে পাঠাইয়া দিতেন। কখন তিনি পত্নীর নিকট টাকার হিসাব লইতেন না, খরচ বাদে কত জমে তাহাও শুনিতে চাহিতেন না।

তিন সপ্তাহ পরে গৌরীকান্ত সংবাদ পাইলেন—বসন্ত, শর্ব্বরী ও তাহার পুত্রটীকে লইয়া বসন্তর দাদা রেঙ্গুন পর্য্যন্ত আসিবেন, এই সংবাদ পাইয়া গৌরী সাহেবকে সপ্তাহের বিদায় প্রার্থনা করিবামাত্র তাহা মঞ্জুর হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি রেঙ্গুন যাত্রা করিলেন।

(৪)

যে দিন কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনে ষ্টীমার পৌছিবার কথা ঠিক তাহার পূর্ব্ব দিন বৈকালে গৌরীকান্ত রেঙ্গুন পৌছিলেন, তিনি স্বয়ং আসিয়া ষ্টীমার হইতে তাঁহার শ্যালক করুণানিধান ও তাঁহার পত্নী বসন্তবালাকে নামাইবার কথা লিখিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং রেঙ্গুনে পৌছিয়া কোথায় থাকিবেন সে কথা করুণা নিধান বসন্ত বা শর্ব্বরী কেহই জানিতেন না।

রেঙ্গুন সহর ঐরাবতী নদীর মোহনার উপর অবস্থিত—সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী নহে—রেঙ্গুনের ঘরবাড়ী সমস্তই কাঠের—ইংরেজ নিম্নবর্ম্মা অধিকার করিবার পর হইতে তথায় দুএকখানি করিয়া পাকা বাড়ী প্রস্তুত হইয়া সহরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছে। গৌরীকান্ত যে বাড়ীতে আসিয়া বাসা লইলেন সেটী একটী হিন্দুর হোটেল। বাড়িটি ত্রিতল—সকলের উপর তলায় তিনি একটি ঘর পাইলেন, রাত্রিতে তাহাতেই রহিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল তাঁহার

করিয়া শয্যা লইলেন, গঙ্গাবিষণ পা টিপিতে লাগিল, পথশ্রমে শীঘ্রই নিদ্রা আসিবার কথা—কিন্তু ঠাঁইনাড়া প্রযুক্ত যতশীঘ্র চোখে নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা তত শীঘ্র আসিল না—বিশেষতঃ দোতলায় আপিশারদের একটী মেশ চারি পাঁচ খানি ঘরে দশ বারটী আপিশার বাস করেন তাঁহারা তাশ খেলিতেছিলেন, কেহ পড়িতেছিলেন, কেহ হারমোনিয়মে সুর লাগাইয়া গান গাহিতেছিলেন, কেহ বা খোস গল্প করিয়া মাঝে মাঝে হাসির হর্‌রা তুলিতেছিলেন, তাহাতে গৌরী কান্তের নিদ্রার বাধা জন্মিতেছিল. ভৃত্য বলিল—"বাবু পাখা করিব?"

বাবু বলিলেন,—"না গঙ্গা, বেশত হাওয়া বহিতেছে. আজ ভাল ঘুম হ'বে না, যেখানে দিন দিন ঘুমান যায়, সেখান হ'তে অন্য জায়গায় গেলে তেমন ঘুম হয় না,—বিশেষ নীচের বাবুরা না ঘুমাইলে আমার চোখে ঘুম আসবে না।"

ক্রমে মেশের বাবুরা আহার করিয়া শয়ন করিলেন,—নিশার প্রাধান্যে প্রায় সকলেই ঘুমাইলেন, বাড়িটি নীরব হইল। গৌরীর চোখ দুটীও মুদিয়া আসিল। কিন্তু হঠাৎ রোদনধ্বনি তাহার শ্রুতি স্পর্শ করিল, গৌরীকান্ত তন্দ্রায় ছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। বাঙ্গালী স্ত্রী লোকের কণ্ঠধ্বনি। দোতলার বাবুরাও কেহ কেহ জিজ্ঞাসিয়া নিম্নতল হইতে উত্তর পাইলেন—"একটী বাঙ্গালী বাবু সস্ত্রীক কলিকাতা যাইবার জন্য আসিয়া পাশের বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন—একটী বায় মাত্র ভেদ হওয়ায় স্ত্রীলোকটীর নাড়ী ছাড়িয়া যায়, ডাক্তার আনিবারও বিলম্ব সহিল না, মারা গেল।

শুনিবামাত্র কেহ দুঃখ করিল—কেহ বলিল,—"সকলেরি ঐগতি, তবে দুদিন আগে, আর দুদিন পিছে—তার জন্য আর দুঃখ কি—"ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে।"

আবার কেহ বলিল,—"তাতো বটেই, কিন্তু শুনলেই মনটা কেমন বিগড়ে যায়, স্থির হ'তে পারে না, সংসারে আসা যাওয়া নিত্য ঘটনা—এটা জানিয়াওতো মানুষ সংসার ত্যাগ কত্তে পারে না।"

এইরূপ নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল। যে কান্না তাঁহাদের কাণে পৌঁছিল তাহা পাঁচে মিলিয়া নহে—একটী মাত্র স্ত্রীলোকের—সে আর কতক্ষণ কাঁদিবে, শীঘ্রই আবার রাত্রির নীরবতা যেমন ছিল তেমনি হইল, আর শাড়া শব্দ রহিল না।

কান্না শুনিয়া কিন্তু গৌরীকান্তের চোখে নিদ্রার আধিপত্য কমিল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সংসারের এরূপ বাঁধন সহজ ছেদ করিবার মতে ইহার জন্য

সৃষ্টির আরম্ভ অবধি কত মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে—হইতেছে, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিতেছে না, কখন পারিবে বলিয়া ত মনে হয় না। জন্ম মৃত্যু পরকাল এই তিনটীর দোরে যে তালা বন্ধ রহিয়াছে তাহা খুলিয়া দেখিবার শক্তি কাহার নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কখন তন্দ্রা, কখন অনিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল—সুষুপ্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

(৫)

আকাশে সূর্য্য উঠিল—মনুষ্য জাগিল, পাখী ডাকিল। প্রাতের বাতাস বহিল, ধীরে ধীরে গাছের পাতা কাঁপিল, সমুদ্রে তরঙ্গ ছুটিল—গৌরী প্রাতঃসন্ধ্যা সারিয়া ষ্টীমার ঘাটে গমন করিলেন, সেখানে গিয়া শুনিলেন পূর্ব্বদিন বৈকালে কলিকাতার ষ্টীমার আসিয়া পৌছিয়াছে। জাহাজে মাঝি মাল্লা বই আর কেহ নাই, কাপ্তেন সাহেব সহরে বেড়াইতে গিয়াছেন। গৌরী তাঁহার আত্মীয়দের কাহার কোন সন্ধান পাইলেন না, মনটা কেমন হইয়া গেল। সেখান হইতে বাসায় ফিরিলেন, বাম চক্ষু ঘন ঘন নাচিতে লাগিল—সংসার যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হইতে লাগিল। পথিমধ্যে একটী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি আপনাকে বড় বিপন্ন বলিয়া জানাইলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া গৌরীকান্তের মনে একটু সন্দেহ জন্মিল। তিনি তাঁহার শ্যালককে চিনিতেন না—যখন তাঁহার বিবাহ হয় তখন তিনি বিদেশে ছিলেন, আজি কালি অনেকের এরূপ অচেনা আত্মীয় আছেন, হয়ত তাঁহাদের চিরজীবনই এইরূপে থাকিয়া যাইবে। গৌরী ভদ্রলোকটীকে দেখিয়া বলিলেন, "মহাশয় সংসার হইতে যদি "আমার" শব্দটা না থাকিত তাহা হইলে সকল গোলই মিটিয়া যাইত, সম্প্রতি আমারও এক বিপদ উপস্থিত—যাহাই হউক আপনার কি বিপদ অগ্রে বলুন, তবে আমার কথা আপনাকে বলিবার হয় বলিব।

ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"মহাশয় আমি আমার ভগ্নীকে লইয়া কলিকাতা হইতে আসিতেছিলাম,—ভগ্নীপতি ভামোয় থাকেন, তাঁহার আজি আসিয়া পৌছিবার কথা, কিন্তু গত রাত্রিতে বিসুচীকা রোগে আমার ভগ্নী প্রাণ হারাইয়াছেন। সংকার করিবার লোক পাইতেছি না।"

গৌরী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন—আর বলিলেন—"এতদিনে সংসারের সহিত "আমার" সম্বন্ধ ঘুচিল। গত রাত্রিতে যাহাকে পর মনে হওয়ায় আমার দীর্ঘ নিশ্বাস বহে নাই, তাহাকে আজি আমার জানিয়া অস্থির হইতে

গীত।

লেখক,—কবিবর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস রায়।

কি ছিল কি দেখি এখন নদীয়ায়।
দুঃখ ক'ব কায়, বুক ফেটে যায়, ভেবে পাইনে দিশে
শেষে বুঝি দেশে থাকা হ'ল দায়॥
ছিল আদি বাসেন্দা যত, ক্রমে সব হ'ল গত, থিরলে আসি বিদেশীতে সমুদয়।
আকার যে প্রকার, হ'ল একাকার, ভয়ে হাহাকার রব সবাকার,
শবাকারে দেহ প্রায়॥
উঠে গেল সদাচার, সদাই ঘোর কদাচার, আচার ভ্রষ্ট, প্রচার,
তা আর নাই কোথায়।
জাতি ভেদের নাই বিচার, অর্থ পেলেই একাকার,
কেবা কার খোজ করে আর সর্ব্বদায়॥
পয়সা পেলেই হয়, ধনী মামায় জয়, ল'য়ে লুচির ধামা
মামার ঘরে তৃপ্তি দেন রসনায়।
বুনেদি সব অবসন্ন, আধুনিক প্রতিপন্ন, দেখে শুনে ক্ষুণ্ণ মনে রই সদায়॥
বিপদ হেরি ঘোর আপন্ন, উদ্ধারিবে কে আর অন্য,
মা পোড়া মা ভিন্ন আর নাই উপায়।
ভেবে পাইনে কূল পরাণ ব্যাকুল, এখন অকূলে কূল পাই
যদিকুল কুণ্ডলিনী রাখেন পায়॥
দিলেন যদি দুই একটী পাস, পথে যেতে না দেন পাশ,
অসভ্যের ঘেঁস লাগ্‌বে ব'লে অম্‌নি তারা চোখ ঘুরায়।
সদাই মনের উদ্‌বেগে, উর্দ্ধনেত্রে চলেন বেগে, মানুষ জ্ঞানে মানুষ পানে নাহি চায়॥
ব'ল্‌ব আর কি, এসব হ'ল কি, আছে আর কি শেষ কে ক'র্‌বে নিকেশ,
এই দুঃখের খাতায় বাকী যায়॥
বাস করি কি ক'রি বাসে যাইবা চ'লে কোন প্রবাসে,
ইঁটের পাঁজা বাপের ভিটে দিয়ে কায়।
কালক্রমে দেকদারি, বাজারেতে ভেকধারী
দরকারি তরকারি কেনা হ'ল দায়॥
হইলে প্রভাত, খাব চচ্চড়ি ভাত,
বিধি তাতে ও যদি প্রতিবাদী কি ফল আর এ প্রাণ রাখায়॥

কপালে দুঃখ আগাগোড়া, ফোড়ার উপর বিষ ফোড়া,
খোঁড়ার পা যে খালে পড়ে হায় হায়।
কপালের ভোগ, নিত্য পোষা ঘরে রোগ, ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌ছে লোক সমুদায়॥
দে'খে ঔষধের বিল, বুকে লাগে খিল্‌, এখন ভিজিট ছাড়া গাড়ী ভাড়া
তার উপরে হয় আদায়॥
ব'ল্‌তে গেলে বাড়ে দুঃখ, রসনায় না সরে বাক্য, ঐক্য নাই আর
পরস্পরের কোন কথায়।
কেঁদে কয় হরিপ্রসন্ন, যে বিপদ দেখি আসন্ন, হরি প্রসন্ন যদি হন্‌ এ অভাগায়,
তবে যায় কান্না, করি ঘর কন্না, নইলে সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল
মানে মানে হই বিদায়॥

রসাভাষ।

লেখক— শ্রীযুক্ত পরিহাস রসিক রায়।

১। পিতা মূর্খ—নিরক্ষর শিশুপুত্র নিকটে বসিয়া লিখিতে লিখিতে পিতাকে জিজ্ঞাসিল—"বাবা, কলিদাস লিখিতে কটা "ম" চাই?"

পিতা উত্তর করিল—"বাবা আপাতক তিনটা লিখিয়া খানিক ফাঁক রাখ, গুরু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করবে যদি বেশী লাগে ফাঁক জায়গাটায় বসিয়ে দিবে।

২। এক পণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এক গুরু মহাশয় থাকেন, ব্রাহ্মণের শিষ্য যজমান অনেক—তাহাদিগকে পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইলে গুরু মহাশয়ই লিখিয়া থাকেন, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুমতি এবং উপদেশ শুনিতে হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক শিষ্যকে পত্র লিখিবার জন্ত গুরু মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন—"শিষ্যকে কি পাঠ লেখা যায়?"

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন—"কি জা'ত? ব্রাহ্মণ না শূদ্র?"

গুরু। শূদ্র।

ভট্টা। একে শূদ্র তায় শিষ্য তা'কে আপর পাঠ আর কি লিখিবে—লেখ সেবক শ্রী রামতারণ শর্ম্মা (ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম রামতারণ)।

৩। কলুর পুত্র ঘানি গাছে ঘোরে, আর অপন মনে ঘুরিতে ঘুরিতে গান করে। কলু পুত্রের গানে বড় মুগ্ধ, পুত্রের কণ্ঠস্বর কোকিলের অপেক্ষা তাহার কানে সুমিষ্ট লাগে। কথাগুলি যেন অমিয় মাখা। কলু গ্রামের জমিদার বাড়িতে তেল যোগায়—তেলের হিসাব করিতে গিয়া কলু পুত্রের গীতের সুখ্যাতি করে—বলে, "কর্ত্তা মশায় ছেলের এমনি মধুর গলা যে, আমাদের বাড়ীর চতুঃসীমায় কোকিল লজ্জায় ডাকে না, আমার বাড়ীর কাছে একটা বটগাছ আছে, তার ফল খেতে কত কোকিল আসে, ফল খায় চলে যায়, লজ্জায় ডাকে না।" বারবারই কলু এই কথা বলে, জমিদার তৈলকারপুত্রের গীত শুনিবার জন্য লোলুপ হইলেন, একদিন কলুকে বলিলেন—"বেশ তোমার ছেলেকে সঙ্গে আন্‌বে, আমি তার গান শুনবো।"

কলু আহ্লাদে আটখানা হইয়া বাড়ী আসিয়া তাহার পুত্রকে বলিল— "বাবা তোমাকে জমীদার বাড়ী গান শুনাতে যেতে হবে।"

পুত্র বলিল,—"আচ্ছা যাবো" জমীদার দিন ধার্য্য করিয়া দিলেন, ধার্য্য দিনে কলু পুত্রকে লইয়া জমীদার বাড়ীতে উপস্থিত, জমীদার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিয়াছেন। সভার শোভা দেখিয়া তৈলকারপুত্রের গলা শুকাইয়া গেল।

জমীদার গান করিবার আজ্ঞা দিলেন, কলুর পুত্র বলিল, "কোথায় বসিয়া গাইব?" জমিদার বলিলেন,—"যেখানে বসিয়া আছ সেইখানেই বসিয়া গাইবে, যদি কৌচ কেদারার দরকার হয়, তাহাও পাইতে পার।"

তৈলকার পুত্র উত্তর করিল— সে সকলের কিছু চাই না, একটা ঘানি গাছ চাই, আর আমাদের বাড়ীর বলদ জোড়াটী চাই, তা হলে সমস্ত রাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান শুনাইব।

জমিদার— দুর—দুর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

৪। কৃপণব্রাহ্মণ কন্যার বাড়ী গিয়া পাঁচ দিনের পর বাড়ী আসিয়া দেখেন—বাড়ীতে পাঁচটী কুটুম্ব উপস্থিত, কৃপণ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের অভ্যর্থনার পর স্নান করিবার জন্য পুষ্করিণীতে যাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া এক প্রতিবাসী জিজ্ঞাসিল,—"দাদা ঠাকুর কবে এলেন?"

দাদা ঠাকুর উত্তর করিলেন—কোথায় গেছি? ঘরেই আছি।

প্রতি। আপনার পুত্রের মুখে শুনেছিলাম, আপনি না ...

ছিলেন।

ব্রাহ্মণ। কথা মিথ্যা নয়—কন্যার বাড়ী গিয়াছিলাম সেখানে পাঁচদিন অবস্থিতও হয়েছিল কিন্তু বাড়ী এসে দেখি পাঁচটী কুটুম্ব উপস্থিত—তাই বল্‌ছিলাম কোথায় গেছি, ঘরেই আছি।

৫। ঠাকুর মহাশয় মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যস্থলে শিখাটী মাত্র রাখিয়া শিষ্যালয়ে গিয়াছেন। শিষ্য দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল—"ঠাকুর মহাশয় আস্‌চেন না যাচ্চেন?

৬। কমল ও বিশ্বনাথ সম্পর্কে খুড়া ভাইপো, বিশ্বনাথ খুড়া এবং কমল ভাইপো। উভয়েই পাগল— তবে অল্প আর অধিক। কমল প্রাতঃকাল হইতে বাগানে বাগানে ঘুরিয়া ফুল তোলে. ফল পাড়ে, সংগ্রহ করিয়া দেবালয়ে দেব দেবীপদে দিয়া বেড়ায়, বিগ্রহের সহিত কথাবার্ত্তা কহে, এই মাত্র তাহার পাগ্‌লামি আর বিশ্বনাথ উন্মাদ হইয়া পথেরধারে, বসিয়া মল মূত্র গাত্রে লেপন করে যাহাকে দেখে তাহাকেই দুর্ব্বাক্য বলে, কামড়াইতে যায়, এক দিন বিশ্বনাথ তদবস্থায় রাস্তার ধারে বসিয়া পূর্ব্ববৎ পাগলামী করিতেছে এমন সময় কমল ফল পুষ্প হস্তে ঠাকুর বাড়ী আসিতেছে দেখিয়া বিশ্বনাথ তাহাকে জিজ্ঞাসিল— "হাঁরে কমল তুই নাকি খেপেছিস ?"

কমল উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

অদ্ভুত আবিষ্কার।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্যারিসের পাস্তুর চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মেট্‌নিকফ্‌ই শীর্ষস্থানীয়। এই মহাপুরুষের যশঃ গৌরবে আজ সমগ্র পৃথিবী আমোদিত। ইনি জীবদেহে আধি ব্যাধির উৎপত্তি সম্বন্ধে নব নব সত্য তথা সকল আবিষ্কৃত করিয়া জগদ্বাসীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহার দুই একটী আবিষ্কারের কথা বলিব।

মনুষ্য জীবন শত্রু সঙ্কুল। প্রতিপাদ বিক্ষেপে জীবন নাশের সম্ভাবনা। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, অগ্নুৎপাত, সর্পভয়, শ্বাপদভয়, রেলঘর্ষ প্রভৃতি জীবনের যে কত শত্রু আছে তাহা আর কি বলিব ইহা ছাড়া বিভিন্ন রোগ বীজাণুগণ

চতুর্দ্দিকে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক আমাদের দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া প্রাণটি বহিষ্কৃত করিবার জন্য অবিরত যুদ্ধ করিতেছে; জলে কলেরা, টাইফয়েডের বীজাণু বাস করে; দুগ্ধে যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশের বীজাণু থাকে; রাজপথে ধনুষ্টংকারের বীজ ধূলিমলের মধ্যে অবস্থিত, অসূর্য্যম্পশ্চ গৃহ প্লেগ বীজাণুর লীলা ক্ষেত্র। এতদ্ভিন্ন বায়ুমণ্ডলে কত কোটি কোটি চক্ষুর অগোচর রোগ বীজাণু সর্ব্বক্ষণ ভাসমান রহিয়াছে কে তাহার সংখ্যা করে? আমরা যে জলটুকু পান করি, তৎসঙ্গে শত শত জলবায়ুর ব্যাধি বীজ প্রতিদিন দেহে প্রবিষ্ট হইতেছে; যে বায়ু নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হয় তন্মধ্যেও সূক্ষ্মাকারে অসংখ্য বীজাণু বর্ত্তমান আছে। শরীরে সামান্য একটু ক্ষত হইলে অমনি বায়ুর বীজাণু সংযোগে উহা বিকৃত হইয়া পড়িতে পারে, ইহার উপরে আবার মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র জীবগণ নানা দিগ্ দেশ হইতে বীজাণুপুঞ্জ বহন করিয়া সর্ব্বদাই আমাদের খাদ্যে দূষিত করিতেছে। গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, একটী মক্ষিকা ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ হইতে ৬৬০০০০০ ছয়ষট্টি লক্ষ রোগ বীজাণু বহন করিতে পারে। সুতরাং মানবের নিস্তার কোথায়? আমাদের স্থলে ব্যাঘ্র ও জলে কুম্ভীর। এইরূপ সঙ্কট সঙ্কুল স্থানে বাস করিয়া সম্মুখ সমরে ব্যাধি বীজাণুরূপ শত্রুকে দমন করিতে না পারিলে আমাদের এই দেহ দুর্গ রক্ষা হয় না। সভ্যতা লোকদীপ্ত স্থানের লোকেরা অধুনা এই বীজাণুর ভয়ে এতাদৃশ ভীত যে, তাহাদের মধ্যে "বীজাণু বায়ু" নামে এক প্রকার অভিনব ব্যাধি দেখা দিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিস সহরে এক বীজাণু বায়ুগ্রস্তা বিদুষীবালা প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া একটী সুবৃহৎ বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছেন ঐ ভবনে তিনি বসতি করেন। বিবিধ প্রক্রিয়াদ্বারা যে বায়ু বীজাণুশূন্য করা হইয়াছে, তাহাই ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। খাদ্য পানীয়াদি ও সম্যক্ বীজাণুশূন্য না করিয়া ঐ রমণী গ্রহণ করেন না। তিনি যে স্থানে বিচরণ করেন, তৎস্থান ও বীজাণু রহিত। বোধ হয় এই সভ্যা শ্বেতাঙ্গী "হনুমান—বিভীষণের" ন্যায় অমরত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন।

আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ সেই শত্রুব্যূহ দ্বারা অবরুদ্ধ। জল, বায়ু ও খাদ্যাদির সহিত অসংখ্য অনুদেহী শত্রু অনুক্ষণ আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে, এই শত্রুগণ বহুরূপী ইহাদেরআকার এত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যে, কোন কোনটির দৈহিক পারিমাণ ১৫০০০০ইঞ্চি অপেক্ষাও কম। কিন্তু অনুদেহী হইলেও ইহাদের শক্তি কম নহে—

ইহারা মত্তমাতঙ্গ অপেক্ষাও বোধ হয় বলশালী। ভারতের সুবিখ্যাত পালোয়ান্ গোলামের যখন ওলাউঠা হয়, তখন কয়েকবার মাত্র ভেদের পর তিনি এতাদৃশ অবসন্ন হইয়া পড়েন যে, হস্তোত্তলন করিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে পারেন নাই। তৎকালে সেইমুমূর্ষ বীরবর ক্ষোভে কম্পিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "হায়, রোগের কি অসীম শক্তি। এক দিন যে হস্ত দ্বারা আমি অবলীলাক্রমে উপলখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াছি, আজ এই মহা প্রয়াণ দিনে, সেই হস্ত এতদূর হীনবল হইয়াছে যে আমার প্রাণ প্রতিম পুত্রকে সে একবার শেষ আলিঙ্গন করিতে পারিল না।" এড়িয়াদহ নিবাসী মদীয় জনৈক বন্ধু মুষ্ট্যাঘাতে ঝুনা নারিকেল ভগ্ন করিতে পারিতেন। তাঁহার ন্যায় দৈহিক বল বাঙ্গালীর মধ্যে অল্প লোকেরই আছে। একদা বন্ধুবর জ্বরাতিসারে আক্রান্ত হইলে আমি চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম। মিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দুই দিনের জ্বরেই তিনি উত্থান শক্তি রহিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া মূত্র পুরীষাদি পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া আমি সবিস্ময়ে বলিয়াছিলাম,—"কিহে, দুই দিনের অসুখে এত কাতর হইয়াছ! আমাদের ন্যায় অসুস্থদেহীরা ত প্রতি মাসে দুই একবার এরূপ মুক্তকচ্ছ হইয়া থাকে।" তদুত্তরে, সহাস্য আস্যে বন্ধু বলিলেন,—"ভায়া, এক মুষ্ঠাঘাতে কোন এক পালোয়ানের উরুভঙ্গ করিয়াছিলাম কিন্তু দুরন্ত রোগ আমার মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়াছে।" তাই বলিতেছিলাম, রোগ বীজাণুর শক্তি অসীম। ইহারা মনে করিলে নিমেষ কাল মধ্যে কত মহাবীরকে পতিত করিতে পারে। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের দুরবস্থা বিবেচনা করিয়াই প্রাগুক্ত মহাশত্রুর উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এক সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব দেহে রোগ বীজাণু সর্ব্বদাই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদের প্রাণ বিনাশোপযোগী বলসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু কৈ আমরা ত সকল সময় পীড়িত হই না; এই শত্রুর আক্রমণ হইতে কে আমাদের রক্ষা করে? আমাদের রক্তস্থ শ্বেতকণিকাই আমাদের রক্ষক এবং ইহারাই ঐ সমস্ত রোগ বীজাণুর ভক্ষক। মনুষ্যরক্ত মোটামুটি ত্রিবিধ সামগ্রীর সমবায়ে প্রস্তুত। রক্তের তরল পদার্থকে রক্তরস বা Serum বলে। ঐ রক্তরসের মধ্যে শ্বেত লোহিত দুই প্রকারের কণিকা আছে। ঐ কণিকাগুলি এতাদৃশ সূক্ষ্ম যে, চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা উহাদিগকে দেখা যায় না। চক্ষুরঃচক্ষু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা আমরা উহাদিগকে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই। সুস্থ রক্তে শ্বেত কণিকা অপেক্ষা লোহিত কণিকার সংখ্যা

প্রায় ৩৭০ গুণ অধিক। এক সূচ্যগ্র বিন্দু মনুষ্যরক্তে ৫০ লক্ষ লোহিত কণিকা ও প্রায় ১৫ সহস্র শ্বেত কণিকা থাকিতে পারে। রোগ বীজাণু রক্তে প্রবেশ করিলেই চতুর্দ্দিক হইতে পঙ্গপালের ন্যায় রক্তস্থ শ্বেত কণিকা দল আসিয়া উহাদিগকে সমরসায়ী করে এবং একে একে তাহাদের ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আমাদের শরীরে রোগ বীজাণুর সহিত শ্বেত কণিকার এই সংগ্রাম অবিরাম চলিতেছে। জনাকীর্ণ স্থানে বাস, দুশ্চিন্তা, কদাহার, অত্যন্ত পরিশ্রম, শীতাতপ সেবন প্রভৃতি যে কোন কারণে রক্তের শ্বেত কণিকা গুলির অরুচি রোগ জন্মিলে আমাদের আর রক্ষা নাই। তখন রোগ-বীজাণু সকল নির্ব্বিঘ্নে বংশবৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে পীড়িত করিয়া ফেলে। যতক্ষণ আমাদের রক্তে শ্বেত কণিকা সতেজ থাকে, ততক্ষণ আমরা নিরাপদ থাকিতে পারি—তখন রোগ-বীজাণু দেহ প্রবিষ্ট হইলেও রোগানয়ন করিতে পারে না। শ্বেতকণিকার সহিত রোগ-বীজাণুর যে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ আছে, এই রহস্য সর্ব্বপ্রথমে মেচ্‌নিকফ্‌ই আবিষ্কার করেন। অধুনা সকলেই অণুবীক্ষণের সাহায্যে মানব দেহ রূপ রণক্ষেত্রে শ্বেতকণিকার সহিত রোগ-বীজাণুর সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতেছেন।

এই প্রবন্ধে উক্ত মহাত্মার আর এক আবিষ্কারের কথা বলিতেছি। এতকাল জরাকে বয়োধর্ম্ম বলিয়াই লোকে ধারণা করিত। কিন্তু মেচ্‌নিকফ্‌ বলেন, উহাও এক প্রকার জীবাণুঘটিত ব্যাধি। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই জরাব্যাধির আক্রমন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্থির যৌবনে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন। পূর্ব্বকালে কেহ এইরূপ কোন নূতন কথা বলিলে লোকে তাহাকে পাগল বলিত। তাহার কথা লইয়া চতুর্দ্দিকে হাস্যের কোলাহল পড়িয়া যাইত। এক সময় ইংলাণ্ডে যোনাথান্ হল্ নামক এক ব্যক্তি কলের নৌকা চালাইবে বলিয়া প্রকাশ করায় দেশবাসী তাহার নামে গীত বাঁধিয়া গাহিয়াছিল :

Jonathan Hull, with his paper skull,
Tried hard to make a machine,
That sho..d go against wind and tide,
But he, like an ass could; bring it to pass,
So at last was ashamed to be seen*.

অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকগণ নিরন্তর গবেষণা দ্বারা আজ নানা বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতেছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্য সকলেরই নিকট সমাদৃত। মেচ্‌নিকফ্‌ পরীক্ষাদ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের অন্ত্রমধ্যে নানা জীবের বসতি আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল জীবাণু দল পুষ্ট হয়। তখন তাহাদের গাত্র নিঃসৃত রস সমস্ত মানব দেহে ব্যাপ্ত হইয়া বার্দ্ধক্য আনয়ন করে। একদা মেচ্‌নিকফ্‌ ঐ বিষময় রস সূক্ষ্মাগ্র পিচকারি দ্বারা এক বাঁদরের শরীরে প্রবিষ্ট করেন। দেখিতে দেখিতে জরার তাড়নায় কপিরাজের পৃষ্ঠভগ্ন, কটিনম্র ও দেহরুগ্ন হইয়া পড়িল। তাহার লোমরাজিও শুভ্রবর্ণ ধারণ করিতে বিলম্ব করিল না। মোটকথা মৃত্যুরাজ আগমন করিবেন বলিয়া শ্বেত চামরধারী জরাদূত অগ্রেই আসিয়া মর্কটদেহে সমাগত হইল।

মেচ্‌নিককের মতে বার্দ্ধক্যরোগের জীবাণুপুঞ্জ ল্যাক্‌টিক্‌ এসিড নামক দ্রব্যদ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু উক্ত ঔষধ সেবনে কোন ফলোদয় হয় না। কারণ উহা পাকস্থলিতেই রহিয়া যায়। ঔষধ অন্ত্রপ্রবিষ্ট না হইলে অন্ত্রস্থ জীবাণুগুলির বিনাশ সাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিত্য দধি ভোজন করিলে বার্দ্ধক্য জীবাণু ধ্বংস হইতে পারে। বুল-গেরিয়া প্রদেশবাসীগণ প্রতিদিন খাদ্যরূপে দধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইজন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা তাহারা কর্ম্মপটু ও দীর্ঘজীবী। দধি মধ্যস্থ দধিবীজ (Streptothrix Dadhi) অন্ত্রে ল্যাক্‌টিক্‌ এসিড উৎপাদন করিয়া অন্ত্রবাসী জীবসমূহকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এক সময় দধি আমাদেরও নিত্য ভোজ্য ছিল। এখন কালধর্ম্মে আমরা গব্যরসে বঞ্চিত হইয়াছি। পাঠক! জরার আক্রমন হইতে যদি আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে—যদি সুস্থ, সমুন্নত দেহ লইয়া শতাতীতজীবী হইতে বাসনা হয়—তবে আবার নিত্য দধি ভোজন কর। বার্দ্ধক্যের সেই শ্বাস-কাশ-কম্পনাদি তোমার গাত্রস্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু যে সকল অতিক্রান্ত যৌবন পুরুষই তো মধ্যে গলিত অঙ্গ, পলিত কেশ হইয়া কম্পিত করে দণ্ড-ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর আশা নাই। আরও কিছুকাল পূর্ব্বে এই সত্য আবিষ্কৃত হইলে আজ অশেষ-ক্লেশ-জননী জরার কবলে পড়িয়া তাঁহাদের অবসন্ন হইতে হইত না।

তাহা দুষ্পাচ্য। এই কারণে কোন কোন ব্যক্তির দধি সহ্য হয় না। তাঁহাদের দধিবীজের এক প্রকার বটিকা প্রস্তুত হইয়াছে (ইহার নাম "Fermen-lactyl") য়ুরোপে এই বটিকার বহুল প্রচলন আছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধালয়েও উহা পাওয়া যায়। এই বটীকা নির্দ্দোষ ও সকলের পক্ষেই উপযোগী। ইহা নিয়মিত ব্যবহার করিলে অন্ত্রস্থ বার্দ্ধক্যজীবাণুর বংশবৃদ্ধি প্রতিরুদ্ধ হইয়া মানবের যৌবন শ্রীঅক্ষুন্ন থাকে।

কীর্ত্তন।

দীন দয়াময় অনাথ শরণ,
রামকৃষ্ণ তব নাম হয় সুধাময়,
পাতকী জনের ত্রাণ তব নামে হয়
ওহে তব নামে হয়।
ভুবন ভরিয়া আজি পাপী তাপী জন
গাইছে তোমার নাম
ভক্তি ভাবে গুণ থাম।
আকিঞ্চনে প্রভু তুমি হও হে সদয়
ওহে হওহে সদয়।
পরম পুরুষ তুমি, ধন্য হে ভারত ভূমি
অবতার রূপে তোমা করিয়ে ধারণ।
সার্থক সার্থক প্রভু হয়েছে এখন।
এমন মধুর নাম না শুনি কখন
কৃপাকর দীনবন্ধু
ওহে করুণার সিন্ধু
অম্বিকাচরণ মাগে তব শ্রীচরণ॥

সমালোচনা।

চন্দ্রজিৎ।—নীতি বিষয়ক নাটক বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত সার বিজয়চন্দ মহাতব্‌ কে, সি, এস, আই, কে, সি, আই, ই, আই ও, এম। সন ১৩২১ সাল। বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত। ইহাতে পুষ্পনগর রাজ্যাধিপতি ক্ষত্রিয়রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ, তৎপুত্র ইন্দ্রজিৎ, পুত্রবধূ সুমতি, ইন্দ্রজিতের শিশুসন্তান ভানুজিৎ। মন্ত্রীদ্বয় ভোলানাথ ও কেশব, ইন্দ্রজিতের প্রিয় গণিকা পান্না, সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পূজারি ভবানী, চন্দ্রজিতের প্রধান প্রিয়

চরিত্র প্রধান, তদতিরিক্ত জনৈক ঘাতক, দর্শকবৃন্দ, জনৈক ব্রাহ্মণ, জনৈক দণ্ডী, ভিখারিগণ, জনৈক যুবক পার্শ্বচরদ্বয় ইত্যাদি। রাজপুত্র ইন্দ্রজিত গণিকাপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহে তাদৃশ মনোযোগী নহেন। রাজমন্ত্রী ভোলানাথ ও কেশব রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। রাজপুত্রের চরিত্রের কথা মন্ত্রীদ্বয় রাজর্ষি চন্দ্রজিতের গোচর করিলে তিনি উত্তর করিলেন,— "বাবাজী যা কচ্চেন তা ভালই করচেন। পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্য, সুকৃতি দুষ্কৃতি কি পিতা মাতার তিরস্কারে যেতে পারে।" "একের পাপের বোঝা অন্যের বহন করা সম্ভবে? মন্ত্রিবর সব বুঝি। যা ঘটেছে, যা ঘটচে যা ঘটবে তা কি জানি না বা দেখ্‌ছি না, বা বুঝ্‌ছি না? ধৈর্য্য অবলম্বন কর, সব ঠিক হবে।" আমরা ঘোর অদৃষ্টবাদী—ঐহিক কার্য্য পরম্পরা যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলানুবর্ত্তী তাহা অবিসম্বাদিত রূপে স্বীকার করি, ইহা এই পুস্তকের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে তাহা গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ আপনার অন্তিম কাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন—"একবার দেখ্‌বার ইচ্ছা হয় যে, ভগবানের ঐশী শক্তির নামে, তামসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণের পরিশোধন ও পরিবর্জ্জন ঘট্‌তে পারে কি না? আমি কল্য প্রত্যূষে গৌরীনগরীতে যাত্রা করবো, কেশব তুমি অদ্যই তথায় যাও এবং সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে রাজকোষ হইতে ভোগাদির যে ব্যবস্থা আছে, তৎ সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি সঙ্গে লইয়া যাইও।

চন্দ্রজিৎ নাটকখানি যে মানস লীলার অংশ বিশেষ আমরা মানস লীলার আলোচনা কালে তাহার আভাস দিয়াছি। রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ আলোচ্য নাটকে মন্ত্রীকে বলিতেছেন,—"আমার নিকট নারীস্তুতি নারীপূজার কথা আর কখনও বলিও না। তোমরা জান আমি আজীবন নারীবৈরি এবং সেই জন্যই আমার মানসলীলার প্রতি আচরণে তোমরা ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়াছিলে এবং এখনও যে তার স্মৃতিটী আমি সজাগ রাখিয়া স্বকার্য্য সাধন করচি তার সূক্ষ্ম মর্ম্ম না বুঝ্‌তে পেরে, আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখে তোমরা দুঃখিত হও। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এক দিনের জন্যও মনে আসে নাই যে চন্দ্রজিৎ এখনও ভঙ্গুর নরদেহে নিবসতি-বাসনা-বিবর্জ্জিত। যাহাতে নারীযোনি দিয়া আর তাঁহাকে আসিতে না হয়, তিনি তাহাতেই দৃঢ়ব্রতী, যাহাতে প্রকৃতিরাণীর সাধনা আর তাঁহাকে

হইতে শীঘ্র পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই অভিনব সাধনা, তাঁর আগুণের সঙ্গে খেলা করা।"

আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না,—কৌতূহলী পাঠক, মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন, কবি কি অপূর্ব্ব কৌশলে শক্তিসাধনার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। দুঃসাধ্য লতাসাধনাদি তান্ত্রিক উপাসনায় যাঁহারা অগ্রগামী তাঁহারা এই সাধনতত্ত্ব অবগত আছেন। শক্তি (স্ত্রী) ব্যতীত এ সাধনা হইবার নহে। এ সাধনা যে আগুণের সঙ্গে খেলা করা তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই, দুর্দ্দম কামকে সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করিয়া তাহার সঙ্গে সাধনা করা আগুণের সঙ্গে খেলা বই আর কি বলা যাইতে পারে,—একটু অসতর্ক হইলে চিরতরে ভস্মীভূত হইবার সম্ভাবনা।

রাজর্ষি শেষ বলিতেছেন—"মহেশ্বরের সহিত মহামায়ার যে সম্বন্ধ সাধন মার্গে চন্দ্রজিতের সহিত মানস লীলার ঠিক সেই সম্বন্ধই।"

"হায় এরা বৈষয়িক হলেও নিঃস্বার্থ ভজনের পূজনের বা নিষ্কাম কর্ম্মের মর্ম্ম কি বুঝিতে আদৌ পারে না?"

এইখানে একটি সুন্দর গীত সংযোজিত হইয়াছে,—

ইমন—আড়াঠেকা।

আমি দিবানিশি ভাবি ভবিতব্য আমারি।
নিরখিয়ে মিথ্যা সব, হৃদে সত্য ভিখারী॥
মনে হয় যাই চলে কর্ত্তব্য কিন্তু গো বলে।
কর্ম্ম ব্রহ্ম, করমই করম ক্ষয়কারী॥

কর্ম্মই যে কর্ম্মক্ষয়কারী ইহা শাস্ত্র বাক্য। কবির বহুবিধ শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে। তিনি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ গৌরীনারীতে উপস্থিত হইয়া পশুবলি বন্ধ করিয়া দিলেন। তদুপলক্ষেও একটী চিত্তোন্মাদী গীত রচিত হইয়াছে।

গৌরী নগরীর গঙ্গাতটে জনৈক দণ্ডী প্রেমোল্লাসে গাহিতেছেন,—

বিভাস্—একতালা।

গঙ্গা বল, সিন্ধুই বল, সাগরে মিশিতে চলে গো।
সুরা বল সুধাই বল, জনমত সেই জলে গো॥
যা কিছু একের অধিক, কোনটাই নহে সঠিক,
মায়া বেটি নিজে বেঠিক, সে বেটিই জলেস্থলে গো॥

দণ্ডী রাজর্ষি চন্দ্রজিতের ইন্দ্রিয় সংযম সধানায় সিদ্ধির কথা তুলিয়া যথেষ্ট

অতঃপর চন্দ্রজিৎ পুত্রকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার বিলাস ভবনে উপস্থিত—পুত্র তথায় বেশ্যা পান্নার বিলাস ভোগে মত্ত! চন্দ্রজিৎ পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সুপথে আনয়ন করিবেন তজ্জন্য তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্রজিতের মনে তখন ধর্ম্মের সুবাতাস বহিয়াছে—তিনি রাজান্তঃপুরে পিতার অনুগামী হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া আপন নবজাত পুত্রের সুকোমল মুখকমল নিরীক্ষণ করিলেন। একদিন বহির্ভ্রমণে বাহির হইয়া রাজপুত্র এক বৃক্ষমূলে এক যুবকের মুখে এই গীতটি শুনিলেন,—

দেওগিরি—ঝাঁপতাল।

ওমা তারা তোর মুখ ফুটেছে পারা।
দেখে পারা, ছেড়ে পাড়া, হয়েছি মা দিশেহারা॥
যখন মুখে মাখ পমেটম, ঝোঁকে নাগর ঝম্ ঝম্।
কি জনারে করে বেদম কর তাদের পাগল পারা॥
যে স্তনে শিশুর প্রাণ রাখ, তাতেই বধ প্রাণ,
মা হ'য়ে রাক্ষসী সমান, ধন্য তারা ধন্য তোরা।
তারা পদে এই মিনতি, যেন ওদ্বারে হয় না গতি॥
ভেবে দুর্গতি, ফিরেছে মতি, সকাতরে তাই ডাকি তারা।

এই যুবক, ইন্দ্রজিতের প্রণয়িনী পান্নার অগ্রজা তারার প্রেমে মজিয়া সর্ব্বস্বান্ত—শেষে প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হইয়া দূরীকৃত—মনস্তাপে সে গীতটী গাহিতেছিল। ইন্দ্রজিৎ বুঝিলেন তিনিই তাহার দুঃখের হেতুভূত। তখন তাঁহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি বেশ্যার প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলেন, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। চন্দ্রজিতেরও আহ্লাদের সীমা রহিল না, তিনি পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৈলাসে মানস সরোবর তীরবর্ত্তী পবিত্র গুহায় দেহত্যাগ করিলেন। রাজ পুত্র ইন্দ্রজিতের পূর্ব্বপাপ জন্য অনুতাপ, চন্দ্রজিতের প্রাণাবসানকালে তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ ও অন্তিম কালে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, চন্দ্রজিতের চিত্র নিখুঁত নিষ্কলঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান লাভে চন্দ্রজিতের নিম্নোক্ত গীতটী বড়ই মধুর, বড়ই চিত্তস্পর্শী ও ভাবেভরা—পাঠকালে মন মাতিয়া উঠে, না জানি স্বরসঙ্গতে শ্রোতার মনে কি অপূর্ব্ব ভাবের ইচ্ছ্বাস উঠিবে।

আলাইয়া—একতালা।

কেবা গুরু কেবা শিষ্য, কেবা বড় কেবা ছোট।

সকাল বিকাল বেলা জোয়ার ভাটার খেলা,
মায়ার মোহন মেলা চল ভাসি যথা তট॥

নাটকের শেষাংশের গীতটীও উদ্ধৃত না করিয়া থাকা যায় না। ইহাতে সংসারে আমাদের আমিত্ব তুমিত্ব, তাহাদের সম্বন্ধ সংশ্রব—মায়ার প্রভাব মায়ামুক্তিতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের জ্ঞান সমস্তই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

দেওগিরি—একতালা।

এখন আমিত্ব, মিশিয়া তুমিত্ব একত্ব হয়েছে সার।
অন্তরে অনন্ত, বাহিরে অনন্ত অনন্তই পর পার॥
নিভেছে বাসনা, মিটেছে কামনা, নাহিক ভাবনা নাহিক যাতনা,
ঘুচেছে বেদনা, এসেছে চেতনা পেয়ে জ্ঞানামৃত তার।
দেহ আছে কিন্তু গেছে তাতে মায়া, জেনেছি সকলি শব্দ আর ছায়া,
আমিত আছত সৎচিদানন্দ, সত্য নিত্য পূর্ণাকার॥

মহারাজাধিরাজের লেখনী সার্থক বিশ্বতত্ত্বালোচনা সার্থক,—জ্ঞান গবেষণা সকলই সার্থক। বিষয় যেরূপ গুরুতর তাহাতে প্রাঞ্জলি৩া রক্ষা বড়ই কঠিন, কিন্তু চিত্রাঙ্কন গুণে ইহা সকলেই সুখবোধ্য হইয়াছে। এবারের সাহিত্য সম্মিলন হইবে বৰ্দ্ধমানে—এখন হইতে চেষ্টা করিলে মানস লীলা ও চন্দ্রজিৎ একাকারে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ইহাতে পারে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে যে সমবেত সাহিত্যিকগণ অপার আনন্দ লাভে কৃতার্থ হইবেন, যে পক্ষে সন্দেহ নাই।

পঞ্চদশী।—বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত সার বিজয় চন্দ মহতাব—কে, সি, এস, আই, কে, সি, আই, আই ও ই প্রণীত। পঞ্চদশী এক অপূৰ্ব্ব জিনিষ ইহার পনরটী পৃষ্ঠায় পনরটী ক্ষুদ্র কবিতা কবির মনের পনরটী ভাব সুপ্রকটি৲ হইয়াছে। ভাষা ভাল। প্রতি দুই পৃষ্ঠায় দুইটী দুই রকমের চিত্র—মনে হয় গুরু ও শিষ্যেরই চিত্র—শিষ্য রাজ কিরীট-ধারী—গুরু নগ্নপদ আলখেল্লাধারী। চিত্র কাগজ ছাপার তুলনা হইবার নহে।

গায়ত্রী।—পূৰ্ব্বোক্ত মহারাজধিরাজ প্রণীত। ব্রহ্ম গায়ত্রীর ত্রয়ো-দশটী শব্দে ত্রয়োদশটি সুন্দর চিত্র এবং শেষটী বাদে দ্বাদশটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাহাদের ব্যাখ্যা। এই কবিতা দ্বাদশটিতে গ্রন্থকারের ভাবুকতা ও লিপি কুশলতা দেদীপ্যমান। কবিতাগুলির কল্পনা নূতন ভাবও নূতন।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত।



ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। | ১৩২১, শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য ও বর্ণাশ্রম।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

অধুনা বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, যতদিন আমরা তাঁহার শ্রীচরিত সম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা না করিয়াছিলাম ততদিন আমাদেরও তদ্রূপ ধারণা ছিল। শ্রীচরিত সম্বন্ধে বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ তিন খানি, আর দুই এক খানি থাকিলেও তাহা সর্ব্বজনবিদিত নহে। সেই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে একখানি ঠাকুর বৃন্দাবন দাস প্রণীত শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং তৃতীয় লোচনানন্দ দাস ঠাকুর প্রণীত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। শেষোক্ত গ্রন্থখানি খোল করতালের সঙ্গতে অনেক দিন পর্য্যন্ত পরম ভাগবৎ বৈষ্ণব দিগের দ্বারা গীত হইত। বৈষ্ণব মাত্রেই এই গ্রন্থত্রয়ের যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদাস

কবিরাজ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি প্রভূত পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ, ইহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দর্শন বলিবার পক্ষে কোনই আপত্তি দেখা যায় না। ইহাতে বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা আছে। কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার উক্তি বৈষ্ণবদিগের নিকট বেদ বাক্যের ন্যায় সমাদৃত। উপরি উক্ত তিনখানি গ্রন্থ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারি যে, তিনি যত দিন সংসারাশ্রমে ছিলেন, ততদিন গৃহীর ন্যায় আচার করিয়াছিলেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অঙ্গে আঘাত করা দূরে থাকুক সর্ব্বতোভাবে তাহার নিয়ম পালন করিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও তাহার অপচয় না করিবার পক্ষে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। সকল ধর্ম্মই উৎপত্তি কালে যেরূপ আকারে থাকে, পরে তাহার বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হইলেও কালপ্রভাবে আজি কালিকার বৌদ্ধের মধ্যে হয়ত অনেকের সে বিশ্বাস নাই। কেবল বৌদ্ধ বলিয়া নহে, সকল ধর্ম্মেই এইরূপ ভ্রষ্টাচার প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। সে দোষ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতৃগণের নহে, পশ্চাৎ যাঁহারা তাহার অনুসরণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের। অতঃপর আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা উক্ত ধর্ম্মের কোন প্রকার অঙ্গহানি ঘটিয়াছে কি না। আমাদের বিশ্বাস ইহাতে আমাদিগকে বৈষ্ণব সমাজের বিরাগভাজন হইতে হইবে না, আমরা মহাপ্রভুর মহান্ চরিত্রের মহোদারতাই প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাতে প্রধান সহায় মহাজন বাক্য, ইহাতে আমাদের স্বকপোলকল্পিত কিছুই নাই।

মহাপ্রভুর বাল্যাবস্থায় সাবিত্রী গ্রহণাদি দশবিধ সংস্কার তাঁহার পিতামাতা দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সে পক্ষে তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্বই ছিল না, কোন্ বালকেরই বা তাহা থাকে। তবে একথা বলিব যে, মহাপ্রভু সাধারণ বালক ছিলেন না, তিনি জন্মাবধি অসাধারণ। পিতামাতার অবাধ্যাচরণে তাঁহাকে কখন প্রবৃত্ত দেখা যায় না। পিতামাতার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল।

বাল্যকালে শ্রীচৈতন্যের পিতৃবিয়োগ হয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধান মতে তিনিপি তৃশ্রাদ্ধ করেন,—

কথোদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতাপুত্র দোঁহার বাড়িল হৃদিশোক॥
বন্ধু বান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিলা।
পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিলা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা
১৬ শ পরিচ্ছেদ।

তবে বেদবিধি মতে যে ছিল উচিত।
করিলা বাপের কর্ম্ম কুটুম্ব বেষ্টিত॥
পিতৃবৎসল প্রভু পিতৃযজ্ঞ কৈল।
ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণে পূজিল॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, আদিকাণ্ড।

চৈতন্যচন্দ্রের অপূর্ব্ব লীলা—গৃহে থাকিয়া গৃহী হইতে হইলে গৃহিণী চাই, তাহা না হইলে গৃহধর্ম্ম শোভা পায় না। অতএব শাস্ত্রানুসারে তিনি দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

কথোদিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥
গৃহিণী বিনা গৃহকর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল আদি।

বৃন্দাবন দাসের এই শুভ বিবাহ বর্ননা একটু বিস্তৃত, উহা যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুমোদিত তৎপ্রদর্শনার্থ কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নানদান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান॥
হেন পাদপদ্মে পাদ্যদিল বিপ্রবর।
বস্ত্র মাল্য চন্দনে ভূষিলা কলেবর॥
যথাবিধি রূপে কন্যা করি সমর্পণ।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল ব্রাহ্মণ॥

গৃহস্থাশ্রমে থাকিবার কালে তাঁহার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। গুরুজনে ভক্তি, পিতামাতার আজ্ঞা পালন, অতিথি অভ্যাগতের সাদরে সৎকার ইত্যাদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের কোন ত্রুটিই তিনি রাখেন নাই—

মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমনে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥
ঐ অন্ত্যখণ্ড ৪র্থ অঃ।

পিতৃপিতামহাদির উদ্ধার জন্য গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানেও তাঁহার বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন তিনি সন্ন্যাসী নহেন—গৃহী। গয়ায় পিতৃকার্য্য বর্ণাশ্রমীর না করিলেই নয়—করিতেই হয়।

ষোড়শ বেদিকায় প্রভু পিণ্ডদান করে।
উৎকণ্ঠা বাড়িল বিষ্ণুপদ দেখিবারে॥
গয়াশিরে পিণ্ডদান পাদাব্জ উপর।
পিতৃকার্য্য কৈলা প্রভু আনন্দ অপার॥
শ্রীচৈতন্য মঙ্গল আদিকাণ্ড।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ইহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন—

তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি দেয়া।
তীর্থ শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া॥
ফল্গুতীর্থে করিয়া বালুকার পিণ্ডদান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া স্থান॥
প্রেতগয়া শ্রাদ্ধ করে শ্রীশচী নন্দন।
দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ॥
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সম্ভাষিয়া।
দক্ষিণ মানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া॥
ইত্যাদি শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আর একটী প্রধান কাজ দীক্ষাগ্রহণ। তাহাতেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই, শ্রীপাদঈশ্বর পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তবে তিনি স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের সাধন॥

কেশব ভারতী ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ কালেও তিনি শাস্ত্র-

আছে তাহা তিনি পূর্ণ মাত্রায় পালন করিয়াছিলেন—মাতা পত্নী আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কতই বিনয় অনুনয় করিলেন, পরিশেষে, সন্ন্যাস গুরু কেশব ভারতী পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছিলেন,—

ভারতী আছেন শুন শুন বিশ্বগুরু।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁদয়ে অন্তর॥
এহেন সুন্দর তনু—তরুণ বয়েস।
জনম অবধি নাহি জান দুঃখ ক্লেশ॥
অপত্য সন্ততি নাহি হয়েত তোমার।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে না হয় আমার॥
পঞ্চাশের উর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি॥
তবে সে সন্ন্যাস দিতে তারে হয় যুক্তি॥

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল "বঙ্গবাসী"সং।

শ্রীচৈতন্য কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, সন্ন্যাসের জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলেন, যে সকল জ্ঞানগর্ভ বাক্যে গুরুকে আত্মনিবেদন করিলেন—তাহাতে ভারতী ঠাকুর আপত্তি করিতে পারিলেন না—জীবের উর্দ্ধার জন্য শ্রীচৈতন্যকে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না, আত্মীয়গণের নিকট যথারীতি বিদায় লইয়া আসিবার উপদেশ দিলেন। তিনি তাহাই করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রানুযায়ী সন্ন্যাসের অনুষ্ঠান করিলেন,—

তার পরদিন প্রভু গুরু আজ্ঞা লৈয়া।
সন্ন্যাস বিধান„কর্ম্ম করল হাসিয়া॥
করিল সকল কর্ম্ম যে ছিল বিহিত।
সন্ন্যাস করিব বলি আনন্দিতচিত॥

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ১৪৮ পৃঃ।

পূর্ব্বদিন সংযত ভাবে রহিলেন, মস্তক মুড়াইলেন, গঙ্গাস্নান করিলেন; তাহার পর তিনি স্বপ্নযোগে কোন মহাপুরুষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন, সেই মন্ত্র শ্রীপাদ কেশব ভারতীকে কাণে কাণে শুনাইলে তিনি তাঁহাকে সেই মন্ত্রই প্রদান করিলেন, এবং সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম রাখিলেন। এই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে শাস্ত্রবিধির কোন

ব্যবস্থা না থাকিলেও মহাপ্রভু কখন নীচান্ন গ্রহণ করেন নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অন্ন বিচারের বড়ই আঁটা আঁটি। যখন তিনি গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন তখন স্বপাচিত অন্ন গ্রহণ করিতেন, তবে মাতা পত্নী উপস্থিত থাকিলে তাঁহারাই পাক করিয়া দিতেন,—

তবে মহাপ্রভু কতোক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ আদিখণ্ড ১২ অঃ।

পরান্ন গ্রহণে তিনি পূর্ব্বাপর বড়ই সতর্ক ছিলেন—আমরা শ্রীগ্রন্থের নানা স্থানে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তিনি যে ব্রাহ্মণেতর অন্য কাহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করেন নাই। প্রয়াগে আচার্য্যগৃহে আতিথ্য গ্রহণে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গৃহে, জগন্নাথ তীর্থে গোপীনাথাচার্য্যের আতিথ্য উপলক্ষে পুরুষোত্তম হইতে তীর্থভ্রমণপথে কৃষ্ণদাস নামে এক সরলপ্রকৃতি কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া পাকাদি সম্পাদন করিতেন,—

কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ—ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর—কিছুই না বলিবে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত "বঙ্গবাসী" সং।

বৃন্দাবন যাত্রাকালে মহাপ্রভুর পাক ও সেবাদি কার্য্যের জন্য সঙ্গে গিয়াছিলেন—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—

ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইহোঁ পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাবৃত্ত॥
ইহা সঙ্গে লহ যদি সবার হয় সুখ।
বনপথে যাইতে তোমার না হবে কোন দুখ॥
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল!
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করিলেন॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্যব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥
দুই তিন দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্যবন—লোকের নাহিক বসতি॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক।
ফলমূলে ব্যঞ্জন করে নানা শাক॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে।
মহাসুখ জানি সেদিন রহেন নির্জ্জনে॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

অন্নগ্রহণের পক্ষে তিনি যে বিলক্ষণ সাবধান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কাশীতে গিয়া তিনি তপন মিশ্রের ঘরে রহিলেন, তপন যথোচিত সম্মান সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তাঁহারও বাড়ীতে তিনি অন্ন গ্রহণ করিলেন না, ভট্টাচার্য্য পাক করিলেন,—

প্রভুকে নিমন্ত্রণ করি করে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল॥

পরান্ন গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি যে বড়ই সতর্ক ছিলেন তাহার আরও এক প্রমাণ আছে। মথুরায় গিয়া মহাপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এক ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইয়াও বলিয়াছিলেন,—

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেইত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা।

কিন্তু ব্রাহ্মণের যত্নাতিশয্যে প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে শিষ্যগণ্যে তাঁহার ভিক্ষা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আড়ইলহা গ্রামের বল্লভ ভট্টের বাড়ীতে বলভদ্র পাক করিয়াছিলেন,

গন্ধপুষ্প ধূপদীপে মহা পূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল॥
ভিক্ষা করাইল প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে॥

শ্রীক্ষেত্রের পুলিনভোজনে কি দেখিতে পাই? মহাপ্রভু আপনার প্রিয় পার্ষদগণকে লইয়া ভোজনে বসিলেন, ব্রাহ্মণে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

পুরী গোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥
আচার্য্য রত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা বৈশে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লঞা এতজন॥
তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ১২ শ পরিঃ

পরিবেশক সাতজন যথা—

স্বরূপ গোসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর॥

ঐ ঐ

বলা বাহুল্য যে সমস্ত দ্রব্যই শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবে নিবেদিত, অতএব তাহা মহাপ্রসাদ এবং স্পর্শদোষে দূষিত নহে, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর পক্ষে তাহাতে কোন আপত্তি হইতে না পারিলেও তিনি তাহা অন্যের হাতে গ্রহণ করিলেন না।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন একঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই॥
অদ্বৈত কহে অবধূত সনে একপঙক্তি।
ভোজন করি না জানিয়ে হবে কোন গতি॥
প্রভুত সন্ন্যাসী উহাঁর নাহি অপচয়॥
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ১২ শ পরিঃ

মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইলেও সমাজের প্রতি তাহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল, কোন প্রকারে সমাজের নিন্দাভাজন না হইতে হয় তজ্জন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ৩ য় পরিঃ

একবার রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড় দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে দুইশত বৈষ্ণবের সমাগম, মহাপ্রভু সকলের সুবিধা সচ্ছন্দতার জন্য ব্যস্ত—ভক্ত বৈষ্ণবগণের আহার অবস্থান জন্য তাঁহার পার্ষদগণ সদা সচেষ্ট, সকলের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে শূদ্র জাতীয় ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ বৈষ্ণবগণের জন্য মহাপ্রসাদ লইয়া উপস্থিত।

রাজা বলে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে জান পাঁচ সাত॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ১১ শ পরিঃ।

বাণীনাথ ব্রাহ্মণ নহেন, সে মহাপ্রসাদ মহাপ্রভু গ্রহণ করেন নাই—সমবেত বৈষ্ণব মণ্ডলীকে তিনি স্বয়ং পরিবেশন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন॥
তোমার সঙ্গে রহে শতজন।
গোপীনাথ আচার্য্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥
আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী ভারতী আছে অপেক্ষা করিয়া॥
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ হাতে দিলা।
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইলা॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া।
পরিবেশন করে আচার্য্য [illegible]

এই সমারোহের ভোজনে মহাপ্রভু পংক্তিবিচারে কত সাবধান তাহা নিম্নোক্ত কবিতায় সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

সভারে বসাইলা প্রভু যোগ্য ক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈলা গৌর হরি॥

তিনি সন্ন্যাসী হইলেও সামাজিক ব্যবহারে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না. নিম্নোক্ত কবিতাগুলি তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ,

রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র॥
প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মন বাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥
রায় কহে কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু পাতে কেহ না করে পরশ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ১১ শ পরিঃ।

যেখানে নিসকড়ি খাও সেই খানেই তিনি আহারে সকলের সহিত মিশামিশি করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল নাহি যার অন্ত॥
ছেনাপানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ড থর্জ্জুর॥
মনোহরা লাড়ু আদি ক্ষীরশা অপার।
অমৃত মণ্ডা ছানার বড়া আর কর্পূর কুলি।
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলী॥
হরিবল্লভ সেধতী কর্পূর মালতী।

পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ী কদমা তিলা খাজার প্রকার॥
নারাঙ্গ ছোলঙ্গ আম্র বৃক্ষের আকার।
ফলযুক্ত পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার॥
দধিদুগ্ধ দধিতক্র রসলা শিখরিনী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি॥
নেবু কোলি আদি নানা প্রকার আচার।
লিখিতে নারি প্রসাদ কতেক প্রকার।

ঐ ঐ

ইহাতে অন্নের নাম গন্ধ ছিল না' ভোজনে বসিবার সম্বন্ধে কোন আঁটা আঁটীও দেখা গেল না।

তুমি প্রভু না খাইলে কেহ না পারে খাইতে।
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লৈয়া॥

ঐ ঐ

রঘুনাথ দাসের দত্ত পুলিনভোজনে দধি চিড়াঁর বন্দোবস্ত ছিল তাহাতেও পুংক্তি বিচারের ত্রুটি হয় নাই,—

তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডি আরোয়া চিঁড়া ডাহিনে রাখিলা।
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাঁরা বসাইলা।
দুইভাই তবে চিঁড়া খাইতে লাগিলা॥

শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত অন্ত্য ৬ ষ্ঠ পরিঃ।

ভোজন ও পুংক্তিবিচার সম্বন্ধে 'আর বেশী কথা বলিব না, মহাপ্রভুর প্রধান ভক্ত রঘুনাথ দাসেরও এ অভ্যাসটা বেশ ছিল, তিনি ব্রাহ্মণালয় বই অন্যত্র ভোজন করিতেন না,—

ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
প্রস্তাবে সকল লোক করেন পূজন॥

শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত অন্ত্য ৩ য় পরিঃ।

বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে যে মহাপ্রভু সে ক্ষেত্রে কিছু বলেন নাই এমন নহে, চাতুর্ব্বর্ণের পক্ষেই যে কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে॥
ঐ মধ্যলীলা ২২শ পরিঃ।

আর বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বর্ণাশ্রমের বিরোধী বলিয়া কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে পারা যায় না,—

কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন।
সেবানামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব সঙ্গ বহু শিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জন॥
হানিলাভ সম শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিঃ।

অন্য দেবতায় দ্বেষভাবও তাঁহার ছিল না, উপরি উক্ত শ্লোকেই তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে,—

মহাশক্তির মহিমা প্রকাশ এবং তাঁহার স্তব শুনিবার জন্য তাঁহার যে আগ্রহ উৎসাহ তাহা বৃন্দাবন দাস প্রভু বর্ণণা করিয়া গিয়াছেন।

কেহো পরে লক্ষ্মীস্তব, কেহ চণ্ডীস্তুতি।
সবে স্তুতি পড়েন—যাহার যেন মতি॥
জয় জয় জগত জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কোটীশ্বরি।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারেক অন্যে কে দিবেক সীমা॥
জগৎ স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা দয়া লজ্জা তুমি বিষ্ণুভক্তি॥

সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা॥
তুমি ত্রিজগৎ হেতু গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, জানে কোই॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্ব জীবের বসতি।
তুমি আত্মা অবিকারা পরমা প্রকৃতি॥
জগত আধার তুমি দ্বিতীয় রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীব পালয়িতা॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন।
তোমার সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন॥
সাধুজন গৃহে তুমি কালরূপাকৃতি।
তুমি সে করান ত্রিজগতে সৃষ্টি স্থিতি॥
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি।
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বদা উদয়া।
রাখহ জননী চরণে দিয়া ছায়া॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর॥
সভার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ দাস॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্বভূত বুদ্ধি।
তোমা স্মঙরিলে সর্ব্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ মধ্য ১৮শ পরিঃ।

ঘোর তান্ত্রিক সাধকও এইরূপ স্তবে আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতে পারেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রাখিবার ইহা অপেক্ষা আর কি চেষ্টা হইতে পারে। তাঁহার লীলা মহিমা আমরা সামান্য বুদ্ধিতে কি বুঝিব। তাহার সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, তিনি মহানুভব মহাপুরুষ—তাঁহার মত তার্কিক ও দার্শনিক আর কেহ মহীমণ্ডল পবিত্র করিয়াছিলেন কি না সন্দেহের স্থল। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার আন্দোলন করা বর্ত্তমান

ফলে উপরে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল,—তাহাতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ঠাকুরকে কেমন করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী বলিতে পারা যায়—তবে যদি জোর করিয়া কেহ তহা বলিতে যান, আমরা বিবেচনা করি প্রভু-আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ জন্য তাঁহাকে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে।

—•—

ইন্দুমতী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

(১)

"আমার মাথা খাও, থাক!"

"না—থাক্‌তে পার্‌ব না, আমার কাজ আছে।"

"কি এমন কাজ আছে যে তোমাকে আজই যেতে হবে?"

"তোমরা মেয়ে মানুষ তোমাদের এত কথা জিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন থাক আর নাই থাক, আজ তুমি কোন মতেই যেতে পাবে না। এত তাড়াতাড়ী কেন, একটা রাতই না হয় এখানে থাক না?"

"তা হবে না—আমার কাজ আছে।"

"ইস্‌! কি আমার কাজের লোক গা,—যত কাজই থাকুক আজ আমি তোমায় কোন মতেই যেতে দিব না।"

এই বলিয়া ইন্দুমতী দরজা বন্ধ করিয়া দরজায়পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন। ইন্দুমতী বড় লোকের মেয়ে, ইন্দুমতীর পিতা গোপাল বাবুর অবস্থা ভাল, তাঁহার সংসারের মধ্যে কেবল মাত্র ইন্দুমতীই এক কন্যা, কাজেই বড়ই আদরের—বড়ই যত্নের। গোপাল বাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়া ইন্দুমতীর ১৩ বৎসর বয়সে বাগবাজার নিবাসী তারক চন্দ্র বসুর একমাত্র পুত্র হরেন্দ্র কুমারের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। তারক বাবুও বড় মানুষ, তিনি কোন এক সওদাগরী আফিসে মুচ্ছুদ্দিগিরী কার্য্য করেন। তাঁহারও সংসারে কেবল মাত্র তাঁহার পুত্র হরেন্দ্রকুমার ও তাঁহার এক কন্যা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী ভিন্ন আর কেহ ছিলেন না। যথা সময়েই তারক বাবু ভাল ঘর, ভাল বর দেখিয়া কন্যাটীকে পাত্রস্থ করিয়া গৌরীদানের ফল লাভ করিয়াছেন। হরেন্দ্রকুমার দেখিতে অতি সুপুরুষ। লেখা পড়া হেয়ার স্কুলের ফাষ্ট ক্লাস

হরেন্দ্রকুমারের চরিত্র বিবৃত হইয়াছে, সুরাপান করিতে শিখিয়াছে এবং একটী জনৈক কুলটার প্রণয়পাশে পড়িয়াছে।

আজ জামাই ষষ্ঠী।—গোপাল বাবু তাঁহার একমাত্র জামতা হরেন্দ্র কুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিয়াছেন। অদ্যই হরেন্দ্রকুমার বাড়ী ফিরিতে চান। ইন্দুমতী তাঁহাকে ফিরিতে দিবেন না। এক রাত্রি ঘরে রাখিবেন ইহাই ইন্দুমতীর একান্ত বাসনা।

"ছাড়—আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, ট্রেন ফেল হইবে। ইন্দু! ছেলে মানুষী করো না।"

"তুমি রাগই কর, আর মেরেই ফেল, আজ আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দিব না।"

ইন্দুমতীর এ আব্দার, হরেন্দ্রকুমারের ভাল লাগিল না। তিনি স্ত্রীর কথা শুনিয়া সত্যসত্যই মনে মনে রাগিলেন। তিনি ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া টানিলেন। ইন্দুমতী হঠাৎ হাঁচকা টানের চোটে ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িলেন। হরেন্দ্রকুমার তাহাকে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। মার্ব্বেল মোড়া ঘরের মেজের উপর ইন্দুমতী পড়িয়া যাইয়া বড়ই আঘাত পাইল। কপালে বাক্সের ঘা লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া গেল। সে রাত্রি ইন্দুমতী কাহাকেও কিছু বলিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইলেন।

(২)

"আশা! আজ বড়ই বিপদে পড়েছিলুম। কেবল তোমার ভালবাসার টানে তোমার ঐ চাঁদ মুখখানি দে'খতে পেলাম।"

"কি ব্যাপার খানা কি? অত গৌরচন্দ্রিকায় প্রয়োজন কি? আমি খুব ভালই জানি তুমি আমাকে কতটা ভালবাস?"

"আশা! আজ আমি বহুকষ্টে যুদ্ধে জয়লাভ করে এসেছি! তোমার কিছু বক্‌সস্ করা উচিত। যদি আজ পরাজয় হতুম তা' হলে আমাকে আজ বন্দী থাকতে হতো?"

"থাক বাজে কথা রাখ, এত রাত্রিতে কি মনে করে শুধু হাতে আমার বাড়ীতে আগমন? আমার নিকট তোমার কি কিছু গচ্ছিত ধন আছে?"

"ভয় কি? পকেট শূন্য বটে, ঘড়ি ও সোণার চেন তো আছে! তোমার মার নিকট ঘড়ি চেন আংটী বাঁধা রেখে ২০০ শত টাকা নিয়ে এস, আজ জামাই ষষ্ঠীটা এখানেই করবো।"

হরেন্দ্রকুমার তাঁহার পকেট হইতে ঘড়ি, চেন আংটী খুলিয়া আশালতার হাতে দিয়া বলিলেন,—"যাও শীঘ্র করিয়া টাকাটা লইয়া এস, রাত্রি অধিক হইয়া গেল আমোদ জমিতে রাত্রি শেষ হইয়া যাবে।"

"আঃ—মরণ আর কি, চিরকালই এক রকমে গেল" এই বলিয়া আশা চেন ঘড়ি ও আংটী লইয়া উঠিয়া গেল। ক্ষণেক পরে আশা মুখখানি ঈষৎ ভার করিয়া আসিয়া বলিল,—"ভাই! মা ১৫০৲ শত টাকার বেশী কিছুতেই দিতে চায় না, আবার তার মধ্যে হইতে ১০৲ দশটাকা কাটিয়া লইতে চায়, আমি অনেক বুঝাইয়া বলিয়া ১৫০৲ শত টাকা লইয়া আসিয়াছি।"

"সাধে কি তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়ে আছি? তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে মানুষ দেখি নাই? যত কম টাকায় জিনিষ রাখা যাবে তত শীঘ্রই খালাস করা যাবে। এখন তোমার প্রাণের রামদাসটীকে একবার বাজারে পাঠাইয়া দাও, রসদ লইয়া আসুক। দুইচারিজন দৈত্য দানবাকে সংবাদ দাও, নইলে আমোদ হবে কি করে।"

"আঃ মরণ। কথার রকম খানা দেখ?"

এই বলিয়া আশালতা রামদাসের হাতে ৫০৲ টাকা দিয়া বাজারে পাঠাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ রসদ আসিয়া পৌঁছিল। সে রাত্রি হরেন্দ্রকুমারের জামাই ষষ্ঠী আশালতার বাড়ীতে বেশ আমোদে কাটিয়া গেল। ইন্দুমতীর ভাবনা একবার ভাবিবার অবসর হইল না। পরদিন প্রাতেই গোপাল বাবু এবং তাঁহার পত্নী নিরদা সুন্দরী জামতার অত্যাচারের কথা শুনিতে কিছুই বাকী রহিল না। গোপাল বাবু বলিতে লাগিলেন,—"হ'ক না আমার জামাই, তা বলে কি মেয়েটাকে খুন করবে নাকি। সে বাপের আদরের ছেলে হয় তাহার বাপ মাই তার অত্যাচার সহ্য করবে? ইন্দু একটু সেরে উঠুক, আমি ব্যাটার নামে ফৌজদারী করিব, দেখিব ব্যাটার কতদূর অত্যাচার আমার মেয়ে এখনও বিধবার মত আছে, তখনও থাকবে।"

"হাজার হউক জামাই তো বটে, তোমার ছেলে বল্‌তেও হরেন, আর জামাই বল্‌তেও হরেন, আর তো কেহ নেই। ওর উপর রাগ করে কি করবে বল? দেখে শুনে বিয়ে দিতে তো কসুর কর নাই,—অদৃষ্টে সুখ না থাকলে, কর্ব্বে কি? এখন ডাক্তারকে সংবাদ দিয়া ইন্দু যাহাতে শীঘ্র আরোগ্য হয় তাহার বন্দোবস্ত কর।" নিরদা সুন্দরী এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে

গোপাল বাবু খানিক চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণ মনে বলিলেন—"বেইকে তার গুণধর পুত্রের বিদ্যা বুদ্ধির কথা লিখিয়া পাঠাই, তাঁরও তো বউ, তিনি এসে দেখুন।"

ইন্দুমতী সজোরে পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার মাথায় বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। তার ফলে সেই দিন হইতেই ইন্দুমতীর বড়ই জ্বর হইল। ডাক্তার আসিয়া ঔষধের সুবন্দোবস্ত করিয়া গেল। একমাস কাল তাঁর পিতা মাতার, শ্বশুর শাশুড়ীর শুশ্রূষায়, যত্নে ও চিকিৎসার গুণে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। রোগমুক্ত হইয়া ইন্দুমতীর আর সে ভাব ভঙ্গী নাই। সে এখন গম্ভীরা, শান্ত ও স্থির হইয়াছে। তাহার বদনে আর সে চপলতা চঞ্চলা ভাব নাই। সে যেন সদাই অন্যমনস্ক হইয়া থাকে। ইন্দুমতী একদিন ম্লান মুখে তাহার জননীকে বলিল,—"মা আমি শ্বশুর বাড়ী যাব। অনেক দিন এসেছি, আর থাকা ভাল দেখায় না। না জানি আমার শ্বশুর শাশুড়ীর কত কষ্টই না হইতেছে। তুমি একবার বাবাকে বলিও আমার যাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

"সে কি মা ইন্দু! তুই এখনও ভালরূপে সেরে উঠ্‌লি না, কি করে তোকে সেখানে পাঠাব মা? আশীর্ব্বাদ করি, শীঘ্র আরোগ্য হও, জন্ম জন্ম সেই ঘর কর এবং ঘরের ঘরণী গৃহিণী হয়ে থাক।"

"না মা আর আমার থাকা ভালদেখাচ্চে না। বুঝ্‌চো না মা, তারপর হতে তোমার জামাই একদিনের জন্য এলেন না; আমি এখানে থাক্‌লে সারিয়া উঠিতে পার্ব্ব না। আমি যাব, তুমি বাবাকে বলিও।

নিরদা সুন্দরী কন্যার রোগেপাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া চোখে জল ফেলিতে ফেলিতে উঠিয়া গেল।

ইন্দুমতী নিজ শয়ন কক্ষে যাইয়া দোয়াত কলম লইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিলেন। আজ অনেক দিনের পর ইন্দুমতী স্বামীকে পত্র লিখিবেন বলিয়া বসিয়াছেন। কি লিখিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না, চোখের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, ১।৩ খানি কাগজ নষ্ট করিলেন, অবশেষে মনকে দৃঢ় করিয়া অতি কষ্টে লিখিলেন,—

শ্রীচরণেষু!

এ হতভাগিনী দাসীকে কি মনে আছে! যদিও এ দাসী তোমার

সামলাইতে না পারিয়া এবং আমার শেষ সময় বলিয়া তোমাকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। দয়া করিয়া নিজগুণে অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। অভাগিনীর শেষ সময়ের শেষ মিনতি। আমার আর অধিক দিন নহে। বোধ করি আমার জীবনের গণাদিন ফুরিয়া আসিতেছে। শেষ সময়ের শেষ দিনে তোমাকে দেখিয়া মরিব. এই আমার বাসনা। তুমি তো একবারও আসিলে না। তুমি যে এ বাটীতে আসিবে এবং আমাকে লইয়া যাইবে, সে আশা তো আমার নাই। প্রাণের আবেগে যন্ত্রণায় আমি নিজেই মাকে কল্য ওবাটীতে যাইব বলিয়া পত্র দিয়াছি, সারাদিনে তোমার সময় মত একবার করিয়া আমাকে দেখা দিও। আমি তোমায় দেখিয়া মরিব। ইহাতেই এখন আমার স্বর্গসুখ অনুভব করিব। ভয় নাই, আর আমি কখন তোমাকে তিরস্কার করিব না, কিম্বা তোমার সুখের পথে কণ্টক হইব না, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিব না। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিও।

তোমার সেবিকা,—

ইন্দু।

"আশা! শুনেচ, কাল যে আমার ইন্দুমতী আস্‌বে।"

"বল কি, সে যে এখনও ভাল করে সেরে উঠ্‌তে পারেনি। কি করে আস্‌বে? তাকি কখনও হয়, তোমার মিথ্যা কথা।"

"না আশা,—তা নয়, তাহাকে আমি চিনি, সে সত্য সত্যই কাল আসবে।"

এই বলিয়া ইন্দুমতীর পত্রখানি হরেন্দ্রকুমার পকেট হইতে বাহির করিয়া আশালতাকে দিলেন।

আশালতা পত্রখানি ২।৩ বার ধরিয়া পড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,—"হরেন্দ্র বাবু! আর তোমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না। এতদিনে তুমি আমার হাতছাড়া হইলে।"

"কেন?"

"কেন জানি না, এখনও বুঝিতে পার্‌চ্চো না? সকল ডাকের উপর পরিবারের ডাক বড় জোর ডাক। স্ত্রী যদি ডাকৃতে জানে এমন স্বামী নাই যে সে ডাক শুনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকৃতে পারে। এতদিনের পর তোমাকে ডাকের মত ডাকিয়াছে, তাই বল্‌চি এবার তুমি আমার হাত হাতছাড়া হলে।

"ইস! বড় গলাবাজী করে বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলে যে, ও সব

"না হে হরেন্দ্র বাবু! বাজে কথা নয়, সত্য কথা বলচি। তোমাদের মত পুরুষ গুলো আমাদের জন্য পাগল হয় কেন জান? স্ত্রীর নিকট আমাদের মত সেবা, মৌখিক আদর যত্ন টুকু পায় না ব'লে। আর আমরা মন্দ হলেও মানুষের রক্ত মাংস লয়ে জন্মতো—নিন্দনীয়া হতে চাইনি বলে তোমাদের মত পুরুষকে লইয়া থাকিতে চাই। "ভালবাসা" আমাদের গালা-গাল, আমাদের ভালবাসতো নেই, আমরা ভালবাসি নাই। কিন্তু যেটী কর্‌তে নেই, সেইটী মানুষ আগে করে। চন্দ্রের উপর দাগ আছে, তাহা তো জান। আমরা দাগের মুল্যটা বড় বেশী বুঝি। যতই হউক আমি তো মেয়ে মানুষ, আমার কি আর বুঝ্‌তে বাকী আছে?"

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

এই বলিয়া হরেন্দ্রকুমার গলবস্ত্র হইয়া আশাকে প্রণাম করিল।

"তোমার এত বুদ্ধি থাক্‌লে কি আর আমায় ধরে রাখ্‌তে পার। কিন্তু কি বল্‌তে ভাই, মাগীটা বড়ই ভ্যান্‌ভেনে প্যান্‌পেনে। তাই ভাল লাগে না।"—

"না হরেন্দ্র বাবু আর প্যান্‌পেন্ করবেন না, এবার রোগ ধরা পড়েছে, আমি সব বুঝেছি।

(৫)

আজ পৌষ সংক্রান্তি। মহাযোগ, গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য ফল, দলে দলে সারি বাঁধিয়া স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানে যাইতেছে॥ প্রতি ঘাটেই বড় ভীড়, লোকে লোকারণ্য। ইন্দুমতী তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে লইয়া ঘরের গাড়ী করিয়া বাগবাজারের ঘাটে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। ঘাটে যাইয়া শুনিলেন একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি মহাপুরুষ, তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ, তাঁহার সুখ্যাতিতে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। ইন্দুমতীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শাশুড়ী সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিলেন।

সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই ইন্দুমতীর শাশুড়ী ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং ইন্দুমতীকে প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন।

সন্ন্যাসী একবার তাঁহাদের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "মায়ি! তোম্ ক্যায়া মাঙ্গতা মায়ী?"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী গলবস্ত্র হইয়া করজোড়ে বলিলেন,—"বাবা আমার কোন জিনিষেরই অভাব নাই। ঈশ্বর আমার সব সাধ মিটাইয়াছেন। আমি ঈশ্বর

তোমার নিকট কি চাহিব বাবা? আমার হরেনের যেন সুমতি হয়। এই আমার বউ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! মা আমার ঘরে এসে উতলে উটেছে, আমি আর ওর মলিন মুখ দেখ্‌তে পারি না, বাবা! বউ মা যাতে সুখী হয় তাহা করো।"

সন্ন্যাসী।—মা স্বামী বশ কর্‌বার ঔষধ সতী সাধ্বী স্ত্রীর নিকটেই থাকে। অন্য কোন কড়ি কিম্বা বড়ি নেই মা।

শাশুড়ী।—কি অসুধ বাবা? কি কর্‌লে আবার আমার সোণার চাঁদ হরেন গৃহে আসে? কি কর্‌লে বাবা আমার সোণার প্রতিমা বউমার মুখে আবার হাসির রাশি ফুটিয়া উঠে?

সন্ন্যাসী।—মা, স্বামীর সেবা কর্‌তে হয়, স্তবস্তুতি করিলে দেবতা ভুলে, আর একটা মানুষ ভুলে না, তোমার বউকে তাঁর স্বামীর সেবা কর্‌তে বলো। জামা জুতা কাপড় এ সব যেন তিনি গুছিয়ে রাখেন, আহারের দ্রব্য যেন নিজেই পাক করেন। যখন যাহা চাইবে তখনই তাহা দেন। তিন মাস এই ভাবে চলুন দেখি। কেমন স্বামী নিজের হয় কিনা? তারপর আবার আমি দেখা দিব। যদি এতেও ছেলে বশ না হয়, তখন না হয় মন্ত্রতন্ত্র করিও। মা! পুত্রবতী না হলে স্বামীর উপর জোর চলে না। যতদিন না স্ত্রীলোক পুত্রবতী হয়, ততদিন রমণী। স্বামীর কোলে পুত্র দিলে তখন স্ত্রীলোক সহধর্ম্মিণী হয়। তখন স্বামীকে দুচার কথা বলা চলে।

ইন্দুমতী একমনে গুরু উপদেশ শ্রবণ করিয়া মা গঙ্গার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

(৬)

সূর্য্যদেব নির্ব্বাণোন্মুখ। সারাদিন তিনি তাঁহার কার্য্য সমাধা করিয়া বিশ্রাম লইবার জন্য জগতের নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাস্তায় রাস্তায় গ্যাস জ্বলাইয়াছে। কলিকাতা নগরী যেন একটী আলোক মালা গলায় দিয়া সাজিয়াছে। বাবুদের সাজ সজ্জা করিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কাহারও জুড়ী গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় বাবুর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইয়া আছে। আমাদের হরেন্দ্রকুমার ও বেশ ভূষা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন,—"ইন্দু!",

"কেন?"

"গোটা ৪০৲ টাকা দিতে পার?"

"এই কথা? ইহার জন্য এত কিন্তু কেন," বলিয়া ইন্দুমতী বাক্স হইতে ৪০৲ টাকা বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। হরেন্দ্র টাকা কয়টী লইয়া ইন্দুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

"আমি টাকা কয়টী ফিরিয়া দিব।"

"কার টাকা, কারে ফিরিয়া দেবে! তোমারই টাকা তোমাকেই দিলাম।"

হরেন্দ্র বাবু আবার স্থিরনেত্রে ইন্দুমতীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শেষে স্ত্রীর হস্তটি ধরিয়া বলিলেন, "ইন্দু তোমার মুখ খানি অতি সুন্দর হইয়াছে, কথাগুলি বেশ মিষ্টি হয়েছে।" হরেন্দ্র বাবু আর কথা কহিতে পারিলেন না,—হঠাৎ কক্ষ হইতে বাহিরে যাইলেন। ইন্দু অঞ্চলের কাপড় মুখে দিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গিয়াছে, হরেন্দ্রকুমার মাতাল হইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার কিছুই ঠিক নাই, স্বামীর পদ শব্দ শুনিয়া ইন্দমতী উঠিয়া বসিয়াছিলেন। হরেন্দ্রকুমার কক্ষে আসিয়াই বমি করিয়া ফেলিল। উৎকট দুর্গন্ধে ঘর আমোদিত করিয়া তুলিল। ইন্দমতী নির্ব্বাক হইয়া সকল ময়লা পরিস্কার করিল। স্বামীকে সুস্থ করিয়া ভাল কাপড় পরাইয়া গোলাপ জল মাখাইয়া শোয়াইয়া রাখিলেন। পাশের ঘর হইতে গরম লুচি, তরকারি ভাজিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিলেন। স্বামীকে উঠাইয়া বসাইয়া বালককে যেমন ভুলাইয়া খাওয়াইয়া দেয় তেমন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া দিলেন। হরেন্দ্র বাবু আহারান্তে ঘুমাইয়া পড়িল। আর ইন্দুমতী স্বামীর শিরোদেশে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় নয়টার সময় হরেন্দ্র কুমারের নিদ্রা ভাঙ্গিল। নয়ন মেলিয়া দেখেন যে, ইন্দুমতী মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছে এবং চোখের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতেছে। ঠিক সেই সময়ে ইন্দমতীর দুই ফোঁটা চোখের জল হরেন্দ্র কুমারের কপালে পড়িল। ইন্দুমতী তাড়াতাড়ি অঞ্চল দিয়া জলটা মুছাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন।

হরেন্দ্রবাবু ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া বলিলেন,—"মুছাইও না ইন্দু, মুছাইও না, উহা আমার পক্ষে স্বাতীনক্ষত্রের জল।"

ইন্দুমতী আর রোদনের বেগ সামলাইতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

আদর করিয়া ইন্দুকে কতই সান্তনা করিতে লাগিলেন। ইন্দর চক্ষে যেন বরষার বন্যা আসিয়া পড়িল।

"ছিঃ ইন্দু, কাঁদে কি, আমি তো তোমারই; দেখ রোদ্দুরে ছেলেরা বড় ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়। ক্লান্ত হয়ে যখনও বাবলার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায়, কখনও বা খেজুরের ছায়ায় এসে দাঁড়ায়, কিন্তু যখন বটের ছায়ায় এসে দাঁড়ায় তখন তাহারা ছুটাছুটী করে না। এতদিন পরে আমি বটের ছায়া পাইয়াছি, আর কি কোথাও যাই।"

"এত দিন পর আমিও তাহা বুঝিয়াছি, সব জানিয়াছি, কিন্তু তাহা বলিয়া কাঁদিবার সুখ হইতে বঞ্চিত হই কেন? আমাকে কাঁদিতে দাও, আমি প্রাণ খুলিয়া আজ কাঁদি।"

(৭)

এখন হরেন্দ্র বাবুর সব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন ঈশ্বর যেন, নুতন সাজে তাঁহাকে তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন। হরেন্দ্রকুমার স্থির, ধীর, গম্ভীর, হরেন্দ্রকুমার বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বৃদ্ধ পিতা তারক বাবুর হাত হইতে অনেক কার্য্যের ভার নিজে লইয়াছেন। প্রত্যহ হরেন্দ্রকুমার পিতার সহিত আফিস যান, আফিস হইতে পিতাপুত্রে একসঙ্গে আসিয়া হরেন্দ্র কুমার ইন্দুমতীর সহিত গল্প করিয়া সময় কাটান। এতদিন পরে ঈশ্বর ইন্দুমতীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

কয়েকদিন পরে হরেন্দ্র বাবু তাঁহার এক বন্ধুকে ২০০৲ শত টাকা দিয়া আশালতার বাড়ীতে পাঠাইলেন। এবং বলিয়া দিলেন, আশালতার নিকট যাহা কিছু আমি ঋণী আছি, তাহা যেন পরিশোধ করিয়া লয়। ইন্দুমতীর পরামর্শ মতই হরেন্দ্রকুমার তাঁহার বন্ধুকে আশালতার নিকট পাঠাইলেন।

হরেন্দ্র বাবুর বন্ধু একদিন আশলতার বাড়ীতে গেলেন। আশালতা বন্ধুটীকে চিনিতেন, দেখিবামাত্র বলিলেন, "কি হে আমার কথা কি সত্য হলো? আমি তো বলেছিলুম, ও জগন্নাথের দড়ির টান ওকি সামলান যায়! তা বেশ, প্রাণে খুবই খুসী হইলাম, হরেন্দ্র বাবু সুখে থাকুন, আমরা তো সংসারে প্রত্যহ ইহাই দেখি। আমাদের একুল ওকুল—দুই সমান।"

বন্ধু।—"হরেন বাবু তোমাকে ২০০ শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, বোধ করি ইহাতেই তোমার সব ঋণ পরিশোধ হবে, যদি না হয়, আর কত দিতে হবে আমাকে বলিয়া দাও, কালই আমি দিয়া যাব।"

হয়, চরিত্রহীন পুরুষ বানর, গলায় দড়ি বেঁধে রাখতে হয়। পয়সা তো আমাদের হাতের ময়লা। টাকার কাঙ্গাল আমরা নই, টাকাই আমাদের কাঙ্গাল। এ টাকা ফিরাইয়া লইয়া যাও, এই টাকাতে হরেন্দ্র বাবু তার স্ত্রীর জন্য একখানি বেনারসী শাড়ী খরিদ করিয়া দিবেন।

এই কথা শুনিয়া বন্ধুটী দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেলেন।—

আশালতা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, সে বিছনায় আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভালবাসা যে আমাদের পক্ষে গালাগাল তাহা এতদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝিলাম। এই যন্ত্রণা ভোগই ঈশ্বরের অভিশাপ।"

(৮)

তারক বাবু পুত্রের কার্য্যতৎপরতা ও কার্য্য নৈপুণ্য, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হরেন্দ্র বাবু পিতার আফিসের কার্য্য সমস্তই শিখিয়া লইলেন, সাহেবরা হরেন্দ্র বাবুর কার্য্যে বড়ই সন্তুষ্ট। কয়েকদিন পর তারক বাবু পুত্র হরেন্দ্রকুমারকে তাঁহার কার্য্য ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন।

একদিন প্রাতে ইন্দুমতী তাঁহার শ্বাশুড়ীকে লইয়া বাগবাজারের ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া সেই সন্ন্যাসীর পদধুলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—

"বাবা তোমার আশীর্ব্বাদে আমি আমার হারানিধি ফিরিয়া আনিয়াছি।"

"বলেছিলুম তো মা, সেবায় দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত বশ হয়, আর একটা মানুষ বশ হয় না? স্ত্রীলোকের স্বামীসেবা একটা মহৎ কর্ম্ম। স্বামীকে যত্ন করিতে পারিলে, স্বামীর মনের মত হইয়া থাকিতে পারিলে, স্বামীর সব কর্ম্ম নিজ হস্তে করিতে পারিলে, স্বামীর সেবা একচেটিয়া করিতে পারিলে, স্বামীর প্রণয়ও একচেটিয়া করা যায়। সেবা একটা বড় বিদ্যা—সেটাও যে সহজে শেখা যায় না মা।"

হাঁ বাবা, তুমি ঠিক বলেছ; আমার হরেন এখন সংসারী হয়েছে, আফিসে কাজ করিতেছে, সন্ধ্যার পর হইতে আর বাড়ীর বাহির হয় না, সকল নেশা ত্যাগ করিয়াছে।"

"বলেছি তো মা, স্বামী বশ করতে কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। আশীর্ব্বাদ করি তোমার পুত্রবধু স্বামী লইয়া সুখে ঘরসংসার করুক। ইহা ভিন্ন আর আমার আশীর্ব্বাদ কিছুই নাই মা।"

প্রাতঃস্তোত্র।

—ঃ(*)ঃ—

লেথক,—

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যাবিনোদ।

নমঃ নিরঞ্জন,
সত্য সনাতন,
পতিত-পাবন, পতি।
বিঘ্ন বিনাশন,
কল্যাণ কারণ,
পাপ নিসূদন গতি॥
করি প্রণিপাত,
অনাথের নাথ,
কর দৃষ্টিপাত দীনে।
জগৎ সংসারে,
বাঁচিতে কে পারে,
তোমার করুণা বিনে॥
চৈতন্য বিলুপ্ত,
ছিনু যবে সুপ্ত,
ছিলা গুপ্তভাবে কাছে।
রাখিলা যতনে,
সন্তানে চরণে,
তেঁই এ জীবন আছে॥
প্রসাদে তোমার,
হেরিনু আবার,
সুখের সংসার মুখ।
সুনীল গগন,
সুবর্ণ তপন,

কিবা মরি! মরি!
তুলিয়া লহরী,
গাইছে বিহগ কুল।
কিবা দুর্ব্বাদলে,
হীরা মুক্তা জলে,
গাছে গাছে হাসে ফুল॥
অতুল বিভব,
হেরিনু এ সব,
দয়ার্ণব নিরঞ্জন।
আত্মীয় স্বজনে,
পুন দরশনে,
পুলকে পুরিল মন॥
যেন কৃপালেশ,
ওহে অখিলেশ,
নিবেদন শেষ করি।
থাকে অভাজনে,
সদা সর্ব্বক্ষণে,
ন্যায়-পথ যেন ধরি॥
বিপদ বারণ,
হে ভব তারণ,
চরণ আশ্রয়ে রেখ।
সংহতি বিচরি,
দিবস শর্ব্বরী,
বিপদ আপদে দেখ॥
সদা সর্ব্বক্ষণ,
থাকে যেন মন,
ধরম-করমে রত।
স্বার্থের জল্পনা,
কলুষ কল্পনা,

হয় যদি ভয়,
হৃদ্ বল ক্ষয়,
কর্ত্তব্য সাধনে কভু।
দিয়া নব বল,
করিও প্রবল,
এই নিবেদন প্রভু॥
কণ্টকিত পথে,
যেতে কোন মতে,
বাজে যদি বড় পায়।
হৈতে অগ্রসর,
যদি অতঃপর,
হয় মন ক্ষুণ্ণ প্রায়॥
বলিও তাহারে,
"ক্লেশ কাঁটাপারে,
আছে ফল সুধাময়।
'নিত্য সুখ' নাম,
তৃপ্তি অভিরাম,
উপভোগে নিরাময়॥
বুঝেছি একান্ত,
অহে লক্ষ্মীকান্ত,
"অধর্ম্মের পথ যাহা।
নেত্র সুখকর,
অতি মনোহর,
অতি পরিপাটী তাহা॥

প্রলুব্ধ অন্তরে,
প্রবেশিলে পরে,
উপনীত মৃত্যু দেশে।
ব্যাধি বহুতর,
মৃত্যু সহচর,
ভ্রমে যেথা নানা বেশে॥
হৈলে উপনীত,
একি বিপরীত,
ভীষণ চাপিয়া ধরে।
ভীম মৃত্যু দণ্ড,
প্রহারে প্রচণ্ড,
অমনি পথিক মরে॥
জেনেছি মুরারি,
পথের দু'ধারি,
বিরাজে যতেক ফল।
দেখিতে সুন্দর,
গরল ভিতর,
পরশিলে রসাতল॥
তাই, ভবপতি,
হেন পথে গতি,
যেন কভু নাহি হয়।
সৎকাজে সতত,
থাকি যেন রত,
পদে যেন মতি রয়॥

হোমিওপ্যাথিক।

চিকিৎসা তত্ত্ব বারিধি।

লেখক,—ডাক্তার টী, মুখার্জ্জী।

নাড়ী পরীক্ষা।

চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে নাড়ীর পরীক্ষা আবশ্যক। কারণ নাড়ীর অবস্থা ভেদে ঔষধ নির্ব্বাচন এবং আবশ্যক মত তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ইহার পরীক্ষা বড় সহজ নয়, যাঁহারা সদা সর্ব্বদা সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিলে ব্যাধির বিষয় অবগত হইতে পারেন। কেবল মাত্র চিকিৎসা গ্রন্থের সূত্র পাঠ করিলে, নাড়ী সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয় না। প্রকৃত ধাতুগত পীড়ানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, নাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তির আবশ্যক।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাড়ী পরীক্ষা রোগ নির্ণয়ের অতি সুন্দর উপায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থে নাড়ী সম্বন্ধে এমন সুন্দর উপায় দৃষ্ট হয় না, প্রত্যেক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকের আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাড়ী জ্ঞানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। কারণ হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে রোগীর প্রকৃতি, ধাতু ইত্যাদি অনেক বিষয় জানিতে হয়। এই সকল বিষয় আয়ুর্ব্বেদে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে, ডাক্তারী ও আয়ুর্ব্বেদীয় নাড়ী পরীক্ষার বিষয় কিছু সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

বিশুদ্ধ রক্তবাহী শিরাকে ধমনী বলা যায়। সেই ধমনীকে নাড়ী বলে, ধমনী সকলের ভিতর দিয়া রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে শরীরের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়, হৃৎপিণ্ড বিশুদ্ধ রক্তকে প্রথমে বড় বড় ধমনীতে ঠেলিয়া দেয়, এবং ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ধমনী দিয়া প্রবাহিত হইয়া, শারীরিক তন্তু সকলের পোষণ করে, তাহার জন্যই মানব ক্রমে ক্রমে হৃষ্ট পুষ্ট হয়, হৃৎপিণ্ড যতজোরে রক্তকে ধমনী মধ্যে ঠেলিয়া দেয়, শরীরের সর্ব্বত্রে রক্ত তত জোরে ধমনী দ্বারা প্রবাহিত হয়, এই বিশুদ্ধ রক্তের গতি পরীক্ষাই নাড়ী পরীক্ষা।

হস্তের মণিবন্ধের ঠিক নিম্নে বা বৃদ্ধাঙ্গুলীর মুলদেশের নিম্নস্থল নাড়ী পরীক্ষার উত্তম স্থান। স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ও পুরুষের দক্ষিণ হস্তে নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়, নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়ম—গুলি যত্ন পূর্ব্বক পালন করা আবশ্যক।

১। রোগী কথা কহিলে নাড়ী পরীক্ষার গোলমাল হয়, তজ্জন্য সে সময় পরীক্ষা করা অনুচিত।

২। ভ্রমণের পর, আহারের পর, নিদ্রাবস্থায় বা নিদ্রার পর নাড়ী পরীক্ষা অনুচিত।

৩। রোগীর শারীরিক পরিশ্রম কিংবা মানসিক চিন্তার পর নাড়ী পরীক্ষা অনুচিত।

৪। নাড়ী পরীক্ষার পূর্ব্বে রোগীকে অন্ততঃ ১৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত স্থির ভাবে থাকিতে বলা উচিত, তৎপরে নাড়ী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ মতে নাড়ী পরীক্ষা করাই ভাল। প্রথমে তর্জ্জনী তৎপরে মধ্যমাঙ্গুলী অবশেষে অনামিকা, এই তিনটী অঙ্গুলী মণিবন্ধের ঠিক নিম্নে অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশের ঠিক নিম্নে ধমনীর উপর সমভাবে এরূপে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছানুসারে ঐ অঙ্গুলীর চাপ বৃদ্ধি ও কম করার সুবিধা হয় এবং প্রতি মিনিটে ঠিক কতবার চলিতেছে স্পষ্ট তাহা গুণিতে পারা যায়, নাড়ী পরীক্ষা কালীন দেখা উচিত যে, চাপ দ্বারা সহজে তাহা অবরোধ প্রাপ্ত হয় কিনা, সমভাবে চলে কি বিষম ভাবে চলে ক্ষণ বিলুপ্ত হয় কি, একেবারে বিলুপ্ত হয় বা ধীরে ধীরে চলে ইত্যাদি কি ভাবে চলে, মনোযোগ পূর্ব্বক অনুভব করা আবশ্যক।

নব প্রসূত শিশুর নাড়ী প্রতি মিনিটে ১৫০ হইতে ১৪০ বার পর্য্যন্ত চলে, ৬ মাস বয়স মধ্যে ১২০ হইতে ১০০ বার পর্য্যন্ত, ৬ মাসের পর ৭ বৎসর বয়স মধ্যে ১০০ হইতে ৮৫ বার, ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর মধ্যে ৮৩ হইতে ৮০ বার, পূর্ণ বয়স্কের নাড়ী ৭৫ হইতে ৭০ বার এবং পরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ীর গতি আরও কম হইতে থাকে, এমন কি, অতি বৃদ্ধদের নাড়ী কমিয়া প্রতি মিনিটে ৫০ বার পর্য্যন্ত চলিতে দেখা গিয়াছে; স্ত্রীলোকদিগের নাড়ী পুরুষ অপেক্ষা দ্রুত চলে, পূর্ণ বয়স্কা স্ত্রীলোকের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৮৫ হইতে ৮০ বার পর্য্যন্ত চলে, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের নাড়ী ৭০ হইতে ৬৫ বার পর্য্যন্ত চলে। এই প্রকারের নাড়ী সুস্থাবস্থার লক্ষণ, অসুস্থাবস্থায় ইহার তারতম্য হয়।

নাড়ীর গতি দ্বারা রোগীর যথার্থ অবস্থা বুঝা যায় এবং ঔষধ নির্ব্বাচনের সাহায্য করে। সাধারণতঃ নাড়ী কতিপয় প্রকারের দেখা যায়, যথা :— কঠিন, ধীর, দ্রুতগামী, পুনঃ পুনঃ গমনশীল, ক্ষীণ, ধীরগামী, মৃদু, শক্ত, দুর্ব্বল,

কঠিন নাড়ী।—ইহা চাপে অত্যন্ত শক্ত ও স্থির অনুমিত হয়, ইহার দ্বারা শরীরে রক্তাধিক্য হইয়াছে বুঝাযায়।

ধীর নাড়ী।—ইহা সুস্থাবস্থায়ও দেখা যায়, কিন্তু অধিক ধীর হইলে জীবনী শক্তির নিস্তেজ অবস্থা হইতেছে বুঝায়। জ্বরাতিসারে নাড়ীর গতি ঐরূপ ধীর হইলে, সাংঘাতিক অবস্থা আনয়ন করিতেছে অনুমান হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত ভয়ানক জ্বর ভোগের পর, জ্বরের মগ্নাবস্থায় ঐরূপ নাড়ী হইলে যদি সেই সময় উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা রোগীকে উত্তেজিত না করা যায়, তাহাতেও সংঘাতিক অবস্থা আনয়ন করে। এপোপ্লেক্সিস রোগে মস্তিষ্কে রক্তের চাপ পড়ার জন্য ঐরূপ নাড়ীর অবস্থা হয়। ইহাতেও প্রায় সাংঘাতিক অবস্থা আনয়ন করে। জ্বরাতিসারে কিংবা এপোপ্লেক্সিস (মস্তিষ্কের উপরের শিরা ছিন্ন বা মস্তিষ্কের শিরার মধ্যে রক্তাধিক্য হওয়া) রোগে বা এই প্রকারের রোগে (যাহাতে মস্তিষ্কে রক্তের চাপ পড়ে) নাড়ী অত্যন্ত ধীরগামী হয়। যদ্যপি ঐ নাড়ী ধীর, পূর্ণ ও ভার বোধ হয় তখন মনে করা উচিত যে, রোগীর স্নায়ু সমূহের শক্তির অভাব হইতেছে। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় কিংবা হঠাৎ মস্তকে কোনরূপ কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর, এইরূপ নাড়ী হইতে পারে, এ নাড়ীও সংঘাতিক অবস্থা প্রকাশ করে।

দ্রুতগামী নাড়ী।—ইহাতে ধমনীর ভিতর রক্ত শীঘ্র শীঘ্র প্রবাহিত হয়, যাহা নাড়ী স্পর্শে সহজে অনুমান করা যায়, এইরূপ নাড়ী নানা প্রকারে হইতে পারে। জ্বরের বৃদ্ধির সহিত নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। জ্বরাতিসারে বা ঐরূপ কোন তরুণ পীড়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে নাড়ী দুর্ব্বলতার সহিত অত্যন্ত দ্রুত চলে। এরূপ অবস্থায় নাড়ীর পরিবর্ত্তন করা অতীব কঠিন, যদ্যপি ঐ নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত এবং ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে রোগী দুর্ব্বলতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, বুঝা উচিত, এইরূপ নাড়ী স্পর্শে কেবল মাত্র কম্পন অনুমান হয়, স্পষ্ট গতি বুঝা যায় না। ইহাকে অসম্পূর্ণ নাড়ীও বলিতে পারা যায়। যক্ষ্মা রোগে কিংবা শ্বাস যন্ত্রের আবরণ ঝিল্লির প্রদাহে রোগের বর্দ্ধিত বা সাংঘাতিক অবস্থায়, নাড়ীর গতি এইরূপ ক্ষুদ্র ও দ্রুত দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের আবরণ ঝিল্লির প্রদাহে বা শ্বাস যন্ত্রের রোগে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত শরীরে জোরের সহিত প্রেরিত হইতে পারেনা, বলিয়া নাড়ীর গতি কম্পন শীল হয়, এবং ঐ রোগী যখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে, তখন আবার নাড়ী

পরিচায়ক এরূপ রোগীর প্রদাহ বিশিষ্ট নবজ্বর, চিকিৎসার দ্বারা নষ্ট না করিলে, রোগী ক্রমে বেশী পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হইয়া কাল গ্রাসে পতিত হইতে পারে। নাড়ী দ্রুতগামী পূর্ণ লম্ফবান বা কঠিন বোধ হইলে, রোগী প্রদাহ বিশিষ্ট তরুণজ্বরে আক্রান্ত মনে করিতে হইবে। মস্তিষ্কের প্রদাহে দ্রুতগামী নাড়ী ধীরগামী হইলে মস্তিষ্কের কোন একটী অপচয় হইতেছে, স্থির করিতে হইবে।

মৃদু নাড়ী।—ইহা অঙ্গুলীর নীচে মৃদুভাবে চলে, মৃদু নাড়ীর সহিত নাড়ীর ক্ষুদ্রত্ব বোধ করিলে রোগী দুর্ব্বল হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

শক্ত নাড়ী।—এই নাড়ী জোরে চাপিয়া ধরিলেও অঙ্গুলীকে জোরের সহিত ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয় এবং প্রত্যেক স্পন্দন স্পষ্ট অনুমিত হয়। শক্ত বেগবতী নাড়ী শরীরে রক্তাধিক্যের পরিচয় দেয়, যদ্যপি তাহার উপর নাড়ী আবার পূর্ণ বেগবতী থাকে, তাহা হইলে কোনরূপ প্রদাহের কারণে এইরূপ হইতেছে বুঝিতে হইবে, আক্ষেপ জনিত জ্বরে বা আক্ষেপিক কোন পীড়ায় নাড়ীর গতি শক্ত অনুমান হয়, বৃদ্ধদের ধমনীর সঙ্কেত হেতু নাড়ী এরূপ শক্ত হইয়া থাকে।

দুর্ব্বল নাড়ী।—ইহা চাপিয়া ধরিলে আর উঠিতে পারে না। কোন রোগীর চিকিৎসা কালীন বিনা উপসর্গে হঠাৎ নাড়ী সঙ্কোচিত হইলে, তাহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতেছে, বা শরীরাভ্যন্তরীয় স্নায়ুর আক্ষেপ হইতেছে স্থির করিতে হইবে, এরূপ হঠাৎ পরিবর্ত্তনশীল নাড়ী, জ্বরে অত্যন্ত মন্দ চিহ্ন, এবং স্নায়ু মণ্ডলীর কার্য্যের বিশৃঙ্খলা বশতঃ দুর্ব্বলতা জ্ঞাপক।

বৃহৎ নাড়ী।—এই নাড়ী স্পর্শ করিলে বোধ হয় ধমনী মধ্যে রক্ত প্রবাহে স্ফীত হইয়া চলিতেছে. এইরূপ নাড়ীর গতি অতীব সন্তোষ জনক। এই নাড়ী কোনরূপ প্রতিবন্ধক পাইয়া চলে না, রোগীর কোনরূপ আভ্যন্তরীণ আক্ষেপ এবং উত্তেজনা বা এই রকম কোনও পীড়ার উপশম অবস্থায়, নাড়ীর ভিতরে উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত থাকায়, নাড়ীর অবস্থা এইরূপ হয়। যদি ঐ নাড়ীর গতি পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত তরল হইতে না পারিয়া এরূপ হইয়াছে। এরূপ নাড়ী নখ দিয়া চাপিলে আর উঠিতে পারে না। জ্বরাতিসারে এইরূপ নাড়ীর গতি প্রায় দেখা যায়। নাড়ী রক্তে পূর্ণ হইয়া শক্ত বোধ হইলে বুঝিতে হইবে, রোগী কোনও কারণে

ক্ষুদ্র নাড়ী।—এই নাড়ী স্পর্শে অনুভব হয় যে, ধমনী মধ্যে অত্যন্ত সঙ্কোচ অবস্থা আসিতেছে। ইহাও দুর্ব্বলতার চিহ্ন। এরূপ নাড়ী কঠিন রোগের পর দেখা যায় বটে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে বিশেষ মারাত্মক হয় না। তরুণ পেটের পীড়ায় সচরাচর এরূপ নাড়ী দেখা যায়। ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থায়ও এরূপ নাড়ী দৃষ্ট হয়, সবল লোকের এরূপ নাড়ী হইলে হঠাৎ কোন সাংঘাতিক অবস্থা আনায়ন করিতেছে বুঝিবে।

পূর্ণ নাড়ী।—ইহাতে ধমনী রক্তে পূর্ণ আছে বুঝায়, কিন্তু বৃহৎ নাড়ীর মত ধমনী মধ্যে স্ফীত হইয়া চলে না। এই নাড়ী দ্রুত চলিলে জ্বর বুঝিতে হইবে। পিত্ত জনিত জ্বরে নাড়ী এইরূপ চলে।

অসম্পূর্ণ নাড়ী।—ইহা দ্বারা ধমনী মধ্যে রক্ত অত্যন্ত কম হইয়াছে বুঝা যায় এবং ইহাতে নাড়ীর গতি অত্যন্ত বেগবতী কিন্তু ক্ষুদ্র থাকে, প্রতি মিনিটে ১২০ হইতে ১৯৫ বার পর্য্যন্ত চলিতে পারে; ইহার দ্বারা রোগীর দুর্ব্বলতার চরম সীমা হইয়াছে বুঝা উচিত। এরূপ নাড়ীর গতিও অনেক সময় স্পষ্ট বুঝা যায় না, ধমনী মধ্যে কেবল মাত্র কম্পন হইতেছে অনুভব হয়। শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের প্রদাহের চরম অবস্থায় এরূপ নাড়ী দেখা যায়, ওলাউঠা রোগেও নাড়ী প্রায় এরূপ হয়।

পরিবর্ত্তন শীল নাড়ী।—এই নাড়ী কখন সমভাবে কখন বিষম ভাবে, কখন ধীরগামী কখন দ্রুতগামী ইত্যাদি নানা ভাবে চলিয়া থাকে। স্নায়ুগত পীড়ায় নাড়ীর গতি এইরূপ হয়। জ্বরে জীবনীশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ জন্যও এইরূপ হয়। হঠাৎ কোনও পীড়ায় ঐরূপ নাড়ী মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ বুঝায়, শ্বাস যন্ত্রের প্রদাহ বশতঃ ঐ যন্ত্র মধ্যে বেশী রক্ত সঞ্চয় জন্য ঐরূপ হইলে রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন বুঝিতে হইবে। জ্বরে হঠাৎ পরিবর্ত্তন-শীল নাড়ী অত্যন্ত মন্দ চিহ্ন, এই সকল নাড়ী পরীক্ষা করিলে বুঝা যায়, স্নায়ু-মণ্ডলীর কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ী।—এই নাড়ী কখন আছে, কখন নাই, অনুভব হয়। ক্ষণবিলুপ্ত নাড়ীর দ্বারা হৃৎপিণ্ডের রোগ আছে বুঝিতে হইবে। কোন প্রদাহ বিশিষ্ট তরুণ পীড়ার শেষে ঐরূপ নাড়ী হইলে রোগীর জীবনী শক্তির সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে এবং রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে বুঝা উচিত, ওলাউঠা রোগের পতনাবস্থায় এরূপ নাড়ী সর্ব্বদা দেখা যায়।

কারণ মহাত্মা হ্যানিম্যানের চিকিৎসা প্রণালীতে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ধাতু বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পীড়া আনায়ন করিবার ক্ষমতা আছে, তজ্জন্য রোগ আরোগ্য করিতে ধাতু সম্বন্ধে জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগীর যথার্থ ধাতু সম্পূর্ণ অনুভব করিতে না পারলেও, কোন্ ধাতুর রোগী, কতক পরিমাণে স্থির করিতে পারা যায়, ভারতবর্ষের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে যে, চিকিৎসকের সর্ব্বাগ্রে নাড়ী পরীক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ মতানুযায়ী নাড়ী প্রধানতঃ তিন রকম, যথা।—বায়ু পিত্ত কফ। ইহা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার মিশ্রিত নাড়ী আছে, যথা।—বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা এবং বায়ু পিত্ত কফ মিশ্রণ ইত্যাদি। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে অনেক সময় আয়ুর্ব্বেদোক্ত ধাতু ও নাড়ী জ্ঞানের প্রয়োজন।

১। বায়ুপ্রধান ধাতুর নাড়ী সজোরে চলিতে থাকে, সুতরাং কোন পীড়িত ব্যক্তির নাড়ী জোরের সহিত চলিলে এবং তৎসঙ্গে বায়ু বৃদ্ধির জন্য ভুলবকা বা বেশী বকা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, তাহাকে বাতজ পীড়া বলিতে হইবে।

২। পিত্ত প্রধান ধাতুর নাড়ী ঘন ঘন চলে, সেই জন্য পীড়িত ব্যক্তির নাড়ী ঘন ঘন চলিলে পিত্তজ পীড়া বুঝিতে হইবে।

৩। শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুর নাড়ী মোটা হইয়া চলে, তজ্জন্য নাড়ী বেশী মোটা দেখিলেই, শ্লেষ্মা জনিত পীড়া বুঝিতে হইবে।

৪। যে নাড়ী জোরের সহিত মোটা হইয়া চলে, তাহাকে বাতশ্লেষ্মার নাড়ী বলে।

৫। যে নাড়ী জোরের সহিত ঘন ঘন চলে তাহাকে বাত পিত্তের নাড়ী বলে।

৬। যে নাড়ী ঘন ঘন মোটা হইয়া চলে তাহাকে পিত্ত শ্লেষ্মার নাড়ী বলে।

৭। যে সকল নাড়ী জোরের সহিত মোটা হইয়া ঘন ঘন চলে তাহাকে ত্রিদোষজ নাড়ী বলে।

প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নাড়ী ঔষধ সম্বন্ধে লিখিবার সময় লিখিত হইবে এখানে তৎসম্বন্ধে লেখা অনাবশ্যক বিবেচনায় লিখিত হইল না।

(ক্রমশঃ)

পদ্মাবতী।

(পৌরাণিক গল্প!)

"পতির পবিত্র ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ,
পুত্রমুণ্ড করে সতী স্বহস্তে ছেদন!"

আধুনিক ছোটনাগপুরের প্রাচীন নাম অঙ্গদেশ। পৌরাণিক যুগে মহাবীর কর্ণ এই অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। মহাত্মা কর্ণ যেমন যুদ্ধ-বীর তেমনি দান-বীরও ছিলেন। তাই তিনি দাতাকর্ণ বলিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। কর্ণের দানশীলতা ও সত্যবাদিতা তাঁহার রণ নৈপুণ্য-তার বিমল যশঃরাশিকেও ম্লান করিয়াছিল। কর্ণ রণ-বীর দান-বীর ও সত্য-বীর।

সতী পদ্মাবতী এই মহাপ্রাণ মহাবীর মহাদাতা মহারাজ কর্ণের মহা-মহিমান্বিতা মহাপ্রাণা মহীয়সী মহিষী। মহারাণী পদ্মাবতী স্বামীর সত্য-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্বহস্তে একমাত্র প্রাণ-প্রতিম পুত্রের মুণ্ড ছেদন করিয়া—স্বয়ং সেই পুত্র-মাংস রন্ধন করিয়া পতির আতথি-সেবা ধর্ম্মের সহায় হইয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্রিভুবন দুর্লভ আত্মত্যাগ—স্বামী ধর্ম্মের জন্য পাষাণ-কঠিন প্রাণে রাক্ষসীর ন্যায় মাতৃস্নেহের বিসর্জ্জন বিশ্ববাসীর নিকট এক বিস্ময়কর অদ্ভুত ঘটনা। তিনি জানিতেন, শত কঠোর—সহস্র বৃশ্চিক দংশন জ্বালাপ্রদ হইলেও স্বামীর ধর্ম্মরক্ষার সহায় হইয়া—স্বামীর সত্য-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণ করা, এমন কি আবশ্যক হইলে প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াও স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং পতিব্রতা নারীর সারধর্ম্ম।

একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাদশীর উপবাস অন্তে মহারাজ কর্ণের নিকট উপনীত হইয়া পারণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা প্রার্থীত আহার্য্য দানে ব্রাহ্মণকে তৃপ্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"মহারাজ! আমার প্রার্থীত আহার্য্য দানে সমর্থ হই-লেনত? আমি উপবাসক্লিষ্ট ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ, দেখিবেন, শেষে অতিথি-প্রত্যাখ্যান করিয়া—প্রার্থীকে বিমুখ করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দুরপনেয় পাতকে মগ্ন হইবেন না।

ব্রাহ্মণ।—মহারাজ! বীরের নিকট জীবন অতি তুচ্ছ পদার্থ; জীবনদান অপেক্ষাও কঠোর কার্য্য আছে।

রাজা।—আপনার ভোজনতৃপ্তির জন্য আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

ব্রাহ্মণ।—উত্তম। মহারাজ! আপনি স্বয়ং রাজমহিষীসহ একত্র হইয়া করাত যন্ত্র দ্বারা আপনার পুত্র রাজকুমার বৃষকেতুকে কাটিয়া সেই মাংস মহারাণী স্বহস্তে রন্ধন করতঃ আমাকে ভোজন করাইবেন। কিন্তু সাবধান মহারাজ! পতি-পত্নী মিলিয়া অম্লানবদনে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে; পুত্রশোকে একবিন্দু উষ্ণ অশ্রুপাত হইলে বা একটিবার দুঃখ প্রকাশক 'আহা' শব্দটি করিলে ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে না।

অতিথির এই অভাবনীয় নিষ্ঠুর বাণী শ্রবণে রাজা বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন। অতঃপর আপনার বুকের মাংস দ্বারা ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের ভোজন তৃপ্তি সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বীর-দেহের কঠিন মাংস অপেক্ষা শিশুর কোমল মাংসই তাঁহার সমধিক তৃপ্তিপ্রদ বলিয়া ব্রাহ্মণ, রাজার প্রার্থনা প্রত্যাক্ষণ করিলেন। ক্রুর ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,— "মহারাজ! অতিথি প্রত্যাখ্যানের দুরপণেয় পাপও জানেন? আমার প্রার্থীত মাংস প্রদানে অসক্ত হইলে সত্বর বলুন, আমি এখনই এখান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করি।"

মহাবীর কর্ণ এতক্ষণে বুঝিলেন, প্রাণদান অপেক্ষাও কঠিন কার্য্য আছে। প্রাণ অতি তুচ্ছ তাহা সকলেই দিতে পারে। কিন্তু দম্পতী একত্র মিলিয়া স্বহস্তে পুত্রের মস্তক ছেদন এবং পুত্র মাংস রন্ধন করিয়া ভোজনার্থ অতিথিকে অর্পণ করা বড় সহজসাধ্য কর্ম্ম নহে। হায়! স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া কোমলহৃদয়া পদ্মাবতী, জননী হইয়া কেমন করিয়া এই ভীষণ কার্য্য সম্পাদন করিবেন? উঃ কঠিন হৃদয়া রাক্ষসী জননীও এমন করিয়া আপনার গর্ভপ্রসূত পুত্র মুণ্ড ছেদন ও পুত্র মাংস রন্ধন করিতে পারে না। রাজা এইরূপ বিষম চিন্তায় অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়বৎ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

মহাত্মা কর্ণ কিছুকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "দেব! আমার একটি প্রার্থনা আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। রমণী হৃদয় সহজেই বড় দুর্ব্বল—নারী সকল ক্লেশ অবাধে সহিতে পারিলেও তাঁহার পক্ষে স্বহস্তে আপনার স্নেহের ধন পুত্রের জীবন [illegible]

ভোজনার্থ অর্পন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; বাঘিনীও যে এত নৃশংশ হইতে—এমন ভীষণ কার্য্য করিতে পারে না। অতএব পদ্মাকে ছাড়িয়া আমি একাই স্বহস্তে পুত্রমুণ্ড ছেদন ও রন্ধন করিয়া আপনাকে ভোজনার্থ দিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে এই অনুমতি প্রদানে কৃতার্থ করুন।"

ব্রাহ্মণ।—মহারাজ! ধর্ম্মকার্য্য সস্ত্রীক করাই বিধি, তাই স্ত্রীর এক নাম সহধর্ম্মিণী। সুতরাং আপনারা দুই জনেই একার্য্য সম্পন্ন করিবেন। অন্যথা বলুন, আমি অন্যত্র গমন করি—এমন আতিথ্যে আমার প্রয়োজন নাই।

ধর্ম্মাত্মা কর্ণ রুষ্ট ব্রাহ্মণকে বিনীত বাক্যে তুষ্ট করিয়া বসাইলেন—অতঃপর এই হৃদয় বিদারক নিদারুণ সংবাদ লইয়া অন্তঃপুরে মহারাণী পদ্মার নিকট গমন করিলেন।

অন্তঃপুরে সুসজ্জিত সুরম্য প্রকোষ্ঠে স্বর্ণপালঙ্কে বৃষকেতুর মুখ পানে তাকাইয়া তাহার সদ্যশিক্ষালব্ধ শ্লোকাবলীর সুন্দর আবৃত্তি—পুত্র-মুখ নিঃসৃত সেই অমিয় মধুর ভক্তি গাঁথা শ্রবণে অমৃত পানের সুখানুভব করিতেছেন। শিশু পড়িতে ছিল,—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

এবং,—

"মাতৃ পদাম্বুজ রেণু সর্ব্বাঙ্গে লেপয়েৎ যদি।
চরমে জাহ্নবী তোয় তুল্য মুক্তি লভেন্নর॥

তারপর,—

"আদায় বেদাঃ সকল সমুদ্রা নিহত্য শঙ্খং
রিপু মত্যাদস্ত্রং।
দত্তাঃ ভুরী যেন পিতামহায় বিষ্ণুং তমাদিং
ভজ মৎস্যরূপং॥" ইত্যাদি।

এমত সময় মহাবীর কর্ণ সেই নিদারুণ বার্ত্তা লইয়া ধীর কম্পিত পদবিক্ষেপে মহিষীর প্রাসাদ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মরন্তুদ দুঃখদগ্ধ সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাসে মহারাণী পদ্মাবতীর হৃদয় কম্পিত হইল। শিশু পুত্র দৌড়িয়া যাইয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমার শ্লোক পাঠ শুনিয়াছ বাবা? কেমন ভাল পড়িয়াছিলাম না বাবা?" সহিষ্ণুতার আধার কর্ণ অতি কষ্টে

এমত সময় ধাত্রী আসিয়া আহারের জন্য শিশুকে লইয়া গেল। পিতা অশ্রুপূর্ণলোচনে অনন্ত দৃষ্টে প্রাণাধিক স্নেহভাজন পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পদ্মা দেখিলেন, পতির মুখ-পদ্ম বিষাদ কালিমাপূর্ণ, ঘন ঘন নিশ্বাস তাঁহার প্রাণের কি যেন এক অব্যক্ত গভীর দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। এ অভাবনীয় শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া পদ্মা ভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বিনয়-মধুর-নম্রবচনে সহসা স্বামীর এই ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসিলেন।

কর্ণ ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে অতিথি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ পত্নীর নিকটে বর্ণনা করিয়া বলিলেন। সে বজ্র কঠোর নিদারুণ বাণী শ্রবণে অপত্য বৎসলা পদ্মা বাতাহতা স্বর্ণলতিকার ন্যায় অবসন্ন দেহে স্বামীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। কর্ণ ডাকিলেন, "পদ্মা!" পদ্মার উত্তর নাই, তিনি মুর্চ্ছিতা।

পতির ঐকান্তিক যত্নে পত্নীর মুর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। ধীরে ধীরে তিনি পতি পদপ্রান্তে উঠিয়া বসিলেন।

রাজা কহিলেন, "পদ্মা! তুমি বীরকন্যা বীরমহিষী এবং আমার ধর্ম্ম কার্য্যের নিয়ত সাহায্যকারিণী—পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী; পাষাণে বুক বাঁধিয়া আমার ধর্ম্মকার্য্যের সহায় হও, বিপদে বিহ্বল হইও না—কঠোর কর্ত্তব্যে অবহেলা করিও না। প্রকৃত বীরাঙ্গনার ন্যায় অচল অটল হৃদয়ে দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রস্তুত হও।"

পদ্মা বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমার স্বামী! স্বামী দেবতা। আমি আমার সেই মুর্ত্তিমান প্রত্যক্ষ দেবতার নিকট আন্তরিক বল প্রার্থনা করিতেছি। আমি তোমা ভিন্ন অন্য দেবতা জানি না—তোমার পাদপদ্ম সেবা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম মানি না। আমার নিকট তুমি বড়, তোমার নিকট তোমার ধর্ম্ম বড়, সুতরাং তোমার চেয়েও আমার নিকট তোমার ধর্ম্মই বড়। তোমার ধর্ম্ম রক্ষা অপেক্ষা আমার নিকট আর কিছুই বড় নহে; কিছুই বেশী নহে। আমি তোমার ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত সব করিব, সব সহিব। কিন্তু প্রভু! তুমি জান নারীহৃদয় বড় দুর্ব্বল। তুমি আমায় বল দাও, বুদ্ধি দাও, সাহস দাও। আশীর্ব্বাদ কর, আমার এ স্নেহ মমতাপূর্ণ দুর্ব্বল প্রাণ—অবসন্ন দেহ-মন তোমার ধর্ম্মরক্ষার উপযোগী বল সংগ্রহ করিয়া পাষাণ কঠোর হউক!"

যোগনিরতা যোগিনীর ন্যায় মহাধ্যানে মগ্ন হইলেন। ধ্যানস্থা পদ্মা যোগ-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান নারায়ণ পতিরূপে বসিয়া আছেন। এবং তিনিই আবার বৃষকেতুর সুকোমল মাংস ভক্ষণে উদর পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ অতিথি রূপে উপস্থিত হইয়া বহির্ভবনে উপস্থিত আছেন। পদ্মা দেখিলেন, বিশ্বময় ভগবান বিশ্বেশ্বর বিরাজ করিতেছেন, তিনি কে, বৃষকেতু কে, কর্ণ কে, ব্রাহ্মণ অতিথিইবা কে?—সর্ব্বঘটে সেই একমাত্র ভগবান বর্ত্তমান!

দেখিলেন পদ্মা, "সমস্ত জগতে
এক মহাপ্রাণ, একই প্রাণী।
নারায়ণ! সেই মহাপ্রাণ
তোমার, আমার, জগৎময়।
পতঙ্গে, বিহঙ্গে, পাদপে, লতায়,
এক মহাপ্রাণ,—দ্বিতীয় নয়।"
"নরের আশ্রয় বিষ্ণু, সর্ব্বভূতময়!
উভয় অনন্ত নিত্য, উভয় অব্যয়!"

পদ্মা সর্ব্বভূতে সেই বিশ্বময় বিশ্বেশ্বরের বিভূতি দর্শন করিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। তিনি দেখিলেন, জগন্ময় এক নারায়ণ। স্বামীরূপ ধ্যান করিতে করিতে পদ্মার মানসপটে বিশ্বরূপ দর্শন হইল। ধ্যানস্থা পদ্মা শ্রীভগবান জ্ঞানে পতির চরণে প্রণাম করিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইল। মহিষী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন তখনও তাঁহার মস্তক পতি-পদতলে বিলুণ্ঠিত।

পদ্মা প্রাণে বল পাইলেন। তিনি উঠিয়া ধীর প্রশান্ত মনে স্বামীকে বলিলেন,—"চল প্রভু! স্বহস্তে পুত্র বৃষকেতুর মস্তক ছেদন ও রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব।

তাহাই হইল। দম্পতী মিলিয়া করাত অস্ত্রে প্রাণাধিক পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া—রাণী পদ্মা স্বহস্তে সেই মাংস রন্ধন করতঃ ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভোজনার্থ সাদরে আহ্বান করিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রফুল্লচিত্তে আহার করিতেবসিলেন। রাণী পদ্মাবতী স্বর্ণথালায় করিয়া অন্ন—স্বর্ণ বাটীতে ভরিয়া পুত্রের সপ্তমাংস আনিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজনার্থ প্রদান করিলেন।

নহে; তোমরা একটি বালককে আমার সহিত একত্র ভোজন করিতে ডাকিয়া দাও।"

ধর্ম্মবীর কর্ণ বালকের সন্ধানে বহির্ভবনে গমন করিলেন। সিংহদ্বারে যাইয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিষম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। রাজা বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার একমাত্র স্নেহেরধন পুত্র বৃষকেতু—যাহাকে তাঁহারা পতি-পত্নীতে মিলিয়া এইমাত্র স্বহস্তে হত্যা ও রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণের ভোজনতৃপ্তির জন্য অর্পণ করিয়াছেন—সেই পুত্র বৃষকেতু রাজপ্রাসাদের অদূরে খেলার সাথীদের সহিত একত্র খেলিতেছে! আত্মচক্ষুর প্রতি কর্ণের অবিশ্বাস হইল। তখন পুত্র বৃষকেতু বাবা—বাবা! বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পিতার ক্রোড়ে উঠিল। সে মধুর শীতল স্পর্শে অপত্যবৎসল কর্ণের প্রাণ-মন শীতল হইল। তিনি হারাধন ফিরিয়া পাইয়া বুঝিলেন, এ অতিথি কে?

কর্ণ পুত্র ক্রোড়ে পাইয়া পদ্মার সম্মুখীন হইয়া দেখিলেন, অতিথি ব্রাহ্মণ আর তথায় বসিয়া নাই। ব্রাহ্মণ সহসা কোথায় গেলেন—তাঁহার কি হইল?—সে বিরাট রাজপুরীর কেহই তাহা বলিতে পারিল না। অতিথির আকস্মিক অন্তর্ধানে ও প্রিয়তম পুত্রের পুনঃদর্শনে পদ্মা মহা বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে মূর্ত্তিমান নারায়ণ জ্ঞানে পতি-পদে প্রণাম করিয়া—তাঁহাকেই বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর জ্ঞানে ধ্যান করিয়া পূজা-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে কৃতার্থ হইলেন।

এখন আর কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, এ অতিথি স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীনারায়ণ। সতীর পতি-ভক্তি পরীক্ষা—ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ অতিথি রূপে দাতাকর্ণের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অপার কৃপায় মহাবীর কর্ণ "দাতা কর্ণ" নামে চির পরিচিত এবং সতীলক্ষ্মী পদ্মাবতী আদর্শ সহধর্ম্মিণীর উচ্চ গৌরবে গৌরবান্বিত হইলেন। দাতাকর্ণের অদ্ভুত আতিথেয়তা এবং কর্ণের আদর্শ সহধর্ম্মিণী পতিব্রতা পদ্মার অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ-মাহাত্ম্য জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। বিশ্ববাসী বিস্মিত নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, পতির জন্য সতী সব করিতে পারেন—পতির ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত সতী অকাতরে সব করিয়া থাকেন। ধন্য দাতাকর্ণ। ধন্য পতিব্রতা সতী পদ্মাবতী।।

সমালোচনা।

জগতের সভ্যতার ইতিহাস,—সূচনা।—শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মুর্শিদাবাদ কাশিম বাজারের মহারাজ অনারেবল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যা-রঞ্জন মহাশয়ের করকমলে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উৎসর্গিত। উৎসর্গ পত্রে গ্রন্থকার যে তিনটী বিশেষণ মহারাজের নামের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে উপযুক্ত। "বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বিকাশ বন্ধু জাতীয় সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠ পোষক" আর "বঙ্গের বিক্রমাদিত্য"। সকল গুলিই উপযুক্তরূপে ব্যব-হৃত হইয়াছে। সভ্যতারইতিহাস-ইতিহাস ইতঃ পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, কেহ কোথাও আংশিক প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে, হয়ও নাই। বিষয়টীও বড়ই গুরুতর এবং বহুব্যয় ও শ্রমসহিষ্ণুতা সাধ্য। কুবেরকল্প মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থাভাব নাই এবং যাঁহার শ্রমশীলতা ও লিপি কুশলতায় রাজস্থান, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের মহান্ অভাব মিটিয়াছে, তাঁহার যত্নে যে জগতের সভ্যতার ইতিহাস বাঙ্গালা সাহিত্যের মহদুপকার সাধন হইবে সে পক্ষে সন্দেহ নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি জগতের সভ্যতার ইতিহাসের সূচনা মাত্র ২০৮ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। গ্রন্থকারের ভাষার পরিচয় দিতে হইবে না! ভাষা মার্জ্জিত—নির্দ্দোষ— এবং প্রাঞ্জল। আমরা হিন্দু, বেদ আমাদের গ্রহণীয় গ্রন্থ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করি। সুতরাং অভ্যাস বশতঃ আমরা বেদকে নিত্য মানিয়া থাকি। পাশ্চাত্য জগৎ ইহাতে সম্মত নহে। আমাদের মধ্যে দুই একটী হিন্দুকুলকজ্জলও স্বার্থের বশীভূত হইয়া তাহার পোষকতা করিয়া থাকেন; তাহাতে কিছু আসে যায় না—অন্ধে যদি বলে আকাশে সূর্য্য নাই, তাহা হইলে সে সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ পাইবে এমন কথা নহে।

ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি কীর্ত্তিমান পুরুষ পৃথিবীর মধ্যে যে সকল প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া কথিত, সেই সকল স্থান উৎখাত করিয়া প্রাচীন কীর্ত্তির উদ্ধার সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের দেখাদেখি কোন কোন ভারত সন্তান তাহাতে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া আমাদের অন্ধকার-ময় মানসাকাশে আশার ক্ষীণালোকের সঞ্চার হইতেছে কিন্তু ভারতের পুণ্য-ভূমি অনেক পুণ্যময়ী কির্ত্তিরও সংখ্যা হয়না। এখানকার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, পর্ব্বতে কন্দরে নানা স্থানে নানা ভাবে পুরাতত্ত্ব নিহিত আছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"রামায়ণের অনন্ত সৌন্দর্য্য কি চিরকালই কূপকালঙ্কারে আচ্ছাদিত থাকিবে? না রামায়ণের এবং অযোধ্যা ও লঙ্কার

পূর্ব্বে সীতাবিরহকাতর শ্রীরামচন্দ্রের গভীর শোকোচ্ছ্বাসে সুর মিশাইয়া পশু পক্ষীকুলকেও কাঁদাইয়াছিল, সেই পুষ্প বর্ত্তমান একভদ্রার অঙ্গবিশেষে সংলগ্ন থাকিয়া সেই ভাবেই প্রবাহিত হইতেছে। কে তাহার সেই প্রাচীন কর্ণে স্বরলহরী আবার জাগাইয়া তুলিবে?" "উত্তরে আমরা বলিব—"কেন, আপনি?" গ্রন্থকার যে বহুগ্রন্থ পাঠে বহুতথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা এই সূচনা পাঠেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। তিনি বেদ পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সংস্থাপনে সমর্থ হইবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। গ্রন্থকার সভ্যতার যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার নিকট অন্যবিধ যুক্তি তর্ক দাঁড়াইতেই সক্ষম নহে, তাহা সর্ব্বতো ভাবে প্রশংসার যোগ্য—"বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রাদির অনুমোদিত ও সামাজিক অবস্থা ব্রহ্মণ্যতাদের পিতৃভক্ততা সৌম্যতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ শীলের আধার সাধুগণের সদাচার যাহার জীবন স্বরূপ এবং যাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্ব বিষয়ে সকল মনুষ্যের এবং ইতরপ্রাণীগণের চরম সুখ বিধান করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বা মোক্ষের পথে লইয়া যায়, তাহাই সভ্যতা। ইহার একটী কথাও বাদ দিবার নহে। অধ্যাপক মোক্ষমুলরের মত গ্রন্থকার যেরূপ তীক্ষ্ম তর্কাস্ত্রে খণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করিবেন, তবে যাঁহারা নিরপেক্ষ তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইবারই কথা। যথা লোকক ও ফরাসী সুধী মুখে জাকোলে—তাহারা স্বপ্ন প্রণীত India in Greece এবং Bible in India গ্রন্থ দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার প্রাধান্য প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থের সূচনা দেখিয়া মনে হয় যে মূল গ্রন্থখানি ৭।৮ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। যেদিন ইহার শেষ খণ্ড পড়িবার সুযোগ পাইব সেদিন জীবনের একটা অতি প্রয়োজনীয় কাজ সিদ্ধ হইল মনে করিব। গ্রন্থকার কতকগুলি নূতন শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে ব্যবহার করিয়া মাতৃভাষার শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন, যথা উত্তিতীষু প্রীনন, ক্রকচ, বিপাটিত, উন্মগ্ন, ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য বড় বড় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মত যে, গ্রন্থকার একবারে উপেক্ষায় উড়াইয়া না দিয়া তাঁহাদের কথায় তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। যেদিন ভারতীয় সভ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, সেদিন গ্রন্থকার এবং তাঁহার পৃষ্টপোষক বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে অমরত্ব লাভ করিবেন, তাঁহাদের শ্রমত ও অর্থব্যয় সফল হইবে। বঙ্গদেশে অনেক ধনী বাস করেন, তাঁহাদের বিলাস ব্যসনেও অনেক অর্থের অপব্যয়ও হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার জন্য অতি সামান্যও ব্যয় করেন তাহা হইলেও অনেকটা উপকার হয়, অর্থের সার্থকতা জন্মে। পুস্তক খানির ছাপা অতি সুন্দর, কাগজ ও বাঁধাইও তদ্রূপ প্রথম সংস্করণে এরূপ নির্ভুল ছাপা আমরা পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, ছবি গুলিরও প্রশংসা করিতে হয়।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। | ১৩২১ সাল, ভাদ্র। | ৫ম সংখ্যা।

ময়দানব।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

ময়দানব অনেক কালের—ময় লঙ্কেশ্বর দশাস্তের পত্নী মন্দোদরীর পিতা, সুতরাং তাহা ত্রেতাযুগের কথা, কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সত্যযুগে দানবপতি বৃষপর্ব্বার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের জন্য মণিময় ভাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দক্ষ-কন্যা দনু যে চত্বারিংশৎ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন,—বৃষপর্ব্বা তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠান কালে ময়ের অস্তিত্ব হেতু তাঁহাকে সত্যযুগে প্রাদুর্ভূত বলিয়া গণ্য করিতে হয়। বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ দেবশিল্পী, ময় সেইরূপ দানব-শিল্পী। ময়দানবের অবস্থিতিস্থান প্রাচীন খাণ্ডবপ্রস্থ—এই খানেই পাণ্ডবগণের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী। খাণ্ডবপ্রস্থের অধিকাংশই অরণ্যময় হইলেও তাহাতে অনেক ঋষি তপস্বী বাস করিতেন। খাণ্ডবপ্রস্থ দগ্ধ হইবার

দানব কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের কৃপায় রক্ষা পাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাণ্ডবদিগের জন্য এক পরম রমণীয় সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। খাণ্ডবপ্রস্থের যে স্থানে ময়দানবের বাস ছিল এক্ষণে তাহা মিরাট নামে প্রসিদ্ধ। ময়দানবের রাষ্ট্র বলিয়া উহা ময়রাষ্ট্র নামে অভিহিত হয়, রাষ্ট্রর অপভ্রংশ বা পল্লীভাষা (পালী) রাট্ঠ ময়রাট্ঠ হইতে উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ মিরাট হইয়াছে। মিরাট কলিকাতা হইতে প্রায় সহস্র মাইল। এখানে অদ্যাপি ময়দানবের অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অদূরবর্ত্তী স্থানে মিরাট নগরের সংলগ্ন স্থানে ময়-কন্যা মন্দোদরীর পূজিত মহাদেব আছেন, তিনি মন্দোদরীর নামেই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। মিরাটযাত্রী মাত্রেই তাহা দেখিয়া থাকেন। মিরাট যে খাণ্ডবপ্রস্থের অন্তর্গত তাহা ইন্দ্রপ্রস্থের সামীপ্য হেতু স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ইহাই প্রাচীন খাণ্ডববন। দ্বাপরযুগে ইহাই কৃষ্ণার্জ্জুন দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিল। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতে খাণ্ডবদাহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কোথায় হিমাচলের পাদদেশবর্ত্তী মন্দোদরীর পিত্রালয় ময়রাষ্ট্র—আর কোথায়—বরুণালয় বিশোভিত রাবণের সোণার লঙ্কাপুরী, কেমন করিয়াই বা রাবণের সহিত মন্দোদরীর পরিণয় সংঘটিত হইল তাহা জানিবার জন্য সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইতে পারেন।

বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণ দিকবর্ত্তী কানন মধ্যে একদা ময়দানব কন্যা মন্দোদরীকে লইয়া বেড়াইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে লঙ্কাধিপতি দশাস্যের সহিত সাক্ষাৎকালে রাবণ তাঁহাকে তাঁহার পরিচয় এবং কিজন্য সেই শার্দ্দূলাদি শ্বাপদ সঙ্কুলস্থলে লাবণ্যবতী ললনাকে লইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন জিজ্ঞাসিলে ময়দানব উত্তর করিলেন,—"দেবলোকে হেমনাম্নী এক অপ্সরা আছে ইহা পূর্ব্বেই শুনিয়া থাকিবেন, ইন্দ্রকে পৌলোমীর ন্যায় দেবতারা আমাকে সেই অপ্সরা সম্প্রদান করেন। আমি সহস্র বৎসর তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়াছিলাম—এক্ষণে সে দেবকার্য্যের জন্য দেবলোকে চলিয়া গিয়াছে। তাহার বিরহে আমার ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এতাবৎকাল মধ্যে আমি বিচিত্র কৌশলে বজ্র এবং বৈদূর্য্য সমূহে চিত্রিত হেমময় পুর নির্ম্মাণ করি। তাহার বিরহে অতিশয় দুঃখিত হইয়া দীনভাবে সেই পুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম। এক্ষণে সেখান হইতে কন্যাকে লইয়া

লইয়াছে। ইহার উপযুক্ত পতির অনুসন্ধানের জন্য ইহাকে সঙ্গে লইয়া বনে আসিয়াছি। কেননা মানাকাঙ্ক্ষী সকল ব্যক্তিরই কন্যার পিতা হওয়া দুঃখদায়ক, বিশেষতঃ কন্যা—পিতৃকুল এবং মাতৃকুল সততঃ সংশয়ে স্থাপিত করিয়া অবস্থিতি করে। আর সেই স্ত্রীর গর্ভে আমার দুইটী পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমটীর নাম মায়াবী আর দ্বিতীয়টীর নাম দুন্দুভি। হে রাজন্ তোমার প্রশ্নানুসারে যথাযথ সমস্ত বলিলাম,—বৎস তুমি কে? তাহা কিরূপে জানিতে পারিব?" সেই রাক্ষস এই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে বলিল,—"আমি ব্রহ্মার পৌত্র, পুলস্ত্যতনয় বিশ্রবা মুনির পুত্র, আমার নাম দশানন।" তখন দানবশ্রেষ্ঠ ময়দানব রাক্ষসরাজের এই কথা শুনিয়া তাহাকে ঋষি-পুত্র বলিয়া জানিলেন এবং ইহা জানিয়াই তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে বাসনা করিলেন। তখন দৈত্যেন্দ্র ময় কন্যার কর দ্বারা তাহার কর গ্রহণ করাইয়া সহাস্যে রাক্ষসরাজকে বলিলেন—"রাজন্ আমার এই কন্যাকে হেমা অপ্সরা গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করিয়াছে, তুমি এই মন্দোদরী কন্যাকে পত্নী করিবার জন্য গ্রহণ কর।" দানব কহিল,—"আপনার কথায় আমি স্বীকৃত হইলাম।" অবশেষে সে সেইস্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার পাণি-গ্রহণ করিল। রাবণ "দানব-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে" তপোধন বিশ্রবা প্রদত্ত তাহার এই শাপের বিষয় ময়দানব শুনিয়াছিল। সুতরাং কন্যাদান না করিলে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, ইহা বুঝিয়া এবং পিতামহ ব্রহ্মার বংশে তাহার উৎপত্তি জানিয়া ময় তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিল। যে শক্তি অস্ত্র দ্বারা রাবণ লক্ষ্মণকে হনন করিয়াছিল, ময় দুষ্কর তপস্যা দ্বারা লব্ধ পরম অদ্ভুত সেই অমোঘ শক্তি তাহাকে দান করিল। *

রামায়ণ উত্তরা কাণ্ডে সীতার অন্বেষণকালে হনুমান যখন অঙ্গদাদি বানরগণের সহিত বিন্ধ্যাগিরির গুহা বন প্রস্রবনাদি খুঁজিয়া নৈঋতদিকস্থিত শিখরের উপরিভাগে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে ভ্রমণকালে সকলে পিপাসার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে করিতে ঋক্ষবিল নামক এক মহাবিলের মধ্যেপ্রবিষ্ট হইয়া এক পরম রমণীয় কানন মধ্যবর্ত্তী অট্টালিকা মধ্যে কৃষ্ণাজিন পরিধায়িনী নিয়তাহারা তেজোদ্বারা যেন প্রদীপ্তা এক তপস্বিনীকে দেখিতে পাইয়া

[illegible] কাণ্ডের ১২ সঃ ১৯—১৬ শ্লোক।

তাহাকে তাহার পরিচয় এবং বিল মধ্যস্থিত ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় পুরীর বিবরণ জিজ্ঞাসায় তিনি বলিলেন,—"মহাতেজা মায়াবী ময় নামক দানববর মায়াবলে কাঞ্চনময় বন সৃজন করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দানবগণের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। তিনি এই কাননে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে শুক্রাচার্য্য প্রণীত শিল্প শাস্ত্রের জ্ঞান এবং সৃষ্টি সামার্থ্য এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। সেই সৃষ্টিসামর্থ্যবলে নিজ সৃষ্ট ভোগ্য বিষয়ের ভোক্তা ময়দানব এই মহাবনে কিছুদিন বাস করিয়া হেমা নাম্নী অপ্সরার প্রতি আসক্ত হওয়ায় দৈত্যপুরধ্বংসকারী ইন্দ্র যুদ্ধে বজ্রদ্বারা তাহাকে নিধন করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা হেমাকে এই অত্যুত্তম হিরণ্ময় বন, গৃহ এবং শাশ্বত কাম ভোগ্য দ্রব্য সকল দান করিয়াছিলেন। আমি মেরুসাবর্ণি তনয়া, আমার নাম স্বয়ম্প্রভা। আমার প্রিয়সখী সেই নৃত্য গীত সুনিপুণা হেমা এই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য আমার প্রতি ভারার্পণ করায় আমিই তাহার ভবন রক্ষা করিতেছি।"

ইহা সীতা হরণের পরবর্ত্তী ঘটনা—এই সময়ে ময়দানব জীবিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইন্দ্রহস্তে তাহার নিধন সাধন হইয়াছিল। কিন্তু এই ময়দানবকে দ্বাপরযুগে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে দেখিতে পাই। খাণ্ডবদাহ কালে ময় কৃষ্ণার্জ্জুনের কৃপায় খাণ্ডববন হইতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। খাণ্ডবপ্রস্থের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ—যুধিষ্ঠিরের রাজধানী। বনদাহে রক্ষা পাইয়া ময় কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে এক অপূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সভার রচনাকৌশলে প্রতারিত হইয়া দুর্য্যোধন যারপর নাই অপ্রতিভ হইয়াছিলেন, এবং অভিমানে অস্থির হইয়া পিতৃ-সকাশে উপস্থিত হইয়া তদনুরূপ সভা প্রস্তুত জন্য খুব আবদার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সভা ময়দানবে গড়িল না, সুতরাং সেরূপ সৌন্দর্য্য শালিনী বা মনোহারিণী হইল না! এই ময়ই যে রাবণের শ্বশুর ও মন্দোদরীর পিতা তাহা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ রচিত মহাভারত পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়। যখন ময়ের প্রার্থনা মতে পাণ্ডবদের সভা নির্ম্মাণ স্থির হইয়া গেল তখন ময় তাঁহাদিগকে বলিল—"বহুকাল পূর্ব্বে দানবরাজ বৃষপর্ব্বার যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ কালে কৈলাস পর্ব্বতের নিকট অনেক বহুমূল্য রত্ন স্ফটিকাদি সভা নির্ম্মাণের উপকরণ স্থাপিত রাখিয়া আসিয়াছি। সেখানে যদি সে সকল জিনিষ অত্যাপি থাকে তাহা হইলে আনিয়া আপনাদের সভাকে

জগতের অতুলনীয়া করিয়া তুলিব।” ময় সেই সমস্ত সামগ্রী কৈলাসগিরির নিকট হইতে আনাইয়া যুধিষ্ঠিরের সভাকে লোকলোচনের পরম রমণীয় করিয়া দিয়াছিল।

ময়দানবের মিরাট খাণ্ডবপ্রস্থের মধ্যগত যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ (প্রাচীন দিল্লী) হইতে বেশী দূরে নহে। কিন্তু যে ময়কে সুপ্রাচীন কবি মহর্ষি বাল্মীকি ইন্দ্রের বজ্রে নিহত হইবার কথা বলিয়াছেন, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহাকে দ্বাপরে খাণ্ডব বনে বসতি স্থাপন করিয়া যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছেন, রাম রাবণের যুদ্ধ ত্রেতাযুগে এবং কুরু পাণ্ডবের রাজ্য কাল দ্বাপরযুগের শেষে ঘটিয়াছিল। অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের ৫২ পুরুষ পরবর্ত্তী তদ্বংশীয় রাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কুরুপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। যে ময়দানব ত্রেতাযুগে রাবণের শ্বশুর সেই ময় রামচন্দ্রের ৫২ পুরুষ পরে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু ময় যে মায়াবী দানব একথা বাল্মীকি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—মায়াবী দানবেরা যে মরিয়া বাঁচে একথা যখন বাল্মীকি ও বেদব্যাস উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন তখন আর তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মিরাট দ্বাপরযুগের প্রাচীন নগর—ময়ের পুত্র পৌত্রাদি কত পুরুষ মিরাটে অবস্থিতি করিয়াছিল তাহার কোন কথা মহাভারতে নাই তবে ময়দানবের পরিচয় দিবার জন্য এখনও তাহার রমণীয় অট্টালিকা স্তূপরূপে বিদ্যমান আছে, এবং মন্দোদরীর পূজিত মহাদেবও বিদ্যমান থাকিয়া মন্দোদরীর নামে পরিচয় দিতেছেন। এখন মিরাট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটী প্রধান নগর—এখানে ইংরাজ রাজের জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, পুলীশ-সাহেব আছেন, তাঁহারা মিরাট শাসন করিয়া থাকেন, তদতিরিক্ত এখানে একটী প্রসিদ্ধ সেনা নিবাসও আছে, তাহাতে বহু সৈন্য এবং সেনাপতিও আছেন। মিরাটবাসীরা ময়দানবের বাসস্থানের পরিচয় জানেন, কিন্তু আমরা বঙ্গদেশবাসী অনেকেই তাহা অবগত নহি।

ভারত সম্রাট



পঞ্চম জর্জ্জ।

ভারতীয় প্রজা ও নৃপতিবর্গের প্রতি

শ্রীশ্রীমান্ ভারত-সম্রাটের সম্ভাষণ।

মানবজাতির সভ্যতা ও শান্তির বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব্ব আক্রমণ হইয়াছে, তাহা প্রতিরুদ্ধ ও পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া, আমার স্বদেশ ও সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রজাগণ, এক মনে ও এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন। এই সর্ব্বনাশকর সংগ্রাম আমার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় নাই। আমার মত পূর্ব্বাপরই শান্তির অনুকূলে প্রদত্ত হইয়াছিল। যে সকল বিবাদের কারণ ও বিসম্বাদের সহিত আমার সাম্রাজ্যের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, আমার মন্ত্রিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সমস্ত কারণ দূর করিতে ও সেই সমস্ত বিসম্বাদ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল প্রতিশ্রুতি পালনার্থ আমার রাজ্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, সেই সকল প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া যখন বেল্‌জিয়ম্ আক্রান্ত ও তাহার নগরসমূহ বিধ্বস্ত হইল, যখন ফরাসি জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইল, তখন যদি আমি ঔদাসিন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আমাকে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে হইত ও আমার সাম্রাজ্য এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা ধ্বংসের মুখে সমর্পণ করিতে হইত। আমার এই সিদ্ধান্তে আমার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ আমার সহিত একমত জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। নৃপতিগণের ও জাতিসমূহের কৃত সন্ধি, ও তাঁহাদের প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ইংলণ্ড ও ভারতের সাধারণ জাতিগত ধর্ম্ম। আমার সমগ্র প্রজাবর্গ আমার সাম্রাজ্যের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য একপ্রাণে অভ্যুত্থান করিয়াছেন। যে কয়েকটি ঘটনায় ঐ অভ্যুত্থানের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আমার ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ এবং ভারতবর্ষের সামন্ত নৃপতিবর্গ আমার সিংহাসনের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন ও সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় স্ব স্ব ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিবার যে বিরাট সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমি যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছি এমন আর কিছুতেই হই নাই। যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রগামী হইবার জন্য তাঁহারা একবাক্যে যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে; ও যে প্রীতি ও অনুরাগের সূত্রে আমি ও আমার ভারতীয় প্রজাগণ আবদ্ধ আছি, সেই প্রীতি ও অনুরাগকে প্রকৃষ্টতম ফললাভের নিমিত্ত অনু-

দরবার আহূত হয়, সেই দরবারের অবসানে, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, ভারত ইংরাজজাতির প্রতি অনুরাগ ও সৌহৃদ্যসূচক যে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা অদ্য আমার স্মরণপথে উদয় হইতেছে। গ্রেট্ ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ভাগ্য পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে বলিয়া আপনারা আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এই সঙ্কট সময়ে আমি দেখিতেছি যে তাহা প্রচুর ও সুমহৎ ফল প্রসব করিয়াছে। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৪। ২২শে ভাদ্র ১৩২১।

রামমোহন রায়।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, এম, এ।

(মৃত্যুদিন উপলক্ষে রচিত।)

যখনি ধর্ম্মের গ্লানি হয়েছে ধরায়,
ভয়াবহ পরধর্ম্ম করে অভ্যুত্থান,
তখনি পুরুষ এক দিব্য প্রেরণায়—
আবির্ভূত সাধিবারে আদিষ্ট বিধান।
ভাষ্যের প্রভায় শাস্ত্র করি উদ্ভাসিত,
নির্ব্বাণে অভাব হেরি তৃষিত আত্মার,
শঙ্কর শঙ্কর পদ করিয়া আশ্রিত,
পবিত্র সোহং বাক্য করিল প্রচার।
বিদেশী ধর্ম্মের শিক্ষা নহে ত নূতন,
সনাতন ধর্ম্মগ্রন্থ পুণ্য বাংলায় ;—
উপনিষদের মর্ম্ম করিয়া ঘোষণ,
দেখাইলে তুমি দেব নবীন ভাষায়।
খ্রীষ্টান ধর্ম্মের স্রোত করিতে ধারণ,
আবির্ভাব তব বঙ্গে হইল রাজন!

নূতন দশাবতার।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ।

পুরাণের দশ অবতার নেহাত "পুরাণ" হইয়া গিয়াছে, তাই আজ উহার নূতন সংস্করণ বাহির করিতে হইতেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক সাহিত্যিক প্রভৃতি যখন সকল বিষয়েরই সংস্কার চলিতেছে ও চলিবে, তখন বহুযুগের পুরাতন দশাবতারের সটীক ব্যাখ্যাসহ নূতনসংস্করণ কেন বাহির হইবে না? অবশ্য হইবে, অতএব আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া আমরা একেবারে নূতন দশাবতারের কথা সংক্ষেপে লিখিব, যদি কাহারও ইচ্ছা হয় পড়িয়া সময় নষ্ট করিবেন।

প্রথম, বাক্যাবতার।—ইঁহাদের বিশেষ পরিচয় আবশ্যক নাই, কারণ আমরা যখন বাঙ্গালী, তখন এই অবতারই আমাদের নিকট প্রথম ও প্রধান—ইহারা কথায় পারেন না এমন কাজই নাই; ইহারা কথায় বিশ্বকর্ম্মার পিতামহ, কিন্তু কার্য্যে নিষ্কর্ম্মার চূড়ামণি।

দ্বিতীয়, উদরাবতার।—ইহারা কুম্ভকর্ণের ভাগিনেয়, "নরাণাং মাতুল-ক্রমঃ" এই শক্তিই ইঁহাদের সহিত কুম্ভকর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিতেছে। আহার ও নিদ্রাই ইঁহাদের জীবনের সারউদ্দেশ্য—অন্য উদ্দেশ্য নাই।

তৃতীয়, ঢেঁকি অবতার।—ইঁহারা কলির অদ্ভুত জীব, পরনিন্দা ইঁহাদের গীতা, এবং পরচর্চ্চা ইহাদের ভাগবত; একাগ্র চিত্তে এই দুই চতুর্বর্গ-ফলপ্রদ বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত ইহাঁদের জীবনে অপর কোনও কার্য্য নাই। ইহাদের নিকট মাতা অপেক্ষা স্ত্রী পূজ্যা, সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষা স্ত্রীর ভ্রাতা আপনার হইতে আপনার, পিতৃকুল বা মাতৃকুল অপেক্ষা শ্বশুরকুল শ্রেষ্ঠ—ইহাদের জপ—"ভার্য্যা চ ভার্য্যা-ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ইহাঁদের মন্ত্র—

"জায়া ধর্ম্ম, জায়া স্বর্গঃ, জায়াহি পরমা গতিঃ
জায়ায়াম্ প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ"

ইহারা পিতাকে ভাবেন "old fool", মাতাকে ভাবেন স্ত্রীর দাসী এবং

চতুর্থ, ভণ্ডাবতার।—ইঁহাদের চেনা বড় কঠিন, ইঁহাদের দেখিলে মনে হইবে যেন ইঁহাদের মত সাধু ও ধার্ম্মিক পৃথিবীতে আর নাই। ইঁহারা মুখে "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" করিয়া বেড়ান বটে, কিন্তু কোনও ধর্ম্মেরই ধার ধারেন না। ইঁহারা সাধু সাজিয়া করেন না এমন জঘন্য কাজই নাই; গোপনে মদ্যপান, অখাদ্য আহার, ব্যভিচার প্রভৃতি কিছুই ইঁহাদের বাদ যায় না, তবে প্রকাশ্যে ইনি পরম ধার্ম্মিক।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য শাস্ত্রের জঘন্য ব্যাখ্যা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না—রাসলীলার ঘৃণাজনক ব্যাখ্যা দিয়া পাপের প্রশ্রয় দেন! কেহ কেহ বা পঞ্চ "ম" কারকে ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া অনাচারে প্রবৃত্ত হন। কেহ কেহ সরল বিশ্বাসে ওরূপ করিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু যদি কেহ এই ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেন, তবে চটিয়া আগুণ হইয়া বলেন, "শাস্ত্র কি সব মিথ্যা, তুমি কি শাস্ত্রকার ও ঋষিদিগের অপেক্ষা পণ্ডিত?" শাস্ত্র মিথ্যা না হইতে পারে, তবে শাস্ত্রের যে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা হইতে পারে, এ কথা তিনি মানিতে চান না। নিগূঢ় ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে তাঁহারা সহজ ও ইন্দ্রিয় সুখের পক্ষে অনুকূল ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেন ও ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন।

পঞ্চম, ধর্ম্মাবতার।—ইঁহারা যুধিষ্ঠিরের কোনও আত্মীয় কি না জানি না, তবে আজ কাল ধর্ম্মাবতার বলিলে যে যুধিষ্ঠিরের মত কোনও ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে তাহার কোনও মানে নাই। এখন "ধর্ম্মাবতার" মানে হাকিম বা বিচারক। অবশ্য ইঁহাদের বিচারগুণে দেশে ও সমাজে শান্তি রক্ষা হয় বলিয়া ইঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন সন্দেহ নাই, তবে মধ্যে মধ্যে বিচারবিভ্রাট ঘটাইয়া ইঁহারা রামের ধন শ্যামকে দিয়া, বা নিধুর অপরাধের জন্য বিধুকে শাস্তি দিয়া যে হাস্যরসের অবতারণা করেন না এমন নহে। যদি বুদ্ধির অভাবে ঐরূপ ঘটনা ঘটে তবে উহা মার্জ্জনীয়, ভ্রম কাহার না হয়? কিন্তু যদি অন্যায় বিচার হইতেছে বুঝিয়াও নিজ স্বার্থ বা উন্নতি সিদ্ধির মানসে কর্ত্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টির জন্য ঐরূপ করিতে হয় তবে উহা নিতান্ত নিন্দনীয়।

ষষ্ঠ, অর্থাবতার।—ইঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি।

সতী সাধ্বী স্ত্রীকে কাঁদাইয়া বারবনিতার কুহকে মজিয়া অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। ভোগ বিলাস আমোদ প্রমোদের জন্যই যেন ভগবান তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন—এই তাঁহাদের ধারণা। ইঁহারা ধন-কুবের হইলেও সাধারণের কোনও বিশেষ উপকারে ইঁহাদের অর্থ ব্যয়িত হয় না। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ আছেন যাঁহারা অপরের উপকারার্থে বা কোনও সৎকার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং অর্থের কিরূপে সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহারও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন, দানবীর কার্ণেজী, নোবেল, তারক পালিত, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ পরোপকারের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

সপ্তম, বীর্য্যাবতার।—বাহুবলকেই ইঁহারা শ্রেষ্ঠ বল মনে করেন ও বলদর্পে দর্পিত হইয়া নিজের শক্তির পরিচয় দিবার জন্য নরশোণিতে ধরা প্লাবিত করিয়া "ভুবন বিজয়ী" বীর এই আখ্যা লাভ করিবার জন্য লালায়িত। এই যে জর্ম্মান সম্রাট বলদর্পে দর্পিত হইয়া ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তে নিজ আধিপত্য বিস্তারের পিপাসা চরিতার্থ করিতেছেন—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে বিধবার দীর্ঘশ্বাস, পিতামাতার হাহাকার ও আত্মীয় স্বজনের বিলাপ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিতেছেন, এ দর্প কয়দিন থাকিবে? অচিরে এ মদ-গর্ব্ব চূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই, "জগৎবিজয়ী" নামের পরিবর্ত্তে 'জগতের শত্রু" এই আখ্যা লাভ করিবেন। তাঁহার স্মৃতি লোপ হইবে না বটে, কিন্তু সে স্মৃতি গৌরব মণ্ডিত হইবে না—সে নামে লোকে শিহরিয়া উঠিবে বটে, কিন্তু ভক্তি বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না।

অষ্টম, কর্ম্মাবতার।—ইঁহারা জগতের প্রকৃত হিতকারী। কর্ম্ম ইঁহাদের ধর্ম্ম; ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও কূটতর্কের বৃথা আলোচনা না করিয়া ইঁহারা কর্ম্মে মন দেন, দেশের ও দশের কাজে, পরহিতব্রতে নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া থাকেন। ইঁহারা নামের বা প্রশংসার কাঙ্গালী নহেন, ইঁহারা কর্ত্তব্যের দাস।

নবম, জ্ঞানাবতার।—জ্ঞানই উন্নতি ও মুক্তির উপায়, তাই ইঁহারা জ্ঞানোপার্জ্জনে চিরজীবন উৎসর্গ করেন। জ্ঞান অসীম, ইঁহাদের জ্ঞান পিপাসাও অসীম, যতই জ্ঞানলাভ করিতে থাকেন, ততই ইঁহাদের পিপাসা

বাড়িতে থাকে, ততই বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত শক্তির পরিচয় পাইয়া ইঁহারা তন্ময় হইয়া যান, পার্থিব বিষয় তুচ্ছ করিয়া অপার্থিব ও অক্ষয় পদার্থের অন্বেষণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করেন। ইঁহারা মহাজ্ঞানী হইয়াও অতি বিনয়ী। ইহারাও পৃথিবীর উপকারী ও সকলের পূজ্য।

দশম, প্রেমাবতার।—ইঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পশুবল অপেক্ষা জ্ঞান বল অনেক শ্রেষ্ঠ, আবার জ্ঞানবল অপেক্ষা প্রেমবল আরও অনেক শ্রেষ্ঠ। বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিকের তুলনায় বিশ্ববিজয়ী বীর অতি তুচ্ছ—আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, কায়সার প্রভৃতি, বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের কাছে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। ভুবনবিজয়ী বীর জীবিতাবস্থায় প্রবল প্রতাপে ধরাতল কম্পিত ও শঙ্কিত করিতে পারেন বটে, কিন্তু মৃত্যুর পর কয়জন তাঁহাদের নাম করে? কিন্তু প্রেমাবতারের প্রভাব বরং মৃত্যুর পর আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বলের শাসনে যাহা সম্পন্ন হয় না, বা হইতে পারে না স্নেহ ও প্রেমের শাসনে তাহা অনায়াসে সাধিত হয়, নতুবা দিগ্বিজয়ী বীর নিজ ক্ষুদ্র শিশু সন্তানের কাছে হার মানিতেন না, বা কানমলা খাইতেন না। আজও জগতে কোটি কোটি লোক বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদকে আন্তরিক ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু এই পূজা অপর কেহ স্বপ্নেও প্রত্যাশা করিতে পারেন কি? ইঁহাদের নিকট ভেদাভেদ নাই, পাপী, তাপী, উচ্চ, নীচ সকলকেই ইঁহারা সাদরে আলিঙ্গন করেন। কি উদার হৃদয়! কি অদ্ভুত বিশ্বপ্রেম, কি অসাধারণ শক্তি—এ শক্তির কাছে বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য কিছুরই তুলনা হয় না। ইহা ঐশ্বরিক শক্তি, তাই ইহার এত প্রভাব—ঈশ্বর প্রেমময়, তাই ইঁহারা এত বিশ্বপ্রেমিক, তাই ইঁহারা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া কোটি কোটি লোকের পূজা পাইয়া থাকেন, এবং চিরকাল পাইবেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মনুষ্য মাত্রের স্বাস্থ্যই প্রধান বাঞ্ছনীয় সামগ্রী। রোগীর পক্ষে সুরম্য অট্টালিকা, সুরস ভোজ্য, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, নয়ন-মন-তৃপ্তিকর বন্ধুবর্গ, আজ্ঞাবহ দাসদাসী, এ সকল কিছুই শান্তিপ্রদ নহে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা দন্ত থাকিতে দন্তের মর্য্যাদা বুঝি না। যতদিন আমাদের শরীর নীরোগ ও সবল থাকে ততদিন আমরা ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিয়া স্ফীতবক্ষে স্বাস্থ্য-বিধি অমান্য করিতে কুণ্ঠিত নহি। আমাদের পিতৃ পিতামহগণ আহার বিহারাদির সুবিধান দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়া গিয়াছেন। আমরা সেই সকল মহাত্মার পদানুসরণে উদাসীন হইয়া অকালে মহাপ্রয়াণ করিতেছি। যদিও বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় জলবায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে, তথাচ আমরা যে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিতেন, কায়িক পরিশ্রম করিতেন, পবিত্র সত্ত্বগুণবিশিষ্ট সামগ্রী সকল আহার করিতেন, "আপো নারায়ণঃ স্বয়ং" ইহাই বিশ্বাস করিয়া পানীয় জলের পবিত্রতার প্রতিও লক্ষ রাখিতেন এবং ব্রহ্মচর্য্যাব্রত পালন করিতেন। আমরা এ সকল কিছুই করি না। কালধর্ম্মে আমরা শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িয়াছি। আমরা বেলা নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত শয্যায় পড়িয়া থাকি, দুই পদ হাঁটিতে হইলে ট্রামগাড়ীর জন্য এক ঘণ্টা অপেক্ষা করি এবং আহার বিহারাদির সম্বন্ধে কোন নিয়মাধীন থাকিতে চাহি না। এই সকল কারণে আমরা দিন দিন জীর্ণ, শীর্ণ ও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি। দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে মনীষী প্রণীত সেই সকল স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন না করিলে আমাদের কোন ক্রমেই মঙ্গল নাই।

স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সময়োপযোগী বেশভূষা দ্বারা শরীর আবৃত করত কিছুকাল প্রশস্ত স্থানে ভ্রমণ করিবেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করাই প্রাকৃতিক নিয়ম। পশুপক্ষী সকলেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া থাকে। আমরা মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া আলস্য পরিহার করিতে না পারিলে কি ঘৃণার কথা নহে?

"প্রত্যুষকালে পরিহৃত্য শয্যাং
পরিভ্রমণ ক্ষিপ্রপদং সমস্তাৎ।
করোতি যঃ শুদ্ধ সমীর সেবাং
বিবর্দ্ধতে স্বাস্থ্যমতীব তস্য।"

এই নীতিকথা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া মুক্ত বায়ুতে পরিভ্রমণ করিলে শরীরের আলস্য নষ্ট হয়, মনের প্রফুল্লতা জন্মে। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পদগৌরব নষ্ট হইবে মনে করিয়া অথবা অবকাশ অভাবে কোন প্রকার ব্যায়াম করিতে পারেন না, তাঁহারা যথাশক্তি দৈনিক দুই তিন মাইল প্রাতভ্রর্মণ করিয়া অনায়াসেই স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারেন। প্রাতঃ সমীরণের এমন একটী শক্তি আছে যে, উহা দেহ প্রবিষ্ট হইলে শরীর নীরোগ ও সবল হয়। প্রাতঃবায়ুর অন্য নাম বীর বায়ু—চলিত কথায় বীরবাও বলে। কেহ কাহাকেও বিশেষ বলের কাজ করিতে দেখিলে বলিয়া থাকে—"লোকটা যেন বীরবাও পেয়েছে। রক্তাল্পতা, পরিপাক বিকার ও ফুসফুসের পীড়াদিতে প্রভাতবায়ু সেবন পরম হিতকর। বায়ুস্থিত অক্সিজেন যথেষ্ট পরিমাণে দেহ প্রবিষ্ট হইয়া পরিপাক ও অপরাপর যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করে। জগতে যে সকল লোক দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন। বিচারপতি মান্ডফিল্ডের ধর্ম্মাধিকরণে যে সকল প্রাচীন ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন, তিনি তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রাতরুত্থানই তাঁহাদের দীর্ঘজীবন লাভের অন্যতম কারণ। সকলেই ইচ্ছা করিলে এই স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করিতে পারেন। দুই চারি দিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিলেই ইহা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের বালক বালিকাগণকে প্রাতরুত্থান অভ্যাস করান এবং ইহার উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া প্রত্যেক অভিভাবকের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য হানির সমুদয় কারণ দেশের জল বায়ুর স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসিয়া থাকিলে কোন ফলোদয় হইবে না।

স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপযুক্ত চালনা করাও নিতান্ত আবশ্যক। মনশ্চালনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম না করিলে দেহ রোগ প্রবণ হইয়া পড়ে। আজ যে অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ আমাদের দেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, শ্রমশীলতার অভাবই তাহার

প্রধান কারণ। পূর্ব্বকালে লোক সকল স্বহস্তে সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতেন; সুতরাং তাহাতেই তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রম হইত। আমরা মর্য্যাদা হানি হইবার ভয়ে কায়িক পরিশ্রমের কাজ কিছুই করি না। ইংরাজগণ উচ্চপদস্থ হইয়াও দৈনিক কিছুক্ষণ ব্যায়াম করিয়া থাকেন। আমাদের ভূত-পূর্ব্ব রাজমন্ত্রী মহামতি গ্লাডষ্টোন স্বহস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিতেন। আজ কালধর্ম্মে আমরা এমন হতশ্রী হইয়াছি যে, নিজের কাজ নিজে করিতেও অগৌরব মনে করি। নরদেবতা বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াও মস্তকে দ্রব্যসম্ভার লইয়া কলিকাতা হইতে পদব্রজে জন্মভূমি বীর-সিংহ গ্রামে যাইতেন। তখনকার লোক যান বাহনের ধার বড় একটা ধারিতেন না। এতদ্দেশের সকল লোক সেকালে হাঁটিয়া কলিকাতায় গমনাগমন করিতেন; এখন বলিতে লজ্জা করে, আমরা ক্রোশাধিক পথ যাইতে হইলেই গাড়ীর জন্য হুকুম করিয়া বসি। আমাদের এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হইলে কিছুতেই শ্রেয়ঃ নাই। অল্পকাল পূর্ব্বে বালকদিগের মধ্যে "কপাটী" "গাদী" প্রভৃতি খেলার প্রচলন ছিল। উহা দ্বারা বেশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে মার্ব্বেল ক্রীড়া আসিয়া তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। এই ক্রীড়া দ্বারা স্বাস্থ্যবিধানের কোনই উপকার হয় না।

শরীর সুস্থ রাখিবার তৃতীয় উপায় পুষ্টিকর দ্রব্য আহার। ভগবান আমাদের শরীরে এক ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তি দিয়াছেন। ঐ শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে আমরা অনেক সময় সুস্থ থাকিতে পারি। পূর্ব্বকালের লোক সকল সুস্থ ও সবল ছিলেন, ইহার প্রধান কারণ তাঁহারা পবিত্র ঘৃতদুগ্ধাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিতেন। তখনকার দিনে দেশ এত সভ্য হয় নাই; লোকের ধর্ম্মভয়ও ছিল। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইতে তাহারা ভীত হইত। তখন গ্রামে গ্রামে রেল ষ্টিমার ছিল না; বরফ, সোডা, লেমনেড মিলিত না; চা, চুরুট, হাওয়াগাড়ী, ও গোয়ালিনী মার্কার কথা লোকে জানিত না বটে, কিন্তু তখন লোকের মনে স্ফুর্ত্তি ছিল, ক্ষেত্রে ধান্য জন্মিত, পুকুরে মাছ ছিল, গোশালায় দুগ্ধবতী গাভী ছিল। আজকাল বাজারে খাঁটি দ্রব্য প্রায় মিলে না; যাহা পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। অনাহারে ও কদাহারে আমরা স্বাস্থ্যহীন হইতেছি। এইজন্য অতি সামান্য কারণেই

আমাদের শরীর জর্জ্জর হইতেছে। কাজেকাজেই রোগ ও আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। আমরা নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ অসার বিলাসিতায় অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া শরীর রক্ষা কল্পে কার্পণ্য করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদের লাভের গুড় যে পিপিলিকায় খাইতেছে তাহা একবারও চিন্তা করি না। আহার হইতেই বল, আরোগ্য ও চিত্তপ্রসন্নতা; আহারের বৈষম্যেই অস্বাস্থ্য জন্মিয়া থাকে। অতএব যদি সুস্থ দেহ লইয়া দীর্ঘজীবন লাভের ইচ্ছা থাকে তবে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপালনের সঙ্গে সঙ্গে বাবুগিরির সাজ—কামিজ, কোট, রুমাল, এসেন্স প্রভৃতির ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া তদর্থে পবিত্র ঘৃত দুগ্ধাদি পুষ্টিকর সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আহার করুন। তাহা হইলে ব্যাধি প্রতি-ষেধক শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আবার নববলে বলীয়ান ও আয়ুষ্মান্ হইবেন।

আজ যে আমাদের দেশে ক্ষয় ও যকৃৎ পীড়ার এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব, আমার মনে হয়, পীড়িত গাভীর দুগ্ধ পানই তাহার অন্যতম কারণ। তখন প্রায় প্রতি গ্রামে গোচর মাঠ ছিল;—গাভীগুলি মাঠে নব নব তৃণ ভোজন করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া কেমন পুষ্ট ও বলিষ্ঠ থাকিত। সে কালের লোক গাভীকে ভগবতী বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং গৃহস্থ নিজেই স্বহস্তে গো-সেবা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অধুনা আমরা গাভীকে অর্দ্ধাশনে এক অন্ধকূপ গৃহে দিবারাত্র আবদ্ধ করিয়া গো-হত্যায় পাতকী হইতেছি। আমরা লম্বসাট পটাবৃত বাবু হইয়াছি, সুতরাং গাভীর দুঃখ দেখিবার আমাদের অবসর কৈ? এদিকে আমাদের হাভ-ভাব ভঙ্গী শালিনী বিলাসিনী গৃহলক্ষ্মীরাও তাঁহাদের কোমল করকমল গোময় স্পৃষ্ট হইবে বলিয়া ভ্রম ক্রমেও কখন গোশালার ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন না। এ দুরবস্থার প্রতিকার না করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ একপ্রকার অনিবার্য্য।

স্বাস্থ্যরক্ষার চতুর্থ উপায় পানীয় জলের পবিত্রতা সংরক্ষণ। কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড জ্বর, প্রভৃতি রোগগুলি জীবাণু ঘটিত ব্যাধি। ইহাদের জীবাণু জলে বাস করে। সাধারণতঃ পানীয়ের সহিত ঐ সকল জীবাণু মানবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া রোগানয়ন করে। পানীয় জলের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আমরা অনেক সময় ঐ সকল রোগের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারি। এই সকল রোগের জীবাণু রোগীর মল ও বমিত

শয্যা বসনাদি ধৌত করিলে রোগ বিস্তার হইয়া পড়ে। সকলেই দেখিয়াছেন ওলাউঠা রোগীর মললিপ্ত শয্যাবসনাদি যে পুষ্করিণীতে ধৌত করা হয়, সেই পুষ্করিণীর জল পান করিয়া এক এক পল্লী জনশূন্য হইয়া যায়। আমাদের দেশবাসীর জ্ঞান এতদ্বিষয়ে এত সংকীর্ণ যে তাহারা যে জল পান করে, সেই জলেই আবার মূত্র পুরিষ ধৌত করিতে ভীত হয় না। জলকে কেন দেবতা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা যে দিন ভাল করিয়া বুঝিব, সেই দিন হইতে আমাদের প্রাণগুলি কলেরা, টাইফয়েড ও অতিসারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। শরীর রক্ষা করিতে হইলে খাদ্য যেমন প্রয়োজনীয়, পানীয় জলও তদপেক্ষা কম নহে। সুতরাং পানীয় জলের পবিত্রতার প্রতি যে দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অপরিচিত বা অপবিত্র জল রীতিমত সুসিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলে তন্মধ্যস্থ জীবাণু সকল বিনষ্ট হয়। অতএব যদি প্রাগুক্ত ব্যাধিগুলির গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে প্রত্যহ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে আলস্য ত্যাগ করিয়া পানীয় জলটুকু সুসিদ্ধ করিয়া লইবেন।

শরীর নিরাময় রাখিবার আর এক উপায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন। এই উপায়টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দীর্ঘকাল আমরা এই হিতকর অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছি। পূর্ব্বকালে লোক সকল ব্রহ্মচর্য্যব্রতানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ না করিয়া দারপরিগ্রহ করিতেন না। এখন ব্রহ্মচর্য্য ত দূরের কথা আমরা ত্রিসন্ধ্যা পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হইয়াছি। ঐ জরাব্যাধি-নাশক ব্রতানুষ্ঠানে আবার সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চরিত্র গঠন করিতে হইবে। মিতাহার, মিতবাক্, মিতনিদ্রা, ও মিতমৈথুন এই ব্রতের বীজ মন্ত্র। শরীরে শুক্রধাতু অবিকৃত রাখিতে পারিলে স্বাস্থ্য, সন্তোষ ও চিত্তপ্রসাদ করতলগত হইবে—এই পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল সহাস্য আস্যে পরিণত হইবে—বঙ্গপল্লী আবার আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া ভূলোকেই দ্যুলোকের ছবি দেখাইয়া দিবে।

তাই বলি, হে বঙ্গীয় যুবক-সম্প্রদায়! দেশ উৎসন্ন যাইল বলিয়া আর বৃথা হা হুতাশ করিয়া সময় নষ্ট করিও না। সকলে সমবেত হইয়া সেই ঋষি আচরিত স্বাস্থ্যরক্ষা পন্থা অবলম্বন কর—মলয়সমীরণ বঙ্গ-পল্লীতে আবার আশা ও উৎসাহের সংবাদ ঘোষণা করুক।

কোথা যাও কাকা !

শ্রীধরপুরের জনার্দ্দন তর্কবাগীশ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত দুই শত বিঘা নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব হইতেই তাঁহার সাংসারিক সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত, তৎ ব্যতিরিক্ত এতদ্দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের যে সকল নৈমিত্তিক আয় থাকা সম্ভব তাহার পরিমাণও নিতান্ত অল্প ছিলনা। বস্তুত সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক খরচের নিমিত্ত তর্কবাগীশ মহাশয়কে কখনও কোনরূপ দায়গ্রস্ত হইতে হয় নাই। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না, অজিতশেখর নামে একটি সুশীল ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, সেইটী তাঁহার জীবনের ও সংসারের অবলম্বন। অজিতকে তিনি পুত্রতুল্য ভাল বাসিতেন, পিতৃহীন অজিতও তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিত; অধিক কি ঐ কাকা ভিন্ন অজিত আর কাহারও স্নেহযত্ন প্রাপ্ত হয় নাই। তর্কবাগীশ মহাশয় ন্যায়শাস্ত্র জানিতেন, কিছু কিছু চিকিৎসাশাস্ত্রও অধ্যয়ন করা ছিল। যখনকার কথা বলা হইতেছে, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৭৭ বৎসর; এক দিন পূর্ব্বাহ্নে প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া, কি ভাবিয়া, তিনি একবার স্বীয় দক্ষিণ হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; কি বুঝিলেন বলা যায় না, পাড়ার একজন সমবয়স্ক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া একখানা খাট আনিতে বলিলেন। সেই ব্রাহ্মণের নাম নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, শেষ নাড়ী পরীক্ষায় তাঁহারও কিছু কিছু জ্ঞান ছিল, তিনিও তর্কবাগীশের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "সময় হইয়াছে বটে, তবু যেন বোধহয় আট দশ দিন বিলম্ব।" তর্কবাগীশ বলিলেন, "তোমার ভুল; আমি বুঝিতেছি ঊর্দ্ধ সংখ্যা তিন দিন তিন রাত্রি। শীঘ্র তুমি খাট আনাইয়া দাও, আজ অপরাহ্নে আমি গঙ্গাযাত্রা করিব।" বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় খাট আসিল, খাটের উপর শয্যা প্রস্তুত হইল, তর্কবাগীশ মহাশয় চেলির জোড় পরিয়া, ফুলের মালা গলায় দিয়া, ঠাকুর প্রণাম করিয়া, খাটে উঠিয়া বসিলেন; দুই তিন জন স্বজাতীয় যুবকের সহিত শিবিকা বাহক চারিজন বেহারা খট্টা স্কন্ধে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তর্কবাগীশ মহাশয় দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ঘুরাইতে ঘুরাইতে উচ্চ কণ্ঠে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীধরপুর প্রসিদ্ধ নগরী নহে, গণ্ডগ্রামও নহে সামান্য একটি পল্লিগ্রাম মাত্র; সে গ্রামে গভর্ণমেণ্টের স্থাপিত বিদ্যালয় ছিলনা, প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরস্থিত অপর একখানি গণ্ডগ্রামে সাহায্যাকৃত মধ্য ইংবঙ্গ বিদ্যালয়ে অজিতশেখর ইংরাজী পড়িতে যাইতেন; তর্কবাগীশ যখন

খাটে উঠিয়া গঙ্গাযাত্রা করেন, অজিত তখন বাড়ীতে ছিলনা, খাট যখন গঙ্গার আধাআধি পথে গিয়াছিল, শ্লেট পুস্তক লইয়া অজিত তখন বাড়ী আসিতেছিলেন, পথেই খাটের সঙ্গে দেখা। শ্লেট পুস্তক একমুদীর দোকানে ফেলিয়া রাখিয়া, অজিতশেখর কাঁদিতে কাঁদিতে খাটের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন; উচ্ছ্বাসে মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিলঃ—

কোথা যাও কাকা!

কে হানিল মম শিরে অকস্মাৎ আজি—
ভীষণ অশনি তীক্ষ্ণ, কে হেন নির্দ্দয়?
আঁধার নয়নে মোর এই ক্ষুদ্র গ্রাম—
যে গ্রামে জনমি আমি ষোড়শ বৎসর—
ওই পাদপদ্ম দুটি জানি নিরন্তর;
কাকা বই কিছু আমি জানিনা সংসারে,
সেই কাকা কোথা যান ফেলিয়ে আমারে?
ঘরে যাইতেছি আমি, কি দেখিব গিয়া,
কাকাশূন্য ঘরে মোর কিবা প্রয়োজন?
হায় কাকা! সব আমি নিরখিব ফাঁকা!
অজিতে ফেলিয়ে একা, কোথা যাও কাকা?
হেরিয়াছি পিতৃদেবে অতি শিশুকালে
ছায়া সম মনে পড়ে, মনে পড়া নয়,
জ্ঞান হয় মাতৃক্রোড়ে ছায়ার স্বপন;
সেই ক্রোড় হারায়েছি একবর্ষ পরে,
কেবল কাকার স্নেহে বেঁচেছে জীবন!
কাকাগো! তোমারি এই পালিত অজিত;
পালন করেছ তুমি সন্তানের চেয়ে—
অধিক আদরে মোরে ভাগ্যহীন আমি,
ভুলিয়ে আহার নিদ্রা ভুলি পাঁতিপুঁথি,—
কেবল আমার স্নেহে সঁপেছিলে প্রাণ।
পর্ব্বে পর্ব্বে ঘরে বসি ভাল খাদ্য পেলে
আমাকে দিয়েছ কাকা আপনি নাখেয়ে—

আমিত তোমার মনে কিছু ভুলি নাই !
মলমূত্রে কিছু ঘৃণা ছিলনা তোমার—
স্বহস্তে করিয়াছিলে শয্যা পরিষ্কার,
রবিতাপে অজিতের রাঙা হলে মুখ,
কতই অস্থির হতে বাতনা ভাবিয়া—
কোলে করি দিতে কাকা পাখার বাতাস—
ঠাণ্ডা জল ছিটাইতে কপালে কপোলে—
দেখিলে আমার মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
আনন্দ সলিলে তুমি ভাসিতে তখন;
সে সব কি ভুলিতেছ ? ত্যজিয়ে সংসার,—
যাইতেছ অন্য লোকে ভাসায়ে আমায় ?
যেওনা যেওনা কাকা, করি নিবেদন,—
করি নিবেদন কাকা, করি নিবেদন !
এতো নয় কাকা তব যাবার সময়,
কেন তবে হেন ভাব হেরি অসময় ?
ফিরে চল কাকা, ফিরে চল ঘরে
তোমার বৈকালী ভোগ আছে থরে থরে,
রেখেছি খাটের নিচে তাজা মিঠা ক্ষির—
রেখেছি তোমার তরে পুরু পুরু সর,
রেখেছি আপনি চিরি কাচা মিঠা আম—
যাহা তুমি ভালবাস সব আছে ধরা
খাবে চলো আর মোরে কাঁদায়োনা কাকা।

কাকা বাস্তবিক ভাইপোটিকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন, পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন। অজিতের কথা শুনিয়া, কান্না দেখিয়া সহসা তাঁহার শরীরে যেন চপলা চমকিল; বেশী আহ্লাদে, বেশী আতঙ্কে, বেশী উদ্বেগে মাতালের যেমন নেশা ছুটিয়া যায়, অজিত কুমারের করুণ বচনে তর্কবাগীশের তদ্রূপ সংসারবৈরাগ্য ছুটিয়া গেল; অজিতকে তিনি বলিলেন; "বাবা অজিত আজ আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইওনা; অনেক দূর আসিয়াছি, ঐ আমাদের মা গঙ্গার তরঙ্গ দেখা যাইতেছে,—নিকটে গিয়া একবার প্রণাম করিয়া আসি।

আমাকে লইয়া যাইও; মায়ের নাম করিয়া এক রাত্রি আমি গঙ্গায় বাস করিব।

বাহকেরা গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া খট্টা নামাইল, গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া যাত্রী থাকিবার একটি ঘরে তর্কবাগীশ আশ্রয় লইলেন, অজিত কুমারের সহিত অনুযাত্রিগণও সেই ঘরে রহিলেন। সেই রাত্রে তর্কবাগীশ অল্প অল্প ঘুম ঘোরে দৈববাণী শুনিলেন, "এখনো তোমার সময় হয় নাই; আর কিছু দিন সংসারের সুখভোগ বাকি আছে;—ঘরে যাও।"

রজনী প্রভাতে গঙ্গাদেবীর পূজা দিয়া, ফুলের মালা গলায় দিয়া, জনার্দ্দন তর্কবাগীশ গঙ্গা মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শুনা গিয়াছে, তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার পর পূর্ণ দশ বৎসর কাল সুস্থ শরীরে বাঁচিয়াছিলেন।

তুমি।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী।

তুমি আঁখি-আলো নাসিকার শ্বাস,
দেহের পরশ বয়ানের হাস,
　　　　গন্ধ বরণ প্রাণ।
তুমি অনুভূতি মনের বাসনা,
স্মৃতি জ্ঞান মতি ধ্যান ও ধারণা,
　　　　জীবনে আশার গান।
তুমি হও ভাব তুমিই ভাবুক,
সুখে দুখ তুমি, দুখে তুমি সুখ,
　　　　সুখ দুখ অবসান।

রসাভাস।

লেখক—শ্রীযুক্ত পরিহাস রসিক রায়।

অনেক দিনের কথা একজন জজ ছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস বেঁটে মাত্রেই বদমাইস। একজন বেঁটে তাঁহার নিকট এক মোকদ্দমার আর্জ্জি লইয়া উপস্থিত—জজ কিছুতেই মোকদ্দমা লইবেন না, বেঁটে জানিত জজের বিশ্বাস বেঁটে হইলে দুষ্ট ও শঠ হয়। হাকিম যখন কোন রকমেই মোকদ্দমা লইলেন না, তখন বেঁটে বাদী বলিল,—"হুজুর আমি যাহার উপর নালিশ করিতেছি সে আমার অপেক্ষাও বেঁটে।" তখন জজ হাসিতে হাসিতে মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন। বেঁটে বাদী হাসিতে হাসিতে প্রতিবাদীর উপর সমন্সের খরচ দিয়া চলিয়া গেল।

একজন সেকেলে পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ আদালতে সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইয়াছে। হাকিম জিজ্ঞাসিলেন—"তোমার বয়স কত?"

সাক্ষী বলিল,—"হুজুর! যে বৎসর আমাদের গ্রামের রায় মহাশয়দের ইট পাঁজায় আগুণ দেয় সে বছর আমি তামাক খাইতে শিখিয়াছি।"

একব্যাক্তি অপরের বিরুদ্ধে হুকা চুরির নালিশ করিয়াছে, আসামী ফরিয়াদি আদালতে হাজির। হাকিম বাদীকে জিজ্ঞাসিলেন—"এ হুকা যে তোমার তাহা কেমন করিয়া চিনিলে?"

বাদী উত্তর করিল, "হুজুর আসামী হুকাটী চিনিবার কোন উপায় রাখে নাই খোলটী বদলাইয়াছে কিন্তু হুকাটি যে আমার তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমান জেলা যখন ম্যালেরিয়া জ্বরে ছারখার হয়, তখন ফণি বাবু এক এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীর ডাক্তার। আহারের পর ঘরে খিল দিয়া ঘুমাইতে ছিলেন, বাহির হইতে একজন দ্বারে ধাক্কা দিলে ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসিলেন "কে ও?"

উত্তর। আমি হরি নাগ।

ডাক্তার। তুমি যে মাস খানাক হলো মরেছ।

উত্তর। মরেছি বটে, কিন্তু কুইনাইনের জ্বর ছাড়ে নাই।

দুইজন জুয়াচোর সন্দেসের দোকানে অগ্র পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া দুই জনে দুই টাকার সন্দেশ লইল, প্রথম ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়

বলিল—"না তুমি দাও নাই।" এরূপে বচসা হইতে লাগিল চারি দিক হইতে লোক আসিয়া ময়রার দোকানে উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় জুয়াচোর ইত্যবসরে চক্ষে প্রচুর জল সঞ্চয় করিয়া ক্রমশঃ তাহা বাহির করিতেছিল। সমবেত ব্যক্তিগণ তাহাকে জিজ্ঞাসিল,—"তুমি বাপু সন্দেস হাতে করিয়া কাঁদিতেছ কেন?" এই কথায় সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ওব্যক্তি যখন টাকা দিয়াছিল তখন আমি দেখিয়াছিলাম কিন্তু আমি আগে আসিয়া যখন টাকা দিয়াছি তখন যে কেহই দেখে নাই।"

একজন ভদ্রলোক দূর হইতে সমস্তই দেখিতেছিলেন, তিনি "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

একজন একটা কাপড়ের দোকানে গিয়া দোকান দারকে বলিল—"ওহে ছয় হাতি হোক, আর সাত হাতি হোক, একখানা পাঁচি (?) ধুতি দাও ত?

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ভিন্ন গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিয়া আনিলে তবে সংসার চলে। একদিন বেলা দুই প্রহর হইয়া গিয়াছিল, ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া বিষ্ণুসেবা করিয়া নিত্য দেবতার নিকট প্রণাম করেন, তাহার পর বলেন, "ঠাকুর আমার দারিদ্র্যদুঃখ ভঞ্জন কর—আমাকে ধন অর্থ দাও—আমার ছেলে গুলি যেন লেখা পড়া শিখিয়া পণ্ডিত হয়," কিন্তু সে দিন পূজার পর যেমন তিনি জোরে শঙ্খধ্বনি করিবেন অমনি তাঁহার মল পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িল—ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া কাতর কণ্ঠে দেবতাকে বলিলেন,—

ঠাকুর না মাগি ধন কড়ি, না মাগি বর।
শাঁখ ফুক্‌তে যা বেরিয়েছে তা ভিতর লাগ কর।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর নূতন বর্ষের পঞ্জিকা শুনাইতে গিয়া বলিলেন,—"এ বৎসর ১৯শে কার্ত্তিক পূজা, পৌষ সংক্রান্তি বিশে আর ইংরেজের গুড ফ্রাইডে ২৩ এপ্রিল বুধবার। সে কালের স্ত্রী লোকেরা এই রূপেই নূতন পাঁজি শুনিতেন। এমন পঞ্জিকা ঘরে ঘরে।

চাইনা তাহারে।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল।

১

চাইনা তাহারে আমি চাইনা তাহারে,
হয়ে যিনি ধনবান্,
হীনে করে হেয়জ্ঞান
অহঙ্কারে মত্ত সদা লয়ে চাটুকারে।
অর্থ ব্যয় নাহি করি সৎ ব্যবহারে॥

২

চাইনা তাহারে আমি যাহার অন্তরে,
কালকুট বিষে ভরা,
বাক্যে বহে সুধা ধারা,
দয়া, ক্ষমা, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা।
বাহ্যিক দেখায় শুধু, স্বার্থ সিদ্ধি আশা॥

৩

চাইনা তাহারে আমি সে সব দুর্জ্জনে,
অসময়ে যেইজন,
নাহি দেয় দরশন,
একদিন যার সনে প্রণয় বন্ধনে,
বদ্ধ হ'য়ে সুখ শান্তি পাইতাম প্রাণে।

৪

চাইনা তাহারে আমি সেই হীনজনে,
দিবানিশি যেইজন,
ধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন,
বারাঙ্গনা প্রেমে আর মত্ত মদ্যপানে,
দারা পুত্র কন্যা আদি না দেখি স্বনেত্র।

৫

চাইনা তাহারে আমি কখন যে জনে-
সাহিত্য, সঙ্গীতে যার,
বাজেনা হৃদয় তার

অজ্ঞান তিমিরে পূর্ণ হৃদয় যাহার,
ভবে তার শান্তি কোথা নিতান্ত অসার।

৬

চাইনা তাহারে আমি যেই নরাধমে—
শ্রদ্ধা, ভক্তি, গুরুজনে,
নাহি যার হীন প্রাণে,—
বিশ্বাস নাহিক যার বিশ্ব বিধাতারে,
এ বিশ্বে অজ্ঞান হেরি সবে তাহারে।

৭

চাইনা তাহারে আমি ক্ষণেকের তরে,
পরকীয় উপকারে,—
বিরত যে এ সংসারে ;—
আত্মীয় স্বজনে প্রীতি শ্রীবৃদ্ধি সাধনে,
স্বধর্ম্মে বিশ্বাস নাই যাহার পরাণে।

৮

চাইনা তাহারে আমি চাইনা তাহারে,
কোন গুণ নাহি যার,
উদর পূরণ সার—
জগতের কোন তত্ত্ব রাখেনা কখন,
কি ফল তাহারে লয়ে, ধিক্ সে জীবন!—

৯

সুগন্ধ বিহীন পুষ্প উদ্যান মাঝারে—
ফুটিয়া আপন মনে,
শুষ্ক হয়ে পরক্ষণে,
কেহ না আদর করে হায়রে যেমন—
গুণ হীন, ধর্ম্ম হীন মানব (ও) তেমন।

ত্রিধাতু—মানব দেহে তাহাদের ক্রিয়া।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কবিরাজ কাণুপ্রিয় গোস্বামী বিজ্ঞানতীর্থ।

"আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধে র্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥"

যে শাস্ত্রে আয়ুর শুভাশুভ, ব্যাধির নিদান ও প্রশমনোপায় বর্ণিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রকেই আয়ুর্ব্বেদ কহে। জীব ব্যতীত আয়ু থাকিতে পারে না; আয়ু যাহার নাই সে অচেতন বা জড়, আর যাহার আয়ু আছে সেই জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বাত, পিত্ত, ও শ্লেষ্মাই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের স্তম্ভ স্বরূপ, বা প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। এবং ইহাদের সম্বন্ধে জানিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদ জানিতে হইবে। জীবের আয়ু সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং জীব কি; তাহা জানিবার প্রয়োজন; এবং জীব কি, তাহা জানিতে হইলে, কোথা হইতে ও কিরূপে এই জীব আসিল তাহাও না জানিলে চলিবে না। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে জীবের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল তাহাই সংক্ষেপে জানিবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাবনার অবতারণা করিলাম।

আজ কাল পাশ্চত্য বিজ্ঞান ও দর্শনবিদ্ পণ্ডিতগণ, বহু গবেষণা, পরীক্ষা ও যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, গ্রহ, উপগ্রহ, বিদ্যুৎ, অনল, মানব, পক্ষী, মৎস্য, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, প্রভৃতি যাবতীয় জীব ও জড় বা চেতন ও অচেতন পদার্থ সকল যাহা আমরা নিরন্তর দেখিতেছি,—তাহারা সকলেই Ether হইতে সমুদ্ভূত। Ether ব্যতীত আর যাহা কিছু—সকলই Ether হইতে, কিন্তু Ether কাহা হইতেও হয় নাই, সে আপনা হইতেই আপনি, এবং সকলের আদি। তাহার পূর্ব্বে আর কিছুই নাই—সকলই তাহার পরে।

Ether বা খং কি?

আমাদের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বহুশতাব্দী পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, "খং" ই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেই সমুদয় বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহারা বিলীন হইলেও তাঁহাতেই হইবে। "খং" এবং "ব্রহ্ম" একই বস্তু। ইহাই বেদ ইহাই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণেরা ইহাকেই জানেন,—এবং ইহাকে জানিলেই সকলই জানা হয়।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাকে " Ether " বলিয়াছেন, প্রাচীন আর্য্যঋষিগণও ঠিক তাহাকেই " খং ব্রহ্ম " বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ইহার পর আর কিছুই নাই। এই " খং " হইতেই সমুদায় বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে;—ইহাকে জানিলেই সমস্ত জানা হয়। আর আজ তাহার বহুশতাব্দী পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখ হইতে যেন ঠিক তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই ;—Ether হইতেই সকলই হইতেছে,—ইহার পর আর কিছুই নাই।

এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম,—(এবং এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া যাইলে পরে সে সিদ্ধান্ত আরও সুদৃঢ় হইবে।) যে, যাহা আর্য্যঋষিগণের "খং ব্রহ্ম" তাহাই বর্ত্তমান্ শতাব্দীর দর্শন ও বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের আবিস্কৃত Ether বা "Primitive fluid" "খং" এবং Ether সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্তু।

Ether কি তাহা আমরা এখন কতকটা বুঝিলাম; কিন্তু এখানেই আমাদের নিরস্ত হইলে চলিবে না। Ether হইতে কিরূপে জীবোৎপত্তি হয়, তাহা এখন আমাদের দেখিতে হইবে। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সে সম্বন্ধে আর কি বলিয়াছেন, আমরা এক্ষণে তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, Primitive feuid বা Ether প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত;—একভাগ গতিহীন ও অপর ভাগ গতিশীল। যে ভাগ গতিহীন ইহাঁরা তাহাকে Ether endued with motion বা কেবল মাত্র Ether বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেমন Ether,—endued with motion ও motionless Ether বা Ethern ও Ether এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রাচীন ঋষিগণও "খং" কে "বায়ুরং খং" ও "পুরাণং খং" নামে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। "বা" অর্থে গতি বা motion, তাহা হইলে "বায়ুরং খং" অর্থাৎ গতিশীল "খং" বা "খং" endued with motion, এবং "পুরাণং খং" অর্থাৎ গতিহীন "খং" বা "খং" motionless (or Etheron.) "পুরাণং" অর্থাৎ চিরন্তনং, যাহা চিরকাল একরূপ;—অর্থাৎ গতিহীন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা এই নির্ণয় করিলাম যে Primitive fluid বা "খং" প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ; একভাগ motionless Ether. or Etheron বা "পুরাণং খং" ও অপর ভাগ Ether endued with

Ether বা "খং" হইতে কিরূপে জীবোৎপত্তি হইতেছে, ইহাই আমাদের এখন জ্ঞাতব্য বিষয়। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, Primitive fluid এর যে অংশ স্পন্দন হীন, তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ কিছু পরিজ্ঞাত নহেন। তাঁহারা এই অংশকে Invisible বা অপ্রত্যক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই অপ্রত্যক্ষ Ether রই Etheron নামে পরিচিত। এই Inivsible

Biological and Abiological world. জীব ও জড় জগৎ

Ether বা Etheron, গতিহীন ও অপ্রত্যক্ষ বস্তু; ইহা ব্যতীত তাঁহারা ইহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে পারেন নাই; তবে এই কথা মাত্র উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে এই Etheronর সহিত কোনও পার্থিব বস্তুর সম্বন্ধ নাই, ইহা সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা invisible বা অপ্রত্যক্ষ হইলেও, যোগ ধ্যান ও প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে, এবং ইহার ভিতরকার অনেক অপার্থিব শক্তি উপলব্ধি করাইতে পারে. কিন্তু সে সকল কথার আলোচনা করিবার এস্থান নহে, এবং তাহার সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিব, তাহা আমাদের কল্পনা বা অনুমান মাত্র, সুতরাং তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজনও দেখি না। কেবল মাত্র আমাদের এইটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে পণ্ডিতগণ এই motionless Ether বা Etheron কে Spiritual বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পারলৌকিক ও ভৌতিক তত্ত্ব সকল ইহার মধ্যেই সমাহিত।

যাহা হউক এই কথার বিচার লইয়া এখানে বিলম্ব না করিয়া ইহার অপর অংশ অর্থাৎ "বায়ুরং খং" বা Visible Ether যাহা, তাহার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ আর কি বলিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করিব। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই অংশ নিয়তই স্পন্দিত হইতেছে—ইহা গতিশীল। এই Ether এর স্পন্দন হইতেই জীব ও জড়ের উৎপত্তি হইতেছে। যে কম্পন গুলি আসিয়া সরল ভাবেই চলিয়া যাইতেছে, তাহা হইতে জড় বা অচেতন, এবং যে কম্পন গুলি আসিয়া Vortex-rings এর মত আবর্ত্ত ব্যূহাকারে পরিণত হইতেছে,—তাঁহারা বলিতেছেন, তাহা হইতেই জীবের উৎপত্তি।

স্রোতস্বিনী যখন খরবেগে প্রবাহিতা হইয়া যায়, তখন আমরা দেখি, তাহার কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণাবর্ত্ত সকল উৎপন্ন হইয়া ঘুরিতেছে

স্থল হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া একই পথ দিয়া একইভাবে প্রবাহিত হইয়া যেমন একই নদী ঘূর্ণাবর্ত্ত ও তরঙ্গ—দুইটী পৃথক জিনিষের সৃষ্টি করে, সেইরূপ এই একই Primitive fluid বা Ether হইতে অনুকম্পন সকল একই ভাবে আসিয়া কোন স্থান হইতে Vortex-ring বা ব্যূহাকার হইয়া জীবোৎপত্তি হইতেছে ও কোনও স্থানের অনুকম্পন সকল ব্যূহাকারে না ঘুরিয়া সরল ভাবেই চলিয়া যাইতেছে ও তাহা হইতেই জড় বা অচেতনের সৃষ্টি করিতেছে।

আমাদের আর্য্যঋষিগণও ঠিক ইহাই বলিয়াগিয়াছেন। তাঁহারা গতিশীল Ether বা "বায়ুরং খং" কে বারম্বার "বায়ুরং খং" না বলিয়া কেবল "বায়ু" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, এই বায়ু হইতেই চেতন ও অচেতন পদার্থ সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। যে বায়ু ব্যূহাকারে ঘুরিতেছে তাহা হইতেই জীব ও অপর বায়ু হইতেই জড়ের উৎপত্তি।

পাশ্চত্য দার্শনিকগণ স্থির করিয়াছেন Vortex rings—যাহা হইতে জীবের উৎপত্তি তাহা ৫ টী চক্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পাঁচটি চক্রকেই আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চ ব্যূহ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই পঞ্চব্যূহ পরিবেষ্টিত চক্র বা Vortex-ringই পঞ্চবায়ু পরিবেষ্টিত মুখ্য-প্রাণ বা জীব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Ether হইতে এই জীব ও জড়োৎপত্তিকে ২ অংশে বিভাগ করিয়া দুইটি নাম দিয়াছেন; যথা—Biological world ও Abiological world, অর্থাৎ জীব ও জড়জগৎ। এবং Ether হইতে Vortex-ring এর ন্যায় হইয়া যে জীব বা চেতনের উৎপত্তি হইতেছে, সেই জীবকে তাঁহারা "Biological unit" বা Protoplasm নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই Biological unitই আমাদের শাস্ত্রোল্লিখিত "মুখ্য প্রাণ" বা "জীব" পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, এই Biological unit বা জীব পাঁচটি ringএর দ্বারা পরিবেষ্টিত, আর আর্য্যঋষিগণও ঠিক তাহাই বলিয়াছনে যে, মুখ্য-প্রাণ বা জীব পঞ্চব্যূহে বা পঞ্চ বায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত; সুতরাং আমরা এখন বুঝিলাম, যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Primitive fluid বা Ether হইতে Protoplasm বা জীবের উৎপত্তি যেমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; আমাদের আর্য্যঋষিগণও "খং" বা "ব্রহ্ম" হইতে মুখ্য-প্রাণ বা Biological unit or Protoplasm পর্য্যন্ত ঠিক সে ভাবেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

শুনিবে কি কথা ?

প্রিয়তম !

আজি এ নির্জ্জনে পাইয়াছি তোমা,
শুনিবে কি সেই কথা ?
শুনিবে কি তুমি ? প্রাণের কাহিনী—
নিগূঢ় হৃদয় ব্যথা ?
বহুদিন হ'তে অন্তরে লুকান—
আছে যাহা স্তরে স্তরে,
একে একে সব দেখাব কি খুলি ?
দেখিবে নয়ন ভ'রে ?
অন্তরের মম গভীর কালিমা—
বেদনার রেখা দেখি,
ঈষৎ হাসিয়া অবজ্ঞা করিয়া
ফিরাবে কি দুটি আঁখি ?
এ আবার কে গো ? বিষম উৎপাৎ !
সুখের দিবসে মোর,
দীর্ঘশ্বাস ফেলি, আসিল জ্বালাতে,
করি অন্ধকার ঘোর ?
আবার উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় দিনে
বরিষার মেঘ মত ?
এ আবার কেন অন্ধকার করি
পিছল করিছে পথ ?
এ আবার কেন শোক দুঃখ ময়,
লইয়া আপন প্রাণ,
দিতে চায় তুলি নিজ হাতে করি,
কেবা চেয়ে ছিল দান ?
এর সুখে দুঃখে আমার কি স্বার্থ ?
ভাবিয়া আপন মনে,
অবজ্ঞার সহ যাইবে কি চলি—
আমার কথা না শুনে ?
আমি যা দিয়াছি, প্রতিদান তার
পাইতে না করি আশ।
শুধু এই চাহি, শুন প্রিয়তম
পরাণের হা-হুতাশ ! !

——•——

দ্বিভাষে প্রশ্নোত্তর।

ললিত গোপালের বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর, বিনোদিনী সপ্তদশী। দুটিতে বিশুদ্ধ প্রণয় ছিল। এত শৈশববয়সে ভালবাসা যে, ললিতগোপালের তখন উপনয়ন পর্য্যন্ত হয় নাই, বিনোদিনী কত ছোট, পাঠক বিবেচনা করিয়া লইবেন। প্রণয় হইয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তত বয়স পর্য্যন্ত উভয়ের বিবাহ হয় নাই।

কে জানে কি কারণে বিনোদিনী মানিনী হইয়াছিল। তিন দিবসান্তে ললিতগোপাল দিবাভাগে প্রচ্ছন্ন ভাবে আসিয়া বিনোদিনীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। বিনোদিনী তখন ঘরে ছিল না, অর্দ্ধঘণ্টা পরে গৃহে প্রবেশ করিয়াই, ললিতকে দেখিয়া নত মুখে চৌকাটের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। এইখানে দুইজনের প্রশ্নোত্তর। নায়ক কথা কহিতেছে, সংস্কৃত ভাষায় নায়িকা উত্তর দিতেছে, বাঙ্গালায়। নিম্নভাগে আদর্শ দর্শন করুন:—

নায়ক।—আগচ্ছাগচ্ছ কান্তে!

নায়িকা।—যাও, ভালবটে আপনি! জেনেছি জেনেছি।

নায়ক।—হা কথং ক্রোধিভাষি?

নায়িকা।—কারে ক্রুদ্ধ হব বা!

নায়ক।—নিজ ভাজন জনে।

নায়িকা।—সে কেবল বাক্য সারা!

নায়ক।—ক্ষন্তব মেহপরাধ শশধরবদনে!

নায়িকা।—ঐ গুণে ত কিনেছ;

মানভঞ্জন হইয়া গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয়ে দিব্য হাসিখুসি করিয়া সময় জাপন করিল। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এবং বিশুদ্ধ কথা কহিতে শিখিলে প্রণয় কত সুখের হয়, এই মান ভঞ্জনের দৃষ্টান্তে পাঠক দেখুন।

নাম বিতরণ।

ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে নব নব ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রচারক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রচারক আবশ্যক হয় না, সেই কারণে হিন্দু প্রচারক অত্যল্পই দেখা যায়। কথকঠাকুরেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বেদিতে বসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে নানাপ্রকার আখ্যা

অদ্ভুত অলঙ্কারের সংযোগ থাকাতে জ্ঞান পিপাসু লোকের পক্ষে তাদৃশ উপকার প্রদায়ক বোধ হয় না; স্ত্রীলোক ও ইতর লোকেরাই তাহাতে আমোদ প্রাপ্ত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে, এদেশ প্রচলিত কথকতাকে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম প্রচার বলা যায় না। বিশেষতঃ কেবল এক একটি স্থানে সেইরূপ ধর্ম্ম-কথা সীমাবদ্ধ থাকে।

স্থানে স্থানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রচারকগণ পরিভ্রমণ করেন, সে প্রথা খৃষ্টান মিশানারী মহাশয়েরা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, দেখাদেখি আমাদের ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণও স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ঐ দুই সম্প্রদায়ের প্রচারকেরা ধর্ম্মসমাজ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, নিঃস্বার্থ প্রচারের দৃষ্টান্ত বিরল।

নিস্বার্থভাবে প্রচার কোথায় ছিল?—নবদ্বীপে। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচৈতন্য-দেব বিনাস্বার্থে হিন্দুস্থানের প্রায় সর্ব্বত্র হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় সহচর নিত্যানন্দ ঠাকুর নিয়ত নাম বিতরণে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দেখুনঃ—

কীর্ত্তনের সুর।

"নিতাই টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, বলিতে বলিতে যায়।
এনাম কে নিবি, ত্বরায় আয়;
ওগো তোরা আয় গো আয়॥
হরিনাম,—মধুর নাম, তোরা কে নিবি, কাছে আয় গো আয়।
এনাম বিনামুল্যে দিব, জগত মাতাব, মাথা মুড়াইব হরির পায়॥
তোরা কে নিবি, ত্বরায় নেচে নেচে তোরা আয় গো আয়॥"

দেখুন,—এমন নিঃস্বার্থ ভাবে হরিনাম বিলাইতে এ পর্য্যন্ত কে পারিয়াছেন? পারিয়াছিলেন কেবল মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আর প্রিয়ভক্ত নিত্যানন্দ প্রভু! এখন সেই নিতাই চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের কি অবস্থা হইয়াছে তাহাই আমরা ভাবি!

ধর্ম্মের বিচিত্র গতি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী।

পাটওয়ার ঘনশ্যামের পুত্র অকুল মিত্র জমিদারের কৃপায় পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া একবৎসরের মধ্যেই প্রায় দেড় হাজার টাকা তহবিল তছরূপ করিয়া এবং জমিদারের বিনা অনুমতিতে কতকগুলি খারিজদাখিল করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করেন, এবং হিসাব নিকাশের পূর্ব্বেই নিজ বুদ্ধিবলে স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক বেমালুম ডুব মারেন। অকুলের পত্নী হরিণীনয়নাও পতিব্রতার আদর্শ। তিনি অপহৃত অর্থের মধ্যে দেড়হাজার টাকা মাত্র নিজের হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত টাকা অর্থাৎ ৰবলগে পঁচাত্তর টাকা স্বামীর হস্তে দিয়া সাশ্রুনয়নে স্বামীকে ছয়মাসের জন্য বিদায় দেন, এবং পতিবিরহে প্রত্যহ তিনবার মাত্র আহার করিয়া দারুণ মনঃকষ্টে যামিনী যাপন করেন। অকুল অকুলপাথারে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এদিকে সহৃদয় জমিদার মহাশয় পুরাতন কর্ম্মচারীর পুত্রের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ফৌজদারি মামলা না করিয়া দাওয়ানি আদালতে ডিক্রিহাসিল করতঃ তাহার বাস্তভিটাটি ৩৮০৲ টাকায় ডাকিয়া লইয়া ক্ষান্ত হইলেন। গোল মিটিল। ক্রমে নবোদিত শ্মশ্রুকুর্চ্চ সমন্বিত অকুল মিত্র শ্বশুরালয়ে দর্শন দিলে, পতিপরায়ণা হরিণী তিনদিন সাদরে পতির অর্চ্চনা করিতে ক্রুটি করিকরিলেন না। এই দিনত্রয়ে পতির প্রবাসকাহিনী শ্রবণ করতঃ শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, যে আর্য্যপুত্র কাশীধামে বাষট্টি টাকা হারাইয়া ছত্রে ভোজন করতঃ দিন যাপন করিয়াছিলেন, তখন আর দুঃখের পরিসীমা রহিল না। দুঃখটা স্বামীর ছত্রে আহারের জন্য নয়, যে বাষট্টি টাকা তাঁহার চুরি গিয়াছিল, সেই বাষট্টি টাকা স্বামীকে কেন দিয়াছিলেন, ইহাই দারুণ দুঃখ, এবং সেই দুঃখের কথা তিন দিনের মধ্যে ত্রিশবার মুখে বলিয়াছিলেন, মনে কতবার] উদয় হইয়াছিল, তাহা ভগবানই জানেন।

এখন পাঠক সমীপেও একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। অনেকেই বলিবেন, ছত্রে ব্রাহ্মণেই আহার পায়, অকুল মিত্র কেমন করিয়া পাইলেন? ছত্রে ব্রাহ্মণেতর জাতি আহার পায় কি না জানি না, কিন্তু

গ্রহণ করতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ নামের আদি অন্ত পরিবর্ত্তন করতঃ কেবল মধ্যের কুটুকু মাত্র রাখিয়াছিলেন। তাহার পর হরিণী যখন শুনিলেন যে, ছত্রের ব্রাহ্মণদিগকে যাত্রীগণ মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, এবং টাকাটা সিকিটা দক্ষিণাও দিতেন, তখন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সব টাকা আছে ত ?"

"কেমন করিয়া থাকিবে ? ছত্রে একবেলা মাত্র খাইতে পাইতাম, রাত্রে ঐ পয়সা হইতেই খাইতে হইত, তার উপর দুখান কাপড়, একখান ভাল কম্বল কিনিতে হইয়াছে, সব ত চুরি গিয়াছিল ?"

"আসবার খরচ পেলে কোথা ?"

"এক রাণী নিমন্ত্রণ করিয়া একখানা গিনি দক্ষিণা দিয়াছিলেন, তাতেই এসেছি।"

"গিনি ! তবে আর দিন কতক থেকে আর খানকত গিনি নিয়ে এলেনা কেন ? আমার বালা জোড়াটার দুএক যায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছে, ভেঙ্গে একজোড়া ভারি বালা হ'ত।"

"রাণীত রোজ আসেনা, গিনিও রোজ পাওয়া যায় না।" হতাশ হইয়া হরিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে গিনিখান ভাঙ্গিয়েছ ?"

"না ভাঙ্গালে আস্‌বো কি করে ?"

"গাড়ি ভাড়াতে সব টাকাই খরচ হয়ে গেছে নাকি ?"

"না, গোটা সাতেক টাকা আছে, তা মনে করছি, একটা চাকরি বাকরির চেষ্টায় ত বেরুতে হ'বে, ঐ কটা টাকা হাতে ক'রে বেরুবো।"

"তা ভাল কিন্তু সাত টাকায় দরকার কি ? দুটো টাকা সঙ্গে থাকলেই ঢের। আমার জল খাওয়ার জন্যে পাঁচ ছ টাকা দেনা হয়েছে, কি করে শুধবো ভেবে মরছিলাম, তা আপাততঃ পাঁচটা টাকা দিলে কিছু দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হই।"

হরিণী মাতার একমাত্র কন্যা, হরিণীর পিতামাতা উভয়েই বর্ত্তমান, হরিণীর জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা উপার্জ্জনক্ষম, পিতারও কিছু আছে। পিত্রালয়ে হরিণীকে নিজের জন্য এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় না, অধিকন্তু মাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নিজের হাতের টাকা সুদে খাটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বামীর নিকট সে কথা আদৌ প্রকাশ করেন নাই।

পত্নীপরায়ণ অকুল দ্বিরুক্তি না করিয়া স্ত্রীর হস্তে টাকা পাঁচটি দিয়া দুইটি মাত্র টাকা সম্বল রাখিলেন।

চতুর্থদিন হইতে হরিণী স্বামীকে চাকরির চেষ্টায় বাহির হইবার জন্ম তাগিদ দিতে আরম্ভ করিলেন; অকুল আজ কাল করিতেছেন দেখিয়া তাগাদা ক্রমে জোর হইতে লাগিল। শেষে একদিন হরিণী স্বামীকে বলিলেন, "দেখ, আমার বাপের বাড়ী বসে বসে থাচ্ছ, এরা মনে মনে বিরক্ত হচ্ছে, তা বুঝতে পাচ্চ না? তোমার ত লজ্জা সরম নেই, কিন্তু আমার মাথা কাটা যায়।"

পরদিনই অকুল পথের সম্বল দুই টাকা হাতে করিয়া চাকরির চেষ্টায় আবার অকূলপাথারে ভাসিলেন। চাকরির কথাই প্রথমে মনে আসা বাঙ্গালির স্বধর্ম্ম। বিশেষতঃ একটু অতিসামান্য লেখাপড়া জানিলে, তাহার আর কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকিতে পারেনা। অকুলও স্বধর্ম্ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। কলিকাতা আট ক্রোশ পথ তিনক্রোশ পদব্রজে গেলে রেলে যাওয়া যাইতে পারে, কয়েক ক্রোশ পথ হাঁটার পরিবর্ত্তে অনর্থক রেলে কয়েক আনা পয়সা নষ্টকরা অকুল নির্ব্বোধ ও অলসের কার্য্য মনে করিয়া পদব্রজেই কলিকাতা গমন স্থির করিলেন। বিদেশে, বিশেষতঃ কলিকাতার ন্যায় অপরিচিত স্থানে যাইতে হইলে ব্রাহ্মণ হওয়ার অনেক অসুবিধা দূর হইতে পারে মনে করিয়া, পথিমধ্যেই পূর্ব্বনাম ও ব্রাহ্মণ বেশ গ্রহণ করিলেন। ক্রোশদ্বয় পথ অতিক্রম করিয়া দেখেন, একজন কৃষক বেশী লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। প্রথমে একটু ভয় হইল লোকটা দস্যুদলের নয়ত? তবে দিনের বেলা, পথে লোকও যাতায়াত করিতেছে. সাহসে ভর করিয়া চলিলেন। সাহস না করিয়াই বা কি করেন? লোকটা সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অকুল পাটওয়ারের পুত্র বটে, কিন্তু তখনও পাকা পাটওয়ার হয় নাই, চোর ডাকাতের ভয়টা অন্ততঃ যায় নাই।

আরও অর্দ্ধক্রোশপথ অতিক্রম করার পর যখন লোকালয় নিকটবর্ত্তী হইল, তখন পশ্চাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

লোকটা বিনীত ভাবে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে দাদাঠাকুর! আমার কেও নেই,—মামার বাড়ী ছিলাম, তা মামী রাগ করে তাড়িয়ে দেছেন, তাই কল্‌কেতায় যাচ্ছি, একটা চাকরির চেষ্টায়।"

"তোমার কেও নেই?"—অকুলের একটু সাহস হইয়াছে।

"না দাদা ঠাকুর! ছেলে বেলায় বাপ মা মরে গেছলো, তাই আয়ী আমায় মানুষ করেছেলো, এখন আয়ী নেই, মামী তাড়িয়ে দিলে, আয়ী থাক্‌লে কি আর পারত?"

উভয়ে পথ চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অকুল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কিছু কায্ করতে না?"

"কর্‌বনি কেনে? বাবুদের বাড়ী কায কর্ম্ম হলেই যেতাম, খাট্‌তাম, মিটুই মণ্ডা খেতাম, যাত্রা পাঁচালি শুন্‌তাম, কোথাও বাঁধা চাকরি করিনি।"

"কলকাতায় কি চাকরি করবে?"

"যা জুটবে তাই করব।"

"আমার কাছে চাকরি করবে?"

"করবনি কেনে ঠাকুর? তুমি কি কায করেন?"

"আমি কবিরাজ, দেশে রোজগার কম, তাই কলকাতায় যাচ্চি, কবিরাজী কর্‌তে। বেশ তুমি যদি আমার কাছে থাক, ত কি মাইনে নেবে?"

"তোমার পেসাদ পাব, আর মাসে মাসে দু এক টাকা যাহা দেবেন।"

"তা বেশ, তোমার ও পুঁটলিতে কি আছে?"

"আস্‌বার সময় বাবুদের বাড়ী বিদেয় নিতে গিছলুম, তা কর্ত্তাবাবু ধুতি চাদর আর একটি টেকা দিলেন, গিন্নী মা একটা আধুলি দিলেন, আর দাদাবাবু তাঁর গায়ের একটা ভাল পিরেন দিলেন, তাই আছে।"

"বেশ কথা, কলকাতায় গিয়ে ওসব আমার কাছে রেখে দিও, এখন চল। তোমার নাম কি?"

"যে আজ্ঞে দাদাঠাকুর! আমার নাম সরল চন্দর।"

অপরাহ্নে উভয়ে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। পথে সরল চন্দ্রের আধুলি ভাঙ্গাইয়া উভয়ের জলযোগ হইল।

পথে আসিবার সময় অকুল সরল চন্দ্রকে দিয়া কতকগুলা পাতা লতা সংগ্রহ করিয়া লইলেন, অভিপ্রায় ঔষধ প্রস্তুত করা। এ মতলবটা সরলকে পাওয়ার পর এবং তাহার নিকট আপনাকে কবিরাজ বলিয়া পরিচিত করার পর তাঁহার মস্তিষ্কে উদিত হয়।

কলিকাতা বড় কঠিন স্থান। ব্রাহ্মণই হও আর দেবতাই হও, রাত্রে কোথাও থাকিবার স্থান পাইবে না। অগত্যা সেই রাত্রেই অনেক অনুসন্ধান করিয়া একটি ক্ষুদ্র খোলার ঘর মাসিক দুই টাকা ভাড়ায় লইয়া সেখানে

একমাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়া থাকিতে হইল। উভয়ের সম্বল এক টাকা মাত্র রহিল। প্রভুভক্ত সরল সর্ব্বস্ব অকুলের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। অকুলও সরলের প্রভু নকুড় মৈত্র হইয়া সরলের কাপড়, চাদর, এবং জামার অধিকারী হইয়াছে।

প্রভাতে অকুল মিত্র ওরফে নকুড় মৈত্রেয় মহাশয় প্রিয়ভৃত্য সরলকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সরল! রাতটাত কোনমতে কাটিল, এখন আহারাদির ব্যবস্থা ত করা চাই।"

"আজ্ঞে তা চাই বই কি, না খেলে চল্‌বে কেন?"

"পুঁজি পাটাত কিছু নেই।"

"তা ত নেই।"

"তবে এক কাজ কর।"

"যা বলবেন তাই করব, আপনি কেবল চারটি ভাতের ব্যবস্থা করুন।"

"তাই কর্‌ব বলেই ত বল্‌ছি।"

"বলুন।"

"তুমি একবার সহরে বেরোও।"

"বেরুচ্চি," বলিয়া সরল বহির্গমনোদ্যত হইল দেখিয়া নকুড় বলিলেন, "বেরিয়ে কি করবে বল দেখি?

"কি করব?"

"তুমি কাল পথে এক এক বার গুণ গুণ করে গাইতে ছিলে না? তোমার গলাত বেশ!

"আজ্ঞে বাবুদের বাড়ী যাত্রা পাঁচালি শুন্‌তাম তারই দুই একটা গান মনে পড়ছিল, তাই গাইছিলাম।"

"হরিনামের গান জান?"

"আজ্ঞে জানি বই কি, গাইব?"

"গাও দেখি একটা।"

সরল একটি সুন্দর হরিনাম গান করিল, নকুড় সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "তুমি এই গানটি গেয়ে সহরে বাড়ী বাড়ী ঘুরে কিছু ভিক্ষে করে আন। কেও বেশি গান করতে বল্লে গান পিছু এক পয়সার কম নিওনা, পারত দুপয়সা করেই আদায় করো। এখন যাও, দেখ, যেন বেশিদুর যেওনা, সহরের রাস্তা বড় গোলমেলে, পথ ঠিক করে যেও।" বলিয়া তাঁহার ঠিকানা বলিয়া দিলেন।

সরল ভিক্ষায় বাহির হইল। নকুড় বাবু প্রাতবেশিদের খোলার চালের পার্শ্বদেশ হইতে ইন্ধন স্বরূপ কিছু বাখারি বেমালুম সংগ্রহ করিলেন, একটি চুল্লী প্রস্তুত করিলেন, হাতে খুচুরা দুচার পয়সা যাহা ছিল, লইয়া যৎকিঞ্চিৎ তৈল লবণ সংগ্রহকরিয়া রাখিলেন।

এদিকে বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়, দেখিয়া নকুড় চিন্তিত হইলেন, হয়ত সরল পথ ভুলিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই সরল পথ ভুলিয়াছিল, তবে প্রভুর আদেশ স্মরণ করতঃ বহুদূর যায় নাই, নিকটেই ঘুরিতে ছিল. বাসার নিকট দিয়া ৩।৪ বার যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু গলি ঠিক করিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী এক দোকানে বসিয়া এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া চর্ব্বণ করিতেছে। নকুড় সরলের সন্ধানে বাহির হইয়াই তাহাকে পাইলেন। তখন প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই নিশ্চিন্ত হইয়া বাসায় ফিরিয়া পাকের আয়োজন করিলেন। সরল প্রথম দিনেই নগদ পাঁচ আনা ও প্রায় দুইসের তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রথম দিন কাটিয়া গেল। সরল প্রত্যহই ভিক্ষায় বাহির হইয়া চারি, পাঁচ, ছয় আনা, কোনও দিন বা আট দশ আনা নগদ ও কিছু কিছু তণ্ডুল আনয়ন করে, প্রভু ভৃত্যের বেশ দিন কাটিয়া যায়। নকুড় একখানা টিনের গায়ে কবিরাজ নকুড় চন্দ্র মৈত্র লেখাইয়া গলির মুখে লাগাইলেন, তাহাতেও মধ্যে মধ্যে দুচারি আনা আমদানি হইতে লাগিল। এক মাস অতীত হইলে নকুড় হিসাব করিয়া দেখিলেন, খরচ খরচা বাদে চৌদ্দ টাকা নয় আনা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। তখন একবার সরলকে পাঠাইয়া গৃহিণীর সংবাদটা লওয়া আবশ্যক মনে করিলেন। অকুল যে কোন উপায়ে উপার্জ্জন করিতেও কুণ্ঠাশূন্য, উপার্জ্জিত অর্থ নিঃশেষে পতিপরায়ণা হরিণীকে দিতেও তদ্রূপই কুণ্ঠাশূন্য।

—— (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

১। কুসুমাঞ্জলি।—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দালাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। সঙ্কলিত পুস্তকের কোন্ কোন্ কবির রচনা সঙ্কলিত তাহা লেখা থাকে, এ পুস্তকে তাহা নাই। সঙ্কলন কর্ত্তা একস্থানে লিখিয়াছেন, "সাধারণতঃ লেখক সম্প্রদায় যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন, আমার রচনা প্রবৃত্তি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন * * * পাঠক মহাশয়

নূতন কথা বটে। সাধারণ কবিগণের রচনা প্রবৃত্তি হইতে এই সঙ্কলন কর্ত্তার রচনা প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই অংশ পাঠ করিয়া প্রথমে আমাদের হাসি আসিয়াছিল, কিন্তু সেই যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রবৃত্তি, তাহা বুঝিবার কিছু ব্যতিক্রম ঘটাতে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশে প্রবৃত্তি আসিলনা। "সঙ্কলিত" এই শব্দটি পাঠ করিলেই বুঝাযায় অপরাপর কবির কিছু কিছু সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু এই পুস্তিকায় কোন্‌গুলি সংগৃহীত এবং কোন্‌গুলি দালাল মহাশয়ের নিজের রচনা, তাহা বুঝিতে পারা গেলনা; বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলে ভাল হইত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—এই জ্ঞানগর্ভ নামযুক্ত কয়েক খানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার অনেক স্থল আপনাদের জ্ঞান বুদ্ধিমতে সাজাইয়া লইয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থের গুণাগুণের তুলনা করা অল্প সময় সাপেক্ষ নহে; একখানি গ্রন্থের সমালোচনা স্থলে সেই গুরুপাঠে আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। অদ্য যে গ্রন্থ খানির আলোচনা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সেখানি শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে মূল, অন্বয়, সন্ধিবিচ্ছেদ, শব্দার্থ, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনুবাদ, ভাবার্থ ও গীতোক্ত উপদেশের সারমর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে। গীতার ন্যায় জ্ঞানোদগ্রন্থের যত অধিক প্রচার হয়, বিশুদ্ধতা সাধনের যতই চেষ্টা হয় ততই উপকার। গোস্বামী মহাশয় যতদূর পরিশ্রম করিয়াছেন, রসাস্বাদন করিলেই সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরা তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অংশটি আলোচনা করিতে পাঠকগণের যে শ্রম ও সময় ব্যয়িত হইবে, তাহা নিরর্থক হইবে না, অসঙ্কচে তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত এই পুস্তকখানির মূল্য স্থির করিয়াছেন এক টাকা আট আনা।

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণস্তবামৃত।—পরমহংস ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক গুলি ভাবুক ভক্ত ভিন্ন ভিন্ন আকারে অনেকগুলি স্তব কবচ প্রচার করিয়াছেন, সে গুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, পরমহংসদেবের জনৈক ভক্ত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ সেনগুপ্ত সেইগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এতৎ পাঠে ভক্তমণ্ডলীর আনন্দের সহিত বিশেষ উপকার লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণের দুর্গতি ও তাহার প্রতিকার উপায়।—শ্রীযুক্ত রাজা

ধামের মহামণ্ডল শাস্ত্রপ্রকাশক সমিতির লিমিটেড প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য এক আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি প্রকৃত উপযুক্ত সময়েই প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক ব্রাহ্মণগণের যেরূপ দুর্গতি হইয়াছে, ব্রাহ্মণেরা নিজেই তাহা বুঝিতেছেন, সে দুর্গতির প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া রাজা শশিশেখরেশ্বর এদেশের হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা অনুরোধ করি, দুর্দ্দশাপন্ন ব্রাহ্মণেরা এই পুস্তকখানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া আপনাদের দুর্গতি দূর করণে সাধ্যমতে তৎপর হইবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

কলিকাতা ৫৯ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটস্থ সুবিখ্যাত—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ মহাশয়ের ১৩২১ সালের চিত্র পঞ্জিকা আমরা উপহার পাইয়াছি। চিত্রখানি সুন্দর বিশেষত্ব পূর্ণ,—চিত্রে সুনীল সলিলা স্রোতস্বতী, গ্রাম প্রান্তর, বন উপবন ও পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করিয়া দূরদূরান্তরে তরঙ্গমালা উচ্ছ্বাস ছুটাইয়া যাইতেছে, তদুপরি কারুকার্য্য খচিত সেতু, বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ নগর, নদীবক্ষে শানবাঁধান ঘাট, এবং তীরে ভগবান শ্রীশ্রীসোমনাথের শ্রীমন্দির।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ মহাশয় কলিকাতার একজন সর্ব্বজন সুপরিচিত সুশিক্ষিত প্রথিত নামা কবিরাজ; তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যের পরিচয় আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কবিরাজ মহাশয়ের আবিষ্কৃত "সোমেশ্বর রসায়ন" মহৌষধটির নামের সার্থকতা এই চিত্র পঞ্জিকায় অক্ষুণ্ণ রাখিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বাঙ্গলা ডেট্‌কার্ড।—কলিকাতা ১৪।৪ নং হ্যারিসন রোডের কারবাইড বা গ্যাসের মসলা বিক্রেতা সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী কে, সি, দে এণ্ড সন্ আমাদের একখানি "ডেটকার্ড বা তাস পঞ্জিকা" উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। এই ডেটকার্ডে বাঙ্গলা তারিখ, মাস, বার, পর্য্যায়ক্রমে সুসজ্জিত আছে। প্রতি দিন প্রাতে বার ও তারিখের কার্ডখানি বদ্‌লাইয়া দিতে হয়;—বাঙ্গলায় যে ইংরাজী "ডেট্‌কার্ডের" অনুকরণে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ডেটকার্ড হইতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমাদের ধারনায় আইসে নাই; ইহা এক নূতন জিনিষ গৃহে থাকিলে গৃহের শোভা বৃদ্ধি হয়। আমরা কে, সি, দে এণ্ড সনের ব্যবসায়ের উন্নতি কামনা করি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। ১৩২১ সাল, আশ্বিন। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবের তত্ত্বকথা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

শরৎকালে যখন সমীরণ হিল্লোলে হিল্লোল তুলিয়া, বিকচারবিন্দ সৌন্দর্য্য ভূয়িষ্ঠা অরবিন্দলক্ষণা শরৎ লক্ষ্মী সমাগতা হন—ধরণী উল্লাসে প্রোল্লোসিত হইয়া শুভ্রাকাশ কুসুমরূপ কৌষেয় বসন পরিধান করেন—সুনীল গগন হাস্যময়, নীলা অরণ্যানী হাস্যময়ী এবং সুনীল সলিলা তড়াগতটিনী কুমুদ-কহ্লার কমলদলে শোভাময়ী ও হাস্যময়ী হয়, বঙ্গবাসী হিন্দুগণ তখন শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। যখন নির্গলিতাম্বুক লঘুশারদমালা কণ্ঠে পরিধান করিয়া সুপ্রসন্ন দিগঙ্গনাগণ নির্ম্মলেন্দুদ্যুতি পরিচ্ছিন্ন ব্যোম-মার্গের স্থানে স্থানে প্রজ্বলিত হীরকখণ্ডবৎ তারকার বর্ত্তিকা সমগ্র রজনী জ্বালিয়া রাখিয়া প্রভাত সমাগমে সেইগুলিকে সুরভিফুৎকারে নির্ব্বাপিত করণ নিমিত্তই যেন সুগন্ধি মারুত সুখস্পর্শ হয়—যখন বঙ্গীয় শস্যক্ষেত্রের প্রসরো-

স্থশালিনী শালিধান্যময়ী কেশরাজি হইতে বারিবিন্দুপাতের ন্যায় শিশরবিন্দুপাত হয়—যখন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, ইতর, ভদ্র সকলের অন্তঃকরণে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হয়, তখন বঙ্গের হিন্দুগৃহে ষোড়শোপচারে দুর্গা-দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

বরাবর যেমন হইয়া থাকে, এবারও তেমনই বঙ্গীয় হিন্দুর গৃহে মায়ের শুভাগমন হইতেছে—সকলেই এ পূজোৎসবের জন্য অল্পবিস্তর আনন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু কয়জনে এই পূজোৎসবের উৎপত্তি কথা জানেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে, কলিযুগে দুর্গাদেবীর আরাধনা করিলে অশ্বমেধের ন্যায় ফল লাভ হয়, "দুর্গা" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে দেবীভাগবত বলিয়াছেন,—

"দুর্গাত্রায়তি ভক্তং যা সদা দুর্গতিনাশিনী।
দুর্জ্ঞেয়া সর্ব্বদেবানাং তাং দুর্গাং পূজয়াম্যহম্॥"

অর্থাৎ যিনি ভক্তকে দুর্গ বা দুর্গম অবস্থা হইতে ত্রাণ করেন,—তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। যিনি সর্ব্ব দেবতাগণেরও দুর্জ্ঞেয়া সেই দুর্গাকে আমি পূজা করি।

মহাবিঘ্ন, মহাবন্ধ, কুকার্য্য, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্মমৃত্যু এবং অতিরোগাদির হননকর্ত্রী বলিয়া শাস্ত্রকারগণ দেবীকে "দুর্গা" নামে অবিহিত করিয়াছেন,—

"দুর্গে দৈত্যে মহাবিঘ্নে মহাবন্ধে কুকর্ম্মানি।
শোকে দুঃখেচ নরকে যমদণ্ডেচ জন্মানি॥
মহাভয়েঽতি রোগে চাপ্যাশব্দোহন্তি বাচকঃ।
এতান্ হন্তেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥

আহা দুর্গানামের কি অপার মহিমা! যে একবার ভক্তিতদ্গদকণ্ঠে প্রভাতকালে দুর্গানাম উচ্চারণ করে, সে পাপী হউক, তাপী হউক, সূর্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় অমনি তাহার বিপদরাশি দূরীভূত হয়—

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা॥"

দুর্গার এই নিখিল বিশ্বসংসারের পালয়ত্রী এবং চরাচর জনগণের সৃষ্টিকর্ত্রী, তাই আমরা আজ এই শুভ পুণ্যময় শরৎকালের পবিত্র মুহূর্ত্তে আমাদের

ময়ী জ্ঞান—ইচ্ছাক্রিয়ারূপিনী মহাশক্তি দশভুজা দুর্গায় পূজায় আমরা সকলেই মহানন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছি। সুনির্ম্মল নভোমণ্ডল আজ এই সুখের শারদীয় মহোৎসবে স্থির, প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া আমাদিগেরই ভবিষ্যৎ যে শুভময়ী তাহা ঘোষণা করিতেছে। সুগন্ধবহ সমীরণ এই শুভযোগে শারদফুল্লকুসুমাবলীর সৌরভরাশি দশদিকে বিকীর্ণ করিয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে! সকলই এই বৎসরান্তের শুভদিনে দুর্গোৎসব মহানন্দে মাতোয়ারা হইয়া দুর্গতিহারিণী দুর্গামাতার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান মানসে হর্ষোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন মহানন্দের দিনে ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গের গৃহেগৃহে আজ মা দুর্গার মহোৎসবের মহানন্দ-উৎস সহস্র মঙ্গল ধারায় ছুটিতেছে। আজ এই পুণ্যমুহূর্ত্তে বঙ্গবাসী হিন্দুগণের আনন্দের সীমা নাই। কর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্ম-পরায়ণ বঙ্গবাসী পরিবার আজ অতীত বৎসরের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনা বিস্মৃতির অতলতলে বিসর্জ্জন দিয়া বর্ত্তমানের আনন্দময় দুর্গোৎসব পূজানন্দে, ব্যবহারে সৌজন্যের পূর্ণ আদর্শ হইয়া, আচারে ধার্ম্মিকের অতুল সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক, কুলপরম্পরাগত রীতিপদ্ধতিগুণে ভদ্রতার চরম সীমায় উপ-নীত! ধন্য ভারতবাসী! ধন্য বঙ্গবাসী! শতধন্য তোমাদের ধর্ম্মোপাসনায়! ততোধিক ধন্য তোমাদের চৈতন্যময়ী দুর্গাপূজায়! তোমরাই আর্য্যঋষি মহর্ষিগণের প্রকৃত আচরণ এবং ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছ; তাই মা-আনন্দময়ী দুর্গা আজ তোমাদের গৃহে গৃহে সিংহবাহিনী দশভুজারূপে সিদ্ধিদাতা গণেশ, সুরসেনানী কার্ত্তিকেয়, সর্ব্বসম্পৎরূপিণী লক্ষ্মী এবং সর্ব্ব-বিদ্যাস্বরূপিনী সরস্বতীকে সঙ্গে করিয়া তোমাদের পূজা গ্রহণ করিতে আসিয়া-ছেন। তাই গৃহে বসিয়াই আজ তোমরা সর্ব্বশক্তিময়ী চিন্ময়ী দুর্গাদেবীর রূপ সাকাররূপে মৃণ্ময়ীর আরাধনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছ এবং সকলেই একমনে, একপ্রাণে এবং একস্বরে বলিতেছে—

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নোদেবি দুর্গাদেবি নমোস্তুতে ॥"

দুর্গাপূজা আমাদের পক্ষে নূতন নহে। আমাদেরই আর্য্যবংশের চৈত্র-কুলোদ্ভব মহারাজ সুরথ স্বারোচিষমন্বন্তরে প্রবল প্রতাপ বৈরগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান এবং স্বকীয় পরিবার পর্য্যন্ত হারাইয়া একাকী বনেবনে পর্য্যটন করিতে করিতে সমাধি নামক বৈশ্যের সমভিব্যাহারে মেধস

ব্যক্ত করেন। ঋষিবর মেধস রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন, আপনারা মোহগর্ত্তনিপতিত হইয়া বৃথা রাজ্য, ধন, দারাপুত্রাদির জন্য ক্ষোভ করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীহরির যোগনিদ্রারূপিনী মহামায়াতেই সমস্ত জগৎ সম্মোহিত হইয়া রহিয়াছে। সেই দেবী মহামায়া, তিনি জ্ঞানিগণেরও চিত্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মহামোহে মোহিত করিয়া ফেলেন। সেই মহা-মায়া কর্ত্তৃকই এই চরাচর বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তিনিই প্রসন্না হইয়া মানুষের মুক্তির জন্য বরদান করিয়া থাকেন। সেই মহামায়া দেবীই পরমা বিদ্যা ও মোক্ষের সনাতন হেতু স্বরূপা।"

ইহা শুনিয়া মহারাজ সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! আপনি যাহাকে মহামায়া বলিতেছেন সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্না হইলেন? তাঁহার কর্ম্মই বা কি?

মেধস্ বলিলেন, "সেই দেবী নিত্যা এবং বিশ্বরূপা। এই জগৎ সেই মহামায়া হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি নিত্যা বটে, কিন্তু দেবগণের কার্য্য-সিদ্ধি-নিমিত্ত যখন আবির্ভূতা হইয়া থাকেন, তখনই তিনি লোকসমাজে "উৎপন্না" বলিয়া অভিহিতা হন। তিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াশক্তি এবং সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী সেই বৈষ্ণবী মায়াতেই আপনি ও বৈশ্য এবং অন্যান্য বিবেকীগণও মোহিত হইয়া থাকেন। অতএব মহারাজ! আপনি সেই পরমেশ্বরীদেবীরই শরণ লউন, তিনি প্রসন্না হইলে মনুষ্যাদিগের সমস্ত ভোগ এবং মোক্ষ দান করিয়া থাকেন।

মহর্ষি মেধসের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামায়ার তপস্যার্থে নদী পুলিনে যাইয়া রাজা সুরত ও সমাধি বৈশ্য সেই চিন্ময়ী দেবীর মুর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পুষ্পধুপাগ্নিতর্পণাদি উপচার দ্বারা তাঁহার পূজারম্ভ করিলেন। এই ভাবে সুরথ ও সমাধি তিন বৎসর যাবৎ দেবীর আরাধনা করিলে পর দেবী স্বয়ং তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে ঈপ্সিত বর দান করিতে চাহিলেন। রাজা সুরথ রাজ্যসুখভোগ বর প্রার্থনা করায় পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সমাধি বৈশ্য জ্ঞান প্রার্থনা করায় কালে সেই বৈশ্য জ্ঞান বলে মুক্তিলাভ করিলেন।

তদবধি শারদীয়া পূজা হিন্দুজাতির ধর্ম্মকর্ম্ম মধ্যে একরূপ শ্রেষ্ঠ নিত্য-কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি শক্তিমান্ হইয়াও মোহ বা আলস্য

ভগবতী তাঁহার সমস্ত অভীষ্টই নষ্ট করিয়া থাকেন। সুতরাং কামনা সিদ্ধি হেতু দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা যেরূপ কাম্য বলাযায় সেইরূপ নিত্যও বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ী শুভা॥
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ॥"

অর্থাৎ প্রতিবর্ষে শরৎকালে যে মহাপূজা করা হয়, সেই পূজাই চতুঃকর্ম্মময়ী শারদীয় মহাপূজা; সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিন তিথিতেই ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি এই চতুঃকর্ম্মময়ী শারদীয়া মহাপূজা প্রতিবর্ষেই আশ্বিন শুক্ল পক্ষে করা উচিত। চতুঃকর্ম্ম বলিতে স্নান, পূজা, বলি এবং হোমকার্য্যই বুঝায়। হিন্দুজাতির ধর্ম্মকর্ম্মমাত্রই যখন সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকভেদে তিন প্রকার তখন এই শারদীয়া মহাপূজাও যে সেইরূপ তিন প্রকার হইতে পারে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ সাত্ত্বিকী, রাজসিকী এবং তামসিকী পূজাভেদে হিন্দুমাত্রেরই এই দুর্গাপূজার অধিকার আছে—

"শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ॥
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্॥
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবী মনস্তযা।
দেবীসূক্তজপশ্চৈব যজ্ঞোবহ্নিষু তর্পণম্॥"

জপযজ্ঞাদি এবং নিরামিষ নৈবেদ্যাদি উপকরণ দ্বারা যে পূজানুষ্ঠান হয় তাহাকেই সাত্ত্বিকী পূজা বলে। পুরাণাদিতে এইরূপ সাত্ত্বিকী পূজা দ্বারাই মা ভগবতী দুর্গার মাহাত্ম্য অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবীমাহাত্ম্য অর্থাৎ চণ্ডীপাঠই জপ, এইহেতু দেবীমনা হইয়া দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডিপাঠ করিবে এবং দেবীসূক্ত জপ করিবে ও সুসংস্কৃত বহ্নিতে তর্পণ করিবে। এই প্রকার জপ যজ্ঞাদি রহিত পূজাই রাজসিকী পূজা বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

"রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।
সুরামাংসাদ্যুপহার জপ যজ্ঞৈর্বিনাতু যা॥"

অর্থাৎ যে পূজা উক্তরূপ জপযজ্ঞ বিহীন হইয়া বলিদান, আমিস, নৈবেদ্য

আর তামসিকী পূজা বলিতে মন্ত্র ব্যতীত যে পূজা তাহাই বুঝিতে হয়; এই তামসিক পূজা কিরাতাদিরই করণীয়,—

"বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্ত সম্মতা।"

এইরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণভেদে স্ব স্ব অধিকারানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এবং অন্যান্য সেবকগণ এমন কি নানাবিধ ম্লেচ্ছাচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণও এই মহামায়া দুর্গার পূজা করিতে অধিকারী। অধিকার বিচারে নিজে কিম্বা উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারাও এই দেবীর পূজা করিতে পারা যায়। পূজক ভাল হইলে অর্থাৎ তপঃপরায়ণ হইলে পূজাচর্চ্চার গুণে পূজিত প্রতিমূর্ত্তির আভিরূপ্যহেতুই অভীষ্টদেবতা আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। যথা—

"অর্চ্চকস্য তপোযোগার্চ্চনায়াতিশয়নাৎ।
আভিরূপাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি॥"

আজকাল স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়, হিন্দুর দেবদেবী পূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। তাঁহারা জানেন না যে হিন্দুজাতি যে প্রতিমা গড়াইয়া দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে, উহা হিন্দুগণের পুতুল পূজা নহে, উহা বাস্তবিকই চৈতন্যের উপাসনা। প্রকৃত পক্ষেত সেই এক শুদ্ধ, নিত্য, চৈতন্য আত্মার প্রতিবিম্বই যাবতীয় দেবদেবীগণ। প্রথম হইতে শুদ্ধ নিরাকার চৈতন্যের উপাসনা করিতে পারা যায় না বলিয়াই—অদৃশ্যে ভাবনা সম্ভবে না বলিয়াই চৈতন্যের প্রতিবিম্বকে আরাধনা করিয়া হিন্দুজাতি অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রে উপাসনা মাত্রেই প্রত্যক্ষে যে কোন দেবদেবীরই হউক না কেন, পরোক্ষে তাহা এক সেই শুদ্ধ চৈতন্যেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

অতএব এস পাঠকগণ, হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবী উপাসনাই যে একমাত্র সারলক্ষ্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই শারদীয় মহোৎসবের মহানন্দের দিনে একবার মনঃ প্রাণ খুলিয়া বলি—

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য॥
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরি দেবি চরাচরস্য॥

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার গৌরবরক্ষার্থ কি উপায় অবলম্বনীয়।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস।

আজকাল এ দেশে ভৈষজ্য রত্নাবলীধৃত গোবিন্দ দাসের সংগ্রহ পুস্তক, বহুল সমাদৃত। চিকিৎসক মাত্রেই, এই গ্রন্থকেই চিকিৎসা কার্য্যে আপনাদের একমাত্র সাধনীয় বলিয়া মনে করেন। যদিও কেহ কেহ ইহার অনুমোদিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিতে গিয়া চরক সুশ্রুত বাগভট, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক সংগ্রহগ্রন্থ হইতে কোন পাচন বা মুষ্টিযোগ তাহার সহিত যোগ করিয়া দেন, কিন্তু এইরূপ চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অল্প। দোষের অংশাংশ কল্পনা করিয়া ভেষজ প্রয়োগ প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, এখন সে রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, যক্ষ্মা বিষমজ্বর প্রভৃতি রোগের ঔষধ সর্ব্বত্র ব্যবস্থাপিত হইতে দেখা যায়। যক্ষ্মার যেখানে যে ব্যবস্থা পাইবেন, দেখিবেন, তাহাতেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বতোভদ্র রস, জয়মঙ্গল বা পুটপাক বিষমজ্বরান্তক। খ্যাতনামা কোন কবিরাজের ব্যবস্থাপত্র গুলি সংগ্রহ করুন, দেখিবেন আমরা যাহা বলিতেছি তাহার একটি বর্ণও মিথ্যা নহে। দোষের অংশাংশ কল্পনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ বিভিন্ন রোগীতে তাহার দোষের উল্বণ অনুল্বণ ভেদে, বিভিন্ন ব্যবস্থা এ দেশে আর নাই। সুতরাং পেটেণ্ট ঔষধ প্রয়োগের মত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আজ সূত্রহীন, সংপ্রাপ্তি বিজ্ঞান বলিয়া ইহাতে আর কোন বিজ্ঞান পরিদৃষ্ট হয় না। সংপ্রাপ্তি বিজ্ঞান বিহীন চিকিৎসার ফলও সেই জন্য কচিৎ কখন সিদ্ধি সমাপন্ন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যক্ষ্মা রোগী আর সারে না, বিষমজ্বর ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। কেন এইরূপ ঘটিতেছে, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে, কাহার না মনে হইবে, একমাত্র ভৈষজ্যরত্নবলীপ্রোক্ত ঔষধগুলির অতিব্যবহার এবং তৎসঙ্গে রোগনিজ্ঞানের উপায় সকলের অব্যবহার বা অপব্যবহার ইহার কারণ। চক্ষু বুজিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ধনাগম সহজসাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু আতুরের যন্ত্রনার অবসান ইহাতে হওয়া দূরে থাকুক, দেখিতে পাওয়া যায় সর্ব্বস্বান্ত শেষ আপনার জীব লীলার অবসানে সমস্ত যাতনা হইতে বিনির্মুক্ত হইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদের ভেষজ সকলকে সংপ্রাপ্তি বিজ্ঞানের সমুন্নত ভিত্তির উপর প্রতি

প্রভৃতি বিধিমত বিচার করিয়া, বাতাদির উল্বণ অনুল্বণ বিবেচনায় দেশ কাল ভেদে ঔষধ প্রয়োগ ইহাই প্রকৃত চিকিৎসা। বৈদ্যের বৈদ্যত্ব এইখানে।

মহর্ষি পুনর্ব্বসু একদিন যে জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সগর্ব্বে বলিয়াছেন, আমরা বা আমাদের মত ব্যক্তিরাই এরূপ ঔষধপ্রয়োগ করিতে সমর্থ যে ঔষধ দ্বারা রোগের নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ হইবে, "শক্যং তথা প্রতিবিধাতুমস্মাভি চসমদ্বিধেব্বাপ্যোগ্নিবেশ যথা প্রতিবিহিতে সিদ্ধোদোর্বাষধ খকান্তন।" আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা সুসম্পাদিত করিতে হইলে, আমাদের প্রত্যেকেরই সেই জ্ঞানের প্রয়োজন।

কিরূপ উপায় গ্রহণ করিলে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ সহজে সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, এই প্রবন্ধে আমরা প্রদর্শন করিতে সচেষ্ট হইব।

একদিন যে প্রণালীর অনুমান করিয়া আয়ুর্ব্বেদোপদেশ প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। যদিও আমাদের প্রদর্শিত পথ সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু আমরা আশা করি এই প্রণালীর অনুসরণে আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সংসিদ্ধ হইবে। ঔষধের গুণাগুণ অধ্যয়ন করিয়া রোগের প্রতীকারার্থ তাহাদিগকে ব্যবহার না করিয়া, যে রোগে যে যে ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তাহারা সেই সেই ব্যাধির প্রতীকার করিতে কতদূর সমর্থ ইহাই প্রদর্শন করা আমাদের অভিপ্রায় এইরূপ বিশ্লেষণ (Analysis) যুক্তিসঙ্গত, সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠক তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

ভারত জননী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ,।

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী,
আছিল যেদিন ভারত-জননী,
ওঙ্কার রাণী, কহিল বাণী,
ভেদি সে শূন্য উঠিল স্বর।
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ্ মা চাহি
জননী হীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটি ধর।"

পজ্জিব বনানি পর্ব্বত-রাজি,
নেহারি ভারত সম্পদ-সাজি,
ধনাভিলাষী বিদেশ-বাসী,
বাহিয়া সিন্ধু পাতিল কর।
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ্ মা চাহি
তোর কাছে আছি আমি চিন্তা নাহি"
কহিল বাণী শোভার রাণী,
"পূর্ণ যে ঝাঁপি পূর্ণ যে ঘর।"

সে ধ্বনি উঠিয়া করুণচ্ছন্দে,
বিধাতৃ-চরণ প্রণমি বন্দে,
চরণাঘাতে ধ্বনিল বাতে
ভারত ধন্য সে অবনী'পর।
উজ্জ্বল দীপ নাহি অন্ধকার,
বিতরিছ বিশ্বে অন্ন-ভার,
ভারত জননী ভারত জননী
লভিয়াছ ভাগ্যে দুর্ল্লভ বর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

(১)

ইংলণ্ডের লোক যখন তামাকের নাম গন্ধও জানিত না, সেই সময় স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে আমেরিকা হইতে তামাক ও তামাকের বীজ স্বদেশে আনিয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর র‍্যালে আরাম কেদারায় বসিয়া তামাকের ধূমপান করিতেছিলেন। তাঁহার নাক ও মুখ দিয়া ধূম নির্গত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভৃত্য মনে করিল প্রভুর মুখে আগুন লাগিয়াছে। প্রভুর সমূহ বিপদ বুঝিয়া সে তৎক্ষণাৎ এক ঘড়া জল আনিয়া তাঁহার মুখে ও মস্তকে ঢালিয়া দিল। ইহাতে র‍্যালে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলে ভৃত্য বলিল;—"আপনার মুখ হইতে ধুম নির্গত হইতেছে দেখিয়া আমি ভীত হইয়া

তাম্রকূটের প্রসাদে প্রকৃতই এখন এদেশের আবালবৃদ্ধ সকলেরই মুখে আগুন লাগিয়াছে। বিড়ি, সিগারেটের প্রচলনে দেশ রসাতলে যাইতে বসিল। যে সকল বালকের দুগ্ধদন্ত পতিত হয় নাই, আজ কালমাহাত্ম্যে তাহারাও বিড়ি, সিগারেট মুখে দিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছে। ফুসফুসে ধূমপান জনিত প্রদাহ থাকিলে যক্ষ্মাজীবাণু সহজেই তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। পূর্ব্ব কালে আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগের আধিপত্য অল্পই দৃষ্ট হইত। এখন কর্ম্মদোষে অনেক বাল-কিশোর-যুবা বহুদিন ঐ কাল ব্যাধির কবলে পড়িয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে।

তামাকে "নিকোটিন্" (Nicotine) নামক এক প্রকার ভয়ানক বিষ আছে। বিষমাত্রায় এই "নিকোটিন্" উদরস্থ হইলে তিন মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হইতে পারে। একদা একটী ৮ বৎসর বয়স্ক বালকের মস্তকের ক্ষতে তামাকের রস প্রয়োগ করায় ৩ ঘণ্টার মধ্যে বালটীর মৃত্যু হইয়াছিল। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে তামাকের ন্যায় নেশার সামগ্রী কখনই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। এতদ্দেশের গৃহলক্ষ্মীরা তাম্বুলের সহিত দোক্তা খাইয়া থাকেন। এই দোক্তার বিরহ তাঁহারা একদণ্ড কালও সহ্য করিতে পারেন না। কোন স্থানে যাইতে হইলে দোক্তার কৌটাটী অমনি অঞ্চলে বাঁধিয়া লয়েন। ইহার ফলও ফলিতেছে। দোক্তার আশীর্ব্বাদে আজ গৃহে গৃহে "হিষ্টিরিয়া" (Hysteria) বিরাজমান।

তামাক অপেক্ষা বিড়ি ও সিগারেট অধিক অপকারী। ইহাতে তামাক সেবনের অপকারিতা ত আছেই, অধিকন্তু কাগজ ও নানাবিধ শুষ্কপত্রের ধূম গ্রহণে বায়ুনলীতে ফুসফুসের পীড়া হওয়া আশ্চর্য্য নহে। হাঙ্গেরি রাজ্যে একব্যক্তি প্রত্যহ অনুন ৫৬টি সিগারেটের ধূমপান করিত। একদিন হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ পাইল যে "নিকোটিন্" বিষই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। ধূমপানরত যুবকগণের ইহাতে চৈতন্যোদয় হইবে কি ?

(২)

সে কালে বিলাতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণ সময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের হস্তে একখণ্ড বস্ত্র, একটী অঙ্গুরী, একখানি মুক্ত পুস্তক ও একখানি রুদ্ধ পুস্তক দিবার রীতি ছিল। বস্ত্রখণ্ড দিয়া বলা হইত—"আজ হইতে তুমি বিজ্ঞানের ...

বলা হইত,—'আজ হইতে তুমি অধীত বিদ্যার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে সম্বন্ধী হইলে." মুক্ত পুস্তক দিয়া বলা হইত—"তুমি যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ তাহার চিহ্ন স্বরূপ এই মুক্ত পুস্তক প্রদত্ত হইল," এবং রুদ্ধ পুস্তক দিয়া বলা হইত,—"তুমি যে বিদ্যা এখনও শিক্ষা কর নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে করিবে, তাহার চিহ্ন স্বরূপ এই রুদ্ধ পুস্তক দিতেছি।"

আমাদের দেশে এই রুদ্ধ পুস্তকের কথা অল্প লোকই মনে করিয়া থাকেন। এখানে বিদ্যালয়ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ হইয়া যায়। সুতরাং পণ্ডিত মূর্খের অভাব নাই। একদা জনৈক খ্যাতনামা অধ্যাপক ছাত্রগণের কথা প্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—Our students are like loaded guns" অর্থাৎ বারুদ পূর্ণ কামান শত্রুনিধন পক্ষে প্রচুর শক্তিশালী হইলেও গোলা বহির্গমনের পর যেমন শূন্যগর্ভ পড়িয়া থাকে, এত দ্দেশীয় ছাত্রগণও সেইরূপ পরীক্ষা শেষে নিজের সমুদায় শিক্ষা বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কালাতিপাত করে।

(৩)

একদা দেশ প্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ ডাক্তার চার্লস্ একস্থানে গর্ভস্থ শিশু হত্যা করিয়া প্রসবকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বুঝিয়া গৃহস্থকে ডাকিয়া বলিলেন; "আমি অপর একজন চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি। এইকথা শুনিয়া বাড়ীর লোক বলিল,—"ডাক্তার চার্লস্ আবার কাহার পরামর্শ লইবেন ?"

উত্তরে মহাত্মা চার্লস্ বলিয়াছিলেন,—"প্রাণাহত্যা অতি গুরুতর কার্য্য, সুযোগ থাকিতে অপরের পরামর্শ না লইয়া আমি কখনই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না।" অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা ব্যক্তি নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় যে সকল চিকিৎসক অপরের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে শুনিলে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন, তাঁহারা মহামতি চার্লসের কথাগুলি স্মরণ করিবেন কি ?

(৪)

অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে চক্ষুরোগ এক প্রকার সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীনকালে অশীতিপর বৃদ্ধগণ ক্বচিৎ চসমা ব্যবহার করিতেন। আজ দেশের এমন অবস্থা হইয়াছে যে অজাতশ্মশ্রু স্কুলের বালকেরাও কৃত্রিম

লণ্ডি (Dr. Landy) চক্ষু ভাল রাখিবার নিম্নলিখিত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১। ক্ষীণ আলোকে পুস্তক পাঠ করিও না।

২। শরীর ক্লান্ত হইলে অথবা রোগ আরোগ্য হইবার সময় পুস্তক পাঠ নিষিদ্ধ।

৩। শয়ন করিয়া পড়িবে না।

৪। পড়িবার সময় ঘাড় নীচ করিয়া অথবা যাহাতে মস্তকে অধিক রক্ত সঞ্চালিত হয় এমত ভাবে বসিবে না।

৫। পাঠাভ্যাসের নির্দ্দিষ্ট সময় রাখিবে।

৬। পরিষ্কার ছাপা পুস্তক পড়িবে।

৭। অনেক্ষণ ধরিয়া নিকটের বস্তুর প্রতি চাহিয়া থাকিবে না; মধ্যে মধ্যে চক্ষুর বিশ্রাম আবশ্যক।

৮। মদ্য ও তামাক একেবারে পরিহার করিবে।

৯। প্রতিদিন মুক্ত বায়ুতে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করিবে।

১০। যাহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় এমত কার্য্য করিও না। শরীর দুর্ব্বল হইলে দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়িবে।

আশাকরি দেশের যুবক সম্প্রদায় ডাক্তার লণ্ডি মহোদয়ের হিতোপদেশ গুলি প্রতিপালন করিতে ভুলিবে না।

ললাট-লেখা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

(১)

বিলাসবতী সুন্দরী—বয়স বারো বৎসর অতীত তেরোয় পড়িয়াছে, এখনও বিবাহ হয় নাই, পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, না হইলেও তাঁহাকে ঋণ-গ্রস্ত হইয়াও সুপাত্রে কন্যাদান করিতে হইবে নতুবা কর্ত্তব্য পালন হয় না, কন্যা অরক্ষণীয়া; পিতার আহার নিদ্রা নাই, কিরূপে বিলাসবতীর বিবাহ হইবে। দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল; তাহার পিতার ততই ভাবনা হইতে লাগিল, অর্থবল নাই, লোকবলেরও অভাব—আপনি আফিস্ কামাই

অচল হয়—ভদ্রলোক বিষম বিব্রত। কে তাঁহার হইয়া দেশে বিদেশে ঘুরিয়া পাত্র জুটাইয়া আনিবে, তবে আফিসের বন্ধু বান্ধবকে দিয়া যতটা সন্ধান করা যায় তাহার ত্রুটি হইল না। বগলাচরণ লোকটী অমায়িক, সুযোগ পাইলে লোকের ভাল করিতে ছাড়েন না—কাহার মন্দ হউক ইচ্ছা তাঁহার কখন হয় না। সুতরাং তাঁহাকে কন্যাদায়গ্রস্ত দেখিয়া সকলেই সহানুভূতি করিত, করিলে কি হয়, সকলেরই আপনার আপনার কাজ আছে, অবস্থা প্রায় সকলেরই বগলাচরণের মত—কাজেই কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, পরিশেষে একদিন আফিসের একটী বন্ধু একটি পাত্রের অনুসন্ধান-সংবাদ আনিলেন, ঘর বর দুই ভাল, কিন্তু দাবি অনেক, বগলাচরণকে বিক্রয় করিলেও তাহা মিটিবার নহে। পাত্রের পিতা পুত্রের বিবাহে বাদ্যভাণ্ড করিবেন, সামাজিক বিলাইবেন, আপনার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলগুলিকেই বাড়ীতে আনিবেন, আমোদ আহ্লাদ করিবেন। তাঁহার সেইটী বই আর পুত্র কন্যা নাই সকল সাধই তাঁহার এই পুত্রের বিবাহেই মিটাইবেন, পুত্রটীও এক, এ পাশ করিয়া বি, এ পড়িতেছে, আজি কালিকার কালে তাঁহার দাবিও যে অসঙ্গত তাহা কেমন করিয়া বলিব। কিন্তু বগলা চরণের অবস্থায় কুলাইবার নহে। তিনি মাসে বেতন পান একশত টাকা বটে—কিন্তু পরিজন অনেক গুলি—তাহাদের ভরণপোষণ ও দুইটী পুত্রকে শিক্ষার ব্যয় যোগাইতে তাঁহার সমস্তই ফুরাইয়া যায়, এক মাসের বেতনের টাকার সঙ্গে পরমাসের বেতনের টাকার দেখা সাক্ষাৎ হয় না বরং শেষ মাসে কিছু কিছু দেনা হয়। মুদির দোকানে বাকীর জের চলে। পাত্রের পিতা যে ফর্দ্দ দিয়াছেন—দেড় হাজার টাকার কমে কিছুতেই কুলাইবে না।

পাত্র ও পাত্রী দেখাশুনা হইয়া গেল—কেবল পাকা দেখা বাকী। ফলে পাত্রী দেখিয়া পাত্রের পিতার পছন্দ হইল, কিন্তু দাবী বগলাচরণের অবস্থার কুলায় কই—পল্লীগ্রামে তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন ও কিছু ধান জমি ছিল তাহা বিক্রয় করিলে হাজার বারশ টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু পৈতৃক ভদ্রাসনই কেমন করিয়া বিক্রয় করা চলে। দেশে পিতৃপুরুষের নাম ডাক আছে—ধানজমি গুলিই না হয় ত্যাগ করা হইল, কিন্তু ভদ্রাসন ত বিক্রয় করা যায় না, অথচ ভদ্রাসনের সংলগ্ন একটি বাগান ও পুষ্করিণী আছে, গ্রামের লোক তাহাতেই লোভ করে। ভদ্রাসন বাদ দিলে ধান জমির দাম টানাটানি

উপায়ান্তর নাই দেখিয়া বন্ধুবান্ধবের যুক্তিতে তাহাও তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও যে দুই তিন শত টাকার অকুলান হয় তাহার উপায় কি—একজন বন্ধু দুই বৎসরের জন্ম বিনা সুদে তিনশত টাকা কর্জ্জ দিতে স্বীকার করিলেন বটে, উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তিনি পৈতৃক বাস্তু-ভিটা বিক্রয় করিতে সম্মতও হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার মনে কিছুতেই তৃপ্তি জন্মিল না। তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, শেষে নিতান্ত নারাজির সহিত বিক্রয় কোবালা দস্তখত ও রেজেষ্টা করিয়া দিলেন, খরিদদারের সহিত বাচনিক সর্ত্ত রহিল—তিন বৎসর মধ্যে মায় সুদ সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিলে ভদ্রাসনটী ফেরৎ পাওয়া যাইবে।

(২)

পাকা দেখা হইয়া গেল—বিবাহের দিনও ধার্য্য হইল, কিন্তু একজন ঘটক পাত্রের পিতার নিকট অন্য একটী পাত্রীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহের নূতন প্রস্তাব করিল—দুহাজার টাকা নগদ, দুহাজার টাকার অলঙ্কার, আর হাজার টাকার ঘড়ি চেন আংটি ও দুই চারিটা রূপার দান মিলিবে, তবে পাত্রী খুব সুন্দরী নহে, মাঝা-মাঝি, চলন সই। পাত্রের পিতার মন টলিল, প্রস্তাবটা তাঁহার একবারে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইল না। কথা চলাচলি হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাহা শুনিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিল, করিলে কি হয় পাত্রের মাতা তাহাতেই ঝুঁকিলেন—তিনি বলিলেন, —"হউক কাল কুচ্ছিত, ভিতর কপাল ভাল হলেই হলো" দুহাজার টাকা নগদ হাতে পাইলে তাঁহার অনেক সাধ মিটিবে।

বিবাহের ধার্য্য দিনের দুদিন আগে বগলা চরণের যে বন্ধুটী তিনশত টাকা ধারদিতে চাহিয়া ছিলেন হঠাৎ বিষূচীকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। বগলাচরণকে এই দুর্ঘটনায় বড়ই বিচলিত করিল। অনেক কষ্টে তিনি দুই শত টাকার সংযোগ করিলেন, কিন্তু একটীশ টাকা কিছুতেই জুটিল না, তিনি ভাবিলেন, ইহার জন্য বিবাহ আটকাইবে না, বৈবাহিক্ মহাশয় কিছুতে না শোনেন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিব, ইংরাজী মাস কাবারও নিকট,—বেতন পাইলে হ্যাণ্ডনোটের দেনা চুকাইয়া ফেলিব, এই ভাবিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু বিবাহের দিন বৈকালে বৈবাহিক তিনশ টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন, বগলাচরণ দুইটীশ টাকা পাঠাইয়া দিলেন, বৈবাহিক কিছুতেই

গণ্ডায় মিটাইয়া না দিলে তিনি বর আনিবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। বগলাচরণের তখন একশত জুটাইবার সুবিধা নাই, কাজেই বিবাহের দিন বর আসিল না। লগ্ন ভগ্ন হইল—বগলাচরণ সমস্ত দিন উপবাসী—রাত্রি বারোটার সময় একশ টাকা অতিকষ্টে জুটিল, টাকা লইয়া যে লোক গেল সে টাকা ফিরিয়া আনিয়া বলিল,—"পাত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।" বগলাচরণের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি বাড়ীর ভিতরের ঘরে শুইয়া পড়িলেন—অন্তঃপুর মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল স্ত্রীলোক পরস্পরায় নানা কথা চলিতে লাগিল—বিলাসবতীর একটী সঙ্গিনী বলিল,—"বিলাস আজ সকাল বেলা বলিয়াছিল, আমার এ বিবাহ হইবে না।" এইকথা শুনিয়া বিলাসবতীর মাতা আগ্রহান্বিতা হইলেন, বিলাসকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বলিতে বলিলেন, বিলাস লজ্জায় মাথা হেট করিয়া রহিল, বারম্বার জেদ করায় বলিল,—

"স্বপন যদি সত্য হয়,—তা'হ'লে এখনি সব দেখ্‌তে ও বুঝ্‌তে পার্‌বেন।"

বি, মা। কি বলনা কেন মা—আমার হাত পা আস্‌চে না, যদি কিছু কর্‌বার থাকে কত্তে বলি।

বিলা। সে সব কথা কিছু নয়, স্বপন বুঝি সত্তি হয়? আপনারাইত বলেন—

বগলাচরণের সমস্ত দিন আহার নাই, বিবাহের আয়োজন অনুষ্ঠানে যথেষ্ট শ্রম হইয়াছিল, তিনি শয়নমাত্র নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন—নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন—যেন বররুচি রায়কে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন—বররুচি বাড়ীর বাহিরে শয়ন করিয়া রহিয়াছিল।

বগলাচরণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন আত্মীয় স্বজনদের সকলের আহারাদি হয় নাই, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন—রোয়াকের উপর একটি লোক শুইয়া ঘুমাইতেছে, তাহাকে "বররুচি—বররুচি" বলিয়া দুইবার ডাকিতেই সে চক্ষু চাহিয়া দেখিল, চক্ষু মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসিল—"কেন?"

বগ। তুমি কি জাত, কোথায় থাক?

বর। আমি ব্রাহ্মণ—আপাতত, কল্‌কাতাতেই আছি।

বগ। কোন গোত্র?

বগ। তুমি উঠিয়া আমার সঙ্গে বাড়ীতে এসো, বররুচি গা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে উঠিল. উঠিয়া বগলাচরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর ভিতরে চলিল। পুরোহিত ঠাকুর আহারে বসিয়াছিলেন, এই অবসরে বগলা স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। ঘড়ি দেখিলেন রাত্রি তিনটা, আর পনর মিনিটের পরে বিবাহের আর একটা লগ্ন আছে। সেই লগ্নে বিলাসবতীর বিবাহ হইবে, বগলাচরণ অন্তঃপুর মধ্যে একথা প্রচার করিয়া দিলেন। নানাজনে নানাকথা বলিতে লাগিল,—অনেকেরই কথা—"কোথা ঘর, কার ছেলে, কি জাত না দেখা—না শুনা, হলেই বা কন্যাদায়, এমন কোরে কি কেহ মেয়ের বিয়ে দেয়।"

বগলা কাহার কোন কথা শুনিলেন না—বিলাসবতীর মাতা কিছুতেই বিবাহ দিবেন না, বগলা বলিলেন,—

"আমি নিশ্চয়ই বররুচিকে কন্যা দিব।" তাঁহারই জেদ বজায় রহিল। বগলাচরণ বররুচিকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া দায়ে অব্যাহতি পাইলেন। বিলাসের মাতা মাটীতে পড়িয়া রহিলেন, বিবাহ দেখিলেন না, কুটুম্বকন্যাগণ বাসঘরেই আপনারা চোখচোখ টেপাটেপি করিতে লাগিল। কেহ বলিল—"বিলাসের মা জান্‌তে পাল্লে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে।"

(৩)

রাত্রি প্রভাত হইলে জানা গেল—জামাই কুষ্ঠী, বগলাচরণ বরণবাক্য পাঠ কালেই তাহা বুঝিয়াছিবেন, কিন্তু প্রকাশ করিলে আর বিবাহ হয় না, পত্নী বলিলেন, এমন বিবাহ না হওয়াই ভাল ছিল। উপস্থিত সকলেই বলিল—"যা হ'বার হ'য়ে গেছে। এখন আর কোন কথা চলে না।" ফলে এই বিবাহের জন্য বগলাচরণকে আত্মীয় বন্ধুসকলের কাছেই কথা শুনিতে হইয়াছিল, সকলেই তাঁহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বই কিছু বলিল না। সে রাত্রিতে নাই বা বিবাহ হইত—এমনত কত লোকের হইয়া থাকে, তাহা বলিয়া কি একজন অজ্ঞান কুলশীল ব্যক্তিকে কেহ এরূপে কন্যাদান করে। বগলাচরণের উত্তর নাই, কাজটা নিতান্ত নিন্দনীয় যে হইয়াছে সেপক্ষে আর সন্দেহ নাই। তিনি সকল কাজেই বলিতেন—"ভগবান্ যাহা করেন তাহা ভালরই জন্য—এবার কিন্তু একথাটা মনে হইলেও মুখে আনিতে পারিলেন না—

বিলাসবতী বুদ্ধিমতী বালিকা—বয়স নিতান্ত কম নহে; তাঁহার মত অনেক

করিয়া তাহাদের লালন পালন করিতেছেন। বিলাস ভগবানে নির্ভর রাখিয়া পতিসেবায় মন দিল, বগলা বিক্রীত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিলেন।

তিন চারি মাসের সেবায় জামাই বররুচির ক্ষত শুকাইল, সাত আট মাসে দাগ মিলাইল; একবৎসর মধ্যে শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইল, তখন বিলাস-বতীর পুণ্যের পরিচয় হইল, বিশেষতঃ যখন স্বস্কন্ধ-ভাঙ্গা বরের মৃত্যু ঘটিল।

পিতার সংসার চালনে কষ্ট দেখিয়া বিলাসবতী একদিন স্বামীকে বলিলেন,—

"লেখাপড়া যা জান, তাতে কি আর বিশ পঁচিশ টাকার চাকরি একটা জোটে না. দেখো বাবা আমার ছা-পোষা, অনেক গুলিকে পালিতে হয়, তিনি বড় কষ্টে পড়েছেন, আমরা দুজন তাঁর ভার বোঝা হ'য়ে উঠেছি না?"

বররুচি বলিলেন—"আমিত কোন কষ্ট দেখিতেছি না। যে রকম খাওয়া দাওয়া চল্‌চে তাতে আমি কোন কষ্ট মনে কত্তে পাচ্চিনা। আচ্ছা আমাকে চাকরি কত্তে হবে না। জগদম্বা যখন আমাকে প্রাণ দিয়াছেন তখন পুরুষ মানুষ—টাকার অভাব কি?"

তখন বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল পরদিন দশটার সময় আহারাদি করিয়া বররুচি বাড়ীর বাহির হইলেন—আর বৈকালে বাড়ী আসিয়া বিলা-সের হাতে হাজার টাকার খুচরা নোট দিয়া বলিলেন—"বাবাকে খরচের জন্যে দিবে।"

বিলাস অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বর। অমন ক'রে চেয়ে রইলে যে—বিলাসের চক্ষুদিয়া ভগবৎ প্রেমের অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল, বিলাসবতী অনেকক্ষণ স্বামীর কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।

বলা বাহুল্য যে বিলাস তৎক্ষণাৎ নোটগুলি লইয়া পিতার হাতে দিয়া বলিল,—

"বাবা আপনার জামাই আপনাকে খরচ কত্তে দিয়েছেন।"

বগলাচরণ কন্যার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন "এটাকা কোথা হইতে আসিল?"

কন্যা বলিলেন,—"বলিতে পারি না।"

জামাই বগলাচরণকে উঁটিয়া আফিস যাইতে বারণ করিয়াদিল—পেন্স নয়

সময় হইয়া থাকে, যাহা কিছু পাওয়া যায় লইয়া চাকরি ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন খরচ পত্রের জন্য আটকাইবে না। ইহার তিন চারি দিন পরে দুই তিন খানি বাঙ্গলা সংবাদ পত্রে বড় বড় অক্ষরে "১০০০৲ টাকা পুরস্কার শ্রীযুক্ত বররুচি রায় কিছুদিন হইল নিরুদ্দিষ্ট।" একখানি কাগজ সর্বাগ্রে বগলাচরণের হাতে পড়ে, আপন জামাতার নাম দেখিয়া তিনি বিজ্ঞাপনটী সমস্ত পড়িয়া দেখেন তাহাতে লেখা আছে—"লক্ষ্ণৌয়ের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺সচ্চিদানন্দ রায়কে প্রায় সকলেই জানেন। বৎসরাধিক হইল তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাঁহার যে দুইটী নাবালক পুত্র ছিল তাহারাও মারা গিয়াছে। রায় মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বররুচি রায় দেখিতে গৌরবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, বয়স ২৪ বৎসর, বাম ভ্রূর আন্দাজ একাঙ্গুল তফাতে একটী লম্বা কাটা দাগ আর সেই দাগের পাশে একটী ছোট মটরের মত আঁচিল ছিল। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া তিনি নানাবিধ চিকিৎসায় হতাশ হয়েন, তাহার পর নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। যদি তিনি জীবিত থাকেন তাহা হইলে-হয় কোন কুষ্ঠাশ্রমে না হয় কোন কুষ্ঠচিকিৎসকের নিকট আছেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার বিপুল বিস্তৃত জমিদারীর কার্য্য পরিচালনায় নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। যে কেহ তাঁহার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, দেওয়ান।

বগলাচরণ আপনি পড়িলেন—বন্ধুবান্ধবকে পড়াইলেন। লক্ষ্ণৌয়ের জমিদারের নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতুষ্পুত্রই যে বগলাচরণের জামতা তাহা স্থির হইল। বগলা চরণের যে মৃতবন্ধু কন্যাদায়ে তাঁহাকে তিনশত টাকা দুই বৎসরের জন্য বিনাসুদে ধারদিতে চাহিয়াছিলেন তাহার পুত্রের নাম দিয়া বিজ্ঞাপনদাতাকে একটী টেলিগ্রাম পাঠাইলেন তাহা প্রাপ্তি মাত্র দেওয়ানজী স্বয়ং আসিয়া আপন প্রভুকে চিনিয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক দেশে লইয়া গেলেন।

লক্ষ্ণৌ পৌছিলে বররুচির খুড়ি তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসিলেন,—

বাবা বররুচি, কেমন করিয়া তোমার মহাব্যাধি ভাল হইল বাবা ?"

বররুচি উত্তর করিলেন,—

"খুড়ি মা পণ্ডিতেরা যে বলেন,—'নচ দৈবাৎ পরং বলং"

সে কথা খুব সত্য। ভাল হইতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলমে আত্ম-

সের ভিতরে ঢুকিলাম এখন গাড়ীর সময় নয়, টিকিট ঘরে ছুটীবাবু বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, তাহাদের একজনের একটী আত্মীয় শ্রী৺শ্রীতারকেশ্বরে হত্যাদিয়া মহাব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তিনি ভাল হইয়া সেই বাবুটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া আমারও ৺তারকেশ্বরে হত্যা দিবার মন হইল। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া এখান হইতে ৫০ টী টাকা লইয়া ৺তারকেশ্বরে গিয়া হত্যা দিলাম, তিন দিনের দিন রাত্রিতে বাবার প্রত্যাদেশ হইল, "পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ নিন্দা করিয়াছিলাম বলিয়া এজন্মে মহাব্যাধি হইয়াছে। কলিকাতা—গলির ৫ নং বাটীতে আমার পূর্ব্বজন্মের পতিব্রতা পত্নী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই, জন্মান্তরে আমার বিদেশে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া পত্নী মৃত্যুকালে পতিসেবা করিতে পায় নাই—এজন্মে তাহার শুশ্রূষা পাইলেই রোগ মুক্ত হইবে। প্রত্যাদেশ পাইবা মাত্র কলিকাতা গিয়া গলির ৫নং বাটীর বাহিরে শুইয়া রহিলাম, সেই রাত্রিতে সেই বাড়ীর ভাড়াটে বগলাচরণের কন্যার বিবাহ, কিন্তু সব টাকা জুটাইতে না পারায় বিবাহ হইল না, বগলাচরণ আমাকে ধরিয়া কন্যা দান করিলেন, আমাকে ব্যাধিগ্রস্থ দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ছিছি করিতে লাগিল, কিন্তু তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে আর ছিছি করিলে কি হইবে। তাঁহার কন্যা পতিব্রতা বটে, আমার সেবায় প্রাণ মন ঢালিয়া দিল, ক্রমে আমি ভাল হইলাম, এখানে আসিব মনে করিতেছি এমনই সময় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমার শ্বশুর এখানে টেলিগ্রাম দেন—এই সেই পত্নী।

রসাভাস।

লেখক—শ্রীযুক্ত পরিহাস রসিক রায়।

এক জুয়াচোর প্রবঞ্চণা প্রতারনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত—স্বদেশে বিদেশে নানা স্থানে নানা প্রকারে সে আপন ব্যবসায় করিয়া বেড়াইত। একদা জঙ্গল মহলের কোন রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সে, শুনিল যে অল্প দিন পূর্ব্বে রাজার দেহান্তর ঘটিয়াছে, রাজপুত্র রাজতক্তে বসিয়াছেন, তিনি বড়ই পিতৃভক্ত।

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ ॥

একথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে মানিতেন—জুয়াচোর আপন ব্যবসায়ের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। সেই রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া জুয়াচোর আপনাকে মণিকার বলিয়া পরিচয় দিল, এবং আসল নকল হীরা মুক্তা প্রবালাদিও সঙ্গে বেচিয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েক দিন ঘুরিয়া রাজদরবারের উচ্চ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য গোপনে নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। চৈত্র মাস—বেলা ২।৩ টা বাজিয়া গিয়াছে, পথঘাট গরম আগুণ, পাদক্ষেপ করা দুঃসাধ্য—পথে লোকজন নাই বলিলেও হয়, মণিকার আপন বাসার দ্বারটী খুলিয়া চতুর্দ্দিক দেখিতেছিল—এমন সময় এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইল। তাঁহার মাথাটী নেড়া—মধ্যস্থলে বিপুল শিখা একটী বিদ্যমান, তাহা ভিজা গামছায় ঢাকা—হাতে একটী জলের ঘটী, দেখিলেই বুঝাগেল শৌচে (মলত্যাগে) যাইতেছিলেন। জুয়াচোর তাঁহার আত্মগোপনে পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া ব্রাহ্মণ নদীর তীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র জঙ্গলে প্রবেশ পূর্ব্বক মলত্যাগে বসিলেন, তাঁহার মাথার উপর একটি কুলগাছের ডাল ঝুলিতেছিল, তাহা হইতে একটী সুপক্ক কুল তাঁহার সমুখে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ কুলটী হাতে লইয়া চারিদিক চাহিয়া যখন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তখন কুলটীকে বদনে অর্পণ করিয়া তাহার অম্লমধুর স্বাদ গ্রহণ করিলেন, পশ্চাৎ জলশৌচ করিয়া নদীর ঘাটে গিয়া ঘটীটি উত্তমরূপে মাজিয়া ঘসিয়া একঘটী জল লইলেন এবং পূর্ব্ববৎ মাথায় ভিজা গামছা ঢাকা দিয়া যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন সেইপথে আপন বাড়ীতে ফিরিলেন। জুয়াচোর সব দেখিল এবং তাঁহার প্রতিবাসিগণকে জিজ্ঞাসায় জানিল তিনি রাজবাড়ীর সভা পণ্ডিত।

জুয়াচোর তাঁহাকেই আপনার প্রধান অস্ত্র মনে করিয়া সায়ংকালে তাঁহার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করিল, এবং কথাবার্ত্তা স্থির হইল যে স্বর্গীয় রাজা দশহাজার টাকা নগদে এবং জহরেতে তাহার নিকট লইয়াছিলেন, সভাপণ্ডিত মহাশয় সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন, প্রাপ্য টাকার বখরা সিকি বার আনা—বার আনা জুয়াচোরের এবং সিকি সভা পণ্ডিতের।

তখনকার রাজা রাজড়ারা প্রাতঃকাল হইতে স্নানকাল পর্য্যন্ত এবং আহারাদির পর বৈকালে রাজকার্য্য করিতেন। জুয়াচোর প্রাতঃকালে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া রাজার মৃত্যুর জন্য পরমাত্মীয়ের ন্যায় শোক প্রকাশ

টাকার নামও করিল না। রাজপুত্র বলিলেন—"ভালই আপনি আমার পিতার নিকট যেরূপ আনুকুল্য পাইতেন, আমার দ্বারা তাহাতে বঞ্চিত হইবেন না।" তাহার পর জুয়াচোর বলিল—আমি ত তাই প্রত্যাশা করি, আমি এই রাজধানীতে থাকি, যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতাম সমস্তই স্বর্গীয় রাজা মহাশয়ের কাছে স্থগিত রাখিতাম, পার্শবর্ত্তী রাজাদের রাজধানী হইতে যাহা আনিতাম তাহাও রাখিতাম, বৎসরান্তে বাটী যাইবার সময় হিসাব নিকাশ করিয়া সমস্ত টাকা লইয়া যাইতাম। তাঁহার স্বর্গারোহণের প্রায় একমাস পূর্ব্বে একদিন তিনি দরবার হইতে উঠিবেন এমন সময় আমি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া উপস্থিত করিলাম, তিনি ভৃত্যদ্বারা তাহা অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন, আমিও পরদিন রাজ্যান্তরে চলিয়া গেলাম, তাহার পর গতকল্য এখানে আসি রাজধানী প্রবেশ করিতে না করিতে সর্ব্বনাশের সংবাদ পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। বাসায় আসিয়া হা-হুতাশ করি—সকলেই বলিল "আপনার প্রাপ্য পাইবেন, নূতন রাজা পরম ধার্ম্মিক সহস্র কি—দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইলেও তিনি পিতৃঋণ পরিশোধ করিবেন।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসিলেন—"আপনার কোন নিদর্শন আছে?"

জুয়াচোর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—"আজ্ঞা একটী নেড়া শিখাধারী ব্রাহ্মণ মাত্র তখন রাজার পাশে বসিয়াছিলেন বোধহয় তিনি দেখিয়া থাকিবেন। রসিদ পত্র আমি কখন লইতাম না।

রাজপুত্র এইকথা শুনিয়া রাজমন্ত্রী, সভাপণ্ডিত ও অন্যান্য যাহারা সর্ব্বদা রাজদরবারে থাকেন তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিলে তাঁহাদের সকলেরি মুখের দিকে চাহিয়া যেন, হতাশের ভাব প্রকাশ করিল এবং বলিল আমি বেশ চিনিতে পারিতেছিনা।

সভাপণ্ডিত ধীরে ধীরে রাজার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন—"আমি তখন উপস্থিত ছিলাম, যদি টাকা দিবার আপত্তি না থাকে তবে আমি তাহা প্রকাশ করি।"

রাজপুত্র প্রকাশ্যে বলিলেন—"নিশ্চিত। ভদ্রলোক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রায় বঞ্চিত হইবে কি? সামান্য অর্থের জন্য সত্যের অপলাপ করিব।"

তখন জুয়াচোর সভাপণ্ডিতকে দেখাইয়া বলিলেন—"হাঁ—ইনিই বটে, ইনি তখন রাজার নিকট বিদায় হইতেছিলেন।"

তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোককে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিবার হুকুম হইল। স্বর্ণমুদ্রাও

মিলিল। জুয়াচোর প্রসন্ন চিত্তে বাসায় ফিরিল। সায়ংকালে জহরৎওলা একটী বোতল মদ, ছোট ছোট কতকগুলি বাটামাছ ভাজা আর আড়াইশত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া রাজপণ্ডিতের বাটীর দ্বারে উপস্থিত। রাজপণ্ডিত সায়ংসন্ধ্যা করিতে করিতে বসিয়া বাহিরে জুয়াচোরের পাদবিক্ষেপ শব্দের অপেক্ষা করিতেছিলেন —এক একবার তাঁহার মনে হইতেছিল—জহরৎওলা হয়ত ঠকাইল। এমন সময় জুয়াচোর বহির্দ্বারে ধাক্কা দিল। সভাপণ্ডিত স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। জুয়াচোর সর্ব্বাগ্রে স্বর্ণমুদ্রা পরে অন্যান্য সরঞ্জম তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলে সভাপণ্ডিত জিজ্ঞাসিলেন "আমার যে এপ্রকার হয়, তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

জুয়াচোর উত্তর করিল—"ঠাকুর !"

আচার দেখেছি কুলতলায়,
বিচার দেখেছি রাজ সভায়,
আপনায় বই আর একাজ সাজে কার ॥

প্রেম।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী।

বলিহারী প্রেম ধন্য তোমার মহিমা।
তোমার শক্তির কেবা পাইয়াছে সীমা ॥
প্রীতিতে ফুটাও ফুল দাও তারে বাস।
সে মধুর বাস তার বুকের নিশ্বাস ॥
দাও ফুল মুখে তুমি ত্রিদিবের ভাষা।
বিরহিণী তটিনীরে আকুল পিয়াসা ॥
সুখ দুঃখ বারি দাও পাখীর নয়নে।
শিখাও মরম গাথা তুমি সমীরণে ॥
বিচিত্র বরণে তুমি রূপ দাও সুরে।
নিরখিয়া বিমোহিত হয় প্রেমাতুরে ॥
আঁখি দাও তুমি শশীতারার কিরণে।
সুধা ঢেলে দাও তুমি তার পরশনে ॥
তুমিই সাজাও ফুল কিসলয়ে তরু।
আমার হৃদয় কেন করিলে হে মরু ॥

দরিদ্রের দুর্গোৎসব।

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

(১)

নবরাম ভট্টাচার্য্য বড়ই দরিদ্র—দুবেলা আঁচাইবার সংস্থানাভাব—এজন্য তাঁহার ভিক্ষা বই জীবিকান্তর ছিলনা—সংসারে আপনি, ব্রাহ্মণী ও একটি মাত্র পুত্র, সেও উপায়ক্ষম নহে, এখনও তাহার পঠদ্দশা, নবরাম একজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ—ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া, জলগ্রহণ করিতেন না, যত বেলাই হউক গ্রাম গ্রামান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া উদরান্নের সংগ্রহ হইলে বাড়ী আসিতেন মানাহ্নিক সারিয়া আহারে বসিতেন। তিনি পণ্ডিত না হইলেও নিতান্ত অজ্ঞান ছিলেন না, দশকর্ম্ম জানিতেন পূজার্চ্চনায় সুপটু ছিলেন বংশপরম্পরায় অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বলিয়া শূদ্র যাজনে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, ভিক্ষা করিতেও কেবল ব্রাহ্মণালয় বই অন্যত্র নহে। দারিদ্র্যদুঃখের ইহাও অন্যতম কারণ। নবরাম অতিবড় দরিদ্র হইলেও তাঁহার দুর্গোৎসব করিবার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল—শরতে মহামায়ার শ্রীপাদপদ্মে গঙ্গাজল জবা বিল্বদল দিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, আপনার অন্নসংস্থান নাই কেমন করিয়া ইষ্টসিদ্ধি হইবে, ব্রাহ্মণ ইহাই ভাবিয়া অস্থির। নবরামের অন্নচিন্তা গেল, কেবলই দুর্গোৎসবের ভাবনা, মন ভিক্ষায় বাহির হইতে চায় না, ব্রাহ্মণী একদিন বলিলেন—"ঠাকুর ঘরে ভাত নাই, দিবারাত্র বসে বসে কি ভাবেন। আপনারা না খেয়েও দুএকদিন কাটাতে পারি—কিন্তু ছেলেটার মুখপানে চাইলে চোখে জল আসে।" অন্নের জন্য বিদেশবাসী।

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"ব্রাহ্মণি! কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ ধরেছে আর নিস্তার নাই—এবার পূজায় মার পায়ে গঙ্গাজল বিল্বদল দিবার সাধ হয়েছে।"

ব্রাহ্মণী আপনার কপালে হাত দিয়া বলিলেন—"তেমন বরাত যে নয়, তা নাহলে সাধ যায় বই কি, কুঁজোর কি চিৎহয়ে শুতে ইচ্ছা হয় না। আপনিত বলেন দুর্গোৎসব কলির অশ্বমেধ—আমরা দুঃখী, অন্নের জন্য কাতর—কেমন করে মার পায় গঙ্গাজল বিল্বদল দিব—কি এমন অদৃষ্ট লয়ে এসেছি—একথা কারেও প্রকাশ করিবেন না, লোকলাঞ্ছনায় তিষ্টতে পারবো না, পাগল বলে সবাই লাঞ্ছনা দিবে।"

নব ঠাকুর ব্রাহ্মণীর কথায় কাণ মন দিলেন বটে কিন্তু মনের কথা চাপিতে পারিলেন না—একদিন প্রাতঃকালে এক প্রতিবেশীর বাটি হইতে

সমুখ দিয়া একজন প্রতিমানির্ম্মাতা সূত্রধর যাইতেছিল সে জিজ্ঞাসিল "কি হচ্ছে দাদা ঠাকুর ?"

নবরাম উত্তর করিলেন—"এবার তোমাদের অন্ন উঠাইবার ইচ্ছা হয়েছে।"

প্রতিমা নির্ম্মাতা। তামাসা নয় কি করচেন বলুন, আমি কিছু যদি কল্লে হয়, করে দিব।

নব। তবে তোমায় বল্‌তেই হলো—মনে করেছিলাম কায়েও কিছু বলবো না—মার পায়ে গঙ্গাজল বিল্বদল দিবার ইচ্ছা করেছি।

প্র, নি। বেশত করেছেন, এ কাজ ত আপনাদেরই—আমি ঘরের খেয়ে আপনার জন্যে মার প্রতিমা গড়ে দিব।

নবরামের আহ্লাদের সীমা রহিল না—তাহাকে বসাইয়া এক ছিলিম তামাক খাওয়াইলেন। মিস্ত্রী প্রতিমা গঠনের ভার লইলে, ব্রাহ্মণ বাঁশ কাটিয়া প্রতিবাসী কৃষকদের নিকট ভিক্ষা দ্বারা তৃণাদি সংগ্রহ করিলেন, কৃষক সন্তানেরা সকালে বৈকালে অবসর মত একখানি চালা ঘরও প্রস্তুত করিয়া দিল।

(২)

পূজাকে কুড়িটী দিন মাত্র বাকী, নবরাম ভিক্ষার জন্য বিদেশে বাহির হইলেন। ব্রাহ্মণীর ভাবনা ভাবিলেন না—পুত্রটী কলিকাতায় কলেজে পড়ে। দুইচারি দিনের জন্য ব্রাহ্মণীর অন্নসংস্থান মাত্র করিয়া দিয়া গেলেন। এগ্রাম সেগ্রাম করিয়া কত গ্রামই তিনি ঘুরিলেন, ছোট বড় কত গৃহস্থেরই যে দ্বারস্থ হইলেন—তাহার গণনা হয় না। কেহ দুর্বৃত্ত দুরাশয়, কেহ প্রতারক প্রবঞ্চক বলিয়া তাড়াইয়া দিল, কেহ বা বিরক্তির সহিত কিছু দিল, নবরাম অভিমান শূন্য, কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। দশ বার দিন কাল গ্রামে গ্রামে, বাড়ীতে বাড়ীতে বেড়াইয়া দুআনা চারি আনা, টাকাটা সিকাটা করিয়া তাঁহার কুড়িটী টাকা হস্তগত হইল. তাহাতেই ব্রাহ্মণের আহ্লাদের সীমা রহিল না, তখনও পূজার আট দশ দিন বাকী, এই সময় মধ্যে যদি আরও ২০।২২ টাকা হয় তাহা হইলে কষ্টেসৃষ্টে পূজার খরচ এক রকম চলিবে ভাবিয়া তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, ভাবিলেন সকলই জগদীশ্বর ইচ্ছা।

এইরূপ চিন্তা করিয়া পথ চলিতে চলিতে স্নানকাল উপস্থিত। ব্রাহ্মণ একটী পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে স্নান করিতে নামিলেন—সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই; তিনি স্নান করিয়া ভিজা

নার পাশেও রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মন ভগবত্তত্ত্বচিন্তায় নিবিষ্ট, বিশেষতঃ যখন তিনি ইষ্টদেবতার ধ্যান পাঠ করিতেছিলেন তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান শূন্য। পূজান্তে স্তব কবচ পাঠকালে তিনি ইহ জগৎ ভুলিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছেন, তাহার পরে যখন আশে পাশে চাহিলেন, তখন আর টাকাগুলি দেখিতে পাইলেন না, তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, ভাবিলেন, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" উপায় কি—যিনি দিয়াছিলেন তিনিই লইলেন, তবে আর দুঃখ কি—টাকাগুলি যে অসাবধানে রাখা হইয়াছিল তাহাও নহে. সিড়ির এক কোনে রাখিয়া ব্রাহ্মণ তাহার পাশেই বসিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গস্পর্শ না করিলে আর কেহ সেগুলিকে হস্তগত করিতে পারিত না, কিন্তু ইষ্ট চিন্তা-কালে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান যে ছিল না তাহা তিনি কখনই মনে করেন নাই। টাকা যাউক—কিন্তু ইষ্টপূজাকালে অপরের স্পর্শদোষে তিনি যে অশুচি হইয়া ছিলেন, তজ্জন্য কিসে তাঁহার সেই দুরদৃষ্ট খণ্ডন হইবে তাহার ভাবনাই তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলিল। নবরাম স্নান করিলেন, কিন্তু জল যোগের ব্যবস্থা নাই। পুষ্করিণীর ঘাট হইতে তিনি এক বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাইয়া মনে করিলেন, সেই বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলে জঠর জ্বালার নিবৃত্তি হইবে, এবং কিছু ভিক্ষাও মিলিতে পারিবে।

(৩)

নবরাম অবিলম্বে অট্টালিকাদ্বারে উপস্থিত হইয়াই দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি পাইলেন—উপরে উঠিয়াই এক প্রকাণ্ড গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি-লেন—দুইটী সভ্যভব্য পুরুষ বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, কথায় বার্ত্তায় বুঝিলেন একজন গৃহস্বামী, অপর আগন্তুক।

গৃহস্বামী আগন্তুককে জিজ্ঞাসিলেন "আমায় এ অনুরাগের কথা কোথায় শুনিলেন?"

আগ। আজ্ঞা—সহরময় সকলেরি মুখে।

গৃহস্বামী। আপনার বিষয় কর্ম্ম কি করা হয়?

আগ। আজ্ঞা—একটী চাকরি আছে, তাতে একটী শ টাকা বেতন পাই—কিন্তু পিতামাতা গলগ্রহ জুটাইয়া দিয়া গিয়াছেন—সেই গলগ্রহের গর্ভে একটী পুত্র একটী কন্যাও জন্মিয়াছে। যাহা পাই, তাহা ঝি চাকর আর ঘরভাড়া দিয়া আমার ও আমার ভালবাসায় দুজনের চলে না—দুতিন মাস স্ত্রীপুত্রের খরচ বন্ধকরে দিয়েছিলাম, তারাখোর পোষের জন্যে আদালতে দাঁড়ায়—আদালতও

এমনি অবুঝ যে তাদের কুড়ি টাকার ডিক্রি দিয়েছেন। কি করি মাসে মাসে তাহাদের ২ ৲ টাকা দিয়ে থাকে মাত্র আশিটী টাকা—যিনি আমায় ভাল বাসেন, আমাকে বই জানেন না, তাঁর যত ভালবাসা তত আবদার—আমি অর্থহীন, কষ্টে এযাবৎ তাঁর সকল আবদার রক্ষা করে এসেছি—সমুখে পূজা এবার আর ক্ষমতায় কুলাবে না, তাই এবিষয়ে মহাশয়ের খুব সুখ্যাতির কথা যারতার মুখে শুনে আপনার নিকটস্থ—বেশী নয় পাঁচটী শ টাকা হলেই তাঁর আবদারের দায়ে অব্যাহতি পাই, শুনেছি আপনি এরূপ কাজে মুক্তহস্ত—আপনি প্রেমিকের পিতামাতা বঙ্গে সকলে জানে। আপনি না উদ্ধার করিলে কার কাছে দাঁড়াব।”

গৃহস্বামী। আর বেশী কিছু বল্‌তে হবে না আমি সবই বুঝতে পেরেছি পাঁচশ টাকা নিয়ে যান সে স্ত্রীলোকের কষ্ট না হয়, তার পর আমি কলকেতা গেলে আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবেন, দেখিব আপনার সৎকার্য্যের যদি কোন রকমে সহায় হ’তে পারি।

নবরাম যে হাতে পৈতা জড়াইয়া দণ্ডায়মান এতক্ষণ গৃহস্বামী বা আগন্তুক এতদুভয়ের কেহই দেখিতে পান নাই, গৃহস্বামী জমিদারের খাজাঞ্চী পাঁচশত টাকা আনিয়া আগন্তুকের হাতে দিল। সে টাকা পাইয়া প্রফুল্লমনে বিদায় লইল—জমিদার নবরামকে দেখিয়া বলিলেন,—“পূজার সময় বেশ ভঙ্গি করে বেরিয়েছ ঠাকুর।”

নব। দরিদ্র ব্রাহ্মণ—জগদম্বার পাদপদ্মে জবা বিল্বদল দিবার ইচ্ছায় ভিক্ষায় বাহির হইয়াছি, কিছু পাইলেই চলিয়া যাই।

বাবু। পূজার্চ্চনায় আমার শ্রদ্ধা নাই ওসব অন্যের কাছে কওগে।

নব। সে কি বাবু—আপনি হিন্দুসন্তান দেবদ্বিজে শ্রদ্ধা নাই এ যে, অসম্ভব কথা বল্লেন।

বাবু। সে যাহোক আমার কাছে কিছু হবেনা—দরোয়ান এস্কো ভাগায় দেও।

ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়ীতে বৈমুখ হইয়া নিকটবর্ত্তী দুই তিনটী গৃহস্থগৃহে ভিক্ষা করিয়া দুইটী মাত্র টাকা পাইলেন, সেদিন চতুর্থী—সেখান হইতে তাঁহার বাড়ী প্রায় বার তের ক্রোশ দূরবর্ত্তী—মধ্যে একটী দিন মাত্র, সে দিনটী গত হইলেই ষষ্ঠীর কল্পারম্ভ—বোধন। নবকুমার প্রমাদ গণিলেন, কেমন

প্রতিমার মাটী দিয়া কি অপরিণামদর্শীর কাজ করিয়াছেন—যদি না পূজা করিতে পারেন তাহা হইলে পাপের সীমা থাকিবে না—কেমন করিয়া পূজা হয় ব্রাহ্মণ তাহার আশা ছাড়িয়া গৃহ প্রত্যাগমনের জন্য বাসগ্রামের অভি-মুখে যাত্রা করিলেন, যেগ্রামে আসিয়া সূর্য্যাস্ত হইল সেখান হইতে তাঁহার বাড়ী প্রায় ৭।৮ ক্রোশ।

নীলবর্ণ শারদ গগনে মেঘ দেখা দিল—চতুর্থীর চন্দ্র অস্তগত হইবার পূর্ব্বে নিবিড়নীরদমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হইল। ঘনঘন মেঘগর্জ্জনের সহিত মুষল ধারায় বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে চপলাচমক, নবকুমার এক গৃহস্থ গৃহে আশ্রয় পাইলেন, কিন্তু বৃষ্টি থামিল না, সমস্ত রাত্রি সমান বৃষ্টি—পুষ্করিণী, খাল, বিল ডুবিয়া মাঠের উপর দিয়া স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি প্রভাত হইল—সূর্য্যমণ্ডল নয়নগোচর হইল না, গাছের ডালে বসিয়া পাখী ডাকিল, কিন্তু আহারান্বেষণের জন্য নীচে নামিল না। আজি—ষষ্ঠী সর্ব্বনাশ হইল, ব্রাহ্মণ আপনার দুরদৃষ্ট ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—আর ঘনঘন জগদম্বার নাম লইতে লাগিলেন, তিনি আর স্থির হইতে পারিলেন না, ভিজিতে ভিজিতে গৃহাভিমুখ হইলেন, একগলা একবুক জল ভাঙ্গিয়া চলিতে চলিতে আকাশে মেঘের মেলা ভাঙ্গিতে লাগিল, বিরলবিন্যস্ত মেঘ-মালা বায়ুভরে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে করিতে যেন আকাশের নীলবর্ণ টুকরা-গুলি দেখাইতে লাগিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ দ্রবের ন্যায় এক এক বার সূর্য্যরশ্মি ছড়াইতে লাগিল, স্নানকালে আকাশ মেঘশূন্য হইল, প্রকৃতি যেন মুখভরা হাসিতে জগৎ হাসাইল। নবকুমার বাসগ্রামের দুই ক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বেলা দুই প্রহরের সময় আপনার বাসগ্রাম দেখিতে পাইলেন, হৃৎপিণ্ডে শোণিত স্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল—গিয়া হয়ত দেখিবেন তৃণকুটীর ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে, দেবীপ্রতিমা নষ্ট হইয়াছে।

(৪)

নবকুমারঠাকুরের বাড়ীতে একখানি মাত্র শয়নগৃহ, আর একটী ক্ষুদ্র পাকশালা—পূর্ব্বে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ছিল না; ছেলেটী এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার কালে যে, বৃত্তি পাইতেন তাহাতে এবং প্রাই-ভেট পড়ানায় যে কিছু কিছু উপার্জ্জন হইত, তাহাতে চারিদিকে প্রাচীর এবং তাহার পার্শে একখানি বসিবার চালাও বাঁধা হইয়াছিল। পরে ধরণী

কান্ত পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া এক ঐশ্বর্য্যশালিনী অসবর্ণা যুবতীর প্রণয়পাশ পরিবার জন্ত গলা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, বিবাহের সকল উদ্যোগ অনুষ্ঠানই ঠিক হইয়াছিল, পূজার পরই শুভকার্য্য পিতামাতার অগোচরে সমাধান হইবার কথা—কিন্তু দরিদ্র পিতা কিরূপে পূজার বিপুল আয়োজন করিলেন, ইহা দেখিবার জন্ম তাঁহার বড়ই কৌতুহল জন্মিয়াছিল, বিশেষতঃ তিনি বিজ্ঞানে এম. এ উপাধি পাইয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকের মন সত্যের অনুসন্ধানে সদাই সমুৎসুক। আজি তিন দিন হইতে দেশের রাজাধিরাজের দেওয়ানজী আসিয়া তাঁহার পিতার অনুসন্ধানে যখন জানিলেন যে ব্রাহ্মণ প্রায় পনর দিন বাড়ীছাড়া তখন তাঁহার পুরত্রে মনে বড়ই কৌতুহল জন্মিয়াছিল, তিনি কখন দেওয়ানকে দেখেন নাই—কোন অতিথি অভ্যাগত ভিক্ষার্থী হইলে তাহা তাঁহার অগোচর থাকে না। নবরামের পুত্র যখন দেওয়ানজীর মুখে শুনিলেন যে তাঁহার পিতা রাজাধিরাজের সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত তখন ইহার তথ্যানুসন্ধানে তিনি বিলক্ষণ কৌতুকাবিষ্ট হইবেন ইহা বিচিত্র নহে।

নবরাম পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পদার্পণ করিয়াই দেখিলেন—বহুলোক মহারাজার প্রেরিত দ্রব্যসম্ভার লইয়া নবরাম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর অনুসন্ধান করিতেছে তখন তাঁহার মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল তিনি ভাবিলেন—রাজার রাজ্যে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবের পাছে ক্রটি হয় তজ্জন্ত রাজা পূজার অনুষ্ঠান করিয়া পাঠাইতেছেন—পূজান্তে তাঁহার আপনার এই পাপের দণ্ডবিধানে তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। এই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ খিড়কির দ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। নবরামের ন্যায় তাঁহার পত্নীর মনেও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। কেবল তাঁহার পুত্রের মন যেন প্রফুল্লতাপূর্ণ দেখিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে হইল আমার অপরিণামদর্শিতার বিলক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে ইহারই জন্ত পুত্রের ভাবান্তর ঘটিয়া থাকিবে, এজন্য ব্রাহ্মণ তাহার নিকট লজ্জাবনত মুখ দেখাইয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে সাহসী হইলেন না।

ক্রমে বেলাবসান হইল—নবরামের আগমনবার্ত্তা দেওয়ানজীর কর্ণ গোচর হইলে তিনি তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া পাঠাইলেন, নবরাম কাঁপিতে কাঁপিতে দেওয়ানজীর নিকটস্থ হইলে তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন! নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তিনি রাজাজ্ঞা অবগত করিয়া বলিলেন—"আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। মহাষ্টমীর দিন মহারাজ স্বয়ং আপনার বাড়ীতে আসিয়া

আর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আপনার পূজায় তিনদিন তন্ত্রধারকতা করিবেন। বোধনের পূর্ব্বেই তিনি উপস্থিত হইবেন—বলিতে বলিতে এক জটাজুটধারী ব্রাহ্মণ পরিধানে গৈরিক বাস, হস্তে কমণ্ডলু—তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—"এই কি নবরামের বাড়ী?" তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠভাবে প্রণাম করিয়া উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে হাঁ।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাদার্ঘ্যে পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন।

নবরাম দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভ্যাবাচ্যাকালাগা নবরামের মুখে কথাটী আসিল না, কিয়ৎ কালের পর আগন্তুক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া তিনি বলিলেন—"ঠাকুর পূজা আমি আপনিই করিব।"

আগ। তা'ত করবে কিন্তু তন্ত্রধারক ত চাই—আমি তাহারই জন্যে এসেছি।

নব। আমার পরম সৌভাগ্য—কিন্তু ঠাকুর আমি দরিদ্র আপনাকে দক্ষিণা দিবার শক্তি আমার নাই।

আগ। তোমার এ পূজা সাত্ত্বিক ভাবের—তদ্রূপ দক্ষিণা একটী হরীতকী হইলেই যথেষ্ট হইবে।

তথাপি নবরামের যেন মনে কিছু রহিল—তিনি প্রকাশ না করিলেও আগন্তুক বলিলেন,—"আমার আহারাদিরও কোন বন্দোবস্ত তোমায় কত্তে হবে না। আমি তার ব্যবস্থা করিতেছি।

নব। তা'হলে আমা হ'তে কি হলো—আপনি আগন্তুক যদি আপনিই আহারের ব্যবস্থা কল্লেন তা'হলে আমি কি কল্লেম।

রাজদেওয়ান বলিলেন,—"ঠাকুর সে ভাবনা আপনাদের কাহাকেও ভাবিতে হবে না।

(৫)

সূর্য্যাস্ত হইল, সন্ধ্যা আসিল, ষষ্ঠীর চন্দ্র প্রায় আধখানা হইয়া আকাশে উঠিল, সবুজ পাতায় রূপালী কিরণ পড়িয়া সমস্ত সাদা দেখাইতে লাগিল—ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল, বিল্বমূলে ব্রাহ্মণের আসন পড়িল, কৃতস্নান নবরাম কোশাকুশী লইয়া দেবীর বোধনে বসিলেন—

হইলেন—বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন—অতসী কুসুমবর্ণা দশ প্রহরণধারিণী সিংহ-বাহিনী মূর্ত্তি তাঁহার হৃৎক্ষেত্রে যেন আলোকিত হইলেন। তন্ত্রধারক তাঁহাকে তদ্গত চিত্ত দেখিয়া বলিলেন—

"নবরাম এ যে মোহ—মোহ রিপু নয়?"

নব। ঠাকুর! শত্রু হলেও সময়ে মিত্রের কাজ করে!

বোধন শেষ হইলে রাজদেওয়ান নবরামকে বলিলেন—"ঠাকুর আপনার কোন শঙ্কা নাই, আপনার যেরূপ তন্ময়ত্ত্বা দেখিলাম তাহাতে আপনার পূজাই সার্থক—মহারাজ মহাষ্টমীর দিন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। তিনি তিনদিন ভূরিভোজনের ব্যবস্থার আজ্ঞা করিয়াছেন, যে কিছু খরচ পত্র হইবে সমস্ত রাজসংসারের—আগামী কল্য প্রাতে ঢোল সোহরৎ দিয়ে গরিব দুঃখী সকলকে জানাতে হবে, আর ভদ্রলোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসতে হবে। সে জন্য আপনাকে কিছু কষ্টে হবে না—সব সরকার করবেন।"

পরদিন দেওয়ানজী তাহাই করিলেন;—আটজন পাচক ব্রাহ্মণ এবং আয়োজন জন্য ষোল জন ভৃত্য আসিয়াছিল, সপ্তমীর দিন প্রাতে প্রভূত আয়োজন চাউল ডাউল মৎস্য তরকারীপত্র সবই পর্য্যাপ্ত।

নবরাম পত্নীকে ভোগ রাঁধিতে বলিলেন—কিন্তু রাঁধিবেন কি—সবই মহারাজের দ্রব্যসামগ্রী। নবরামের ভিক্ষালব্ধ ৩।৪ টী টাকা ছিল তাহাতে যে রূপ ভোগানুষ্ঠান হইতে পারে তাহাই আয়োজন হইল। সপ্তমীর দিন সাত আট খানি গ্রামের লোক ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইল।

মহাষ্টমীর দিন মহারাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন—প্রতিমা দেখিয়া প্রেমভক্তিতে তাঁহার মন গলিয়া গেল, তিনি যেন সাক্ষাৎ কৈলাসের মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলেন—রাজভবনে যে প্রতিমা দেখিয়া আসিয়াছিলেন সে মূর্ত্তিতে ও এমূর্ত্তিতে অনেক প্রভেদ। তিনি অনিমেষ লোচনে তাহা পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিলেন না। নবরাম তখন পূজায় বসিয়াছিলেন,—

ওঁ জটাজুট সমাযুক্তা মর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাং
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাং—

এই ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাঁহার গণ্ডস্থলে অশ্রুধারা বহিতেছিল—

তিনি ভাবিলেন,—ভক্তের ভগবতী, ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে পাওয়া যায় না,—সে ভক্তি মুখের কথায় জন্মে না, বহু সৌভাগ্য সাপেক্ষ।

সন্ধি পূজা সমাপ্ত হইলে মহারাজ রাত্রিকালে তথায় অবস্থিতি করিলেন, সমস্ত দিন উপবাসী ছিলেন—মহামায়ার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, রাজবাড়ীতে পলান্ন প্রসাদে তাঁহার রাসনার যত না তৃপ্তি হইত, ইহাতে ততোধিক হইল, তিনি যেন তাহাতে এক অপূর্ব্ব স্বাদ পরিগ্রহ করিলেন, সেরূপ স্বাদে তাঁহার রসনা পূর্ব্বে কখন পরিতৃপ্ত লাভ করে নাই।

নবরামের বৈজ্ঞানিক পুত্র এইসকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া যেন হতবুদ্ধি হইলেন, কোন থিওরীই তাঁহার মনে দাঁড়াইবার স্থান পাইল না কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহার বড়ই উৎকণ্ঠা জন্মিল। মহারাজের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার নিকটস্থ হইয়া আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, মহারাজও তাঁহাকে কৃতবিদ্য জানিয়া অকপটে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিলে ব্রাহ্মণ কুমার মহারাজকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমার পিতৃদেবের সহিত কত দিনের পরিচয়?"

মহা। কস্মিন্ কালে আপনার পিতৃদেবের নাম পর্য্যন্ত আমার শ্রুতি গোচর ছিল না।

ব্রাহ্ম। তবে কিরূপে তাঁহার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ জন্মিল।

মহা। সে কথা প্রকাশ করিতে আমি নিষিদ্ধ। তবে একথা সত্য যে, তাঁহার কোন কথাই আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।

পূজা ফুরাইল, বিজয়ার দিন নবকুমার যখন—

"আবাহনং নজানামি
ন জানামি বিসর্জ্জনং
সম্বৎসর ব্যতীতেতু
পুনরাগমনায় চ॥"

বলিয়া বিসর্জ্জন মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তিনি উন্মাদের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল, জগজ্জননী ভক্তবৎসলা ভগবতী যেন সত্যসত্যই কৈলাসধাম ত্যাগ করিয়া নবরামের কুটীরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

নবরাম প্রতি বৎসরই ব্রাহ্মণালয়ে পূজা করিতেন বা করাইতেন, অনেক

তাঁহার নিজের পূজা,—নিজের সব, তাই তাঁহার মন এত উদ্বেলিত। কোন পিতাই কন্যাকে পতিগৃহে যাইবার জন্য বিদায় দিয়া এরূপ ব্যথিত হয়েন না।

একাদশীর দিন নবকুমারের পুত্র পিতৃচরণে শিরস্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—"এতদিন আমি পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় অপথে ভ্রমণ করিতেছিলাম, আপনি আমার জন্মদাতা পিতা হইয়া সুপথ দেখান নাই কেন ?

নব। পূর্ব্বে দেখাইলেও তুমি দেখিতে পাইতে না, এখন দেখাবার সময় হইয়াছে। তাই আপনিই তাহা দেখিতে পাইয়াছ। আর আমাকে দেখাইতে হইবে না।

ব্রাহ্মণ পুত্র। সম্পূর্ণ সত্য, আমি পূর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম—আমি অসবর্ণ বিবাহে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।

প্রিয়া।

লেখক,—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী।

১

প্রাণপ্রিয়া প্রিয়তমা জীবিত ঈশ্বরী
যতগুলি বিশেষণ আছে অভিধানে
বলেছি তোমারে প্রিয়ে মনে মনে করি,
ঢালিবারে সুধা-ধারা তব দুটি কাণে।

২

তথাপি বিরাগ তব দেখি মোর প্রতি,
একটি মধুর কথা কহিলে না হেসে—
ছলে হেসে কথা কও কিবা তাহে ক্ষতি ?
সব অভিমান মোর কোথা যাবে ভেসে।

৩

রমণীজাতিরে ধিক্ ধিক্ সেই নরে,
প্রাণ দিয়ে যেই চায় রমণীর প্রাণ।
নরে বিড়ম্বনা দিতে অবনী ভিতরে—
বিধি স্বজিয়াছে হায় কুসুমে পাষাণ।

গ্রহবৈগুণ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নাদনঘাট হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে একগণ্ডগ্রাম, গ্রামটির নাম পুটশুনি, ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। রাত্রিকালে, পূর্ণিমার চন্দ্র, পুটশুনি গ্রামের প্রান্তস্থ মাঠ, শীতকাল, পৌষমাস, শস্যক্ষেত্রের ধান্য প্রায় গোলাযাত হইয়াছে, শূন্য মাঠ সকল চন্দ্রালোকে দেখা যাইতেছে, সুদূরে গ্রাম সকল মধ্যে মধ্যে ঝোপের মত বৃক্ষ সকলের আব ছায়া দ্বারা যেন এক একখানি ছবির মত দেখা যাইতেছে।

আজ কয়েকদিন এই প্রান্তরে এক সাধু পুরুষ, আসিয়াছেন, তাঁহার প্রশান্ত ললাট, জটাজুট বিশিষ্ট, কৌপিনধারী, উজ্জ্বল চক্ষু, উৎসাহশীল বদনমণ্ডল, উন্নত নাসিকা তাম্রবর্ণ দেহ, গলদেশে কতকগুলি রুদ্রাক্ষ মালা, সম্মুখে ধুনি জ্বলিতেছে, সাধুর বয়ঃক্রম আন্দাজ চল্লিশ বৎসর হইবে। তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, নাসিকাগ্রে চক্ষুর জ্যোতিঃ রাখিয়া সর্ব্বদা প্রণায়াম করেন, দ্বিতীয় সহচর নাই, গ্রামের বালক বালিকা, যুবক যুবতী, পৌঢ়গণ সকলেই সময় মত আসিয়া সাধু দর্শন করিতেছেন, কেহ বা প্রশ্ন করেন, কেহ বা কলাটা মুলাটা আনিয়া সাধু সেবার জন্য সাধুর নিকটে রাখিয়া যান, সময় সময় সাধুও তাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথন করেন।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি বারটার সময়, গ্রাম নিস্তব্ধ! পশুপক্ষী নিস্তব্ধ! এমন সময় কতকগুলি লোক মাঠের উপর দিয়া আসিয়া সাধুর নিকট পৌঁছিল। ইহার মধ্যে একজন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ব্যক্তি কহিলেন, "বীরেন্দ্র! কিছু সন্ধান পাইলে কি?"

পাঠক! সাধুর নাম বীরেন্দ্র। তিনি উত্তর করিলেন, "কিছুই না।" বলশালী ব্যক্তি পুনরায় বলিলেন, "আমি জানি এই জাতিয় লোকরে মধ্যে বড়ই দুর্দ্দন্ত, বিশ্বাসঘাতক, চোর ডাকাত, ইংরাজের কৃপায় এখন ইহাদের মধ্যে অনেকেই সভ্য হইয়াছেন, ভালকার্য্যও পাইয়াছেন, কিন্তু জাতি মহিমা কোথাও যায় নাই। পূর্ব্বে এই সকল জাতি সামান্য এক পয়সার জন্য নরহত্যায় লিপ্ত হইত, এখন ইহারা মোকর্দ্দমা নিপুণ, সকল জেলায় এই জাতির বড়ই উৎপাত! এখন স্বকার্য্য সাধন কর!" এই বলিয়া তিনি অনুচরবর্গকে প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিলেন, উপদেশ প্রাপ্ত মাত্র সেই বিস্তৃত ময়দানে কয়েকটি মসাল প্রজ্বলিত হইল, আরও বহু

লোক আসিয়া যোগ দিল, ধুনির প্রজ্বলিত অগ্নি শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া উঠিল, গ্রামের সবই খোড় ঘর, মাটির দেওয়াল, চকিতের মধ্যে সেই সকল ব্যক্তি সেই সকল মসাল দুই তিন খানি চালে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। কতকদল রহিল। সাধু বীরেন্দ্র সেই যোগাসনে সেই ধুনির নিকট স্থির মনে যেমন ছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন।

এক চাল জ্বলিল, ক্রমে দুই, তিন, খানি চাল জ্বলিল, ক্রমেই ধুধু শব্দে গ্রাম দগ্ধ হইতে লাগিল, নিস্তব্ধ গ্রাম জাগ্রত হইল, খুব কোলাহল হইল, গ্রামশুদ্ধ লোক বাহির হইল, স্ব স্ব দ্রব্য লইয়া, সন্তান সন্ততি লইয়া, ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কত ধানের গোলা জ্বলিতে লাগিল, কত গরু বাছুর চারিদিকে দৌড়িতে লাগিল, পালিত পক্ষী কত পুড়িল, কত মানুষ পুড়িল, কত লোকের কত গৃহদ্রব্য ভস্মীভূত হইল, কত লোকের ক্রন্দন রোলে গগণ ও প্রান্তরের বায়ু পরিপূর্ণ করিল। সকলের মুখে হায় হায় শব্দ! কে কাহার উপকার করিবে, সকলেই শশব্যস্ত, কত কুললক্ষ্মীরা ক্রন্দন করিয়া প্রান্তরের একদিকে একত্র হইলেন, এমন সময় সাধু গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তিনি এক যুবকের সম্মুখে উপস্থিত! যুবক একটী বৃহৎ টিনের বাক্স সবলে তাহা মাঠের এক স্থানে রাখিতেছিলেন, সাধু গিয়া যুবককে বলিলেন, "ইহাতে কি আছে?" যুবক, "টাকা আছে।" সাধু "কতটাকা?" যুবক "তা'জানিনা! আমার পিতা জানেন।" সাধু হাসিয়া কহিলেন, "রামকিষণ।" সেই প্রবল কোলাহল মধ্য হইতে উত্তর আসিল "হুজুর" সাধু "ইধার আও" রামকিষণ আসিল, সাধু কহিলেন, "ইস্‌কো পাক্‌ড়ো, হাণ্ডকপ দাও, আউর এই বাকস্ লে চলিয়ে!" যুবকের হাতে হাতকড়ি পড়িল, রামকিষণ অন্য লোক ডাকিয়া বাক্স এবং চোর লইয়া সেই জ্যোৎস্না রাত্রে এবং প্রজ্বলিত গ্রাম দগ্ধের আলোকে সবেগে যাইতে লাগিলেন। সাধুও সেই রাত্রে গ্রাম ছাড়া হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার কোন এক পল্লীভবন,—সন্ধ্যার পর তিনটী যুবক, সকলেই বলবান, তেজস্বী, উৎসাহশীল, কার্য্যপটু বদন মণ্ডল, হাসি হাসি মুখ, সমবয়স্ক, শীতকাল, বাবু সাজে খুবই বাহার দিয়া তাঁহারা সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল; সেখানে মদের বোতল আসিল, মদ খাওয়া হইতে লাগিল,

মদ পেটে পড়িয়া কত রাজা উজির বাদসাহের গল্প চলিতে লাগিল। আড়ভাঙ্গা গলায় তালভাঙ্গা সুরে প্রত্যেকে আপন মনে কত গান হইল, স্ফুর্ত্তি খুবই, আসর সরগরম! এই অবস্থায় এক যুবক আর একজনকে প্রশ্ন করিল, "তোর নাম কি বাবা?" "ভুলিয়া গিয়াছি।" "তুই কি জাত বাবা?" "আমি জাতিতে হাঁড়ি মুচী!" "একি চাঁদ বলনা একটা জাতের নাম কর, নয় বল হাঁড়ী নয় বল মুচী?" সে কথায় কাজ কি? অন্য যুবক কহিল, "কেন চাঁদ! তোমার বাড়ী কোথা?" "আমাদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়?" অন্য যুবক, "আমার বাড়ীও বর্দ্ধমান জেলায় কালনায়! তোর বাড়ী ভাই কোন গ্রামে?" "আমার বাড়ী পুটশুনিতে।" অপর যুবক "পুটশুনি! পুটশুনি! খুব জানি, সে গ্রামে ত হাঁড়ি মুচী নাই, সে যে বিভিন্ন জাতির গ্রাম বাবা!" "আমিও উগ্র ক্ষত্রিয় তনয়।" সকলে "তাই বল চাঁদ! বাহবা বাহবা! উক্ত যুবক ত্রয়ের মধ্যে একজনের নাম ছিল ভূপতিবাবু! তিনি কহিলেন, "তোর বাপের নাম কি চাঁদ?" আমার বাবার নাম গোষ্ঠ সামন্ত! ইহা শুনিয়া ভূপতিবাবু অবাক হইলেন, বল কি গোষ্ঠ সামন্তকে আমি খুব চিনি! তিনি উগ্রক্ষত্রিয়ের শিরোমণি! গোষ্ঠের মত লোক পুটশুনিতে নাই। তিনি আমার গ্লাসফ্রেণ্ড! তুমি বেণী রায়কে জান?" "জানি, তিনি আমার পিতার উকিল।" "আমি তাঁর ভাই গো! তুমি গোষ্ঠ বাবুর ছেলে আমি তোমায় ছাড়িব না, "তোমাকে অনুসন্ধানের জন্য গোষ্ঠ বাবু আমার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, তুমি সেই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা নগরী, হোগলকুড়িয়া পল্লী, রাত্রিকাল, এক দ্বিতল গৃহের উপর ক্ষুদ্র প্রদীপ মিট্ মিট্ জ্বলিতেছে, ঘরটী সাজান, বহুসংখ্যক পুস্তকরাশি গ্ল্যাসকেশে এবং গৃহের চারিদিকে স্তরে স্তরে সজ্জিত। চেয়ার টেবিল এবং শয়নের জন্য একখানি পালঙ্ক রহিয়াছে। একটী ঘড়ি টক্ টক্ শব্দ করিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইতেছে। সেই গৃহে এক যুবক বয়স আন্দাজ ৩৭।৩৮ বৎসর হইবে, শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি এবং এক যুবতী বয়স অনুমান ২৭।২৮ বৎসর হইবে, সুন্দরী সুশ্রী কস্তাপাড় সাটী পরিধান, সিঁথির সিন্দুর দক্ দক্ করিতেছে, হস্তে সুবর্ণ বলয় অঙ্গে অন্য কোন অলঙ্কার নাই। যুবতী কহিল, "আপনাকেও

বোধ তুমি!” যুবক “প্রতিবাদ করিয়া আর না।” যুবতী “এখনও সময় হয় নাই, শত মিথ্যা সত্যের এক আলোকে দূরীভূত হইবে; শত বর্ষের অন্ধকার গৃহে এক আলোকে আলোকিত হইবে। তুমি ভাবিও না, টাকাটা আমাদেরই গিয়াছে, এজন্য ঠাকুরপো অবশ্য কষ্ট পাইবেন বৈ কি? টাকা যায়, টাকা হয়।”

যুবক কহিল, “তা হয় বটে, টাকার সঙ্গেই সংসারের উন্নতি অবনতি! দেখ! আমি যেন আকাশ হইতে পড়িতেছি, হুড়মুড় করিয়া পড়িতেছি; এখনও পড়িতেছি, এই পতনের শেষ কোথায় জানি না, কোথায় আসিলাম, শাস্ত্রে বলে মৃত্যু আট প্রকার, শশ্মানে সৎকার যে মৃত্যুতে তাহা শাস্ত্র সঙ্গত মহা-প্রলয়—নির্ব্বাণ! তাহার জন্ম আর হয় না, উক্ত আট প্রকার মৃত্যুর পুনর্জন্ম আছে, ঐ আটের মধ্যে ভদ্রলোকের অপমান এক মৃত্যু! অতএব আর সহ্য হয় না। আবার ভাবি, যে চিকিৎসকেরা এত রোগ ধরিয়াছেন, কিন্তু একটা রোগ ধরিতে পারেন নাই, তাহা কি? গ্রহ! মানুষের যেমন বিবাহ হয়, ছেলে হয়, সেইরূপ গ্রহ ধরে, ইহা সকলকেই ধরিবে! মৃত্যু যেমন অনিবার্য্য গ্রহে ধরাও তেমনি অনিবার্য্য! নল রাজার কি হয়েছিল, শ্রীবৎস রাজার কি হয়েছিল, যুধিষ্টির রাজার কি হয়েছিল? রাজা রামচন্দ্রের কি হয়েছিল? নেপোলিয়নের কি হয়েছিল, এইরূপ সকল দেশে, সকল পল্লীতে পল্লীতে দেখ, আজ সুরম্য অট্টালিকা, কল্য পতন অবস্থা! মানুষ এ জগতে আসিয়া যত প্রকার রস খায়, যত প্রকার ভাব উপলব্ধি করে, তন্মধ্যে গ্রহও একটী রস ও একটী ভাব! বোধ হয়, চৈতন্য করিবার জন্যই গ্রহ ধরে! স্মৃতি রাখে! আমার জন্য ভাবি না। ভাবি তোমার জন্য, ভাবি বিমলা, কমলা, স্নেহ জ্যোৎস্না বেলা পান্নালাল এবং ছোট বাবুর জন্য। ভাবি, সমাজের জন্য, ভাবি ভ্রাতাভগ্নি এবং পিতামাতার জন্য! ভাবি পাড়া প্রতিবাসীর জন্য। আর কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না।” যুবতী কহিলেন, “আপনি আর কথা কহিবেন না, আপনার কথা শুনিলে কান্না পায়। আপনি ত মায়া কাটাইয়া, কোথায় পলাইতে ছিলেন, তাইত সে লোকটা টাকা নিয়ে পলাইল। অদৃষ্ট ভিন্ন পথ নাই। তজ্জন্য ভাবিয়া কি হইবে। যুবক কহিল, “তুমি আমার শক্তি! তুমি নিকটে থাকিলে এতটা হইত না। এখন এই শত্রু পুরীতে কেবল তোমার শক্তিতেই আত্ম বাঁচাইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছি। শান্তি গিয়েছে, গ্রহে ধরিয়াছে। আর শান্তি আসিবে কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে অগ্নিময় স্থান হইতে যে যুবককে ধরা হইয়াছিল, তাহার নাম জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী। জটাজুট বিশিষ্ট সাধুও ঐ সঙ্গে চলিয়া আসিতে আসিতে জটা খসিল, কৌপিন খুলিল, তৎস্থলে জামা, জুতা চাদর অঙ্গে উঠিল কদমতলার ঘাটে নৌকা বাঁধা ছিল। জ্ঞানেন্দ্র এবং কোতোয়ালের লোকজন নৌকায় উঠিল। নৌকায় সকলে উঠিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, বাক্সটিও নৌকায় রাখা হইল, কিছুক্ষণ পরে বীরেন্দ্র কোতোয়ালের পোষাকে আসিয়া নৌকায় উঠিলেন; নৌকা ছাড়িয়া দিল। জ্ঞানেন্দ্রের হাতে হাতকড়ি সজলনেত্র বিমর্ষ বদন জ্ঞানেন্দ্রের মুখখানি ডায়মণ্ডকাটা অর্থাৎ গত বৎসরে ভয়ানক বসন্ত হইয়াছিল, সে দাগ অদ্যাপিও টাটকা রহিয়াছে। বীরেন্দ্র কহিল, "কত টাকা চুরি করেছ?" জ্ঞান "আমি নির্দ্দোষী।" বীরেন্দ্র "তা জানি তোমার জন্য আমি সাত দিন মাঠে বসিয়া হিম খাইতেছি, পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, যে দিন তোমাদের বাড়ী থানাতল্লাসী করি, সে দিন তুমি কোথা ছিলে?" জ্ঞান কহিল, "রাজসাহী ছিলাম, তথায় নলিনীকান্ত দাস নামক আমার এক বন্ধু আছে, বাবুদের কাজ উঠিয়া গেল, আমরা গরীব মানুষ কাজ করে খেতে হবে, নবীন আমাকে রাজসাহীতে কাজ করে দিবে বলিয়াছিল, তাই তথায় গিয়াছিলাম!" বীরেন্দ্র বাবু "গ্রামে কবে আসিয়াছ?" জ্ঞান "কল্য প্রাতে!" বীরেন্দ্র "প্রাতে কি করিয়া আসিলে রাণা ঘাট দিয়া শান্তিপুর হইয়া নৌকাযোগে কালনা, তৎপর কদমতলা কিংবা নাদন ঘাট? ইতিমধ্যে প্রাতে কোথায় আসা যায়?" জ্ঞান কহিল, "নাদন ঘাটে আসা যায়, তারপর বাড়ী যাই।" বীরেন্দ্র "গ্রামের সকলেই সাধু দর্শনে আসিল; তুমি কেন এলে না?" রামসিং কহিল "চোরকা সাধুভি ভালা লাগ্‌দা নেহি।" বীরেন্দ্র কহিল, "তুমি বাড়ী ছিলে তা, আমি এবং তুমি জান।" জ্ঞান কহিল, "কিছুই জানি না।" বীরেন্দ্র "আচ্ছা চল, কালনায় সব হবে এখন।"

সংসার।

বাড়িছে যাতনা,
সংসার বেদনা,
উড়ে গেল বুঝি প্রাণ।

আসিলাম ধীরে,
সংসার ভিতরে,
গাহিতে সুখের গান॥
সুখ নাহি লেশ,
এমত বিশেষ,
শোকে তনু হ'ল জরা।
বিষাদেতে ভরা,
বেঁচে যেন মরা,
হইয়ে পাগল পরা॥
তাই বলি সখে,
থাকিব কি সুখে,
এ সংসারে কে আমার।
এ জীব প্রবাহ,
শুধু দাবদাহ,
দেখ ঘোর অন্ধকার॥
সংসার মায়ায়,
সবারে ভুলায়,
পড়িয়া মিশায়ে রই।
কাঁদিব না আর,
কেহ নয় কার,
ছাই যেন নাহি হই॥
আর কি দেখিছি,
কোথা চেয়ে আছি,
কেনরে সংসারে বসে।
বিভোর হইয়া,
মায়ায় ভুলিয়া,
ভাবছি কাহার আশে॥
হৃদয়ের আশা,
স্নেহ ভালবাসা,
অনলে ঘৃতের মত।
অনল শিখায়,
সকলি মিশায়,
যত কর বাড়ে তত॥
অতএব বলি
মানব মণ্ডলী,
সাবধান সাবধান।

সংসারের বিষে,
বৃথা মোহে মিশে,
বৃথা হারায়ো না প্রাণ ॥

সমালোচনা।

প্রেমাশ্রু।—করুণ-রসাত্মক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ বি, এ, এল, এম, এস, বিরচিত, মূল্য আট আনা।

এই ক্ষুদ্র কাব্যে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র চুয়াল্লিশটি কবিতা আছে;—পাঠ করিয়া দেখা গেল, সকলগুলিতেই প্রেমাশ্রুর ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কণা;—ভাবুকেরা বুঝিবেন, এই কাব্যখানির নাম সার্থক। কবিবর সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমাদের সাদা কথায় কেবল কবিমাত্র নহেন,—কবিরাজ।—কাব্যরসে এই কবিরাজ কবিবরের জীবাত্মা অভিষিক্ত, অবশ্য একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব;—কবিতাগুলি যথার্থই হৃদয়গ্রাহী। শুনামলব্ধ যে, কয়েকজন সুপণ্ডিত এই প্রেমাশ্রু সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভাবুক—ভাবুক চূড়ামনি। বাস্তবিক আমরা আমাদের মাতৃভাষায় এপ্রকার রসপূর্ণ কবিতা অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি। প্রেমাশ্রু পাঠে মুগ্ধ হইলাম।

নির্ব্বাণ।—একখানি বিয়োগান্ত পঞ্চাঙ্ক নাটক। শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত ইহার বিরচণ কর্ত্তা। সংসার চিত্রের একাংশকে ভূমি করিয়া সুন্দর সুন্দর বিবিধ বর্ণে চিত্রকর এই নবীন ছবিখানি চিত্রিত করিয়াছেন। ভ্রান্তি-বশে সতীলক্ষ্মী সহধর্ম্মিনীর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া সংসার পথের অগণিত পথিক সতীকে কলঙ্কিণী এবং আপনাদের জীবনকে বিড়ম্বনাময় করিতেছেন, এই চিত্রে নবীন নাট্যকার কল্পনার সাহায্যে তাহাই দেখাইয়াছেন। পাঠ করিয়া যেরূপ পরিতোষ লাভ করা গেল, নাট্যমন্দিরের দৃশ্য রঙ্গভূমিতে এই দৃশ্য কাব্যের অভিনয় দর্শন করিলে এতদপেক্ষা অধিক পরিতোষ লাভ হইতে পারিবে, আমরা এইরূপ আশা করি। নবীন গ্রন্থকার নাট্য সাহিত্যে উৎসাহ পাইবার যোগ্য পাত্র।

প্রাচ্য-বিজ্ঞান।—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। সনাতন আয়ুর্ব্বে-

তুলনা করাই কবিরাজ মহাশয়ের উদ্দেশ্য। যে, যে, দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রাচ্য বিজ্ঞানের অস্তিত্ব তিনি সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সাধারণ লোকের জ্ঞান গোচরে তাহা সংলগ্ন হইতে পারিবে, দেশের বিজ্ঞান দেশের পদার্থেই খাটিবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত তুলনার অবসরে তাহা কোন কাজে আসিবে না. পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাঁহারা সুপণ্ডিত, তাঁহারা প্রাচ্য বিজ্ঞানের অপ্রশংসা করেন না, প্রাচ্য-বিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণও বলেন না, বরং এক এক বিষয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ বিজ্ঞলোকেরা যুক্তি দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন, ডফকলেজের ভূতপূর্ব্ব দর্শন শাস্ত্র অধ্যাপক ষ্টিভেন সাহেব তাঁহার কতিপয় হিন্দু-ছাত্রকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমাদের জাতীয় শাস্ত্রে ষড়দর্শনের ন্যায় উচ্চ বিজ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শিক্ষা না করিয়া ইংরাজী বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে তোমাদের এত পিপাসা কিজন্য?"—কেবল এই বাক্যের দ্বারাই প্রাচ্যবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় নিরপেক্ষ ভাবে উভয় দেশীয় বিজ্ঞানের তুলনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহা অবশ্য তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয়, তাঁহার পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্ত লাভ করিয়াছি।

গৃহস্থ-চিকিৎসা।—শ্রীযুক্ত কবিরাজ পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর দ্বারা আসক লেন, ঢাকা হইতে উপরোক্ত কবিরাজ মহাশয় প্রণীত ও প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদের যৌথ কারবার স্থাপন করিয়া কবিরাজ পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর স্বয়ং ঔষধ প্রস্তুত ও ঔষধ পরীক্ষা করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের মূল সূত্র ব্যাখ্যা করিয়া গৃহস্থগণকে তিনি আয়ুর্ব্বেদ সম্মত চিকিৎসার পক্ষ হইবার উপদেশ দিতেছেন। যাহা তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা হিন্দু মাত্রেরই অনুমোদিত, আয়ুর্ব্বেদ সম্মত চিকিৎসা এদেশের পক্ষে যথার্থ উপযোগী সকলেই ইহা স্বীকার করেন, সে বিষয়ে মতভেদ নাই। কবিরাজ পার্ব্বতীচরণ ভিন্ন ভিন্ন রোগের ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ব্যবস্থা ও নিয়মিতরূপে চিকিৎসাকরণের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া এই পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছেন। গৃহস্থচিকিৎসা প্রকৃত পক্ষে কার্য্যে পরিণত হইলে গৃহস্থলোকের উপকার হইবে, কবিরাজ পার্ব্বতীচরণ এইরূপ আশা করেন, আমরাও আশাকরি তাঁহার আশা ফলবতী হউক।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। ১৩২১ সাল, কার্ত্তিক। ৭ম সংখ্যা।

জিঃ পেন বা জাপান দেশ।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

চীনবাসীরা জাপানকে " জিঃ পেন " বলে। জিঃ পেন হইতেই জাপান নামের উৎপত্তি। ইহার অপর নাম "নিপন"। এই দুই শব্দেরই অর্থ বালার্ক প্রদেশ। কতিপয় দ্বীপ লইয়া এই সাম্রাজ্যটী গঠিত। এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। ইহাকে পৃথিবীর প্রমোদ উদ্যান বলিলেও অত্যুক্ত হয় না। ইংরাজ কবি স্যার এড্উইন্ আরনোল্ড ইহার সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্য দেখিয়া একান্ত বিমোহিত হইয়াছিলেন। অনুমান ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপীয়গণ মার্কপোলো নামক একজন ভিনিশীয় পর্য্যটকের নিকট জাপানের ইতিবৃত্ত জানিতে পারেন। মার্কপোলের মতে তখনও জাপান বাসীরা অসভ্য ছিল না। জাপান পৃথিবীর মধ্যে একটী প্রাচীন রাজ্য;

এখানে আড়াই হাজার বৎসরের লিখিত ইতিহাস অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থান পর্ব্বতময়। এখানে অনেক আগ্নের গিরি আছে। বৎসরের মধ্যে চারি পাঁচ সাতবার অল্পাধিক ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এতদ্দেশে একবার অষ্টাদশ দিবসব্যাপী ভূকম্পন হইয়াছিল। আমাদের দেশের লোক যেমন মনে করে বাসুকীর ফণার উপর বসুমতী রহিয়াছেন, বাসুকীর মাথা নড়িলেই মেদিনী কম্পিতা হয়েন, ইহারাও তেমনি মনে করে, এক বৃহদাকার মৎস্য এই ভূভার ধারণ করিয়া আছেন। মৎস্যরাজ একটু নড়িয়া উঠিলেই ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। এদেশে উষ্ণ প্রস্রবণের অভাব নাই। ঐসকল প্রস্রবণের জল বিবিধ রোগনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেক জাপ-রোগী চিকিৎসকের উপদেশানুসারে প্রস্রবণবারি স্নান ও পানের জন্য ব্যবহার করে।

গত ৫০ বৎসরের মধ্যে রণতরী কল কারখানা, রেলপথাদি নির্ম্মাণে, বিজ্ঞানানুশীলনে, যুদ্ধবিদ্যায় ও স্বরাজ্যে শান্তি সংরক্ষা বিষয়ে এই জাতি এতাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, জগতের সুসভ্য জাতি মাত্রেই অল্প বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। অধুনা অনেক ছাত্র দেশ বিদেশ হইতে শিক্ষা লাভের জন্য জাপানে যাইতেছে। জাপানীরা অনেক প্রকার শিল্পকর্ম্ম করিয়া থাকে। হস্তশিল্পের প্রাদুর্ভাব এখনে যথেষ্ট। কৌষেয় ও কার্পাসজাত শিল্পে ইহারা জগদ্বিখ্যাত। এদেশের কার্পেট, ছত্র, মাদুর, রেশমীবস্ত্র, কর্পূর মৃণ্ময়পাত্র, প্রভৃতি সামগ্রী পৃথিবীর নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

এই পর্ব্বতময় দেশে কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ অল্প। তবে যেটুকু আছে তাহাতে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহাই প্রচুর। ধান্য, গোধুম, যব, তামাক, আলু, চা, কর্পূর প্রভৃতি এখানে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। এই রাজ্যে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার নির্য্যাসে উৎকৃষ্ট বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। এখানে গ্রাম্য বা বন্যজন্তু অধিক নাই। স্থানে স্থানে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতির খনি আছে।

জাপানের শাসনপ্রণালী অনেকটা বিলাতের ন্যায়। রাজ্যে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ আদালত সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজধানী টোকিও সহরের হাই-কোর্টই রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ। এখানে দেওয়ানি ও ফৌজদারি

এই মিকাডো বংশ অতি প্রাচীন। খৃষ্ট জন্মিবার ৬৬০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই বংশ চলিয়া আসিতেছে। জাপানীরা মনে করে তাহাদের রাজবংশের আদি পুরুষ দেবতা ছিলেন। রাজ্যপরিচালনের জন্য এদেশে পার্লামেণ্টের ন্যায় মন্ত্রিসভা আছে। মন্ত্রীবর্গ নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

জাপানদেশের লোক খর্ব্বাকৃতি। ইহাদের দেহ খুব সুদৃঢ়। "যুযুৎসু" নামক এক প্রকার ব্যায়াম করিয়া ইহারা শরীরকে সুগঠিত করে। জাপানী স্ত্রীলোকেরা বেশ সুশ্রী; কিন্তু বিবাহের পর দন্ত কৃষ্ণবর্ণাক্ত ও ভ্রূ লোমশূন্য করিয়া বিশ্রী হইয়া যায়। জাপানবাসীর পরিচ্ছদাদি অনেকটা পাশ্চাত্য ধরণের, তবে ইহারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া শোকচিহ্ন প্রকাশ করে।

শিক্ষাবিভাগে জাপান গভর্ণমেণ্ট অনেক টাকা ব্যয় করেন। দেশবাসী সকলেই ৬ হইতে ১০ বৎসরের বালক বালিকা পাঠশালায় পাঠাইতে বাধ্য। এখানে চিকিৎসা, শিল্প, সঙ্গীত, কৃষি, স্থপতিবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কলেজ আছে। জাপানীদের বর্ণমালার মধ্যে সাতচল্লিশটী অক্ষর। শুনিয়াছি এখানে স্ত্রী ও পুরুষ নাকি সতন্ত্র অক্ষর ব্যবহার করে। জাপানের ভাষায় ছোট বড় সকল প্রকার কথাই আছে। এইস্থানে দুই চারিটীর নমুনা দিতেছি। আমি—"ওয়াতাকুশী"; আমরা—"ওয়াতাকুশী দামো"; এক—"হিতোৎসু"; দশ—"তো"; সহস্র—"সেন", অযুত—"মান"; চিত্র—"এ"; থালা—"সারা"; কলসী—"মিদজুসাশী; চেয়ার—"ইসু"; কাগজ—"কামি"; কলম—"পেন"; মসি—"ইঙ্কি"; স্বর্ণ—"কিন" রৌপ্য—"গিন্"; সূর্য্য—"হি"; প্রাতঃকাল—"আবা"।

জাপানে ক্রীড়া কৌতুক প্রচুর। এস্থান সঙ্গীতের স্বর্গপুরি। এখানে এক জাতীয় সঙ্গীত ব্যবসায়িনী আছে; তাহাদের সাধারণ নাম "গ্যেইসা"। কথাটা বোধ হয় সংস্কৃত গায়িকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। জাপানের আমোদালয়ে, ক্রীড়াভূমিতে, কাফি-গৃহে, "গ্যেইসার" নৃত্য গীতাদি প্রায়ই হইয়া থাকে। "গ্যেইসাগণ" রূপগুণানুসারে উপাধি পাইয়া থাকে। সে সকল উপাধি বেশ শ্রুতিমধুর। কেহ উপাধি পাইলেন, "আঙ্গুর বালা" কেহ বা উপাধি পাইলেন, "শিশির বিন্দু" ইত্যাদি। যতদিন "গ্যেইয়াগণ" উপাধিভূষিতা না হয়, ততদিন জাপানীরা তাহাকে "হান্-জকু" বলে। "হান্-জকু" শব্দের অর্থ অর্দ্ধ মাণিক। নৃত্যগীতাদির পর "গ্যেইসাকে" যে অর্থ প্রদত্ত হয় তাহা

করিতে হয়। গেইসাগণ, ঐ "হান্থ" পাইয়া "ছায়ো নারা" (Good night) বলিয়া চলিয়া যায়। এদেশে "জন্‌কিনো" নামে এক প্রকার নৃত্য প্রচলিত আছে। বোধহয় এমন অদ্ভুত, নৃত্য পৃথিবীর আর কোন সভ্যদেশে নাই। একজন স্ত্রীলোক বসিয়া সেতার বাজাইতে থাকে, নৃত্যকারিণীগণ তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া নৃত্যকরে।

জাপানীরা আমাদের ন্যায় ভাত মাছ খাইয়া থাকে। একহাতে ভোজন পাত্র রাখিয়া অপর হস্তস্থিত দুইটী কাটির সাহায্যে ইহারা আহার করে। জাপানে তাম্রকুটের দ্বারা আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিবার রীতি আছে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজেরা এরাজ্যে সর্ব্ব প্রথমে তামাক আনয়ন করে; কিন্তু তৎকালীন মিকাডোর আদেশে উহার ব্যবহার নিবারিত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজাদেশে এই নেশার সামগ্রীটী সুসভ্য জাপানদেশে প্রচলিত হইয়াছে।

এরাজ্যে ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যা খুব অল্প। টোকিও সহরে দুই পাঁচ খানি অশ্বযান আছে মাত্র। তবে এখানে রেল ও ট্রাম গাড়ীর অভাব নাই। বড় বড় সহরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ট্রাম লাইন। অল্প ব্যয় ও সময়ে ট্রামে চড়িয়া লোক সহরের মধ্যে যাতায়াত করে। এখানে ইতর ভদ্র সকলেই ট্রামে উঠিয়া থাকে। জাপানী ধনী সম্প্রদায় দরিদ্রকে ঘৃণা করে না। একজন উচ্চ বংশোদ্ভব ব্যক্তি কুলি মজুরের সহিত অক্লেশে এক গাড়ীতে বসিয়া যাইতে পারে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্ব প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম খুলিয়াছিল। এখন সকল প্রধান প্রধান সহরেই বৈদ্যুতিক ট্রামের প্রচলন হইয়াছে। ঐ সকল ট্রাম গাড়ীর চালক ও টিকেট-বিক্রেতারা অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্টাচারী। বৃদ্ধ বা বিকলাঙ্গ লোকদিগকে তাহারা বিশেষ সাহায্য করে। টিকেট-বিক্রেতা কখন আরোহীর নিকট আসিয়া "টিকেট লউন মহাশয়"—একথা বলেনা। তাহারা কেবল দরজায় দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে বলিবে—"কিপ্প নাই কাতা গোজাই মাছেনকা?" অর্থাৎ টিকেট খরিদ করেন নাই এমন কোন মহাশয় ব্যক্তি এ গাড়ীতে আছেন কি? জাপানে রেল গাড়ীরও ছড়াছড়ি। ঐ সকল গাড়ীতে তিনটী শ্রেণী আছে। প্রত্যেক গাড়ীতে পাইখানা এবং প্রতি ট্রেনে একটী ভোজনাগার থাকে। গাড়ীতে একজন করিয়া "বয়" রক্ষিত হয়। যাত্রীদের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখাই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সময়ে সময়ে "বয়" আসিয়া ব্রুস লইয়া আরোহীদের হ্যাট্, কোট্, বুট্, পরিষ্কার করিয়া দিয়া থাকে।

জাপানীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এখন অনেকে নানা দেবদেবীর আরাধনাও করে। "জিজো" এখানকার ষষ্ঠীঠাকুরাণী। তবে তিনি পুরুষ মানুষ। য়ুকোহামা নগরের নিকট এক পর্ব্বতে "জিজো" মন্দির আছে। অকাল মৃত বালক বালিকাগণ তাঁহার মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে সমাহিত হয়। জাপানীরা মনে করে নিশাকালে ঐ সকল মৃতশিশু কবর হইতে উঠিয়া "জিজোর" সহিত ক্রীড়া করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ত্রিশ দিনের দিন ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। তখন মাতা সবান্ধবে শিশুকে লইয়া দেব মন্দিরে গমন করে। তথায় মুণ্ডিত মস্তক পুরোহিত ঠাকুর রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতার নিকট শিশুর মঙ্গল প্রার্থনা করেন।

জাপানে শিশুর বড়ই আদর। শিশু জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার জন্ত উত্তম উত্তম পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইতে থাকে। পুত্র হইলে নীলবর্ণের এবং কন্যা হইলে গোলাপি বর্ণের পরিচ্ছদ আবশ্যক হয়। জাপ বালক বালিকাদের নামকরণের সময় মহা ধূমধাম পড়িয়া যায়। পুত্রের নাম "ইচিরো" অর্থাৎ প্রথম; টৌশিও অর্থাৎ চতুর; ইবাও অর্থাৎ বলবান; ইসামু অর্থাৎ প্রতাপশালী ইত্যাদি হইয়া থাকে। কন্যার নাম "হানা" অর্থাৎ কুসুম; "য়ুকি" অর্থাৎ তুষার ইত্যাদি রক্ষিত হয়।

আমাদের দেশে যেমন—"তিষ্ঠেৎ পিত্রোর্বশে বাল্যে, ভর্ত্তুঃ সম্প্রাপ্ত যৌবনে; বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং; ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ ক্বচিৎ"—জাপানেও সেইরূপ স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার অধীনতায়, যৌবনে ভর্ত্তার অধীনতায় এবং বার্দ্ধক্যাবস্থায় পুত্রের অধীনতায় অবস্থান করে। জাপানের সকল সম্প্রদায়ের লোকেই পিতৃপুরুষের পূজা করিয়া থাকে। গৃহে গৃহে পিতৃপুরুষপূজার ঘর বা মন্দির আছে। এই উন্নত দেশের লোক ভূত, প্রেত, দানব, দৈত্যের কথাও অমান্ত করে না। এখানে "কান মাইরি" নামক একটী চমৎকার পদ্ধতি আছে। জানুয়ারি মাসের দুরন্ত শীতে একখণ্ড বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া এবং কোমরে একটী ঘাটা বাঁধিয়া নগ্নপদে বহু জাপানী দেবালয় ভ্রমণ করিয়া থাকে। প্রতি দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইলেই তথাকার পুরোহিত একঘটী বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা জল উহাদের গাত্রে ঢালিয়া দেয়। এইরূপ বেগে দেবালয়ে স্নান করার নামই "কান মাইরি"। "কান মাইরি" করিলে দেবতা ও দুষ্ট গ্রহ তুষ্ট হইবেন বলিয়া জাপানীরা মনে করে।

আমাদের বর্ত্তমান যুবরাজ



প্রিন্স অব ওয়েলস্।

গ্রেট বৃটনাধিপতি ভারত-সম্রাট মহামান্য পঞ্চমজর্জ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স এড্ওয়ার্ড আল্বার্ট, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৫এ জুন তারিখে রাজ্ঞীমেরীর পিত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন; ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর যথা সময়ে বর্ত্তমান যুবরাজের জন্মদিন উপলক্ষে বিলাতের ওয়েষ্ট মিন্ষ্টার প্রাসাদে "প্রিন্স অব ওয়েলস্" উপাধি ধারণ করিয়া অভিষিক্ত হইয়াছেন; ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখে বিলাতে খাস্ ওয়েলস্ প্রদেশের কারণারভন প্রাসাদে সেই যৌবরাজ্যের অভিষেক মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ভীষণ সমরাঙ্গনে সৈনিকবেশে আমাদের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ ইংরাজের প্রধান সেনাপতি স্যারজন ফ্রেঞ্চের দেহরক্ষীরূপে সমরক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন; যুবরাজের বয়স এক্ষণে একবিংশতি বৎসর মাত্র।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে জনরব বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের শুভ পরিণয় সত্বরেই সুসম্পাদিত হইবে। বিবাহের প্রস্তাব নানাদিক হইতে আসিতেছে। গত দুই বৎসর পূর্ব্বে গুজব উঠিয়াছিল, বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাট কৈশারের একমাত্র কন্যা প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া লুইর সহিত যুবরাজ এড্ওয়ার্ডের বিবাহ হইবে, কিন্তু সে গুজব সত্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই; গত পূর্ব্ব মে মাসে প্রিন্স আর্নেষ্ট অব ব্রোন্স উইক কৈশার কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি জনশ্রুতি প্রচার করিতেছে, যুবরাজের বিবাহ হইবে বর্ত্তমান রুষ সম্রাট জারের কোন এক কন্যার সহিত, জারের কন্যা চারিটী,—জ্যেষ্ঠার বয়স উনবিংশ বর্ষ,—নাম গ্রাণ্ড ডাচেস ওল্গা। ইহাঁর বিবাহ সম্বন্ধ নাকি ইহাঁদের জনৈক আত্মীয় ভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউফ পাভলোভিচের সহিত স্থির হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, আমাদের যুবরাজের সহিত জারের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পূর্ব্বেও বহুবার হইয়াছিল, বোধ হয় এই যুদ্ধের সময় রুষ ও ইংলণ্ডের সৌহার্দ্দবন্ধন দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যেই এই নবোদ্বাহের সূচনা। অন্য একদল বলিতেছেন; জারের দ্বিতীয়া কন্যা গ্রাণ্ড ডাচেস্ টাটিয়ানাই ব্রিটিশ রাজ্যের রাজবধূরূপে নির্ব্বাচিতা হইবেন। ইনিই জার-দুহিতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, অষ্টাদশ বর্ষীয়া ও অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী, সুতরাং ইহাঁর নির্ব্বাচনই যেন বেশী সম্ভব বলিয়া মনে হয়। জারের অপর দুই কন্যা নাবালিকা—বয়স যথাক্রমে পনর ও তের বৎসর মাত্র। আমাদের যুবরাজ গত জুন মাসে বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। অনেকের লক্ষ্য রুষ রাজ্য ছাড়াইয়া রুমানিয়ার উপর নিবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, রুমানিয়ার নবীন রাজা কিং ফার্ডিনাণ্ডের উনবিংশ বর্ষীয়া যুবতী কন্যা প্রিন্সেস এলিজাবেথই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাবীরাজ্ঞী। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ বলেন, প্রতাপশালী ব্রিটিশ সম্রাট ক্ষুদ্র রুমানিয়ার সহিত বৈবাহিক সূত্রে কখনও আবদ্ধ হইবেন না। ইটালির রাজবংশের সহিত কুটম্বিতা স্থাপনের বাসনা ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণের হৃদয়ে বহুকাল যাবৎ জাগরূক রহিয়াছে; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর অভাবে এত দিন তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এবারও সে বাসনা পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ ইটালীর রাজকন্যা প্রিন্সেস্ জোলাণ্ডা এখনও ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করেন নাই। আর এক অবিবাহিতা রাজদুহিতা আছেন—গ্রীসের প্রিন্সেস্ হেলেন, কিন্তু রুমানিয়ার পক্ষেও যে আপত্তি, এখানেও ঠিক সেই প্রতিবন্ধক বিদ্যমান। কাজেই সকল

দিক বিচার করিয়া মনে হয়, রুষ-সম্রাটের মধ্যমা কন্যাই আমাদের নবীন যুবরাজের অঙ্কলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইবেন। কথাটা কিন্তু এখনও কানাঘুষায় শুনা যাইতেছে, পাকা হইলে আমরা স্বস্তি বাচন করিব।

বেদান্ত মতে বায়ুর নিরুক্তি।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীকাণুপ্রিয় গোস্বামী বিজ্ঞানতীর্থ।

আয়ুর্ব্বেদের মতে—

রস
রক্ত
মাংস
মেদ
অস্থি
মজ্জা
শুক্র ও শোণিত বা আর্ত্তব,

যেমন ধাতু, তেমনি বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মাও ধাতু। প্রথমোল্লিখিত সপ্ত ধাতু দেহ ধারণ করে বটে কিন্তু তাহারা দোষ নহে,—বরঞ্চ তাহারা দূষ্য শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা দোষ বলিয়া অভিহিত হয়, কেননা তাহাদিগের দ্বারা শরীর ধৃত হইলেও, তাহাদেরই জন্য শরীর দূষিত হয়। ফলতঃ শরীর দূষিত হইবার মূলে প্রধানতঃ বাত পিত্ত শ্লেষ্মা অবস্থিত, কেহ কেহ শোণিতকে চতুর্থ স্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। শরীর ধারণ করে বলিয়া তাহারা যেমন ধাতু শব্দ বাচ্য, শরীর দুষ্ট করে বলিয়া তাহারা দোষ বলিয়াও অভিহিত হয়। শাঙ্গধর বলেন,—তাহারা কেবল ধাতু ও দোষ নহে, শরীর মলিন করে বলিয়া তাহারা মল শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে।

যাহা শরীর ধারণ করে—তাহাতেই আবার কি করিয়া শরীর দূষিত বা মলিনীকৃত হয় তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যদিও কঠিন, কিন্তু যদি আমরা মনে করি, ধাতু, দোষ এবং মল প্রতীচ্য বিজ্ঞানে, যাহাকে Bioeogy, Pathology এবং Morbid Anatomy বলে, তাহারই যথাক্রমে আলোচ্য বিষয়, তাহা হইলে আমাদিগকে ত্রিধাতু এবং মল কি তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ চিন্তা-

কুলিত হইতে হয় না। প্রাণবিদ্যা বা আয়ুর্ব্বেদের মূল তত্ত্ব যাহা তাহা ধাতু স্বরূপ বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মারই ইতিহাস, সংপ্রাপ্তি বিজ্ঞানে ইহারা ত্রিদোষ বলিয়া পরিগৃহীত, এবং বিশিষ্ট সংপ্রাপ্তি বিজ্ঞানে ইহারা মল স্বরূপ। জীব দেহের যত প্রকার ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে যদি শ্রেণীগত করা যায়, তাহা হইলে, আমরা দেখি, বংশোৎপত্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, তাহারা দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতীচ্য বিজ্ঞান, যাহাকে Cor-relative functions বলিয়াছেন, একটি তাহা, আর একটি Sustentative function, অর্থাৎ, শরীর তন্ত্রের যন্ত্র সকলের সমঞ্জসীকরণ ও সমস্ত চেষ্টার প্রবর্ত্তন এবং প্রাণন। প্রাণন বলিতে অন্নপানাদির দ্বারা সপ্তধাতুর পুষ্টি ও জীবন রক্ষা বুঝায়। পিত্ত শ্লেষ্মা উভয়ে মিশ্রিত হইয়া এই প্রাণন কার্য্যে সহায়তা করে, আর বায়ু দ্বারা শরীর যন্ত্র যথোপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। মহর্ষি আত্রেয় সেইজন্য বলিয়াছেন, বায়ু শরীর তন্ত্রের যন্ত্রধর।

"বায়ুস্তন্ত্র যন্ত্রধরঃ
প্রাণোদান সমানাপানব্যানাত্মা
প্রবর্ত্তকশ্চেষ্টানাং
নিয়ন্তা প্রণেতা চ মনসঃ

ইত্যাদি।

মহর্ষি আত্রেয় বায়ু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,—ইংরাজীতে তাহাকে ঠিক Cor-relative functions বলে। যদিও বায়ুর ক্রিয়ার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় মতে কোন প্রভেদ নাই কিন্তু, প্রতীচ্য বিজ্ঞান বলেন, তড়িৎ বা তড়িতের মত কোন শক্তি, মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড ও তন্নিঃসৃত নাড়ী পথে শারীরিক যাবতীয় যন্ত্রকে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত করে, মনেরও ইহা নিয়ন্তা ও প্রণেতা। প্রাচ্য বিজ্ঞান এই শক্তিকে "বায়ু" এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। বায়ু বলিতে আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি বলিবেন,—বায়ু আর তড়িৎ শক্তি এক। আমরা সাধারণতঃ জানি ও বিশ্বাস করি, বায়ু,—নিশ্বাস প্রশ্বাসের বায়ু বা Atmospheric air। ইংরাজী অভিধানে বায়ু Wind বলিয়া অনূদিত। প্রতীচ্য বিজ্ঞান একেবারেই স্বীকার করেন না, যে মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডের নাড়ী সকলের ভিতর বাতাস বিদ্যমান থাকিয়া তাহাদিগকে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করে। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বলেন, ইহা ঠিক তড়িৎ না হইলেও তড়িতানুরূপ কোন শক্তি।

সম্প্রতি খ্যাতনামা প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের অনেকে বলিতেছেন কেবল যে নাড়ী

পথে ও তড়িতের সহায়তায় এই সমঞ্জসীকরণ সম্পাদিত হয় তাহা নহে,— স্থান বিশেষে আমরা এই সমঞ্জসীকরণের মূলে এমন একটি শক্তির অবস্থান উপলব্ধি করি, যাহার সহিত তুলনায় তড়িৎ শক্তি স্থূল বলিয়া মনে হয়।

প্রতীচ্য বিজ্ঞানের এই অভিনব আবিষ্কারের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আমরা বলিতে বাধ্য যে জীবদেহে, যে শক্তি সমঞ্জসীকরণে নিয়োজিত তাহা—

বাতাস নহে,
তাহা, সর্ব্বত্র তড়িৎ নহে,
তাহা তড়িৎ হইতেও কোন সূক্ষ্ম সত্বা।

কিন্তু সেই সূক্ষ্ম সত্বার স্বরূপ কি, তাহা তাঁহারা এখনও সম্যক নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহা ইথারীয় শক্তি বা ইথার।

অধ্যাপক অসবর্ণ রেনল্ডস বলেন,—

We are all waves. Every kind and form of matter is a Phenomenon of the all embracing ether. Life itself is simply a resultant of wave motion in this universal fiuid.

আমরা যদি এখন আমাদিগের সর্ব্ব চেষ্টার প্রবর্ত্তক, শরীর তন্ত্রযন্ত্রধর, মনের প্রণেতা ও নিয়ন্তা—বায়ুর স্বরূপ নির্দ্ধারণে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা অতি অল্পেই দেখিতে পাই বায়ু Atmospheric air বা Wind নহে,—

বায়ু তড়িৎস্তশ্চোত্তমদ্যুতিঃ।
বায়ু রাকাশেনানন্তঃ,

এবং বায়ুতেই—

পরিম্রিয়ন্তে পঞ্চ দেবতাঃ
বৃষ্টিবিদ্যুৎচন্দ্রমা
আদিত্যোঽগ্নিরিত্যেতাঃ

সর্ব্বনিখিল দেবতা যাহাদিগের তুল্য, বহুরূপে অভিব্যক্ত হইলেও ;

যাহারা ইতরেতরজন্মা এবং ইতরেরতর প্রকৃতি সম্পন্ন—
"অগ্নিরাদিত্য চন্দ্রমাবিদ্যুদ্রূপাঃ সর্ব্বনিখিল দেবতা।
ইতরেতর জন্মানৌ ভবন্তি ইতরেতর প্রকৃতয়ঃ॥

ইংরাজীতে যাহাকে "Store house of energy বলে, এক কথায় বায়ু তাহাই। প্রতীচ্য বিজ্ঞান যেমন অভ্রান্ত ভাবে স্থির করিয়াছেন,—

heat, light, electricity, motion সমস্তই Cor-relative functions. ইথার হইতে সমুৎপন্ন ; যেমন বলিয়াছেন,—

Every change in the wored simply couswts in a variation in the moae of appearance of this store of energy.

সেইরূপ, প্রাচ্য মহর্ষিগণও বায়ুকেই, আলোক উত্তাপ বিদ্যুৎ ও গতির চূড়ান্ত আশ্রয় বলিয়া অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। বায়ু যে সাধারণ বাতাস নহে, ইহা স্থূল, অল্প পরিসর, atmosairpheric air হইতেও যে সূক্ষ্ম এবং বিশ্বব্যাপি সত্তা তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

জননী আমার!

লেখক,—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত।

জননী আমার!
কি যে মধু মাখা নাম, নামে পূরে মনস্কাম,
ধরা হয় স্বর্গধাম, প্রসাদে তোমার;
মা তুমি সংসার লক্ষ্মী, জগতের সার!

তোমার কৃপায়—
জন্মভূমি হেরিয়াছি, বিশ্বছবি দেখিয়াছি,
মা বলিতে শিখিয়াছি, তোমারি কৃপায়,
কোটি কোটি প্রণিপাত মা তোমার পায়!

সন্তানের তরে—
যাতনা সহেছ কত, পূজিয়াছ অবিরত,
পার্ব্বতী পার্ব্বতিনাথ, পূর্ণ ভক্তি ভরে—
দেহ কালি করিয়াছ সন্তানের তরে!

কোথা তুমি এবে!
অষ্টবর্ষ হারায়েছি, শোকার্ণবে ভাসিতেছি,
সর্ব্ব শূণ্য হেরিতেছি, তাই ভেবে ভেবে,—
কাতরে জিজ্ঞাসা করি কোথা তুমি এবে!

কে দিবে উত্তর!

মানবীত্ব গেছে দূরে, গেছ দেবী স্বর্গপুরে,
ভবধামে ঘুরে ঘুরে, আমরা কাতর,
এখানে জিজ্ঞাসি বৃথা, কে দিবে উত্তর?

চাহ একবার!

আছ স্বর্গে স্বর্গদেবী, উদ্দেশ্যে তোমারে সেবি,
এসে এসো দেখি দেবী, শ্রীপদ তোমার;—
স্বর্গ হতে ধরণীতে চাহ একবার!

কৃপার ভিখারী!

কৃপাদৃষ্টি বিতরণে, দেব ভক্তি দেহ মনে,
এ বিজন মরু বনে, বর্ষ শান্তি বারি,
আর কিছু নাহি চাহি, কৃপার ভিখারি!

তব শ্রীচরণে—

আছি পড়ে চিরদিন, বারিছাড়া যেন মীন,
দিন দিন তনুক্ষীণ, মা, মা, মা, মা উচ্চারণে!
বিহনে তোমার কোটি কোটি প্রণিপাত তব শ্রীচরণে।*

কার ভাগ্যে কে খায়?

আমাদের ভাষায় একটি "ভাগ্য" শব্দ আছে,—সাধারণ কথায় যাহাকে অদৃষ্ট বলে, তাহাই ভাগ্য। আমাদের দেশের সমস্ত লোক অজ্ঞ বিজ্ঞ নির্ব্বিশেষে অদৃষ্টবাদী। যে সকল দেশে নূতন সভ্যতা প্রবেশ করিতে-ছিল, সেই সকল দেশের নূতন সভ্যেরা প্রথম প্রথম ভাগ্য মানিতেন না, "অদৃষ্ট" কথা শুনিলেই হাস্য করিতেন, এখন ক্রমে ক্রমে অভিধান দেখিয়া এবং মহাবীর নেপোলিয়নের জীবনী পাঠ করিয়া পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিতেছেন। বাস্তবিক ভাগ্য এবং ভাগ্যফল যে নিখাত সত্য, যাহাকে

* বিগত ১৩১৪ সাল, ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার মধ্যাহ্ন বেলা ১২টা ১০ মিঃ সময় পরমারাধ্য পরমপূজনীয়া স্নেহময়ী জননী আমাদিগকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ৮ম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লিখিত, লেখক।

সাধারণ লোকে বিধিলিপি বলে, যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহার উপর অলীকত্ব আরোপ করা মূঢ়তা মাত্র। ফলতঃ ভাগ্যফল মানব জীবনে অখণ্ডনীয় প্রমাণ। গল্পচ্ছলে আজ একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে; পাঠক মহাশয়েরা এতৎ পাঠে সংসার ধর্ম্মের অনেক সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

একখানি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রামে একজন প্রচুর ধনশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন, তাঁহার দুটি পুত্র এবং পাঁচটী কন্যা; তন্মধ্যে চারিটি কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, কনিষ্ঠাটি অনূঢ়া,—বয়স নবম বর্ষ। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বঙ্গের বনিয়াদী বড় লোকেরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিয়া জামাই গুলিকে "ঘর জামাই" রাখিতেন, এখনও সহরে ও পল্লীগ্রামে দু একজন বনিয়াদী ধনবানের গৃহে ঘর জামাই রাখিবার প্রথা আছে। যে ভূম্যধিকারীর কথা আমরা বলিতেছি, গৌরব বাড়াইবার জন্য তিনি চারিটি জামাইকে ঘর জামাই রাখিয়াছিলেন। যথা সময়ে তাঁহার পুত্রবধূরা ও সধবা কন্যারা পুত্রকন্যা প্রসব করিতে থাকেন;—পৌত্র পৌত্রী এবং দৌহিত্র দৌহিত্রী গণনায় সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটি সমুৎপন্ন হয়। কর্ত্তাটি স্বভাবতঃ দাম্ভিক, এতগুলি প্রাণীর প্রতিপালক আমি, এই অহঙ্কার তাঁহার মনে মনে জাগে। কেবল মনে মনে জাগা নয়, বুক ফুলাইয়া, মুখ রাঙ্গাইয়া, স্বগর্ব্বে শ্লাঘা করিয়া লোকের কাছেও মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "আমিই যেন এ দুনিয়ার মালিক,—আমার তুল্য বড় লোক আর কে?—আমাকে কত পরিবার পোষণ করিতে হয়, তাহা কি তোমরা জান?—এই ধর—আমি আর আমার গিন্নি, এই হইল দুই;—তার পর ধর আমার দুই পুত্র ও দুই পুত্রবধূ, এই হইল ছয়,—তারপর ধর পাঁচটি কন্যা, এবং চারটী ঘর জামাই,—এই হইল পঞ্চদশ,—তারপর ধর নাতি নাতনি দ্বাদশটি;—সমষ্টি ধর সপ্তবিংশতি। এই সপ্তবিংশত জীবের আহার যোগাই আমি একা,—আমি কি একজন কম লোক?"

জমিদার মহাশয়ের এইরূপ দম্ভ, এইরূপ আত্মশ্লাঘা, এইরূপ অহঙ্কার। একদিন তিনি অপরাহ্নে অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত পরিবারগুলিকে ডাকাইয়া কাছে বসাইয়া বারাণ্ডা আলো করিলেন। মেয়েরা ত অন্দর মহলে থাকিবেই, তাঁহার সঙ্গে যোগ্য যোগ্য দুই পুত্র, যোগ্য যোগ্য চারিটি ঘর জামাই। ভুঁড়ি নাচাইয়া নাচাইয়া, মৃদু মৃদু হাসিয়া, কর্ত্তা প্রথমে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কও গিন্নি, কার ভাগ্যে তুমি খাও?"—গৃহিণী উত্তর করিলেন, "একথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?—তুমিই সংসারের

কর্ত্তা, তোমারি সর্ব্বস্ব, তোমারি ঘর বাড়ী, তোমারি জমিদারি—তোমারি সব টাকা, তোমারি পোষ্য আমরা সবাই, তোমারি ভাগ্যে অন্ন বস্ত্র পাইয়া আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি, ইহার উপর আবার কেন নূতন প্রশ্ন? আমি আবার কার ভাগ্যে খাইব?—তোমারি ভাগ্যে আমি খাই।"

গৃহিণীর উত্তর শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, আরও অধিক গর্ব্বিত বচনে কর্ত্তামহাশয় একে একে পুত্র দুটিকে, বধূ দুটিকে, কন্যা চারিটিকে, জামাই চারিটীকে এবং নাতি নাত্নি গুলিকে ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহিণীর মুখে যেরূপ উত্তর পাইলেন, তাঁহাদের সকলের মুখেও ঠিক সেইরূপ প্রতিধ্বনি।

জমিদার মহাশয় এই সময় ঠিক যেন দুনিয়াদারির মালিক!—অহঙ্কারের তেজে তাঁহার স্থূলদেহ আরও যেন ফুলিতে লাগিল। মনোরঞ্জন ইতিহাসে লেখা আছে, চতুষ্পদ ভেক যেমন চতুষ্পদ হস্তির ন্যায় দেহ বাড়াইবার লোভে নিশ্বাসে নিশ্বাসে ফুলিয়া গাত্রচর্ম্ম ফাটাইয়া যোগ্য ধামে প্রয়াণ করিয়াছিল, এই পুষ্টাঙ্গ জমিদারটিরও সেই ক্ষেত্রে সেইরূপ দশা হইত, পরমায়ু বেশী ছিল বলিয়া ভুঁড়ির চর্ম্ম ফাটিল না!

কর্ত্তার কনিষ্ঠা কন্যাটির নাম লীলাবতী;—আহ্লাদে ফুলিতে ফুলিতে কর্ত্তা মহাশয় অন্দর হইতে সদর মহলে যাইতেছিলেন, মাঝের দরজার সিঁড়ির চাতালের উপর বসিয়া সেই নবম বর্ষীয়া অবিবাহিতা কুমারী লীলাবতী একাকিনী ঘুটীখেলা করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাচ্ছিল্য ভাবে চলতি মুখে কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন, "কিরে লিলি! তোকে চালায় কে?—কার ভাগ্যে তুই খাস্?"

হাতের ঘুঁটী হাতেই রাখিয়া, উর্দ্ধনেত্রে পিতার মুখপানে চাহিয়া, লীলাবতী উত্তর করিল, "কেন বাবা, আমার কি ভাগ্য নাই?—নিজের ভাগ্যে আমি নিজে খাই। পরের ভাগ্যের দাসী আমি কেন হব?"

দাম্ভিক পিতার অন্তর্জ্জাত ক্রোধ অকস্মাৎ সীমা ছাপাইয়া উঠিল; ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিল। পায়ে খড়ম ছিল, কন্যার দিকে কট্মট্ চক্ষে চাহিতে চাহিতে, খুব জোরে খটাখট্ শব্দে খড়ম ঠুকিতে ঠুকিতে ক্রোধে কম্পিত বীরেন্দ্র পুরুষ সদর মহলে উপস্থিত হইলেন, পূজার দালানে এক খানা অর্দ্ধ ভগ্ন চৌকি পাতাছিল, সেই চৌকির উপর গিয়া বসিলেন;—মুখখানা রাঙা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটিও রাঙা;—স্বগতঃ বাক্যে সংকল্প করিলেন,

"উঃ! এতবড় আস্পর্দ্ধা!—সকলের সাম্‌নে আমাকে অপমান! আপনার ভাগ্যে আপনি খায়?—ভাগ্য এইবার দেখাব!—অমন মেয়ের মুখ আর আমি দেখিব না!—আজ রাত্রেই বাড়ী থেকে তাড়াবো।"

জমীদার মহাশয়ের নাম নরসিংহদুলাল রায়চৌধুরী। তাঁহার সংকল্প স্থির হইল, সংকল্পানুসারে কার্য্য হওয়াটি কেবল বাকি রহিল। আধার বিশেষে টাকার প্রকৃতি দুই প্রকার। বেশী টাকা হইলে কোন কোন লোকের মায়া মমতা বৃদ্ধি পায়, কোন কোন লোকের মায়া মমতা উড়িয়া যায়, নৃসংশতা আসিয়া সেই স্থান অধিকার করে। মায়া মমতা শূন্য নরসিংহ রায় চৌধুরী এই রাত্রেই কুমারী কন্যাকে তাড়াইবেন, মনে মনে ইহাই তাঁহার কল্পনা।

সূর্য্য দেবের অস্তগমনে তথনও প্রায় চারি দণ্ড বিলম্ব ছিল. সেই সময় টুকুর মধ্যে মেয়ে তাড়াইবার যোগাড় যন্ত্র সব ঠিক করিয়া লওয়া দুলাল পিতার পূর্ণ ইচ্ছা। বাড়ীর নিকটস্থ আম বাগানে সেকেলে ধরণের এক খানা ছক্কর গাড়ী ছিল, সেই গাড়ী খানাতে একজোড়া বেটো ঘোড়া জুতিবার জন্য গাড়োয়ানের প্রতি হুকুম, যেখানে লইয়া যাইতে হইবে, তাহা-রও উপদেশ। কর্ত্তার মুথ দেখিয়া ও গলার আওয়াজ শুনিয়া গাড়োয়ান বুঝিল বাবুর মহারাগ।

রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দিনমণি ক্রমে ক্রমে পশ্চিম সাগরে ডুবিলেন, বাবু নরসিংহদুলাল ঠিক সেই সময় দুইজন দাসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দাসীরা আসিয়া হাজির হইলে কর্ত্তা তাহাদিগকে বলিলেন, "অন্ধকার হইতে হইতেই তোদের লীলাবতীকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া অমুক জায়গার বড় জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আস্‌বি। গাড়ী প্রস্তুত আছে। এইবেলা মেয়েটাকে নিয়ে আয়;—তাকে বলিস্ অমুক যায়গায় আজ সন্ধ্যার পর ভারি মেলা,—অনেক রকম নাচ তামাসা, হাতির নাচ, ঘোড়ার নাচ, জলপাইগুড়ির বানরের নাচ,—আর কত যে কি, সে সব আর মুখে বলবার নয়, চক্ষে না দেখ্‌লে বুঝান যায় না। এইসব কথা তাকে বলিস্,—বুঝ্‌লি!—আমার মত আছে, সে কথাও তাকে বলিস্। যা,—এইবেলা যা,—মেয়েটাকে নিয়ে আয়;—আমার কাছে আনিস্‌ নি,—আম বাগানের কাছে গাড়ী আছে—হু—হু—হু—বুঝ্‌লি ?"—"বুঝেছি"!—বিষণ্ণ বদনে এই উত্তর দিয়া দাসীরা বাড়ীর ভিতরে গেল।

ধন্য বাবু নরসিংহদুলাল রায়!—খুব বাহাদুর তুমি!—সময়টা নির্ণয়

করিয়াছ বেশ।—সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত গোধূলি সময়!—এই সময়েই মেয়ে তাড়াইবার যথার্থ উপযুক্ত কাল!

যথার্থই গোধূলি।—দাসীরা লীলাবতীকে আনিয়া গাড়ীতে তুলিল, ঘোড়ারা হাঁপাইতে হাঁপাইতে যথাশক্তি ছুটিয়া, ঝনঝন ধ্বনিতে গাড়ীখানা সেই বড় জঙ্গলে লইয়া গেল, লীলাবতী সেই বনে ঘুমাইয়া পড়িল, গাড়ী লইয়া দাসীরা মনিব বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

নিদ্রাভঙ্গে দাসীদের দেখিতে না পাইয়া লীলাবতী বিপদে পড়িল;—যেদিকে চাহে, সেই দিকে বন,—বালিকা তখন মনে মনে বুঝিল, বাপের মনের মত কথা হয় নাই বলিয়া তাহার এই বনবাস! ইহা ত বুঝিল, কিন্তু এই রাত্রিকালে যায় কোথা?—অন্য ভাবনা দূরে গেল, ভয়াতুরা বালিকার মনের ভিতর তখন কেবল সেই ভাবনা। নিজের ভাগ্যে যাহার বিশ্বাস, বিধাতা তাহার প্রতি সদয়, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।—লীলাবতীর ভয় ভাবনা দূর হইবার একটা উপায় হইল। বন মধ্যে একটা বহু প্রাচীন বট বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষের শাখা লম্বিত ঝুরিতে আর মূলদেশের ঋজু বক্র বড় বড় শিকড়ে সংযুক্ত হইয়া মনি ঋষিদের আশ্রমগুহার মত ক্ষুদ্র একটি আশ্রম হইয়াছিল, যেন একটি গরীব লোকের শয়ন ঘর;—অসহায়িনী বালিকা সেই রাত্রে উপবাস করিয়া সেই ঘরে আশ্রয় লইল; বাহিরে থাকিলে ব্যাঘ্র হয়ত ভল্লুকে খাইয়া ফেলিত, সে ভয়টা ঘুচিল।

বৃক্ষের ফলমূল খাইয়া এবং নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া, লীলাবতী সেই বনে সেই বৃক্ষমূলের আশ্রমে প্রায় তিন বৎসর কাটাইল। দৈব যোগে একদিন সেই বনমধ্যে এক রাজপুত্র মৃগয়া করিতে উপস্থিত হন; লীলাবতী তখন বাহিরে এক তরুতলে ছিল, বনের ভিতর শীকারী বেশী অনেক লোক দেখিয়া, ভয়ে পলাইয়া নিজের সেই গুহামধ্যে গিয়া লুকাইল।

লীলাবতী যখন ছুটিয়া পলায়, সেই সময় তাহার রূপের দিকে রাজপুত্রের নজর পড়িয়াছিল। পরমা সুন্দরী বালিকা। মনে মনে তিনি তর্ক করিতে লাগিলেন, কে এই সুরূপসী বনবালা?—রূপে যেন স্বর্গের সুরবালা।—না, না,—সুরবালা কেন এ বনে আসিবে!—হয়ত কোন বনদেবীর স্নেহলতা। তাহা যদি না হয়, তবে কি?—বোধ হয় কোন নিশাচরীর মায়া।—না,—বিজন বনে রাক্ষসীরা মায়া করিয়া বেড়ায় না। রাক্ষসী যদি না হয়,

তবে কি ?—হয়ত কোন ভৌতিক মায়া।—না,—ভুতের গল্পে যাহাদের বিশ্বাস আছে, অদ্ভুত অদ্ভুত ভুতের কীর্ত্তি যাহারা কীর্ত্তন করে, তাহারা বলে, দিনের বেলা ভূত বাহির হয় না। তবেই বুঝা গেল দেবতা নয়, রাক্ষস নয়, ভূতও নয়, আমাদের মত মানুষ। আহা! কি চমৎকার রূপ!—ঐরূপসীকে যদি হৃদয়ে রাখিতে পারি, তাহা হইলে নরজীবন সার্থক মনে করি।

যে পথ দিয়া যে দিকে লীলাবতী গিয়াছিল, শীকারী রাজকুমার সেই দিকটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন; অনুচরবর্গকে বিদায় করিয়া দিয়া তিনি একাকী ধীরে ধীরে সেই পথ ধরিয়া সেইদিকে চলিলেন; তরুগুহামধ্যে কন্যাটিকে দেখিলেন; কৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? বনের মাঝে কেন থাকো!—বনের ভিতর কেন বেড়াও!—আহা!—এমন রূপ, এমন লাবণ্য, এমন চক্ষু, এমন চাঁদের মতন মুখখানি, কেন তুমি এই তরুণ বয়সে সন্ন্যাসিনী সাজিয়া বনমধ্যে বাস কর—কে তুমি?"

লজ্জা ভয় দূরে রাখিয়া লীলাবতী উত্তর করিল, "কে আমি, সে পরিচয় আমি দিব না,—কোথা হইতে আসিয়াছি, সে কথাও বলিব না—বনের মাঝে থাকি, কেবল এই কথাই বলিব;—বনে আমার রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই, সেই জন্যই মানুষ দেখিলে ভয়ে ছুটিয়া পালাই। এই ত শুনিলে আমার পরিচয়, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেন অত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ—কে তুমি?"

রাজপুত্র কহিলেন, "আমি এরাজ্যের রাজকুমার;—তোমার রূপ দেখিয়া আমি একান্ত বিমোহিত হইয়াছি; তোমাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; রাজ্যেশ্বরের পুত্রবধূ হইতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

লীলাবতী বলিল, "তুমি রাজকুমার!—আমারও ঐরকম কুলে জন্ম, আমি রাজার মেয়ে নই, কিন্তু আমার পিতার ঐশ্বর্য্য ছিল রাজার মতন। তুমি রাজকুমার তোমার রূপও রাজাদের মতন, তোমাকে বিবাহ করিতে একান্ত কোন আপত্তি নাই, তবে অগ্রে অঙ্গীকার কর আমার তিনটী প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিবে তবেই আমাকে—প্রার্থনা কি কি, তাহাও বলিয়া রাখি। এই বন কাটাইয়া নগর বসাইবে, সেই নগরী মধ্যে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেই মন্দিরে মা অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে। এই হইল দুটি প্রার্থনা, তৃতীয় প্রার্থনা এই যে, এই জঙ্গলের চারিদিকে চারি ক্রোশের

মধ্যে একটিও জলাশয় নাই, যাহারা এ অঞ্চলে বাসকরে, নিরন্তর তাহাদের জলকষ্ট ;—সেই কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত নূতন নগরী মধ্যে বৃহৎ একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিবে।"

রাজপুত্র বলিলেন, "আচ্ছা, অঙ্গীকার করিলাম। বিবাহের পুর্ব্বে না পারি, বিবাহের পর যথা সময়ে নিশ্চয়ই আমি ঐ তিন কার্য্য সিদ্ধ করিব।"

লীলাবতীর বয়স তখন দ্বাদশ বৎসর। রাজপুত্রের সহিত লীলাবতীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির। অজ্ঞাত কুলশীলা বলিয়া পিতা যদি এ বিবাহে সম্মতি না দেন, এই চিন্তা মনে আসাতে রাজপুত্র গান্ধর্ব্ববিধানে সেই রাত্রে সেই বন মধ্যেই লীলাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

বনমধ্যে পুত্রের বিবাহ হইয়াছে, রাজা সে সংবাদ জানিতে পারিলেন না; রাজবাড়ী হইতে দুইক্রোশ দূরে স্বতন্ত্র একখানি বাড়ীতে রাজপুত্র সঙ্গোপনে লীলাবতীকে আনিয়া রাখিলেন। আরও তিন বৎসর অতীত, চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভেই রাজা গতাসু হইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, রাজপুত্র রাজা হইলেন, পিতার অতুল ধনের অধিকারী হইলেন, সেই নূতন রাজা। মনে রাখিবেন ইহারই সঙ্গে তিনবৎসর পূর্ব্বে লীলাবতীর বিবাহ হইয়াছে; লীলাবতীর বয়স এখন পঞ্চদশ বর্ষ। রাজপুত্রকে আর সেই অঙ্গীকার পালনের কথাটা দ্বিতীয়বার স্মরণ করাইয়া দিতে হইল না; পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসর গত হইলেই নূতন রাজা তাঁহার পূর্ব্বাঙ্গীকৃত তিনটি মহৎকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন; লীলাবতীর পরম হর্ষ; নূতন রাজা তাঁহাকে রমণীয় রাজপ্রাসাদে আনিয়া রাজরাণী করিলেন, লীলাবতী তখন পুর্ণ ষোড়শী।

বন কাটা হইতেছে, নগর বসিতেছে, মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, দীঘী কাটা হইতেছে। সহস্র সহস্র লোক সেই দীঘি খননে নিযুক্ত, তাহারা প্রায় এক বৎসরে সেই দীর্ঘিকা খনন সমাপ্ত করিল। এক দিকের ঘাট বাঁধা বাকি আছে। খনকেরাও বিদায় পায় নাই। দীর্ঘিকাটি কেমন হইল, রাণী লীলাবতী একদিন বৈকালে তাহা দেখিতে আসিলেন। খনক ও রাজমিস্ত্রীগণের মধ্যে গুটিকতক লোককে চিনিতে পারিয়া রাণীর করুণ হৃদয় করুণরসে আর্দ্র হইল। গুটিকতক লোককে রাণী চিনিলেন। তাঁহারা কে ?—লীলাবতীর পিতা নরসিংহদুলাল রায়চৌধুরী তিনি লীলাবতীকে বনবাস দিবার কর্ত্তা। তিনি ছাড়া সেই দীর্ঘিকাকূলে উপস্থিত লীলাবতীর জননী, লীলাবতীর ভাই দুটি, লীলাবতীর ভগ্নী চারিটি, ভগ্নীপতি চারিটি, তাঁহাদের ছেলে মেয়ে গুলি, ভাই দু-টির স্ত্রীপুত্র গুলি।

হায় হায় ! সেই দ্বিতীয় যক্ষরাজ সদৃশ নরসিংহদুলাল তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত মাটি কাটিয়াছেন, প্রায় শতহস্ত নিম্ন হইতে মাটির ঝুড়ী মাথায় করিয়া দীর্ঘিকার ভিতরের ছোট ছোট ধাপ বাহিয়া উপরে তুলিয়াছেন, কয়েক বৎসরের কষ্টে তাঁহারা সকলেই শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছেন, দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, মজুরী করিয়া, কোন কোন দিন ভিক্ষা করিয়া, কোন কোন দিন উপবাস থাকিয়া তাঁহাদের প্রাণধারণ হইতেছিল, লীলাবতীর স্বামীর দীঘিকা খননে অনেক লোক দরকার, সেই ঘোষণা পাইয়া যৎসামান্য বেতনে তাঁহারা এই রাজ্যে আসিয়াছেন।

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া, লীলাবতী আর একবার সেই পরিচিত মুখগুলি দর্শন করিলেন। একটু দূরে একজন সরকার কানে কলম গুজিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া আনিয়া রাণী আদেশ করিলেন, "এই সমস্ত মজুর লোক মিস্ত্রীলোককে নিমন্ত্রণ কর, কল্য মধ্যাহ্নে উহারা সকলেই রাজবাড়ীতে আহার করিবে; গণনায় উহারা কত ? তোমার ফর্দ্দে তাহা লিখিয়া রাখ, আর ততগুলি বস্ত্র খরিদ করিয়া রাখ।"

যে আজ্ঞে বলিয়া সরকার নমস্কার করিল, লীলাবতী প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, মিস্ত্রীরা কার্য্য বন্ধ করিল, তাহাদের সঙ্গে মজুরেরাও আপনাদের বাসায় আহার করিতে ও শয়ন করিতে গেল।

রজনী প্রভাতে রাজবাড়ীতে মহাসমারোহ। পাঁচহাজার লোক আহার করিবে, তদুপযুক্ত রন্ধনাদির আয়োজন। গরীব লোকেরা সচারাচর যে সকল উপাদেয় সামগ্রী ভক্ষণ করিতে পায় না, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সেই সকল মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে আনয়ন করা হইল। বেলা আড়াই প্রহরের পর নিমন্ত্রিত লোকেরা পরিতোষ রূপে ভোজন করিল।

সেইদিন রাত্রে রাণী লীলাবতী আপন মাতাপিতা প্রভৃতিকে প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষে আহ্বান করিলেন, ভয়ে ভয়ে সন্দেহে তাঁহারা সকলেই আসিলেন। রাণী পুনঃপুনঃ তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন, তাঁহারাও রাণীর মুখখানি বারম্বার দেখিলেন। শেষে মিষ্টান্ন পরিবেশনের সময় রাণী অনাবৃত বদনে তিন চারি বার ভোক্তাগণের সম্মুখ দিয়া গতায়াত করিয়াছেন, কাহারও কি চাই, যাচাই করিয়া তিন চারি বার সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন. নরসিংহদুলাল তথাপি লীলাবতীকে চিনিতে পারিলেন না।

মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া, লীলাবতী অশ্রুসিক্ত নয়নে পিতার মুখপানে চাহিয়া বিনম্র বচনে বলিলেন, "বাবা, তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না!—আমি আমার আপনার ভাগ্যে খাই, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম, সেই অপরাধে তুমি আমাকে বনবাসে দিয়াছিলে! এখন দেখ, ভাগ্যদোষে তোমার সে সকল ধনসম্পদ কোথায় গেল, ভাগ্যফলে আমি এখন রাজরাণী হইয়া কেমন সুখে রহিয়াছি, কেমন আনন্দে গরীব লোক গুলিকে অন্ন বস্ত্র দানকরিতে পারিতেছি, শিবস্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে কত প্রকার ব্রতাচারণ করিতেছি! এসকল আমার ভাগ্যফল! বিপক্ষ লোকেরা আর তস্কর লোকেরা তোমার বিপুল ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া তোমাকে সপরিবারে গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী ও পথের ভিখারী করিয়া দিয়াছে! এ সকল তোমার ভাগ্যফল! সকলেরই ভাগ্য আছে, সকলকেই ভাগ্যফল ভোগ করিতে হয়, ইহা তুমি জানিতে না; তুমি জানিতে—তুমি বলিতে, আমাদের সকলকে তুমিই খাওয়া পরা দিতে ছিলে, তুমিই আমাদের সকলের প্রাণদাতা হইয়াছিলে! না, না,—আর তাহা মনে ভাবিও না,—তুমি এই দিনদরিয়ার মালিক নও, তুমি আমাদের সবাকার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা নও, নিজনিজ ভাগ্যফলে সকলেই আমরা সুখে দুঃখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি;—সৃষ্টি কালাবধি মানবজীবন এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। বাবা, পায়ে ধরি, এখন অবধি তুমি বৃথা অভিমান ও বৃথা অহঙ্কার পরিত্যাগ কর, তুমিই সকলের কর্ত্তা, সকলেই তোমার অধীন এ গর্ব্বটা মন হইতে তফাৎ কর। সকলেরই ভাগ্য আছে, সকলেই নিজনিজ ভাগ্যফল ভোগ করে, মা অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে মতি রাখিয়া এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দাও;—জগৎবাসী আত্মম্ভরি সংসারী লোকেরা তোমার দৃষ্টান্ত পাঠকরিয়া, আত্মশ্লাঘা, আত্মাভিমান ও আত্মাম্ভরিতা বিসর্জ্জন দিয়া হৃষ্টমনে সুখশান্তি ভোগ করুক।"

জমিদার—না, না,—আর জমিদার বলা হইবে না,—অদৃষ্টের ফেরে দুলালের জমিদারী গুলি এখন পরের হাতে গিয়াছে,—দুলাল এখন পথের ভিখারী;—মাথা হেঁট করিয়া লীলাবতীর বাক্যগুলি তিনি শ্রবণ করিলেন,—মাথা হেঁট করিয়াই মৃদুস্বরে বলিলেন, "মা লীলাবতী তোমার বাক্যে আমি জ্ঞান পাইলাম;— বাক্যেই বা কেন বলি—তোমার দৃষ্টান্তে আমি উত্তম শিক্ষা পাইলাম; —তোমাকে বনবাস দিয়া অবধি সংসারে আমি যে কত লাঞ্ছনা ভোগ

করিয়াছি, মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে হইলে বুকের ভিতর আগুণ জলে!—লক্ষ্মী! অজ্ঞানে তোমাকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়া আমি লক্ষ্মীছাড়া হই, দস্যুতস্করে ক্রমে ক্রমে আমার সর্ব্বস্ব হরণ করে, সপরিবার আমাকে বনের পথে বাহির করিয়া দেয়, সপরিবার পথে পথে আমি ভিক্ষা করিয়া বেড়াই। দস্যুরা আমাকে কাটে নাই;—আমার ভাগ্যে বহু যন্ত্রণা ভোগ আছে, তাহা জানিতে পারিয়াই বোধ হয় তাহারা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল! যে সকল লোক আমার পদধূলি স্পর্শ করিতে পারিত না, (তোমাকে হারাইয়া অবধি আমি যেন কামারের জাঁতা!—বাঁচিয়া আছি, নিশ্বাস পড়িতেছে, কিন্তু বৃথা!) সেই সকল লোক সদর্পে আমার মাথার উপর চড়িয়াছে! সকল রকমেই আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে! দম্ভে ভুলিয়া যত পাপ আমি করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে;—আর আমি ইহ-সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। মা! তুমি রাজরাণী হইয়াছ, সুখ ভোগ কর, আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম! ভাগ্য যাহাকে বলে, তাহা বুঝিয়া—সমুচিত ফলভোগ করিয়া, আমি এখন ভুক্তভোগী পণ্ডিত হইয়াছি—মহাপাপী পণ্ডিত!—ভাগ্যকে সঙ্গে লইয়া আমি সংসার ছাড়িয়া চলিলাম, আমার এই হতভাগা ছেলেদের, মেয়েদের, জামাইদের, বৌমাদের নাতি নাতনিদের ভাগ্যে যাহা আছে, ইহারা কিছুদিন তাহাই ভোগ করিতে থাকুক। মা! সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরদিন তুমি পতিসোহাগিনী হইয়া থাকো, —পতির রাজসংসার আরও আলো কর, পুত্রবতী হও,—দেবরাজতুল্য পুত্ররত্ন লাভকর। আর আমি তোমার মুখপানে চাহিতে পারিব না, হেটমুণ্ডে নরকধামে প্রস্থান করি!"—

ভাগ্যবতী রাণী লীলাবতীর চক্ষে জল আসিল,—পিতার ঐ প্রকার মনস্তাপের বিলাপ আর শুনিতে পারিলেন না, পিতামাতা উভয়কে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া এক প্রকার শান্ত করিলেন; তাহার পর রাজাকে বলিয়া সেই নগরেই মাতাপিতার জন্য একখানি উত্তম বাড়ী করিয়া দিলেন, চিরজীবন সুখে অতিবাহিত হইবার যোগ্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, সিংহের শৃগালত্ব প্রাপ্তির ন্যায় নরসিংহদুলাল পরিবারগুলি লইয়া সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যেন তখন মুকুটশূন্য রাজা, ভূমিশূন্য ভূস্বামী, চক্র-শূন্য ভুজঙ্গ!

ভগবান সদয় হইলেন। কন্যাদত্ত নূতন বাড়ীতে বাস করিয়া ভাগ্য

বিশ্বাসী পরিত্যাগী নরসিংহ দুলালকে আর এক বৎসরের অধিক দিন সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইল না,—মরণকালে তিনি বুঝিয়া গেলেন, "কার ভাগ্যে কে খায় ?"

অভিলাষ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সব ছেড়ে আজ এ ভুবন মাঝ
দাঁড়ানু তোমার পাশে,
জান কি রাজন্ কাঙাল এমন
কিসের আশে ?—
জগতের হাসি, জগতের সুখ,
কেন না জাগায় এ ভগন বুক,
কিবা সে বেদনা, হরিল চেতনা
আঁধারে আবরি বাসে!
জান কি রাজন্ কাঙাল এমন
কিসের আশে ?

২

যে কথাটী হায়, সকল হিয়ায়
গোপনে লুকান আছে,
তা'ই যে বলিতে আসিনু চকিতে
তোমার কাছে!
কব কি কব না মনে জাগে ভয়,
কপালের দোষে যদি দয়াময়,
তুমি তা' না শুনে ঘৃণার আগুনে
দহি যাও মোরে পাছে!
তবু যে বলিতে আসিনু চকিতে
তোমার কাছে!

৩

তুমি যে আমার জীবন আঁধার
তুমি যে আমার সখা,
আমি যে তোমারি করুণা ভিখারী
—তোমারি একা!
এ আশার বাণী তুমি কত বার,
কত ভাবে মোরে জানালে অপার,
পলেকের তরে আজনম ধরে
তুমি তো দিলেনা দেখা!
আমি যে তোমারি করুণা ভিখারী
—তোমারি একা!

৪

ছলিও না আর, আমারে এবার
বাঁধগো বাহুর ডোরে,
তোমার ও হৃদি আজি শুধু বিধি,
বিলাও মোরে!
আজ ভাল করে বুঝিবারে দাও,
তুমি যে আমার আমাতেই চাও,
মুছি আঁখি বারি আমি গো নেহারি
আমারি পরাণ চোরে!
তোমার ও হৃদি আজি শুধু বিধি;
বিলাও মোরে!

ইক্ষুতাজ চিনি ও হৃদ্‌রোগ।

চিনি যে মানুষের এক অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, ইহা সর্ব্বসাধারণেই স্বীকার করেন। ডাক্তারেরা পুষ্টিজনক বলিয়া ইহার বহুল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ডাক্তার আর্থার গোলষ্টন্ কোন কোন কঠিন পীড়ায় এক প্রকার শর্করা খাইতে দিয়া রোগীকে কিরূপ আরাম করিয়াছিলেন,

তাহার বর্ণনা করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। গৌল্‌ষ্টন্ বলেন যে, হৃদ-রোগের কতকগুলি বিষম যন্ত্রণাপ্রদ উপসর্গের কারণ Valvu'ar lesion বা আহত হৃৎ পর্দ্দা ততটা নয় যতটা রক্ত চলাচলের ব্যাঘাতজনিত হৃদয়ের মাংসপেশীর দৌর্ব্বল্য। এই মতানুসারে, এই মাংসপেশীকে যাহা সহজে ও দ্রুতভাবে সংস্কার করিতে পারিবে তাহাই এই রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার গৌল্‌ষ্টন্ ১৩ বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন যে, ইক্ষুজাত শর্করাতে এই গুণ বিদ্যমান আছে। শরীর-তত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত এই যে, মাংসপেশীর বলাধানের আবশ্যকীয় উপাদান হইতেছে গ্লাইকোজেন্ বা জান্তব শ্বেতসার এবং যে জান্তব শ্বেতসার মাংসপেশীতে সঞ্চিত থাকে, সেটা প্রথমে "নাশে'স্ ফার্মে'ন্ট"এর যোগে এক প্রকার আঁঠাল শর্করাতে পরিণত হয়, পরে মাংসপেশীর বলাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমরা যে কার্বোহাইড্রেট (শার্করিক) খাদ্য আহার করি, তাহাই গ্লাইকোজেনে পরিণতি লাভ করে, ইহা যে যে, অবস্থার মধ্য অতিক্রম করিয়া পরে মাংসপেশীর বলাধান করে সে সমস্ত গৌলষ্টন্ তাহার পুস্তকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইক্ষুজাত শর্করাই খুব দ্রুত, এইরূপ পরিণতি লাভ করিতে পারে। ইহা সত্য যে বীট চিনি ও ইক্ষু চিনি রাসায়নিক হিসাবে একই জিনিস, কিন্তু রসায়ন বিদ্যা শরীরতত্ত্বের সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অপারগ; ডাক্তার গৌলষ্টন্ দেখিয়াছেন যে, বীট চিনি তত সুন্দররূপে কাজ করে না। ইক্ষু শর্করা অনেকবিধ,—ডাক্তার গৌলষ্টন্ কেবল তিন প্রকার চিনি লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন,—গ্রাবী চূর্ণ চিনি, ব্রাউন বার্বডোস্ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান চিনি। এই তিন জাতীয় চিনিই উত্তম, তবে এক এক রোগী এক এক রকম পছন্দ করেন। ইংলণ্ডে পক্ক ইক্ষু পাওয়া যায় না বলিয়া ডাক্তার গৌলষ্টন্ দুঃখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে অপর্য্যাপ্ত ইক্ষু জন্মে।

ডাঃ গৌলষ্টন্ প্রথম সপ্তাহে রোগীকে প্রতিদিন এক ছটাক করিয়া চিনি দেন, ২য় সপ্তাহে দেড় ছটাক, ৩য় সপ্তাহে দুই ছটাক। হৃৎপিণ্ডের যতখানি ওজন ততখানি করিয়া চিনি ভক্তব্য। মানুষের হৃৎপিণ্ডের ওজন গড়ে ৪॥ হ ৫ ছটাক। ডাঃ গৌলষ্টন্ কখন কখন দেখিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত প্রতিদিন ৩ ছটাক আন্দাজ চিনি না খাওয়া হয়, সে পর্য্যন্ত তেমন ক্রিয়া হয় না। প্রথম প্রথম অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিতে হয়, তাহাও দিনের মধ্যে কয়েক বারে খাইতে হয়, কিন্তু ডাক্তার গৌলষ্টন্ যতটুকু খাইতে পরামর্শ দেন, অর্থাৎ ৬

ছটাক, ততটুকু খাইয়া হজম করিতে পারেন, বাংলা দেশে এমন অনেকে আছেন। চিনি গরম জলে মিশাইয়া খাওয়াই সুবিধা, চা, কাফি, কোকো, মাখনরুটি প্রভৃতির সঙ্গে খাওয়া যাইতে পারে।

হৃদ্‌রোগীর মাদকদ্রব্য সম্যক্‌ পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

বিলাতে ৫৫ হইতে ৬৫ বৎসর বয়সের মধ্যে যত লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় তাহার এক তৃতীয়াংশই হৃৎপিণ্ডের ব্যাধির দরুণ। এত সাধারণ নিরাপৎ ও অল্পমূল্য একটা প্রতিকারোপায়ের আবিষ্কার বাস্তবিকই মানবজাতির একটা মহা কল্যাণ। সঃ ১০।৮।২১

খোকা।

লেখক,—৺বিভূতিভূষণ গুপ্ত বি, এ।

(খোকা!) বহুদূর হতে আসিয়াছ হেথা,
আঁধারে হয়েছ মণি।
অনন্ত সাগর, চাহিয়া কাতর,
তাই কি কেঁদেছ শুনি॥
ছিলি রে যেথানে মনোরম ঠাঁই
বিরাজে বসন্ত চির।
সুনীল সাগর বেড়িয়া যাহারে
বহিছেরে তীর তীর॥
শ্যামল সে দ্বীপ, পুষ্পে শষ্পে ঢাকা,
গাইছে কোকিল ডালে।
আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান, জটিল দর্শন,
নাচিছে সুন্দর তালে॥
মেঘ বৃষ্টি নাই, নির্ম্মল আকাশ.
ঝরিছে অমিয়া ধারা।
পিইতেছে সবে. অপার আনন্দে
হইয়া আপন হারা॥
সবে আসিয়াছ রম্য দেশ হ'তে
রমণীয় তাই এত!

সুবিমল জ্যোতি, সুন্দর ললাটে
ফুলসম বিকসিত॥
পার্থিব কি ধন, আছে রে এমন,
যা দিয়ে তুষিব তোরে।
যে দেশের তুই, সে দেশের নিধি,
সম্যক উপহার রে!
স্নেহ সুধা নিধি, আছে ভরা বুকে
ঢালিব শরীরে তব।
যার ক্ষয় নাই, অক্ষয় ভাণ্ডার
চিরকাল অভিনব॥
এস এস বাপি* মনস্তাপে তাপি,
রহিয়াছি বহু দিন।
সংসারের পথে শান্তি বারি সিঞ্চি
কর মোরে দুঃখহীন॥

রসাভাস।

লেখক—শ্রীযুক্ত পরিহাস রসিক রায়।

১। আমার কোন পরিচিত ব্যক্তিকে নিয়ত দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি—"তোমার কি একটুকুও ধর্ম্মভয় নাই? নরকের ভয় রাখনা।"

দুষ্ট উত্তর করিল বাবা—আমার স্বর্গবাস সুনিশ্চিত জানিবে—মাহেশের রথের দিন রেল কোম্পানী যতই স্পেশেল ট্রেণ দিউক এত জনতা হয় যে থার্ড ক্লাশের আরোহিগণের অনেককেই দাঁড়াইয়া যাইতে হয়,—তখন তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর আরোহিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তুলিয়া দিতে হয়। আমরা যখন মরিব, তখন পাপীর সংখ্যা এত অধিক হইবে যে, নরকে তাহাদের স্থান কুলাইবে না, কাজেই আমাদিগকে স্বর্গে স্থান দিতেই হইবে।

২। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, ভগবান বিষ্ণুকে বলিলেন—"ঠাকুর আমরা তিনজন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্টির আদি হইতে—আপনাদের দুই জনের অধিকন্তু রুদ্রপত্নী মহামায়ার এবং তাঁহার পুত্র গণেশের এমন কি সূর্য্যদেবেরও মর্ত্তে

---

* বাপ শব্দ, আদরে বাপি।

উপাসনা চলিতে লাগিল, মর্ত্যবাসী পঞ্চ উপাসককে বিষ্ণু ভক্ত হইলে আমাকে দিয়া আপনি যে, এতবড় একটা বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করাইয়া লইলেন, আমার কেহ উপাসনা যে করিবে আপনি তাহার পথ রাখিলেন না—এ দুঃখ আমার রাখিবার স্থান নাই।

বিষ্ণু উত্তর করিলেন—ভাই ব্রহ্মা দুঃখ করিও না কলিযুগে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে তোমার নামানুসারে তাহাদের নামকরণ হইবে কেবল ব্যাকরণে নিয়মানুসারে আকারটী পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হইবে।

৩। কুলীন পুত্রেরা কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায়ই মাতামহ ও মাতুলের প্রতি পাল্য ছিল: এক কুলীনপুত্রের বহুবিবাহ—তিনি দুই একটীকে লইয়া ঘরকন্না করেন, অন্যান্য পত্নীর সহিত বিবাহ নিশায় শুভ দর্শন মাত্র হইয়াছিল। সেইরূপ এক পত্নীর পিতা তাঁহার একটী পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁহাকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাইলে কুলীন পুত্র রাগে জ্ঞান শূন্য হইয়া মাতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া শ্বশুরকে গালাগালি করিতে করিতে বলিলেন—"এমন নির্লজ্জ ছোট লোকত কোথাও দেখি নাই, বিবাহের পর হইতে আমি তাহার কন্যার মুখ দর্শন করি নাই,— সে কন্যার পুত্র হইল, তাহার সংবাদ দিতে লজ্জা হইল না? এমন নীচত্ব কোথাও দেখি নাই। কেহ কখন এরূপ কথা কাণেও শুনে নাই।" ইত্যাদি।

ইহাতে তাঁহার মাতা বলিলেন,—"তোমার শ্বশুর ত তোমার পুত্রের অন্নপ্রাশনের সংবাদ দিয়া খুবই ভদ্রতা করিয়াছেন। আমার পিতা তোমার উপনয়নের সময় আমার স্বামীকে সংবাদ দিয়াছিলেন।"

এই কথা শুনিয়া পুত্র নীরব।

৪। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া এক ধনীর নিকট ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে ধনী জিজ্ঞাসিলেন—"সুপারিশ আছে?"

দরিদ্র পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ সুপারিশ কাহাকে বলে জানিতেন না কাজেই জিজ্ঞাসিলেন—

"সে কি বাবু?"

ধনী।—কাহার অনুরোধ পত্র আনিয়াছ?

ব্রাহ্মণ।—এসব কাজে আবার অনুরোধ কি বাপু, যাহার যেমন শক্তি সে তেমন দান করিবে, যাহার অনুগ্রহ হইবে সে নিজে না দিয়া কন্যাকে অনুরোধ করিবে কেন?

ধনী।—আমার কাছে বিনা অনুরোধে এক পয়সা মিলিবে না—আমার দান নামের জন্য, তোমার অভাব মিটাইবার জন্য নয়।

৫। সদুপায়ে মানুষ জীবিকার্জ্জন করিতে না পারিলেই প্রবঞ্চনা প্রতারণা চুরি ডাকাতি দ্বারা স্ত্রীপুত্র পরিজনবর্গের ভরণ পোষণ করে, তাহাতে সাধ্যানুসারে সতর্কতারও আবশ্যক করে। এইরূপে এক ব্যক্তি অভাব প্রযুক্ত কবর হইতে শবের বস্ত্রাদি চুরি করিয়া তৎবিক্রয় লব্ধ অর্থে আপনার স্ত্রী পুত্রাদির লালন পালন করিত, এরূপ কদর্য্যজীবীর পুত্রদের লেখা পড়া শিখা একরূপ অসম্ভব। এই কবর চোরের ছেলেরাও ক্রমে পিতৃবৃত্তি অবলম্বন করিল। পিতা তাহাদিগকে মৃত্যুকালে বলিয়া গেল—"বাবা চুরি করিয়া তোমাদিগকে মানুষ করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পর লোকে যাহাতে আমার সুখ্যাতি করে তোমরা এমন একটী কাজ করিবে। গোর চোর মারা গেল। পুত্রেরা পৈতৃক জীবিকা পূর্ব্বাবধিই করিতে ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাহারা গোর চুরিত করিতই—অধিকন্তু মৃত দেহের নাক কাণ কাটিয়া দিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া যাহাদের আত্মীয়ের গোরে চুরি হইত, তাহারা বলিতে লাগিল,—"আগে যে গোর চুরি করিত সে ভাল ছিল, এবার যাহারা গোর চুরি করে, তাহারা আবার মড়ার নাক কাণ কাটিয়া দেয়।" সংসারে এরূপ গোর চোর না থাকুক, গোর চোরের মত লোক অনেক আছে।

৬। একদিন অপরাহ্ণ কালে এক ফকির নমাজ করিতেছিলেন, এক দুষ্ট বালক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ উঠা বসা করিতে দেখিয়া তিনি বসিলে যে স্থানটীতে তাঁহার গুহ্যদেশ সংস্থাপিত হইবে, ঠিক সেই স্থানটীতে একটী কাটি পুতিয়া রাখিল, ফকির বসিবামাত্র তাঁহার গুহ্যদেশে কাঠিটী বিদ্ধ হইয়া গেল। ফকির নেত্রোন্মীলিত করিয়া দেখিলেন বালক হি হি করিয়া হাসিতেছে, তিনি বালককে চারিটী পয়সা দিলেন। বালক ভাবিল, এতো বড় মজা, তাহার কয়েক দিন পরে এক দীর্ঘাকার বলবান পূর্ব্ববৎ নমাজ করিতেছে, দেখিবামাত্র চারিটী পয়সার লোভে বালক পূর্ব্ববৎ কাঠি পুতিল, বলবানের গুহ্য দ্বারও বিদ্ধ হইল, বলবান রাগে জ্বলিয়া উঠিল. তৎক্ষণাৎ বালকের গ্রীবা ধরিয়া এমন জোরে ফেলিয়া দিল যে, তাহার হস্ত পদাদির অস্থি চুর্ণ হইয়া চিরকালের জন্য তাহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিল। সাধুগণ এই রূপেই দুষ্টের দণ্ড বিধান করেন।

৭। শিষ্যওয়ালা এক ব্রাহ্মণ শিষ্য বাড়ী বেড়াইতে যাইবেন, সঙ্গে একজন তল্পিদার চাই, ফিরিতে মাসাধিক কাল বিলম্ব হইবে কাজেই একজন পাকাপোক্ত

হুঁসিয়ার লোকের প্রয়োজন, নিয়মিত তলপিদার যে ছিল সে পীড়িত—তাহাকে পাওয়া গেল না, প্রতিবাসী রামা কলুর মুল ধন নাই, ঘানি চলেনা, বাড়িতে বসিয়াই থাকে, বামুন ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"রাম আমার সঙ্গে শিষ্য বাড়ী বেড়াইতে যাবি—সঙ্গে যাবি খাবি দাবি, আর মাসে একটা করে টাকা পাবি, শিষ্যেরা তোকে কোন জাত জিজ্ঞাসিলে হয় দাস কৈবর্ত্ত না হয় ঘোষ গোয়ালা বল্‌বি।"

রামা কলু রাজি হইল.—সে মোট বহিতে বেশ পটু, কিন্তু একটু বোকাটে। যাই হউক ব্রাহ্মণ মুটে পান না কি করেন, রামকে লইয়াই কাজ সারিতে হইল। দু-দশটী স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন এক শিষ্যালয়ে উপস্থিত, সেকালের শিষ্যদের কাছে গুরু ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা পাইতেন। ঠাকুর মহাশয় স্নান করিতে গিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় কোন প্রয়োজনানুরোধে শিষ্য রামকে জিজ্ঞাসিল—

"ওহে বাপু তুমি কি জাত?"

রাম উত্তর করিল—"হয় ঘোষ গোয়ালা, না হয় দাস কৈবর্ত্ত।"

শিষ্য বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তুই কলু নাকি?"

কয়েকদিন শিষ্যদের বাড়ীতে রাম গুরুর সঙ্গে থাকায় বেশ আদর যত্ন পাইত, তাহাতে তাহার মনে একটু অভিমান অভ্যস্ত হইতেছিল সে বলিল,—

"আগেই আমি দাদা ঠাকুরকে একথা বলেছিলাম, তিনি শুন্‌লেন না আমাকে যা শিখিয়েছিলেন, তাই বল্লেম শিষ্যত সে কথা মানিল না, আমি চল্লেম" এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

শিষ্য গুরুর বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব সবই বুঝিয়া লইল।

৮। এক গৃহস্থের একটী পুত্র পীড়িত। পল্লীগ্রামে হাতুড়ের সংখ্যাই অধিক—সুশিক্ষিত চিকিৎসক বড়ই কম, কাজেই গৃহস্থ একজন হাতুড়েকেই পীড়িত পুত্রের আরোগ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিল। পীড়া ততটা কঠিন ছিল না, ৩।৭ দিনের চিকিৎসায় রোগী আরাম হইল, স্নানের দিন কবিরাজ বিদায়ের ব্যবস্থা ছিল, সেই দিন হাতুড়ে আসিয়া গৃহস্থের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। গৃহিণী এক খানি আসন পাতিয়া বসিতে দিল। কর্ত্তা গিন্নি গৃহ মধ্যে যুক্তি করিতে ছিলেন চিকিৎসককে কি দেওয়া যায়। গিন্নি বলিতে ছিলেন—"একটী টাকা আর এক খানি ধুতির কম দেওয়া যায় না"

কর্ত্তা বলিলেন,—"তাও কি হয় বেচারা ৭।৮ দিন মেহানৎ করেছে, আসা

যাওয়াত আছেই, তদরিক্ত অনুপানের মধু পান দিয়াছে আপনি ঔষধ মাড়িয়া খাওয়াইয়াছে ইহাতে দুটী টাকা না দিলে ভাল দেখায় না।"

এইরূপ কথায় বার্ত্তায় বিলম্ব দেখিয়া হাতুড়ে বাহির হইতে বলিল—"যতই ফুস্ ফাস্ গুজ্ গাজ্ কর, শর্ম্মা একটী বাঁধা সিকি আর এক সের চাউলের কম উঠ্বেন না। তখন গৃহস্বামী ধুতি খানির উপর টাকা একটী দিয়া চিকিৎসকের সম্মুখে ধরিলেন। হাতুড়ে মনের আনন্দে সে দিন আর কোথাও গেল না, হাসি মুখে ঘরে ফিরিল।

৯। এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণের কতকগুলি শিষ্য ছিল। একদা এক কৃষিজীবি শিষ্যের বাড়ীতে উপস্থিত। কৃষকপত্নী ঠাকুর মহাশয়কে যথা রীতি গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া পাদপ্রক্ষালনের জন্য এক ঘটী জল সম্মুখে রাখিয়া দিয়া ঠাকুরকে স্নান করিবার কথা বলিল,—ঠাকুর স্নান করিবার পূর্ব্বে পাদ প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া বাড়ীতে উপস্থিত গুরুকে দেখিয়া একটু চটিয়াছে। সে লাঙ্গল ফেলিয়া পা হাত না ধুইয়া স্ত্রীকে বলিতে লাগিল,—"দেখ, গুরুত বেণেদের, আহা কেমন হৃষ্টপুষ্ট, কাঁচা সোণার মত রং—গরদের ধুতি পরা, গা ময় ছাপ, নাকে তিলক, হাতে হরিনামের থলি—উপর হাতে সোণার ইষ্টি কবচ, সঙ্গে পাঁচ সাত জন বৈষ্ণব বাবাজী, কেহ রাম শিঙ্গায় ফুঁ দিতেছে, কেহ সাধন ভজন কচ্চে, চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে গেছে, শিষ্যেদেরও তেমনি অবস্থা। ঘি চিনি তরবতর খাবার জিনিষ ভারে ভারে আন্চে। আর আমাদের এই যে গুরু এসেছেন—যেমন মূর্ত্তি—তেমনি পোষাক—দূর কর দূর কর, দেখ্লে ভক্তি হয় না যেমন মরকট বানরটী এসে বসেছেন, আর আমিও তেমনি শিষ্য জুটেছি।"

কথাগুলা গুরুর কর্ণ গোচর হইল, তাহাতে তাঁহার মনটায় একটু যে দুঃখ না হইয়াছিল এমন নয়। গুরু স্নান করিয়া আসিলেন, পাকাদির পর আহার করিলেন, আহারের পর একটু বিশ্রামও করিলেন। বৈকালে শিষ্যকে জিজ্ঞাসিলেন—"বেণেদের যে গুরু এসেছেন তিনি কি গোস্বামী?"

কৃষক একটু বিরক্তির সহিত উত্তর করিল—"হাঁ গোঁসাই বই কি, গুরু বটে, দেখ্লে শত্রু উল্টিয়ে যায়, এমন রূপ কখন দেখি নাই।"

গুরু। আমার সঙ্গে একবার সেখানে যাবে?

কৃষ। গেলে কি হবে ঠাকুর—গোঁসাইজীর সঙ্গে কথা কয় এমন লোক এতল্লাটে নাই, যে আসুচে সেই ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম কচ্চে। তিনি আপনার

ঝুলির ভেতোর হাত গলিয়ে দিয়ে বসে আছেন, আহা যেন গদির মোহন্ত। তুমি গিয়ে ঠাকুর তার বারই পাবে না।

কৃষকের গুরু ঠাকুর জানিতেন, জামগ্রামের হলধর গোস্বামী তাঁহার ছাত্র, তাঁহার নিকট ভাগবৎ পড়িয়া ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনিই আসিয়া থাকিবেন। বৈকালে কৃষক ঠাকুরমহাশয়কে লইয়া বেণেদের বৈঠক খানায় গেল—গ্রীষ্ম কাল দুজন চাকর; দুখানা বড় বড় পাখায় গোঁসাইজীকে বাতাস করিতেছিল; ধনকুবের বেণেরা সব সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, কৃষকের গুরুকে দেখিয়া গোঁসাইজী আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন,—"আসুন আসুন বলিয়া শিষ্যদিগকে বলিয়া আপনার আসনের উপর একখানি আসন পাতাইয়া তাহাতে তাঁহাকে বসাইলেন, সমস্ত বৈকাল গোঁসাইজীর আর কাহার সঙ্গে কথা হইল না, তাঁহারই সহিত শাস্ত্রালাপে কাটিয়া গেল—সন্ধ্যার আগে গোঁসাইজী আপন শিক্ষাগুরুকে বিদায় দিবার কালে চারিটী টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন, গুরুও আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন। কৃষকের আহ্লাদের সীমা নাই, তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া পত্নীকে বলিল,—"দেখ আমাদের এ বেনী মন্দ নয়। বেণেদের গোঁসাই দূরে দেখ্তে পেয়ে উঠে দাঁড়াল, কত আদর যত্ন কল্লে আবার আসবার সময় চারিটে টাকা দিয়ে প্রণাম কল্লে। "ছেঁড়া গুণে খাসা চলে।"

১০। পল্লীগ্রামের পণ্ডিত মহাশয়েরা ছোট ছোট ছেলেদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রায়ই পরীক্ষা দেওয়াইতে যান। এক বৎসর ঐ রূপ এক পণ্ডিত মহাশয় পরীক্ষা দেওয়াইতে ছাত্রদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। গণিতের পরীক্ষার দিনে পরীক্ষা স্থলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সবইনস্পেক্টর পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসিলেন,—"পণ্ডিত মহাশয় আপনার ছাত্রেরা আজি কেমন লিখিল?"

পণ্ডিত মহাশয় উত্তর করিলেন—"আমার ছাত্রেরা আজ ধর্ম্মের গান গাইয়াছে। একজন ধর্ম্মের গায়েন ইছাই ঘোষের সহিত লাউসেনের যুদ্ধ বর্ণনা উপলক্ষে গাইয়াছিলেন,—

উত্তর হ'তে এলো সৈন্য আশি হাজার।
পূর্ব্ব হ'তে এলো সৈন্য নব্বুই হাজার॥
দক্ষিণ হ'তে এলো সৈন্য বিরাশি হাজার।
পশ্চিম হ'তে এলো সৈন্য পঞ্চাশ হাজার॥
একুনে হইল সৈন্য বিয়াল্লিশ হাজার।

আমরা জানি না—কোন ধর্ম্মমঙ্গলে এরূপ গান আছে কি না, কিন্তু সুরসিক পণ্ডিত মহাশয় এইরূপ পরিচয়ই দিয়াছিলেন।

সমালোচনা।

সুমতি।—(বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী সচিত্র গল্প পুস্তক) কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি স্কুলের হেডমাষ্টার বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারেও শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, প্রণীত, ৩২।৭ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত, ছবি, ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, মূল্য ছয় আনা মাত্র।

আমাদের সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে নীরস ভাবে নীতি শিক্ষা না দিয়া গল্পচ্ছলে সুনীতি ও সুশিক্ষা প্রদান করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য; তাঁহার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, বিশেষতঃ "শ্লোক সংগ্রহ" সংগৃহীত শ্লোক গুলি উপদেশ পূর্ণ কেবল শিশু কেন অনেক বৃদ্ধেরও পালনীয়, বস্তুতই অমূল্য উপদেশ। "সুমতি" সুখপাঠ্য সুকুমার মতি বালকবালিকার হস্তে শোভা পাইবার একখানি উপযুক্ত উৎকৃষ্ট পুস্তক।

বেগুণ-পোড়া।—শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র প্রণীত। কলিকাতা ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স দ্বারা প্রকাশিত; মূল্য ছয় আনা মাত্র।

বঙ্গ-সাহিত্যসংসারে রাধানাথ বাবু সুপরিচিত; ইতি পূর্ব্বে তিনি অনেক গুলিগ্রন্থ লিখিয়া বীণাপাণির শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প লিখিবার শক্তি তাঁহার আছে,—আলোচ্য "বেগুণপোড়া"—গ্রন্থখানিতে রাধানাথ বাবু তাঁহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। "বেগুণ-পোড়া"—গল্পের সার মর্ম্ম এই,—একজন বিপত্নীক ব্রাহ্মণ বেগুণ-পোড়া খাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন, তাঁহার কন্যা ও বধূমাতাগণ তাঁহাকে বেগুণ-পোড়া খাওয়াইয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাই ব্রাহ্মণ মনের ক্ষোভে বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন, নূতন গৃহিণী গৃহে আসিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বেগুণপোড়া খাওয়াইয়া সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

রাধানাথ বাবুর বিরচিত বেগুণপোড়া বস্তুতই মুখরোচক হইয়াছে; পাঠক পাঠিকাগণ অবাধে বেগুনপোড়া পাঠ করিতে পারেন, ছবি, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। } ১৩২১ সাল, অগ্রহায়ণ। { ৮ম সংখ্যা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে বঙ্গ সাহিত্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দির শেষভাগে এবং সপ্তদশ শতাব্দির প্রারম্ভে রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংরাজী সাহিত্য যেমন উন্নত শ্রীধারণ করিয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দিতে পুণ্যবতী ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য সেইরূপে উন্নত পথে অগ্রসর হইয়া অভিনব শ্রীধারণ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষা ছিল, বঙ্গ-সাহিত্য ছিল, কিন্তু তখনকার অবস্থা যেন ভিন্ন প্রকার বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তখনকার বঙ্গ সাহিত্য কাব্য প্রধান ছিল; বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের কবিতামালা, চৈতন্যদেবের সমকালীন এবং তৎপরবর্ত্তী চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতির কবিতামালা, কৃত্তিবাসপণ্ডিতের

রামায়ণ প্রভৃতি গীতিকাব্য, কাশীরামদাসের মহাভারত ক্ষেমানন্দ দাসের মনসামঙ্গল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল এবং সাধক রামপ্রসাদ সেনের ভক্তি পদাবলী বঙ্গভাষায় অমূল্য-রত্ন; কিন্তু তৎকালে বঙ্গভাষায় গদ্য সাহিত্যের আলোচনা ও আদর ছিল না। প্রাচীন প্রতাপাদিত্যচরিত, গৌরীচরিত ও কৌরবচরিত প্রভৃতি যে দুই পাঁচ খানি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গভাষার আশানুরূপ মর্য্যাদা রক্ষা হয় নাই; গ্রন্থ প্রচারকেরা সেই সকল পুস্তকের ভাষার আখ্যা দিয়াছিলেন, "গৌড়ীয় সাধুভাষা।" পাঠকেরা কিন্তু সেই গৌড়ীয় সাধুভাষাকে অনুস্বার বিসর্গ বর্জ্জিত সংস্কৃত এবং অতি অপ্রতিকর দুরূহ শব্দপূর্ণ দর্শন করিয়াছিলেন।

ভারতে ইংরাজাধিকারের প্রথম অবস্থায় ইংরাজ পাদরী সাহেবেরা বঙ্গের শ্রীরামপুরে আসিয়া বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন, অবশ্য তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়, ক্রমে মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, রাজীবলোচনাদির হস্তে এই ভাষার শৈশবাবস্থা অতিবাহিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে বঙ্গভাষার অঙ্গ সৌষ্ঠব পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ইহা নবজীবন ও নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া নবীন শ্রীধারণ করিয়াছে। এই সময় মহারাণীর অনুগ্রহে এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন; ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের আলোচনার বিস্তার; এতদ্দেশীয় মেধাবী যুবকবৃন্দ ঐ উভয় ভাষার মধুর আস্বাদন লাভ করেন, এই সময় হইতে ক্রমে ক্রমে ভাল ভাল সংস্কৃতও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনেক গুলি সাহিত্যগ্রন্থ সুললিত বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। সুললিত বঙ্গ ভাষার প্রবর্ত্তক কর্ত্তা, পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। অনেকগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল অনুদিত গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্যাকরণ অভিধানের সম্মান রক্ষা করিয়া আপামর সাধারণের সহজ বোধ-গম্য তাদৃশ সরল বঙ্গভাষা গ্রন্থনে আর কেহ পূর্ব্বে কৃতকার্য্য হন নাই। একটি দৃষ্টান্তে তাহা আমরা বুঝাইব।

কাদম্বরী এবং শকুন্তলা। বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরী একখানি উপাদেয় উপাখ্যান গ্রন্থ. পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন ঐ উপাখ্যানের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদিত কালিদাসের শকুন্তলা। ঐ দুইখানি

পুস্তকের ভাষার তুলনা করিলে সুবিচারক পাঠক মহাশয়েরা ঐ উভয়ের তারতম্য উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। বাঙ্গালা কাদম্বরী বহু সমাসসিদ্ধ সংস্কৃত বহুল শব্দাড়ম্বর পরিশূন্য হয় নাই, কিন্তু বাঙ্গালা শকুন্তলার ভাষা যেমন সুপাঠ্য তেমনি প্রাঞ্জল। অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদেও এইরূপ ইতর বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগে—এই সরল সাধু ভাষার যে নমুনা দেখাইয়াছেন, সেই ভাষাই এখন সর্ব্বত্র সমাদৃত।

বিদ্যানুরাগিণী বিদ্যাবতী ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রসাদে এতদ্দেশে বিদ্যার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যের সাহায্যে বঙ্গভাষা নব সাজে সুসজ্জিতা হইয়া অনেক পরিমাণে আমাদের সাহিত্য সংসারের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, কৃশাঙ্গী ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছে, কৃতজ্ঞ চিত্তে মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাঁহারা বঙ্গভাষার পিতা বলিয়া সম্মান দান করেন, তাঁহারা সবিশেষ যত্ন আগ্রহে তৎপ্রবর্ত্তিত ভাষার আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে রচনা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। এই ভাষা পূর্ব্বের গৌড়ীয় সাধু ভাষা অপেক্ষা কতগুণে মার্জ্জিত, কতগুণে শ্রেষ্ঠ তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অধিকারে বঙ্গ-সংসারে সুললিত গদ্য সাহিত্যের আদর হইয়াছে বলিয়া পদ্য সাহিত্য এককালে উঠিয়া যায় নাই। ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত আপন প্রতিভা বলে বঙ্গীয় কাব্য সংসারে এক নূতন সৃষ্টি দেখাইয়াছেন, সংস্কৃতের ও ইংরাজীতে অমিতাক্ষর কাব্য আছে, বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না; মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালা অমিতাক্ষর রচনা করিয়া বঙ্গীয় কাব্যের নূতন গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তদ্বিরচিত "মেঘনাদ বধ" এ বিষয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ। মেঘনাদবধের আদর্শে আমাদের সাহিত্য জগতের কোন কোন কবি অমিতাক্ষর রচনায় আমোদ অনুভব করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই গৌরবের কথা; যদিও সকলে সে ছন্দটি যথাযথ ভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই, মিল রাখিতে হয় না বলিয়া স্থানে স্থানে ইচ্ছামত যতি পতনে বেজায় শ্রুতি কটু করিয়া তুলিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের চেষ্টা অবশ্য প্রশংসনীয়। যাঁহাদের প্রতিভা অধিকতর জ্যোতির্ম্ময়ী, অনুকরণে তাঁহারা বহুদূরে অগ্রসর হইয়াছেন; ইহা বলা বাহুল্য।

সরল মিত্রাক্ষর কবিতার আদর্শ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অনেকগুলি কৃত-বিদ্য যুবক তাঁহার ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়া কাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছেন; রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, প্রিয়মাধব, মনোমোহন হরিমোহন গুপ্ত, দ্বারিকানাথ অধিকারী প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে অগ্রগণ্য। বিশুদ্ধ গদ্য প্রচারের যুগেও কবি ও কাব্যের নিতান্ত অভাব নাই; গিরীশচন্দ্র ঘোষ হরিশচন্দ্র মিত্র কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ গণনীয়। তদব্যতীত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার অসাধারণ গুরু গাম্ভির্য্যে স্বভাব কবি।

ভারতেশ্বরী মহারাণীর অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশে অনেকগুলি গদ্য গ্রন্থকার এবং সুকবি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাব্যসাহিত্যের উন্নতি সাধনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম অপরাপর সৎগুণাবলীর সহিত চিরস্মরণীয় হইবে এ কথা আমরা শ্লাঘা করিয়া বলিতে পারি। মহারাণী আমাদের জননী রূপিনী ছিলেন, সন্তানের প্রতি জননীর যে প্রকার স্নেহ দয়ার সঞ্চার মহারাণী তাহা সর্ব্ব বিষয়ে সমভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভারত প্রবাসী ইংরাজ বালকদিগের বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য কলিকাতা "ফোর্টউইলিয়ম কলেজ" স্থাপিত হয়, এবং কতিপয় কৃতবিদ্য মহাত্মা উক্ত কলেজের ছাত্রদিগের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কার কৃত "রাজাবলী" ও "বত্রিশ সিংহাসন" রাজিবলোচন মুখোপাধ্যায় কৃত "কৃষ্ণচন্দ্রচরিত" রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত" ও "লিপিমালা" চণ্ডীচরণ মুন্সীর "তোতা ইতিহাস" হরপ্রসাদ করের "পুরুষ পরীক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আমাদের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বিলাত হইতে বিভিন্ন সময়ে কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া আইসে।

অধুনা কবির সংখ্যা অল্প, কিন্তু দেশের মধ্যে গদ্য সাহিত্য প্রণেতার সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত। দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস জীবনচরিত স্মৃতি পুরাণ, সঙ্গীত নাটক এবং আখ্যায়িকা রাশি রাশি প্রস্তুত হইতেছে। রাজ্যেশ্বরির গৌরবের সহিত দেশবাসী প্রজাবৃন্দেরও গৌরব। আখ্যায়িকা ও প্রবন্ধ রচনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অগ্রে বরণীয়।

গ্রন্থাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে মহারাণীর অধিকারে বঙ্গভাষায় সমাচার পত্র ও সাময়িক পত্রের সংখ্যায়ও বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, পূর্ব্বে শ্রীরামপুরে

মিশনারী কেরি সাহেব ইঙ্গো বঙ্গভাষায় একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করেন, নাম ছিল, "সমাচারদর্পণ" সেইখানি বঙ্গভাষার প্রথম সংবাদ পত্র। তাহার পর সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর এবং সংবাদ ভাস্কর। মহারাণীর সময়ে সমাচার পত্রের সংখ্যা কত অধিক হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া তালিকা দেওয়া অসম্ভব। রাজার গৌরবেই প্রজার গৌরব; বঙ্গরাজ্যের প্রজামণ্ডলীর এই সাহিত্যানুরাগ আমাদের স্বর্গীয় রাজ্যেশ্বরীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

যাবতীয় সভ্যসমাজে এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, দেশাধিপতির যত্ন, সাহায্য এবং উৎসাহ ব্যতীরেকে তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ভৈষজ্য তত্ত্ব সংগ্রহ, প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য বিধান পূর্ত্তকার্য্য, দুর্ভিক্ষাদি জাতি সাধারণ বিপদ উদ্ধার এবং বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যগুলি নিরন্তর সাহায্য সাপেক্ষ। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এতদ্দেশে সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে আশাধিক ঔদার্য্য দেখাইয়া গিয়াছেন। দেশে সাহিত্য কাব্যের বিচার এবং তৎবিষয়ে উৎসাহ দান তিনি রাজধর্ম্মানুগত অবশ্য কর্ত্তব্য বরিয়া গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার মহাগৌরবান্বিত রাজত্বকালে যাঁহারা মাতৃ ভাষায় কাব্য সাহিত্যের সেবায় অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগ্য পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া সম্ভ্রম সূচক উপাধি প্রদান করা হইয়াছে, বয়োধর্ম্ম ও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আক্রমণে সাহিত্য সেবকগণের মধ্যে যাঁহারা কার্য্য ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আবশ্যক মত ভরণ পোষণের নিমিত্ত বিশেষ বৃত্তি বিধান করা হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবেশাধিকার ছিল না, বিদ্যানুরাগিনী বিদ্যাবতী মহারাণী সেইঅভাব মোচন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা যোগ্য পাঠ্য পুস্তকাবলীর মধ্যে বঙ্গ সন্তানগণের মাতৃভাষার স্থান দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, মহামহিমান্বিত বঙ্গের সাহিত্য সমাজ তাঁহার নামে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ অর্পণ করেন; চিরদিন করিবেন।

উনবিংশ শতাব্দিতে বঙ্গভাষার সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধি; সেই সঙ্গে এক এক সময়ে বঙ্গভাষা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রাম্য ভাষায় পুস্তক প্রণয়নের চেষ্টা প্রথম আলালের ঘরের দুলাল, দ্বিতীয় হুতমপ্যাচার নক্সা। ঐ দুই খানি পুস্তক সেই সময়ে বঙ্গবাসীর মনোরঞ্জন করিয়াছিল। আলালিভাষা অপেক্ষা হুতমী ভাষা অনেকাংশে মার্জ্জিত। হুতমপ্যাচার নক্সা প্রচারের ত্রিশবৎসর পরে "এই এক নূতন" শিরোনামে "আমার গুপ্ত কথা, অতি আশ্চর্য্য!" অভিধেয় একখানি রহস্য পুস্তকের প্রচার হয়। আলালী ও হুতমী উভয়

ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নুতন ধরণে সেখানি বিরচিত হইয়াছিল। বঙ্গের বর্ণমালায় যাহাদের অল্পাধিক অধিকার জন্মিয়াছে, সেই "গুপ্ত কথা" পাঠ করিয়া তাঁহারা সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন; শব্দার্থ বুঝিবার জন্ম কাহাকেও অভিধানের সাহায্য লইতে হয় নাই। সেই গুপ্তকথা প্রচারের পর কেহ কেহ সেই ভাষার অনুকরণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গুপ্তকথা পাঠ করিয়া বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৌখিক মন্তব্য দিয়াছিলেন, "বিষয় বিশেষে সেইরূপভাষা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।" আমরাও বলি, তথাস্তু। সেই গুপ্তকথার লেখক, শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন দেশের উন্নতি হয় না, সমাজের উন্নতি হয় না, সভ্যতার বিকাশ হয় না, জাতীয়তার মূল বন্ধন হয় না, ইহা ইতিহাস সিদ্ধ প্রমাণ। সাধারণ সাহিত্যের মধ্যে আবার মাতৃভাষা প্রধান। যে জাতির মাতৃভাষা নিরলঙ্কৃত; সে জাতি জগতের সমস্ত সভ্য জাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকে; সহস্র বৎসরেও মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না। সৌভাগ্য ক্রমে বর্ত্তমান কালে রাজানুগ্রহে বঙ্গবাসী আর্য্যসন্তানেরা এখন সাধারণ সাহিত্যের সহিত মাতৃভাষার সমাদর করিতেছেন, মাতৃভাষার মস্তকে রত্ন মুকুট পরাইতেছেন, জগতে তাঁহারা অচিরকাল মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণনীয় হইতে পারিবেন, এইরূপ আশা আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে। এই সৌভাগ্যের হেতু ভূতা আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গবাসিনী মহারাণী ভিক্টোরিয়া; অতএব তাঁহার পবিত্র নামে আমরা ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি।

গীতা।

শুভ পূর্ণিমার নিশি, নিশিথ সময়।
মৃদুমন্দ বহে বায়ু—শান্ত কোলাহল—
শ্রান্ত চরাচর শান্ত, প্রশান্ত জাহ্নবী—
নীর;—নাই বীচিমালা তরঙ্গের ঢেউ,
ঘাত প্রতি ঘাতে শব্দ—বর্ণের প্রকাশ!
শ্বেত স্বচ্ছনীর রাশি বহে এক স্রোতে!
কুল কুল কুল-ধ্বনি আকাশে মিশায়।

হের-ভীম প্রভঞ্জনে কাঁপিল সরিৎ—
ছুটিল তরঙ্গ মালা, ঘাত প্রতি ঘাতে—
ভীমনাদ দিগন্ত পূরিল! আকাশে
এক চাঁদ—শতকোটী ছায়া প্রকাশিল!
গুণময়ী প্রকৃতির বিক্ষোভে প্রকাশে—
এই বিশ্বচরাচর রম্য কর্ম্মধাম!
বিকৃতির সংশ্লেষণে সমষ্টি করণে—
এই তুমি এই আমি এই ভূতচর!
বিশ্লেষণে—ব্যষ্টিভূতে প্রপঞ্চ সকল;
কোথা তুমি, আমি কোথা, কোথা ভূতচর!
সকল(ই) প্রকৃতি লীলা খেলা সঙ্গে মিলে,—
সবে প্রকৃতির সনে! সারাদিন খেলি—
নিশিথে ঘুমায় শিশু জননীর কোলে।
যাহা ছিল তাই সুধী এসেছিল হেথা,
খেলা সঙ্গে মিলে গেছে কারণের সহ!
কেন শোক কর ইথে নিত্য ইহা ঘটে।
প্রকৃতির বিবর্ত্তন অলঙ্ঘ্য নিয়ম।
সরল শিশুটী ছিলে, হাসি, খেলা সাথী;
হইলে যুবক তুমি—রমণীর দাস—
কৌটিল্য, ছলনা, তব নিত্য সহচর!
ভেবে দেখ কোথা গেল সুন্দর জীবন—
মুখ ভরা "মা", "মা" ডাক সুধামাখা হাসি।
প্রকৃতির বিবর্ত্তনে গিয়াছে ডুবিয়া—
সেই দেহ, মন! ভস্মীভূত হয় নাই—
এইত প্রভেদ! গত জীবনের তরে—
ফেলেছ কি একবিন্দু অশ্রু কভূ ধীর!
তবে কেন দেহান্তরে এত তব শোক!
এস ভাই আর কেন—ঘুচেনি কামনা?
ভাল তাই হবে!—চল তবে এই পথে!
কামনা :—কামনা কর কর্ম্ম মাত্রে তুমি,

এ জীবনে কর্ম্মময় রাখ হে সুধীর—
কর্ম্মকর—সাধু কর্ম্মে হও অগ্রসর।
কর্ম্মফলে কভু তুমি করোনা বাসনা—
সাক্ষী যিনি হৃষীকেশ হৃদয়ে সংস্থিত—
নির্ব্বিকার, নিরাকার, চিদানন্দময় ঃ—
করিবেন এ কার্য্যের তিনি সুবিচার!
মহামন্ত্র "গীতা! গীতা,"—বল বারবার—
"গীতা,-গীতা,-গীতা,-গীতা,-গীতা—কি বুঝিলে?"
স্তব্ধ শিষ্য—"বুঝিলাম বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠ"—
বলে শিষ্য বুঝিলাম গুরো "ত্যাগী ত্যাগী।"
জ্ঞানগর্ব্বী শিষ্য মুগ্ধ গুরুর কৃপায়॥

নারী ধর্ম্ম।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন।

(১)

স্পর্শমণির স্পর্শে কুন্তল-কৃষ্ণবর্ণ লৌহ-পাত্রও মহামূল্য অতি উজ্জ্বল স্বর্ণ ভাণ্ডে পরিণত হয়। স্ত্রীলোকেরও সেইরূপ একটি অমূল্য স্পর্শ মণি আছে। সেই স্পর্শমণির নাম, স্ত্রী-ধর্ম্ম—পবিত্রতা—সতীত্ব। এ "পরশ পাথর" যাহার আছে, তিনি ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণা কুরূপ-কুৎসিতা হইলেও বহু মূল্য মণি-কাঞ্চনের ন্যায়ই চির সমাদৃতা। ভাগ্যবতী রমণী আজীবন কৃপণের ধনের ন্যায় প্রাণপণ যত্নে এ রত্ন রক্ষা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম দোষে,—দৈববশে হীনবুদ্ধি নারী একবার মুহূর্ত্তের জন্য এ "সাত রাজার ধন এক মানিক"—এ মহামূল্য কোহিনূর রত্ন হারাইলে তাহার আর নিস্তার নাই। ভ্রষ্ট-চরিত্রা অপবিত্রা মহিলা লোক সমাজে যারপর নাই ঘৃণিতা এবং ধর্ম্মের বিধানে চির পতিতা।

রমণী মাত্রেই জগন্মাতা জগদম্বার অংশ সম্ভূতা। সুতরাং নারীমূর্ত্তি সন্তান-চক্ষে মাতৃমূর্ত্তির ন্যায় চির পূজিতা,—নিত্য সমাদৃতা,—মহাপবিত্রা শান্তিময়ী দেবী স্বরূপিণী। নিতান্ত নরাধম পাষণ্ড ব্যতীত কেহই এ পরম পবিত্র মাতৃ মূর্ত্তির অবমাননা—দেবী স্থানীয়া রমণীর ব্যভিচার দর্শন স্পৃহা করে না। এক মাত্র

বিবাহিতা পত্নী ভিন্ন জগতের রমণীমাত্রেই আমার নিত্য প্রীতি ভক্তির অধিকারিণী স্নেহ প্রীতি দায়িনী জননী বা ভগিনী, এবং একমাত্র বিবাহ কর্ত্তা পতি ব্যতীত বিশ্ববাসী নর মাত্রই আমার স্নেহাস্পদ পুত্র বা প্রিয়তম ভ্রাতা, জগতের নরনারীর মনে এই পবিত্র ভাব বদ্ধমূল না থাকিলে, মনুষ্য সমাজের নৈতিক পবিত্রতা বা চরিত্র রক্ষা অসম্ভব। নর নারী চরিত্রে নৈতিক বলের অভাবই রমণীর মুখে অবগুণ্ঠন প্রথা সৃষ্টির মূল। উন্নত চরিত্র পবিত্র হৃদয় নর নারীতে এ বিশ্ব পরিপূরিত হইলে, আর রমণীর পবিত্র মুখে অবগুণ্ঠন প্রাচীরের প্রয়োজন থাকিবে না।

স্মরণাতীত কালে—ধর্ম্মের মহিমাপূর্ণ যুগে পৃথিবীর নর নারী শিশুর ন্যায় সরল—দেবতার ন্যায় পরম পবিত্র ও নির্ম্মল প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিল, তখন নারী মুখে অবগুণ্ঠণাবরণের আবশ্যক হয় নাই, ত্রেতা বা দাপরেও নর নারী প্রকৃতি ধর্ম্মের সেই সুমধুর মলয় বাতাসেই অনেকটা পবিত্র ও স্নিগ্ধ ছিল—তখন মানুষের ভোগবিলাসিতা ও পাপ লালসা এত তীব্র ছিল না, সুতরাং তখনও অবগুণ্ঠনের তত আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় নাই। অবগুণ্ঠন পাপ-কলুষিত কলিযুগেরই অবশ্য প্রয়োজনীয় অপূর্ব্ব সৃষ্টি বা আধুনিক যুগের উন্নত চরিত্রের বিজয় পতাকা! ধন্য কলি-প্রভাব!

মনুষ্য-সমাজের পবিত্রতা রক্ষা পরম মঙ্গলজনক—নর-নারী চরিত্র রক্ষা বড় প্রয়োজনীয়। ব্যভিচার মানব জীবনের পতনের মূল—ব্যভিচার ঘোর নরকের পথ প্রদর্শক। এই ঘৃণিত ব্যভিচার প্রভাবে মানুষের ধর্ম্ম, নীতি, স্বাস্থ্য, সুখ, মানসিক উচ্চতা ও পবিত্র ভাব নিচয়, সামাজিক সুখ শৃঙ্খলা ও জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ব্যভিচার অনন্ত অশান্তির নিদান। স্পর্শ মণি ভ্রষ্ট ব্যভিচারিণী অসতী রমণী মণি হারা ফণিনীর ন্যায় জীবন্মৃতা।

একমাত্র শারীরিক অপবিত্রতা—শুধু কায়িক ব্যভিচারই একমাত্র ব্যভিচার নহে। শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ উপায়েই রমণীর পবিত্রতা বা সতী ধর্ম্ম বিনাশ হইতে পারে। সুতরাং সুচরিত্রা বুদ্ধিমতী রমণী কায়িক, মানসিক ও বাচনিক কোন রূপেই ভ্রষ্ট চরিত্রা হইবেন না। সুন্দর ও সুবেশধারী পুরুষ দর্শনে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেই মন অপবিত্র হয়, মন অপবিত্র হইলেই মানসিক ব্যভিচার হইল; ইন্দ্রিয় উত্তেজক আদিরসাত্মক হাস্যকৌতুক, গল্প ও সঙ্গীতাদি রঙ্গরস দ্বারা মনচাঞ্চল্য ও চিত্তবিকার উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং এ শ্রেণীর আমোদ প্রমোদকে বাচনিক ব্যভিচার

সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। এ সব ব্যভিচার কায়িক ব্যভিচারের ন্যায় প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজের চক্ষে তেমন ঘৃণা জনক কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান না হইলেও ইহার পরিণাম ফলও যে বিষময় এবং শারীরিক ব্যভিচারের পথ প্রদর্শক সুতরাং ঘোর পাপ জনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাচনিক ব্যভিচারের উত্তেজক হলাহলে প্রথমতঃ মন অপবিত্র হয়, পরে মানসিক অপবিত্রতার তীব্র উত্তেজনায় শারীরিক ব্যভিচার সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নহে। এ জন্যই দূরদর্শী শাস্ত্রকারগণ রমণীদিগকে সুন্দর সুবেশধারী পুরুষ দর্শন, পর পুরুষের সহিত আলাপ এবং নৃত্য গীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পুরুষ অগ্নি এবং রমণী ঘৃত স্থানীয়া বলিয়া প্রবাদ আছে। অগ্নি স্পর্শে ঘৃত গলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং রমণীর এ সকল প্রলোভনীয় পদার্থ হইতে সতত দূরে অবস্থান করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দেবতার পবিত্র মন্দিরে ঘৃণিত কার্য্যের উন্মেষ কখন বাঞ্ছনীয় নহে। নারী-হৃদয় দেব মন্দির—সতী ধর্ম্ম নিত্য পবিত্র দেব বাঞ্ছিত যজ্ঞীয় হবি।

ঈশ্বর জগৎপতি। স্বামী রমণীর প্রত্যক্ষীভূত মূর্ত্তিমান ঈশ্বর বা ঈশ্বর তুল্য পরম ভক্তিভাজন মূর্ত্তিমান নর-দেবতা। রমণী সর্ব্ববিধ প্রলোভনের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা পরমেশ্বরের ধ্যান বা পতি পদ চিন্তা করিলে ব্যভিচার চিন্তা—কোন প্রকার পাপলিপ্সা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনকে অপবিত্র করিতে পারে না। চিত্ত জয় কারিণী যোগনিরতা যোগিনীর প্রাণে কোনরূপ পাপাকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না—চিত্ত শুদ্ধ নর নারীর হৃদয়ে কোনরূপ পার্থিব কলুষভাব ক্ষণকালের জন্যও স্থান পায় না। দীর্ঘকালের কঠোর সাধনা ব্যতীত সেরূপ দেবোপম চিত্ত শুদ্ধি অসম্ভব। শুধু চিত্ত শুদ্ধির অভাবে অনেক দেব দেবীকেও মুহূর্ত্তে পতিত হইতে হয়। প্রলোভনের সামগ্রী হইতে সতত দূরে থাকিয়া চিত্ত জয়—পবিত্রতা রক্ষা যত সহজ কার্য্য, সদা ভোগ সুখের মহা-প্রলোভনে ডুবিয়া থাকিয়া চিত্ত বিজয় তত বেশী কঠোর কর্ম্ম বা অনেকের পক্ষেই অনেক স্থলে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আমি চিত্ত জয়ী—প্রবৃত্তি বিজয়ী, এ কথা বলিলেই চিত্ত জয় বা প্রবৃত্তি দমন হয় না। কঠোর পরীক্ষা ব্যতীত মনুষ্যের মনকে বিশ্বাস করা যায় না—বিশ্বাস করিতেও নাই। অগ্নি শুষ্ক ইন্ধন পাইলেই জ্বলিয়া উঠে—ঘৃত সামান্য আতপ-তাপে বা অগ্নি স্পর্শ করিতে করিতেই বিগলিত হইয়া যায়। সেইরূপ স্থান,

কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া না চলিলে অতি অল্প কারণেই নর নারীর চরিত্র কলুষিত হয়—প্রলোভনে পড়িয়া দেব চরিত্র নরনারীও মুহূর্ত্তে পাপের পঙ্কিল গর্ত্তে গড়াইয়া পড়ে, ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদের চির পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ সাময়িক অসতর্কতার প্রলোভনে পড়িয়া কত দেবতুল্য নর চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে, দেবীসমা নারী আপনার বক্ষঃ লুকায়িত অমূল্য স্পর্শমণি হারাইয়া অপবিত্র অনন্ত কলঙ্ক পসর মাথায় বহিয়া বিশ্ব নিয়ন্তা ও বিশ্ববাসীর চির ঘৃণা-ভাজন হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

সতী হইতে হইলে পতিব্রতা হওয়া—পতি-ভক্তি-মতী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পতিভক্তিহীনা হইয়া সতী হইবার কথাটা 'সোণার মৃণ্ময় কলসীর' কথার ন্যায় অসম্ভব কৌতুক কাহিনী মাত্র। পতিভক্তি পরায়ণতাই সতীত্ব রক্ষার প্রধান উপায় বা একমাত্র নিদান। কায়মনোবাক্যে সেবা পরিচর্য্যা দ্বারা পতিদেবতার মনোরঞ্জন করাই সতীধর্ম্ম। যে রমণী মুর্ত্তিমান দেবতা-পতির তুষ্টি সম্পাদনে অসমর্থ, অশরিরীস্বর্গীয় দেবতার সাধনায় সে কিরূপে সিদ্ধি লাভ করিবে? পার্থিব প্রত্যক্ষ দেবতা পতিকে পূজা ভক্তি ও মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে না পারিলে, অজানা অজ্ঞাত দেশের অপ্রত্যক্ষ স্বর্গীয় দেবতার সন্তোষ বিধান তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত। যিনি পতিভক্তিমতী তিনিই পরম সাধ্বি-সতী। জগন্মাতা জগদম্বাও আদর্শ পতিভক্তি পরায়ণা বলিয়াই আদর্শ সতী। পতির জন্য আত্মবিসর্জ্জন না করিয়া তিনিও বিশ্বপূজ্য বিশ্বনাথের মহিষী হইতে পারেন নাই।

একমাত্র পতি-পদ পূজা করিয়াই তাঁহার সন্তোষ বিধান করা বা পতিব্রতা সতী হওয়া যায় না। পতিব্রতা সতী হইতে হইলে পতির প্রীতি সম্পাদনার্থ তাঁহার পিতা মাতা, ভগিনী ও আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলকেই যথাযোগ্য সেবা পরিচর্য্যা ও প্রীতিকর বাক্য দ্বারা আপনার জন করিয়া লইতে হয়। কেবল পতিকে লইয়াই পতিব্রতার সংসার নহে। স্বামীর আত্মীয়স্বজন,—এমন কি দাস দাসী ও গৃহ পালিত পশু পাখীটিকে পর্য্যন্ত লইয়াই পতিব্রতার সংসার। স্বামী গৃহের সকলের সুখ সুবিধার বিধান করিয়া—সকলের প্রীতি সম্পাদনে পতির প্রাণে প্রীতির অমৃত নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিয়া নিয়ত তাঁহার সুখ শান্তি বর্দ্ধন করাই পতিব্রতা সতীর প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ক্রমশঃ

বিরহিনী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী।

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

বসন্তের প্রতি।

১

এস বসন্ত কর শান্ত—
এ দুরন্ত বিরহে।
আন সঙ্গে সে ত্রিভঙ্গে,
নানা রঙ্গে যে রহে।

২

(বৃন্দার প্রতি)

আন বৃন্দে সে গোবিন্দে
নিরানন্দে রহেছি।
বল কৃষ্ণে কত কষ্টে
দুরাদৃষ্টে রহেছি।
কর প্রসন্ন মম দৈন্য
শ্যাম ভিন্ন না জানি।
পাতি শয্যা, ছাড়ি সজ্জা,
লোক লজ্জা না মানি।
আছি মগ্ন, বাস নগ্ন,—
মন ভগ্ন বিরহে।
বিধি রুষ্ট, দেহ নষ্ট,
কত কষ্ট কে কহে।
ভুলি কর্ম্ম কুল ধর্ম্ম—
হৃদি মর্ম্ম বিদরে।
নাহি লক্ষ পান ভক্ষ্য
মন দুঃখ কে হরে।
শূন্য কক্ষ, ভাসে বক্ষ,
জল মুখ্য সে পদে।

চিত রুদ্ধ, বাক বদ্ধ
হৃদি দগ্ধ বিপদে।
দেহ শীর্ণ জরা জীর্ণ
কাল বর্ণ হয়েছি।
মান ভঙ্গ রতি রঙ্গ
শ্যাম সঙ্গ ভুলেছি।
অতি লুব্ধ, মন ক্ষুব্ধ
নাম শব্দ শ্রবণে।
মানি সত্য সে অনিত্য
তবু চিত্ত না মানে!
আন বৃন্দে! সুত নন্দে,
প্রেমানন্দে গোকুলে।
মন মত্ত, চল চিত্ত,
কাঁদি সত্য বিফলে।

মায়া।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিপিনের কক্ষ। অহল্যা শায়িতা, মায়া তাহার পায়ে ঔষধ মালিশ করিতেছে, মঞ্জরী তাহাকে ব্যজন করিতেছে। সুরমা আসীনা।

অহল্যা। [মায়ার প্রতি] ওগো তোমায় আর আমার পা নিয়ে কচ্লাতে হ'বে না।

মায়া। পায়ের কন্কনানি কমেছে কি মা?

অহল্যা। হা গো হা। ক'দিন ধরে দিন রাত ছড়ে ছড়ে আমার পা দুটো আড়ষ্ট করে দিয়েছ। এখন ছাড় একটু বসি।

[মায়ার সাহায্যে উঠিয়া উপবেশন]

বড় বউ মা আছ কি গা?

সুরমা। হ্যাঁ মা! আমায় কি বল্‌ছিলেন!

অহল্যা। আমার মেজ ভাইপোর মেয়ে অতসীর সঙ্গে তোমার ভায়ের বে'র সম্বন্ধর কথা।

(মঞ্জুরীর হাতের পাখা খসিয়া পড়িয়া গেল।)

মায়া। মঞ্জুরী তোমার হাত ভেরে গেছে। আমায় পাখাখানা দাও।

(মঞ্জুরী ক্ষিপ্র গতিতে পাখা তুলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাতাস করিতে লাগিল)

অহল্যা। হাঁ গা ছোট বৌমা আমি তোমার কি করেছি যে, আমায় সর্ব্ব রকমে জ্বালাচ্ছ। আমি বড় বউমার সঙ্গে দুটো কথা কইছি আর তুমি অন্য কথা পাড়লে। বড় বউমা তোমায় কি বল্‌ছিলাম?

সুরমা। অতসীর সম্বন্ধের কথা।

অহল্যা। হ্যা। তোমার মাকে সে কথা বলেছ কি?

সুরমা। না মা। ক'দিন মায়ের কাছে যেতে পারি নাই। এইবার যে দিন যাব বল্‌বো।

অহল্যা। হ্যাঁ। বেয়ানকে আমার নাম করে বলো তাকে অতসীকে নিতেই হ'বে। অতসীর জ্যাঠা সে দিন বল্‌ছিল তাকে আর বেশী দিন রাখা যায় না। মাঘ মাস পেরুলেই সে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তেরো হয়ে চোদ্দোয় পড়্‌বে। তবে বাড়ন্ত নয় বলে তেমন দেখায় না।

[রাখালের মায়ের প্রবেশ]

রাখালের মা। এই যে মা! আজ উঠ্‌তে পেরেছ, কেমন আছ?

অহল্যা। কে ও রাখালের মা!. এস।

রাখালের মা। এখন কি বেশ সেরেছ?

অহল্যা। আর কি বল্‌ব। বিপিন রাগ করে, দুঃখ করে, তাই ওষুধ খেতে হয়। নইলে কি আর সার্‌তে সাধ যায়। গুঁড়োগাঁড়া যা আছে রেখে যেতে পার্‌লেই বাঁচি।

রাখালের মা। এখন কি মা তোমার গেলে চলে। বিপিন বাবু হাজার হ'ক ছেলে মানুষ বড় বৌদিদিও ছেলে মানুষ! তুমি যতদিন আছ ওরা পর্ব্বতের আড়ালে আছে।

অহল্যা। আর কি সংসার কর্‌তে সাধ যায় মা। পোড়া বরাতে কখন কি হ'বে কে জানে।

রাখালের মা। ভাব্‌ছ কেন মা। বিপিন বাবু বেঁচে থাক রাজা হ'ক বড় বউ দিদি রাজরাণী হ'ক।

অহল্যা। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমার যে ছাই চাপা কপাল তাই ভয় হয়। দুটো ছিল একটায় ঠেকেছে।

রাখালের মা। মা বিপিন বাবু তোমার একাই এক সহস্র। তোমার ননী বেঁচে থাক তার বে হ'ক ছেলে হ'ক। এই সব দেখে নাতি নাতবউয়ের কোলে মাথা দিয়া চাঁদের হাট রেখে তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে যাবে।

অহল্যা। আমার কপালে কি তা হবে? অমন সোনার চাঁদ ছেলে কি এ পোড়া কপালে সইবে? একজন যে সইল না মা।

[মায়া অশ্রুমোচন করিল।]

রাখালের মা। কি কর্‌বে বল মা। সকলই ভগবানের হাত। নইলে কি অমন সোনার পুত কারুর যায়।

অহল্যা। ডাইনেতে খেয়ে ফেল্লে মা! ডাইনেতে খেলে। সেই সর্ব্বনেশে দিন, যে দিন প্রবোধের অমন হ'ল প্রবোধের ঘরে গিয়া দেখি ডাইনী আগুণ খাকীর মত প্রবোধের কাছে বসে রয়েছে। প্রবোধ বল্লে ভাল আছি। তখন কি জানি রাক্ষুসী সেই রাত্রেই প্রবোধকে খাবে তা'হলে কি চলে আসি। [অশ্রু মোচন]

রাখালের মা। কেঁদনা মা! তোমার কান্না দেখে বড় বৌউদিদির চোখে জল এসেছে। তুমি কাঁদ্‌লে যারা আছে তাদের যে অকল্যাণ হ'বে।

অহল্যা। না কাঁদব না। এক এক সময় চাপ্‌তে পারি না, তাই কাঁদি।

[ননীর প্রবেশ।]

ননী। কাকীমা,—কাকীমা,—আমি আজ একজামিনে ফাষ্ট হয়েছি।

[ননী মায়ার গলা জড়াইয়া ধরিল।]

অহল্যা। কেও ননী দাদা। ইস্কুল থেকে এলে।

ননী। হ্যা ঠাকুরমা। তুমি আজ ঘর থেকে উঠে এসেছ কেন?

অহল্যা। আমার যে অসুখ সেরে গেছে দাদা।

ননী। তোমার অসুখ সেরে গেছে। বেশ হয়েছে। ঠাকুর মা, আমি আজ একজামিনে ফাষ্ট হয়েছি। ফাষ্ট কাকে বলে জান! ফাষ্ট জান বুঝ্‌তে পার্‌লে!

অহল্যা। বেচে থাক দাদা রাজা হও।

সুরমা। ননী আয়। কাপড় ছেড়ে জল খাবি আয়।

ননী। কাকীমা খাবার দিবে চল।

সুরমা। আয় আমি দিচ্ছি। কাকীমাকে দিতে হবে না।

ননী। তুমি দিলে খাব না। কাকীমা দেবে।

সুরমা। [ননীর হাত ধরিয়া] দুষ্টমি কর্‌তে নেই। চ আমি দিচ্ছি।

ননী। [হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে] না কাকীমা দেবে।

মায়া। চল বাবা আমিও যাচ্ছি।

সুরমা। ছোট বউ তোমায় আর আস্‌তে হ'বে না।

ননী। না কাকীমা যাবে।

মায়া। ননী যখন বলছে যাই না দিদি।

[সুরমা ও তৎসঙ্গে ননী ও পশ্চাতে মায়ার প্রস্থান।]

রাখালের মা। ননী তোমার ছোট বউয়ের ভারি নেওটো।

অহল্যা। সে ত দেখ্‌তে শুন্‌তে ভালই। তবে যে ডাইনি! বুক ধড়াস ধড়াস করে। প্রবোধের বে দিয়ে ঘরে যে রাক্ষুসী নিয়ে আছি।

রাখালর মা। হ্যাঁ মা ঠিক বলেছ। ছোট বউএয়ের আয় পয় ভাল নয়।

অহল্যা। ডাইনি ডাইনি! নূতন এসে সকলকে ভুলিয়েছিল। খুব বাড় বাড়ন্ত হয়েছিল। তার পর দু বছর না যেতে যেতে নিজ মূর্ত্তি ধর্‌লে। প্রথমে কর্ত্তাকে খেলে, তার পর বিপিনের মেয়েকে খেলে তার পর নিজের বাপ্‌কে খেলে; শেষে পাঁচ বছর না যেতে যেতে প্রবোধকে খেলে।

[সুরমা ও মায়ার পুনঃ প্রবেশ।]

অহল্যা। বড় বউমা ননী দাদার খাওয়া হয়েছে ?

সুরমা। হ্যা মা। সে পড়তে গেছে।

[চন্দ্রমুখী ও একজন ঝিয়ের প্রবেশ।]

সুরমা। এস দিদি এস।

অহল্যা। কে বৌমা ? অতসীর মাসী ? বুড়ো হ'য়ে চোখে ভাল দেখ্‌তে পাই না তাই তোমায় প্রথমে চিনতে পারি নাই। অনেক দিন ত দেখি নাই।

চন্দ্রমুখী। আপনি কেমন আছেন, পিসীমা! দিন পনর আগে শুনেছিলাম আপনার অসুখ করেছে। আজ পটল ডাঙ্গার রাজাদের বাড়ী মেজ রাণীর ছেলের ভাতে নিমন্ত্রণ গিয়েছিলাম। ফিরিবার সময় রাস্তায় পড়ল তাই গাড়ী থামিয়ে আপনাকে দেখ্‌তে এলাম।

অহল্যা। বেঁচে থাক মা বেঁচে থাক। তোমার হাতের নোয়া সিঁতের সিঁদুর অক্ষয় হ'ক।

চন্দ্রমুখী। আপনি এখন সেরেছেন কি পিসীমা?

অহল্যা। আমাদের আর সারা সারি কি বল। যেতে পারলেই ভাল। দেখ বউমা অতসীর সঙ্গে আমাদের বড় বউমায়ের ভায়ের যাতে বে হয়, সেই কথা বড় বউমাকে বল্‌ছিলাম বড় বউমায়ের ভাই শশী বড় ভাল ছেলে।

চন্দ্রমুখী। এ বে হ'লে বেশ হবে পিসীমা। অতসীর বাপ মা নাই, বেশ সুখে থাক্‌বে। একটা পরিচয় দেওয়ার মত সম্পর্ক হ'বে। বে হয়েছে যেমন আমার মেয়ের। মনে হ'লে কান্না পায়। পাড়াগেঁয়ে দেশ তার উপর চালচুলো নাই। লোকের কাছে পরিচয় দিতে মাথা হেঁট হয়।

রাখালের মা। দিদিমণি, আমাদের এত ভাল লোক আর তার কপালে এমন হ'ল। পোড়া ভগবানের বিচার এই রকম। আমরা দিদিমণিকে এত বলি উষাকে সেখানে পাঠিও না তা দিদিমণি শোনে না।

চন্দ্রমুখী। যখন বে দিয়াছি কি করি বল। আর এই তিন বছর বে হয়েছে এখনও উষাকে কোন কষ্ট দেয় নাই। তাই মাঝে মাঝে পাঠাই। তবে কখন ১০।১৫ দিনের বেশী রাখি না। ঝি এক গেলাস সর্ব্বৎ দে ত।

সুরমা। সে কি কথা দিদি! আমাদের বাড়ী এলে আর তোমার ঝি সর্ব্বৎ দেবে। আমি আনাচ্ছি।

চন্দ্রমুখী। না দিদি আনাতে হবে না। আমার ঝিয়ের কাছেই রয়েছে। ক'দিন অম্বলের মত হয়েছে বলে ডাক্তার জলের বদলে রূপার পাত্রে তৈয়ারী করা নেবু আর ছোট এলাচের সর্ব্বৎ খেতে বলেছে। তাই যেখানে যাই রূপার ছোট কৌটা করে খানিকটা সর্ব্বৎ আর একটা রূপার গেলাস নিয়া যাই। ঝি দে।

[ঝি রূপার গেলাসে করিয়া সর্ব্বৎ দিল।]

রাখালের মা। দিদিমণি উষা ঘর কর্‌তে যাবার পর তার চিঠি পেয়েছ?

অহল্যা। হাঁ। চিঠি না এলে কি স্থির থাকতে পারি? উষাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে ত একদণ্ড নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না।

সুরমা। দিদি বে'র সময় শুনেছিলাম উষার শ্বশুরের অবস্থা ভাল, খুব বনেদী ঘরের লোক উষাকে খুব যত্ন করে।

চন্দ্রমুখী। বনেদি ঘর না ছাই। জামাই যখন আসে সে রকম কিছুই দেখি না।

কখনও একটা ভাল সিল্কের বা জরির জামা গায়ে দেয় না, ভাল জুতা পরে না। আঙুলে একটাও আংটি পরে না। আমরা যে সব জিনিষ ভাল ভাল জামা কাপড় আংটি চেন দি শুনেছি নাকি তা বিক্রী করে সংসার চালায়।

অহল্যা। তা বউমা অমন যায়গায় মেয়ের বে দিলে কেন?

চন্দ্রমুখী। তখন কি আমরা কিছু জান্‌তে পারি পিসীমা! আমার মামা শ্বশুর সব ঠিক ঠাক করে তার কে হয় বলে, আমাদের কিছু জান্‌তে দেয় না। উনি তখন কাজে ব্যস্ত থাক্‌তেন, নিজে ত কিছু দেখ্‌তে পার্‌তেন না। মামার উপর ভার দিয়াছিলেন তাই মামা এই সর্ব্বনাশ করে।

অহল্যা। হাঁ হাঁ শুনেছি বটে, নেপেন রাজ মিস্ত্রীর কাজ করে বলে বড় ঝঞ্ঝটে থাক্‌তে হয়।

সুরমা। রাজ মিস্ত্রির কাজ নয় মা, কণ্‌ট্রাক্টারির কাজ।

অলহ্যা। সে কি কাজ?

রাখালের মা। অনেক টাকা না থাক্‌লে সে কাজ কেউ কর্‌তে পারে না। নিজের টাকা দিয়া বড় আফিস করে, লোকের বাড়ী তৈয়ারী করিতে হয়। তাকে কন্‌ট্রাক্‌টারী বলে।

অহল্যা। আমরা সেকেলে লোক কিনা ইন্‌জিনী মিন্‌জিরী বুঝি না। ঐবাড়ী তৈয়ারী করে কিনা, তাই মনে করি রাজ মিস্ত্রীর কার্য্য করে।

চন্দ্রমুখী। দিদি বিকাল হয়ে এলো আমি এখন যাই।

অহল্যা। বউমা চল্লে তা এস। বড় বউমা বউমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এস।

[চন্দ্রমুখী, তাহার ঝি ও সুরমার প্রস্থান।]

অহল্যা। ছোট বউ তুমি কি চোখে দেখ্‌তে পাও না। সন্ধ্যা হয়েছে ঘরে কি আলো দিতে হ'বে না।

মায়া। এখনও অনেক বেলা আছে মা।

অহল্যা। অন্ধকার হয়েছে আর তুমি বল্‌ছ বেলা আছে।

মায়া। মেঘলা করেছে বলে অন্ধকার দেখাচ্ছে।

রাখালের মা। এমনত কোথায় দেখি নাই। খাশুড়ী বল্‌ছে আর তুমি আলোটা আন্‌তে পারছো না।

[মায়ার প্রস্থান।]

অহল্যা। দেখ আবার কি করে। কিসে বাড়ীর অমঙ্গল হয়, কেবল সেই চেষ্টা।

[প্রদীপ লইয়া মায়ার প্রবেশ ও তাহা পিলসুজে স্থাপন।]

অহল্যা। হ্যাঁ গা ছোট বউ তুমি কিরকম অলুক্ষণে গা। দক্ষিণ মুখে প্রদীপ রাখতে নাই আর তুমি দক্ষিণ মুখে রাখলে।

মায়া। না মা আমিত দক্ষিণ মুখে রাখি নাই।

অহল্যা। আমি দেখছি রেখেছ আর তুমি বলছ না।

মায়া। আমি মা পূর্ব্বমুখে রেখেছি।

রাখালের মা। ছোট বউ শাশুড়ির সঙ্গে ঐ রকম করে চোপরা করতে হয়। প্রদীপটা ঘুরিয়ে ঠিক করে রাখতে কি হয়েছে?

অহল্যা। তা রাখবে কেন রাখালের মা। তাতে যে বাড়ীর অকল্যাণ হ'বে না। শুধু প্রবোধকে খেয়ে ত আশ মেটে নাই, সকলকে খাবেন তবে।

মায়া। মা! মা! [অশ্রু মোচন।]

অহল্যা। ওগো তোমায় ব্যগত্যা করি সন্ধ্যাবেলা চোখের জল ফেলে আর বাড়ীর অলক্ষণ করো না।

[সুরমার প্রবেশ।]

বড় বউ মা এলে। ছোট বউয়ের আক্কেল দেখেছ। দক্ষিণ মুখে প্রদীপ রেখেছে আর সে কথা বলেছি বলে কাঁদতে বসলো।

সুরমা। প্রদীপ ত দক্ষিণ মুখে নাই মা।

অহল্যা। তা হ'লে বোধ হয়, রাখালের মা কি মঞ্জুরী ঘুরিয়ে রেখেছে। অতসীর মামী চলে গেছে?

সুরমা। হ্যাঁ মা।

রাখালের মা। আমি এখন যাই মা। কাল আবার পারি ত আসব।

অহল্যা। আমিও ঘরে যাই। একটু ইষ্টদেবতার নাম করিগে।

[রাখালের মায়ের প্রস্থান ও মায়ার হস্তে ভর দিয়া অহল্যার প্রস্থান।]

মঞ্জরী। বড় বউ দিদি ননীর মামার কি এই শ্রাবণ মাসেই বে হবে?

সুরমা। না। এ তার জন্ম মাস এ মাসে ত বে হ'বে না।

মঞ্জরী। মায়ের মেজ ভাইপোর মেয়েকে কি দেখতে ভাল।

সুরমা। কেন তুই তাকে দেখিস্ নাই। মেয়েটি বেশ। আমার খুব পছন্দ হয়। একদিন এইখানে আনিয়ে আমার মা'কে দেখাব। মায়ের পছন্দ হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

[বিপিনের প্রবেশ ও তাহাকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন দিয়া মঞ্জুরীর প্রস্থান]

বিপিন। মল্লিকদের মেজ বউয়ের কাণ্ড শুনেছ? বিধবা হয়েছিল বলে তার শ্বশুর তাকে বিষয়ের বকরা দিয়া গেল, আর সে সেই বিষয় নিজের ভাইকে দিয়েছে।

সুরমা। তা তার ছেলে পিলে নাই কাকে দেবে?

বিপিন। শ্বশুরের বিষয় তার দেবরদেরই দেওয়া উচিত ছিল।

সুরমা। তার যা ইচ্ছা হয়েছে করেছে। লোকে ত এমন করেই থাকে।

বি। দেখ আমাদেরও একটা গোল রয়েছে। প্রবোধ তার অংশ ছোট বউমাকে উইল করে দিয়ে গেছে, একটা ভাবনার কারণ। তা ছোট বউ মা কি ওরকম করবে?

সুরমা। যদিই বা করে তাতে দোষ কি? ছোট বউয়ের ভায়ের অবস্থা শুনেছি খারাপ হয়ে-গেছে। দুঃসময়ে যদি ভাইকে নিজের বিষয় দেয়, ছোট বউ কিছু অন্যায় করবে না। স্বামী ছাড়া মেয়ে মানুষের ভায়ের মত আপনার আর কে আছে?

বিপিন। না,—না ছোট বউমা তা করবে বলে বোধ হয় না। ছোট বউমার টাকা কড়ি গহনা সবই ত আমার কাছে থাকে, তাতে ত কিছু আপত্তি করে না। ননীকে যখন ছোট বউমা অত ভালবাসে ননীকেই সব দিয়ে যাবে।

সুরমা। ওগো ও কথা মুখে এনো না। ননীকে ছোট বউয়ের কিছু দিতে হবে না। একে ছোট বউ ননীকে ভালবাসে বলে দিন রাত মনের আতঙ্কে থাকতে হয়, তার উপর আর বিষয়ে কাজ নাই। আপদের উপর আর বালাই জুটিও না।

বিপিন। তোমাদের ও সব ভুল ধারণা। ছোট বউমা ননীকে ভালবাসে সে ত ভালই।

সুরমা। তোমরা পুরুষ মানুষ ও সব বোঝ না, মান না। ও কথা যাক রাণীর হার গড়তে দিয়েছ কি?

বিপিন। বে'র সময় ত আবার দিতে হবে। এখন আর নাই বা হল।

সুরমা। বে'র সময় দিতে হবে বলে এখন আর দেবে না। এত দিন কি সে শুধু গলায় থাকবে।

বিপিন। কেন তার ভাতের সময় ত এক ছড়া গড়ান হয়েছিল।

সুরমা। সে হারে কি আর চলে? রাণী এখন শত্রুমুখে ছাই দিয়া ছয় বৎসরে পড়েছে। কোথাও যেতে আসতে হলে পরে যাবার মত এক ছড়া

হার না হলে কি চলে।

বিপিন। গায়ে ত জামা টামা থাকে। মিছামিছি আর হারের দরকার কি?

সুরমা। তুমি যে ওকথা বল্‌বে তা আমি জানি। তুমি যে রকম কিপ্পন তোমার হাত থেকে বিষয় বার করে নেওয়া ছোট বউয়ের উচিত।

বিপিন। আহা ও কথা বল্‌ছ কেন? আমি কাল সকালে রাণীর হার গড়াতে দেব।

সুরমা। গড়াতে দাও, আর নাই দাও, আমি ছোটবউকে তোমার কাছ থেকে বিষয় বার করে নিতে বল্‌ব।

বিপিন। না না ও কথা বলো না। পৈতৃক বিষয়। নিজের হাতেও অনেক বাড়িয়েছি। অর্দ্ধেক গেলে অনেক টাকা আয় কমে যাবে। বড় বউ একটা কাজ কর্‌বে?

সুরমা। কি?

বিপিন। আমি ভাবছিলেম এ রকম সন্দেহ ও ভাবনার মধ্যে থাকার চেয়ে এখন থেকে একটা বন্দোবস্ত করে নেওয়া ভাল।

সুরমা। কি সন্দেহ? কি বন্দোবস্ত?

বিপিন। স্ত্রীলোকের মন কখন কি রকম থাকে বলা যায় না। তাই মনে কর্‌ছিলাম, ছোট বউমাকে দিয়া এখনই কোন বন্দোবস্ত করিয়ে নিলে ভাল হয়। ছোট বউমা যত দিন জীবিত থাক্‌বেন অবশ্য তার বিষয় তারই থাক্‌বে। আমি এখন যেরূপ দেখ্‌ছি শুন্‌ছি সেই রকম দেখ্‌ব। ছোট বউমার অবর্ত্তমানে ননী সে বিষয় পাবে। ছোট বউমাকে এ কথা বল্‌বে?

সুরমা। আবার সেই কথা বলছ। ননী যাতে ছোটবউয়ের বিষয় পায় এ রকম কাজ আমি কিছুতেই হতে দিব না।

[শশীর প্রবেশ]

বিপিন। শশী এসেছ ভালই হয়েছে। তোমাদের রিপন ষ্ট্রিটের বাড়ীর ভাড়াটে আর ৩ বৎসরের লিজ চায়। ভাড়া আরও ৫০৲ টাকা বেশী দিতে রাজী হয়েছে। তুমি কি বল!

শশী। বিষয় কর্ম্ম আপনি যেরূপ বোঝেন, আমি সেরূপ বুঝি না। আমি আর কি বল্‌ব। আপনার মত হলেই আমার মত। তবে কোন বাড়ীতে বেশ্যা ভাড়াটে না থাকে আমার এইরূপ ইচ্ছা হয়।

বিপিন। তুমি ঠিকই বলেছ। তবে অনেক দিন থেকে আছে, আর বেশী ভাড়া দিতে চাইছে। তা ছাড়া ও অঞ্চলে অন্য ভাড়াটে পাওয়া বড় কঠিন।

শশী। আজ আমার কাছে একজন দালাল এসে বল্‌ছিল একজন দোকানদার সে বাড়ী ২৫০ টাকা ভাড়ায় নিতে চায়। তাকে কাল সাকালে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বলেছি।

বিপিন। তা যদি হয় খুবই ভাল। কাল দালাল এলে কি বলে দেখি। তুমিও কাল এস।

শশী। হ্যা। আমিও তাকে সঙ্গে করে আন্‌ব।

সুরমা। দেখ এইবার শশীর বে'র সম্বন্ধ কর। মা আজ অতসীর কথা বলছিলেন।

বিপিন। অতসীর জ্যাটাও আমায় ধরেছে। তোমার মা ত অতসীকে দেখেছেন।

সুরমা। না। একদিন অতসীদের নিমন্ত্রণ করে আনাও। আমি মাকেও আস্‌তে বল্‌ব। তাহলে দেখা শুনা সব হবে।

বিপিন। তাড়া তাড়ির দরকার কি? কার্ত্তিক মাসে বাবার কর্ম্মের সময় ত অতসীরা আস্‌বে। সেই সময়েই হবে।

শশী। দিদি ও সব কাজ কোরো না বে কর্‌তে আমার একটুও ইচ্ছা নাই।

সুরমা। কেন?

শশী। দেখ পাঁচজনের কথায় ছেলেবেলা লেখাপড়া না করে, বাবার মনে যা কষ্ট দিয়েছি তার জন্য বড় দুঃখ হয়। বে করে মায়ের মনে কষ্ট দিতে পার্‌ব না।

সুরমা। কি পাগলের মত বল্‌ছ শশী। তোমার বে হলে মা কত সুখী হবেন।

শশী। তুমি আমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছ না দিদি। আজ কালকার মেয়েরা শাশুড়ীকে গ্রাহ্য করে না। প্রায়ই দেখা যায়, বউয়েরা শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে, নানা রকমে শাশুড়ীকে কষ্ট দেয়। এই সব কারণে আমার বে কর্‌তে ইচ্ছা হয় না।

সুরমা। সকলেই কি ঐ রকম হয়? তোমায় ও সব কিছু ভাব্‌তে হবে না, অতসী খুব ভাল মেয়ে।

শশী। আমার কথা শুনি কিন্তু বিবেচনা করে দেখো দিদি। আমি এখন আসি। ফণিকে খেতে বলেছি সে সন্ধ্যার পরই আস্‌বে।

[শশীর প্রস্থান]

সুরমা। ননী একেবারে শুখ্‌য়ে গেছে। বাবা যাবার পর থেকে নূতন মানুষ হয়েছে।

বিপিন। হ্যাঁ। যদি তোমার বাবা থাক্‌তে থাক্‌তে এ সব বুঝ্‌তে পারত বড় ভাল হ'ত।

সুরমা। তখন ছেলে মানুষ ছিল কিনা? সহজেই লোকের কুপরামর্শে ভুলে যেত।

বিপিন। আমারও তাই মনে হয়। দেখ আমার কথাটা ছোট বউমাকে বল্‌তে ভুল না। বিশেষ তাড়াতাড়ির দরকার নাই, তবে যত শীঘ্র বল্‌তে পার ভাল।

সুরমা। ওকথা আমায় আর বলো না। এর উপর যদি ছোট বউ তার বিষয় ননীকে দেয় তাহলে ননী আর বাঁচ্‌বে না। তা ছাড়া ছোট বউয়ের বিষয় তার যাকে ইচ্ছা তাকে দেবে। আমি তাকে কোন কথা বল্‌তে পারব না। সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি এখন যাই।

[সুরমার প্রস্থান]

বিপিন। পৈতৃক বিষয় অনেক পরিশ্রম করে বাড়িয়েছ। শেষে কি বংশ থেকে বেরিয়ে যাবে। না, না, তা হতে দেবনা বুঝিয়ে সুঝিয়ে বড় বউকে রাজী করতে হবে। আমি ত ছোট বউমায়ের বিষয় কেড়ে নিচ্ছি না।

[প্রস্থান]

খাদ্য ভাণ্ডারে মিষ্ট কি?

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময় সেই জেলায় তাঁহার এক জমিদারির মধ্যে একজন আয়মাদার ভদ্রলোক বাস করিতেন, সাধারণ লোকে তাঁহাকে রাজা বাবু বলিত। সেই আয়মাদারের নাম রঞ্জনকুমার। বিধাতার কেমন খেলা, যৌবন কালে রঞ্জনকুমার উপর্য্যুপরি পাঁচবার বিবাহ করিয়াছিলেন; পাঁচটি পত্নীই দু একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া লোকান্তরে চলিয়া যান, রঞ্জনের আবার বিবাহ হয়; এই প্রকারে তাঁহার এগারটি কন্যা জন্মিয়াছিল, পুত্র একটিও হয় নাই। একাদশটি দুহিতার গর্ভ ধারিণী ছিলেন পাঁচটি, এ কথা বলা হইল, শেষের পত্নীটি যখন সংসার ত্যাগ করিলেন তখন তাঁহার একটি কন্যা পঞ্চম বর্ষীয়া। "একটী কন্যা পঞ্চম বর্ষীয়া" একথা বলিলে সকলেই মনে করিবেন, সেই জননীর আরও কন্যা ছিল; বাস্তবিক ছিল না; সেই উপরতা গৃহিণীর ঐ একটি মাত্র কন্যা।

যতবার বিবাহ করেন, বাবু রঞ্জনকুমার ততবারই কন্যার পিতা হন;—যাঁহাদের সঙ্গে তামাসা চলে, তাঁহারা রঞ্জনকুমারের ডাক নাম দিয়াছিলেন "মেয়ের বাপ!"—রঞ্জনকুমার ঐ নামে যেমন দুঃখিত হইতেন, তেমনি অপমানও বোধ করিতেন, অপমানে মনের ঘৃণায় পাঁচবারের পর আর তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই।

"অষ্ট বর্ষে ভবেৎ গৌরী, নববর্ষেতু রোহিণী।"

মহর্ষী যাজ্ঞবল্ক্যের এই বচন প্রমাণে রঞ্জনকুমার আপন একাদশটি কন্যার মধ্যে পাঁচটিকে সপ্তমে অষ্টমে নবমে পাত্রস্থা করিয়াছিলেন, কুমারী ছিল ছয়টি; যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তখনও কুমারী ছিল ছয়টি।

বাবু রঞ্জনকুমার রায় জাতিতে ব্রাহ্মণ, বার্ষিক আয়ও ছিল প্রচুর, মাসের মধ্যে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, দ্বাদশী এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে তাঁহার বাড়ীতে দ্বাদশটি করিয়া (কোন কোন তিথি বিশেষে অধিক সংখ্যায়) ব্রাহ্মণভোজন হইত; ভোজনান্তে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের সহিত কর্ত্তার নানা প্রকার গল্প চলিত;—কতকগুলি শাস্ত্রীয় কথা, কতকগুলি সাংসারিক কথা এবং কতকগুলি খোসগল্প। সেই সকল গল্পে রঞ্জনকুমার অল্পাধিক পরিমাণে আমোদ প্রাপ্ত হইতেন। ছয়টি দুহিতা যখন কুমারী; কনিষ্ঠাটি যখন পঞ্চমবর্ষীয়া, রঞ্জনকুমার তখন ষষ্টিবর্ষের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং বুদ্ধি পাকিয়াছিল,—যাহা কিছু শুনিতেন, তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মনে মনে তর্ক বিচার আঁটিয়া রাখিতেন, যাহা কিছু বলিতেন, তাহাও বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অল্প কথায় ধীরে ধীরে পরিব্যক্ত করিতেন;—বার্দ্ধক্যে ভদ্রবংশীয় শিক্ষিত পুরুষগণের (সকলের না হউক, শতকরা প্রায় ২৫।৩০ জনের) ধৈর্য্য ধারণের শক্তিটা কিছু বৃদ্ধি পায়; যাহাদের স্মৃতি নষ্ট হয় না, তাঁহারা অতীত ঘটনার নজীর দেখাইয়া এক এক বিষয়ের বিচার করেন। রঞ্জনকুমার একদিন ব্রাহ্মণ ভোজনের পর নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মণগণের সহিত গল্প করিতে করিতে বিনীত ভাবে, কিঞ্চিৎ বিনম্র বদনে, যেন কিছু কুণ্ঠিত হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "পাঁচ জনকে নিজ ভবনে ভোজন করাইয়া অন্তরে তৃপ্তি লাভ করা যায়, ইহা আমি বুঝি, কিন্তু কে যেন সেই তৃপ্তি আমাকে সম্পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে দেয় না, আমি যেন অঙ্গহীন তৃপ্তি উপভোগ করি, এই জন্য মনে বড় আক্ষেপ থাকে। কেন আক্ষেপ হয়, আজ আমি আপনাদিগকে তাহা সংক্ষেপে বুঝাইব। যাঁহাদিগকে ভোজন করান যায়, তাঁহারা যাহাতে আশানুরূপ পরিতোষ লাভ করেন;

যথার্থ ভক্তিমান কর্ম্মকর্ত্তারা অবশ্যই সেই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন; যেখানে যে ভাল জিনিষটি পান, ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য তাহাই সংগ্রহ করিতে যত্নবান হন। কি যে ভাল জিনিষ, কি যে সুমিষ্ট, তাহা আমি হয় ত সংগ্রহ করিতে পারি না, এই আমার আক্ষেপ।"

রঞ্জন কুমারের আক্ষেপ শুনিয়া একজন বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য একটু খোসামোদ করিয়া বলিলেন,—"অমন কথা বলিও না, তোমার অভাব কি, দানে তুমি কল্পতরু, দ্রব্য বাছিয়া লইতে, এক গুণের স্থলে পাঁচ গুণ মূল্য দিতে তুমি কাতর হও না, সকল প্রকার উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী তুমি সংগ্রহ কর, তোমার তৃপ্তি কেন অঙ্গহীন থাকিবে! তোমার তৃপ্তি নিরন্তর পূর্ণাঙ্গ, সকলেই আমরা সর্ব্বদা এই কথা বলাবলি করি।"

বাবু রঞ্জনকুমার মাথাহেট করিয়া কি একটু ভাবিলেন, ব্রাহ্মণেরা উক্ত ভট্টাচার্য্যের বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহার (রঞ্জনকুমারের) বিস্তর প্রশংসা করিলেন, ইহার পর সেদিনকার মত মজ্‌লিস ভঙ্গ হইল।

"বাবু রঞ্জনকুমার মাথা হেঁট করিয়া কি একটু ভাবিলেন।"—কি যে সেই ভাবনা, অগ্রে তাহা অনুমান করা যায় নাই, দুই দিন পরে তাঁহার নিজ মুখেই ব্যাখ্যা প্রকাশ পাইল। বাড়ীতে কেবল স্ত্রীলোকের বৈঠক; কর্ম্মচারি অবশ্য পুরুষ আছে, তাহারা কিন্তু সে বৈঠকে উপস্থিত থাকে না, এদেশের সেরূপ প্রথাই নহে; অন্দরে কেবল স্ত্রীলোকের বৈঠক, পুরুষের মধ্যে কেবল গৃহস্বামী স্বয়ং। যে দিন বৈকালে ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে আক্ষেপ, তাহার দুই দিন পরে অপরাহ্ণ সময়ে বাবু রঞ্জনকুমার অন্দরের সেইরূপে বৈঠকে বসিয়া সংসারের পাঁচরকম নৈমিত্তিক ব্যবহারের আলোচনা করিতেছেন, একাদশটি কন্যা স্থির হইয়া বসিয়া তাঁহার সেই সমালোচনা শ্রবণ করিতেছে, মেয়ে গুলির মুখগুলি বেশ হাসি হাসি। কথা কহিতে কহিতে অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কর্ত্তা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বল দেখি মা, আমাদের সকল প্রকার খাবার জিনিষের মধ্যে কোন জিনিষটা মিষ্ট?"

কন্যা বলিল, "মধু।"—কর্ত্তা আবার দ্বিতীয়া কন্যাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন; কন্যা বলিল, "সন্দেশ।"—এইরূপে পর পর দশটি কন্যার প্রতিই ঐ প্রশ্ন,—পিতৃ প্রশ্নের উত্তরে মেয়েরা কেহ বলিল, চিনি, কেহ বলিল, জিলিপি, কেহ বলিল, মতিচুর, কেহ বলিল, গুড়, কেহ বলিল, সরপুরিয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কর্ত্তার ছোট মেয়েটির নাম নিতাইনন্দিনী। দশটি কন্যার দশ রকম উত্তর

শুনিয়া কর্ত্তা শেষকালে কনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত মা নিতু, আমাদের খাবার জিনিষের ভিতর কোন জিনিষটি তোমার মিষ্টি লাগে ?"

নিতাইনন্দিনী হাসিয়া হাসিয়া উত্তর দিল "নুন।"

কর্ত্তার রাগ হইল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বরোষে তিনি বলিলেন, "তামাসা!—কাজের কথায় তামাসা!—আমি বাপ, আমার সঙ্গে তামাসা!—আচ্ছা থাক,—না না—থাকা হবে না;—তুই যে সে দিন বলেছিলি এ জায়গাটা তোকে ভাল লাগে না,—মাসীর বাড়ী গিয়ে থাক্‌বি,—আচ্ছা—সেই কথাই ভাল,—মাসীর বাড়ী গিয়ে;—মিষ্টি মিষ্টি নুন খেয়ে,—মাস কতক সুখ ভোগ করে আস্‌গে যা!"

মাতৃহারা পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা পিতার মুখে ঐরূপ রাগের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল;—বালিকার চক্ষে জল দেখিয়া বাবু রঞ্জনকুমারের প্রাণ কাতর হইল না, দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়া তিনি সেই অশ্রুমুখী আদরিণী বালিকার ম্লান মুখখানি দেখিতে দেখিতে শুষ্ক নয়নে সচ্ছন্দে হেলিতে দুলিতে সদর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন; নিতাইনন্দিনীর অপরাপর ভগ্নীরা কিন্তু নেত্র জল সম্বরণ করিতে পারিল না, ভগ্নীদের মুখ পানে চাহিয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলিল, "তাই তো! বাবার এত রাগ!—একটি কচি মেয়ের কথা শুনে—সত্যি কি তবে—আমরা কি তবে"—অশ্রু বেগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আর কথা বাহির হইল না।

যে বেলাটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা ফুরাইল, প্রভাকর পশ্চিম সাগরে ডুব দিলেন; রাত্রি আসিল। রাত্রিকালে রঞ্জনকুমার রুটি খান, ছোট মেয়েটি নিকটেই থাকে, আদরিণী মেয়ে তাহাকেও কয়েকখানি প্রসাদ দেওয়া হয়, এ রাত্রে সে কথা আর মনেও রহিল না, বাবার আহারের সময় মেয়েও বাপের নিকটে আসিল না। * * * *

* * * * *

নবদ্বীপের গঙ্গার অপর পারে নিতাইনন্দিনীর মাসীর বাড়ী, পিতার আদেশে নিতাইনন্দিনী মাসীর বাড়ী গিয়া রহিল। মাসীর তিনটি পুত্র, তিনটি কন্যা, মাসী সধবা, নিতাইনন্দিনীর মেশোমহাশয় জমীদার সরকারে কর্ম্ম করিতেন।

মাসীর বাড়ীতে গিয়া কন্যাটি কেমন রহিল তিন বৎসরের মধ্যে রঞ্জনকুমার একবারও সে খবর লইলেন না, নিতাইনন্দিনী তিন বৎসর সেই বাড়ীতে কাটাইল; বয়স হইল অষ্টমবর্ষ। মাসীমার আগ্রহে ও যত্নে নিতাইনন্দিনীর বিবাহের একটি সম্বন্ধ জুটিল; অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাদানে গৌরীদানের ফল হয়,

অতএব অষ্টমবর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করা মাসীর একান্ত ইচ্ছা।

নিতাইনন্দিনী একদিন তাহার মাসীমাকে বলিল, "আমাদের বাড়ীতে মাসের মধ্যে চার পাঁচদিন ব্রাহ্মণভোজন হয়, মাঘ মাস পড়িয়াছে, তুমিও একদিন গুটি কতক ব্রাহ্মণভোজন করাও; সেই উপলক্ষে আমার বাবাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাও।"

ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন হইল। পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হইল। মাসী-মার একটি পুত্র নিজে গিয়া রঞ্জনকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল; পঞ্চাশটি ব্রাহ্মণ হইলেও আয়োজন যথেষ্ট। লোকে কথায় বলে, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন;—এখানেও সত্য সত্যই পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের আড়ম্বর। রন্ধন করিবেন মাসীমা স্বয়ং। স্নান করিয়া, দীর্ঘ কেশের অগ্রভাগে গ্রন্থী বাঁধিয়া মাসীমা রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলে পর নিতাইনন্দিনী চুপি চুপি তাহার কাণের কাছে গিয়া বলিয়া আসিল, "মাসী মা! আমার আজ একটি কথা রাখ। যতগুলি বাটীতে তরকারি সাজাইবে তাহার মধ্যে একজনের ভাগে যতগুলি বাটী সে বাটী গুলিতে নুন দিও না; নুন ছাড়া তরকারীতে আজ আমার একটা পরীক্ষা আছে।"

কারণ বুঝিতে পারিলেন না, অথচ আদরিণী ভগ্নীকন্যার ঐ অনুরোধটি রক্ষা করিতে মাসীমার কৌতুক বাড়িল; কৌতুকে কৌতুকেই কার্য্যটি সম্পূর্ণ হইল।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা একে একে আসিতে আরম্ভ করিলেন, বাবু রঞ্জনকুমার রায় বেলা দুইপ্রহরের অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া দর্শন দিলেন, আদর অভ্যর্থনার ধুম চলিল, নূতন আলাপের মত অনেক রকম নূতন নূতন কথা হইল। অতঃপর আহারের আয়োজন। মাসীমাই সকলকে পরিবেশন করিলেন, কেবল রঞ্জন কুমারের তরকারির বাটীগুলি নিতাইনন্দিনী সাজাইয়া রাখিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিলেন, পাক শাক অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া পাচিকা ঠাকুরাণীর বিস্তর খোষনামী দিলেন, কোন তরকারির কোন খুঁতের কথা কেহই তুলিতে পারিলেন না, একটু পরেই যাহা প্রকাশ পাইবে, তাহা কেহ অগ্রে জানিতেও পারিলেন না। রঞ্জনকুমার মাঝে মাঝে দুই তিনবার "এটায় লবণ কম, এটা অলবণ, এটায় লবণ ভুল" ইত্যাদি মন্তব্য দিয়া ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাটি কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়াছিল, মাসীমাও সেইরূপে হাসিয়াছিল, কিন্তু কেন যে, সে রকমের খেলা, তাহার আসল বৃত্তান্ত তিনিও

বুঝিতে পারিলেন না, নিতাইনন্দিনী সেই আসল কারণটা কাহাকেও কিছু বলে নাই। মাসীমা একে একে অলবণ বাটীগুলি সরাইয়া রঞ্জনকুমারের ভোজন পাত্রের নিকটে নূতন নূতন সলবণ বাটী আনিয়া বসাইলেন, ভোজনে আর কোন রহস্য উপস্থিত হইল না। নিতাইনন্দিনী সেই অবসরে গলায় কাপড় দিয়া পিতার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোন বাটীর কোন তরকারি মিষ্টি? আগে কার বাটী গুলি মাসী মা উঠাইয়া লইয়া গেলেন, নূতন বাটী আসিল; তুমি বলিয়া ছিলে অলবণ, কেন হইয়াছিল অলবণ! সে কথা কি মনে পড়ে?"

রঞ্জনকুমার হাস্য করিলেন, গোল মিটিয়া গেল, ধাঁ ধাঁ ঘুচিয়া গেল, সর্ব্ব প্রকার মিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে লবণ অধিকতর মিষ্ট, সকলেই সে কথা শুনিল, সকলেই বুঝিল, সকলেই হাসিল, লবণের মহিমা প্রকাশ্যরূপে কীর্ত্তিত হইল।

কন্যার মাসী অন্য সম্পর্কে কন্যার পিতার কে হয়, সকল দেশের সকল লোকেই তাহা বেশ জানে; বিশেষতঃ আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালা ভাষায় সেই আদরিণী কুটম্বিনীকে যে আখ্যায় পরিচিত করা হয়, তাহা অতীব কৌতুকাবহ,—যাহারা রসিক, তাহারা সেই কৌতুকাবহ সম্পর্ক লইয়া অনেক প্রকার রসিকতার অভিনয় করিয়া থাকেন।

নন্দিনীর মাসীমা এখানে রসিকতার ভাব গোপন করিয়া আত্মীয় ভাবে বলিলেন, "ঠাকুর জামাই! আজ আর তোমার যাওয়া হইবে না;—আসা ত নাইই প্রায়, যদি দৈবাৎ বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে, তবে আর দু একদিন মেরামতের নাম করোনা—তিনটে রাত এইখানে প্রভাত করে যাও। কি বল? ঠাকুর ঝির এ অনুরোধটা কি রক্ষা হবে?" ঠাকুর জামাই উত্তর করিলেন, "তিনটে রাত প্রভাত করা ঘটিবে কি না ঘটিবে, ভবিষ্যতের দেবতারা সে কথার বিচার করিবেন, আপাতত আমার বিচারে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আজি-কার রাতটা এই বাড়ীতেই প্রভাত করা যাবে।"

"রাতটা প্রভাত করা যাবে,"—শ্যালিকার আমন্ত্রণে রঞ্জনকুমারে এইটুকু সরল উত্তর, কিন্তু রাত তখনও আইসে নাই, পশ্চিমদিকে পলাইবার জন্য সূর্য্যদেব তখন রাঙামুখে রাঙাচোখে পূর্ব্বদিকে উঁকি মারিতে ছিলেন, ঠাকুর জামাইকে রাত্রি যাপনে রাজী করিয়া ঠাকুরঝি যথার্থ ই খুসী হইলেন,—খুসীর সঙ্গে হাসি আসিয়া যোগ দিল; মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া ঠাকুরঝি তিনবার বলিলেন,—হুঁ—হুঁ—হুঁ।"—

পল্লীগ্রাম,—দুই তিন রকম রাগিণী ভাজিয়া পাখিরা প্রদোষ সঙ্গীত ধরিল, বংশী ধারিরা পূরবী রাগিণীর আলাপ করিল, বংশকুঞ্জ কাননে শৃগাল দম্পতিরা স্বায়ং মঙ্গলাচরণে "হুয়া হুয়া" শব্দে উলুধ্বনি দিল সন্ধ্যা হইল।

সন্ধ্যা-বন্দনার পর কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া সাদরে মুখ চুম্বন পূর্ব্বক সস্নেহ বচনে রঞ্জনকুমার বলিলেন, "মা! তোমার সে দিনের কথার ভাব আমি বুঝিতে পারি নাই;—তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছ মনে করিয়া আমি তোমাকে বাড়ী ছাড়া করিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে আমার উপর তোমার অভিমান হইয়াছিল, কিন্তু মনে কর, আমি তোমাকে ভিন্ন স্থানে পাঠাই নাই, তোমার নিজের মাসীর বাড়ীতেই পাঠাইয়াছিলাম!"

কন্যাবলিল, "বাবা, তোমার উপর আমি অভিমান করি নাই। বাপের উপর ছেলে মেয়ের অভিমান চলে না। আমি যদি দোষ করিয়া থাকি, তুমি আমাকে শাসিত করিবে, তোমার শাসন আমি মাথা পাতিয়া লইব, এই ত আমাদের জ্ঞান গুরুর উপদেশ। লবণ একটি সামান্য জিনিষ, লবণের গুণের কথা লইয়া আর বেশী তর্ক তুলিব না; পাঠশালে শিখিয়াছি, দুই কথায় কেবল তাহাই বলি। গুরু মা* বলিয়াছেন, "যত প্রকার মসলা দাও, যত প্রকার তরিবত কর, ঘি মিষ্টি যতই ঢালিয়া দাও, লবণ না দিলে আমাদের কোন তরকারির কিছুই আস্বাদন হয় না। তাহাই আমি বুঝিয়াছি, তাহাই আমি শিখিয়াছি, তাই আমি সে রাত্রে নুনকে অন্যান্য সকল মিষ্টি অপেক্ষা ভাল মিষ্টি বলিয়াছিলাম!

সাধারণলোকে রঞ্জনকুমারকে আয়মাদার না বলিয়া রাজা বাবু বলে, পূর্ব্বে এই কথার আভাষ আছে; সেই আভাষ প্রমাণে নিতাইনন্দিনীকে আমারা রাজনন্দিনী বলিতে পারি;—বলিলেই মানায় ভাল। প্রকৃতি প্রদত্ত রূপ থানিও রাজকন্যার রূপের মত।—অবয়বের গঠন নাতিদীর্ঘ, নাতিথর্ব্ব; নাতিস্থূল, নাতিকৃশ; গাত্রের বর্ণ মাটোমাটো গৌর, হস্তপদ মোলায়েম; হস্তের অঙ্গুলীগুলি যেন চাঁপার কলি; মুখখানি বাদামে, ভ্রমর কৃষ্ণ তারকাযুক্ত নয়ন দুটি প্রায় আকর্ণ বিশ্রান্ত; কপাল খানি ছোট, তাহার নিচে দিব্য লোমাবলী

* পূর্ব্বে আমাদের দেশে এখনকার মত বালিকা বিদ্যালয় ছিল না, গুরুমা কথাটিও চলিত ছিল না, নারীশিক্ষার আকাঙ্ক্ষি বন্ধু রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবদ্বীপে বালিকাশিক্ষার জন্য পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন, অতএব স্থান মহাত্ম্যে রঞ্জনকুমারের কন্যার মুখে ঐ কথাগুলি।

শোভিত জোড়া ভুরু; কবরী মুক্ত করিয়া দিলে দীর্ঘ দীর্ঘ কৃষ্ণ কুন্তল জাল। নিচের দিকে নামিয়া জানু চুম্বন করে; গাল দুটি ফুলো ফুলো দাঁত গুলি ছোট ছোট, ওষ্ঠাধর ঈষৎ গোলাপী আভা রঞ্জিত; উপরের ঠোঁট অপেক্ষা নিচের ঠোঁট খানি বেশ পাতলা; সর্ব্ব শরীরের নবীন মাংস ঠিক যেন নবনীর মত কোমল, স্পর্শ করিলে হস্ত শীতল হয়। আমাদের দেশের কবিরা সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট বালক বালিকা গুলিকে "ননীর পুতুলী" বলিয়া আদর করিয়াছেন, অষ্টমবর্ষীয়া নিতাই নন্দিনী সেই প্রকার ননীর পুতুলী, ননীর পুতুলীর মুখে কোমল কোমল মিষ্ট কথা গুলি শ্রবণ করিয়া রাজা রঞ্জনকুমার রায় সুকুমারী নিতাইনন্দিনীকে সস্নেহে ক্রোড়ে লইলেন, ভগবানের নিকটে কায়মনোবাক্যে মঙ্গলকামনা করিলেন, সোহাগ বাড়াইয়া বলিলেন, "দশজনে যাহাকে মান দেয়, তাহারই মান বাড়ে;—লোকে আমাকে গৌরব করিয়া রাজা বলে, সেই গৌরবে তুমি রাজ কুমারী;—এত অল্প বয়সে যেরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি আমাকে লবণের মিষ্টতার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছ, তাহাতে এখন অবধি আমি তোমাকে রাজকুমারী বলিয়া আদর করিব।"

মৃদুহাস্যে নিতাইনন্দিনী অন্তরে আনন্দানুভব করিল। তাহার মাসী মা সেই রকমে হাসিতে হাসিতে দুইফোঁটা চক্ষের জল ফেলিলেন। চক্ষের জলেরা কথা কহে না, এখানে কিন্তু সেই দুইফোঁটা অশ্রু যেন একটু কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া কাতর ভাবে বলিল, "হুঁ—রাজকুমারী—আজ যদি তোমার মা থাকিতেন, তাহা হইলে এ আনন্দে কতই উৎসব হইত, আবার একটি আনন্দের দিন আসিতেছে;—যে পাত্রটি আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, অচিরেই সেই পাত্রের হস্তে তুমি অর্পিতা হইবে।"

আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ চলে। বাস্তবিক পরিণয় সংস্কারটি যে কি, তৎবিষয়ে পূর্ণ অজ্ঞতা থাকিলেও বিবাহের কথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকার অন্তরে আহ্লাদ খেলা করে; কাহার উপদেশে কে জানে—সেই আহ্লাদকে ঢাকা দিবার জন্যই যেন মুখে চক্ষে লজ্জা মেঘের উদয় হয়; লজ্জায় চক্ষু বুজিয়া অষ্টমবর্ষীয়া নিতাইনন্দিনী ক্ষুদ্র মস্তকটি অবনত করিল; চঞ্চলা হইয়া উঠিয়া যাইবার চেষ্টা পাইতেছিল; মাসীমা তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। বিবাহ প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কথা হইল, রঞ্জনকুমার প্রত্যেক কথায় সায় দিলেন, মাসীমার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে, কেবল এইমাত্র অনৈক্য। অনৈক্য হইবার কারণ এই যে, আমাদের দেশে প্রথা আছে, ছেলেই হউক কিংবা

মেয়েই হউক, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিতা থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ হয় না। নিতাই নন্দিনীর উপরে আর পাঁচটি ভগ্নী অনূঢ়া, অগ্রে তাহাদের বিবাহ না হইলে নিতাইনন্দিনীর বিবাহ হইতে পারিবে না, সেই জন্যই বিলম্ব। রঞ্জনকুমারের টাকার অভাব ছিল না, শীঘ্র শীঘ্র সন্ধান করিয়া, সম্বন্ধ স্থির করিয়া এক বৎসরের মধ্যে পাঁচটি অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দেওয়া হইল; একবৎসর পরে নিতাই নন্দিনীর শুভ বিবাহের উদ্‌যোগ।

মাসীমা যে পাত্রটি মনোনীত করিয়া ছিলেন, পত্র লিখিয়া সেই পাত্রের পিতাকে সংবাদ দেওয়া হইল, পাত্রের পিতা এক সপ্তাহের মধ্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবকাশ ক্রমে একদিন রঞ্জনকুমারের বাটীতে পদার্পণ করিবেন, পত্রে এইরূপ আমন্ত্রণ লেখা থাকিল। সেই পত্রের উত্তর আসিল, আমন্ত্রণ রক্ষা করা হইবে। বর কর্ত্তা যে দিন আসিতে পারিবেন, প্রত্যুত্তর পত্রে সেই দিনটি স্থির করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন। কতিপয় গ্রাম্য ভদ্রলোককে ঐ মর্ম্মে আমন্ত্রণ করা হইল, সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে অপরাহ্নে রঞ্জনকুমারের বাড়ীতে এক মজ্‌লিস্‌ বসিল, গ্রামের বিংশতিজন ভদ্রলোক, ওপক্ষে বর কর্ত্তা এবং গ্রামবাসী আত্মীয়লোক তিনজন যথাসময়ে সভাস্থ হইলেন, উভয় পক্ষের পুরোহিত উপস্থিত থাকিলেন। প্রথামত পত্র লেখা পড়া* হইল। পত্র দুখানি পাঠ করিবার সময় একজন ব্রাহ্মণ শঙ্খধ্বনি করিলেন,—প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী শঙ্খধ্বনি।

পত্র করা সমাপ্ত হইলে বিবাহের দিন স্থির হইল। স্থানীয় লোকেরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, নিতাইনন্দিনী সর্ব্বপ্রকার মিষ্ট দ্রব্যের উপরে লবণকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিষ্ট বলিয়াছিলেন, সেই অপরাধে রঞ্জনকুমার ঐ কন্যাটিকে সংসার হইতে বিভিন্ন করিয়া গ্রামান্তরে পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন, তিন বৎসর পরে সেই কন্যা এখন বাড়ীতে আসিয়াছে। যাহারা কন্যার নির্ব্বাসনের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন শুনিলেন, যুদ্ধের অবসান। লবণ-মহিমার তর্কযুদ্ধে কন্যার জিত্‌ হইয়াছে, কন্যার পিতা হারিয়া গিয়াছেন।

---

* পূর্ব্বে প্রথা ছিল—বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে দুই পক্ষের দুখানি পত্র লিখিয়া সেই পত্রের উপর ধান্য দূর্ব্বা ও চন্দন স্থাপন করা হইত, তাহার নাম পত্র করা। সেইরূপে পত্র করা হইলে বিবাহের আর কোন প্রকার অন্যথাচরণ হইতে পাইত না। আজকাল সে প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখনকার প্রথা খুব সংক্ষিপ্ত—দুই পক্ষ হইতে টাকা দিয়া বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা।

অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে হরিহর প্রসাদের সহিত শ্রীমতী নিতাইনন্দিনী দেবীর শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পাত্রের নাম হরিহর প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নিবাস নবদ্বীপ। বিবাহ রাত্রে বাসর ঘরে একজন বৃদ্ধা গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, খাদ্য ভাণ্ডারে মিষ্ট কি?—হো হো করিয়া হাসিয়া বাসরের সমস্ত কুলবালা একস্বরে উত্তর করিলেন,—"নুন!"

সমালোচনা।

মনোহরা।—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, প্রণীত, কলিকাতা ৩২।৭ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য আট আনা।

গ্রন্থকার নিম্নলিখিত দুই ছত্র কবিতায় "মনোহরা" নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন,—

"মনোহর তানে, সুকুমার প্রাণে,
তোল গো কল্পনে! আনন্দ ঝঙ্কার!"

মনোহরার অধিকংশ গল্পই Grimm's fairy Tales নামক ইংরাজী পুস্তক হইতে ভাষান্তরিত। আমাদের সুকুমার মতি বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য গ্রন্থকার মূল ইংরাজী পুস্তক হইতে অনেক পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই জন্য মূলের সহিত অনেক স্থলে গল্পগুলির আদৌ মিল নাই; একথা গ্রন্থকার পুস্তকের ভূমিকার প্রথমেই জ্ঞাত করিয়াছেন। "মধুচণ্ডাল" ও 'বুদ্ধিবটে" গ্রন্থকারের স্বরচিত সুনীতিপূর্ণ চিত্তাকর্ষক গল্প।

"মনোহরা" আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, এ পুস্তকখানি বালকবালিকাদিগের যে, সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। শৈশব জীবনে মানুষের মনের সুনীতি মূলক প্রবৃত্তিকে সজাগ করিয়া দিবার যতগুলি উপায় আছে, গল্প প্রসঙ্গে হিতোপদেশ প্রদান করা তন্মধ্যে একটি প্রধান উপায়; গ্রন্থকার ইংরাজী Grimm's fairy Tales. গ্রন্থ হইতে রত্নরাজী সংগ্রহ করিয়া আমাদের বালকবালিকাদিগের জন্য "মনোহরা" রচনা করিয়াছেন, সুতরাং গ্রন্থকার বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে ধন্যবাদ পাইবার উপযুক্ত পাত্র। গ্রন্থের ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, কয়েকখানি হাফটোন চিত্রে "মনোহরা" শিশুগণের আগ্রহাতিশয্য বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। | ১৩২১ সাল, পৌষ। | ৯ম সংখ্যা।

মনের রোগ।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

দৈহিক পীড়ার শান্তির জন্য আমরা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মন যে চিররোগী হইয়া রহিল, ইহার প্রতিকার কি? শরীর ও মন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু; সুতরাং একের পীড়ায় অপরটিও পীড়িত হইয়া পড়ে। এমত ক্ষেত্রে চিত্ত-স্বাস্থ্য লাভে যত্নবান না হইলে শরীর সুস্থ রাখা একরূপ অসম্ভব। আমাদের মন সতত যে জ্বরে সন্তাপিত হইতেছে, সরল ভাষায় তাহার নাম দুশ্চিন্তা। এই দুশ্চিন্তাই আমাদের পরম শত্রু। ইহা দাবাগ্নির মত অহর্নিশ আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছে।

"চিতা চিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তানাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা প্রাণ সমং বপুঃ॥"

চিতা নির্জীবকে দহন করে বটে, কিন্তু চিন্তা সজীবকে পুড়াইয়া মারে। অতএব সুচিকিৎসার দ্বারা সর্ব্বাগ্রে এই চিন্তা ব্যাধির নাশ কর; নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।

একজন জার্ম্মাণ ডাক্তার বলিয়াছেন,—"যদি আমরা প্রত্যহ এক ঘণ্টা কাল প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই সুস্থদেহে শতবর্ষ বাঁচিতে পারি। মার্কিনের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার জন্ উইলসন্ স্বাস্থ্যরক্ষার যে কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি এই :—

"শিশুকে প্রচুর খেলিবার সময় দাও; উহাকে সর্ব্বদা আনন্দে রাখ। কোন ক্রমে শোক দুঃখের বার্ত্তা জানিতে দিও না।" আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কারলটন্ বেকার মহোদয়ও বলেন, "যে কোন উপায়ে মানসিক শান্তিলাভ করিতে পারিলেই অনেক রোগের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়।" তাঁহার মতে যেমন কোন গুরুভার দ্রব্য উত্তোলন করিলে সর্ব্ব শরীরে একটা বিষম টান পড়ে, সেইরূপ মনকে সর্ব্বদাই চিন্তাক্লিষ্ট রাখিলে সমস্ত দেহে একটা উত্তেজনা উপস্থিত হয়। এই উত্তেজনার ফলেই আমরা পীড়িত হই। তাই ডাক্তার বেকার পরামর্শ দিয়াছেন যে, ঘণ্টায় অন্ততঃ ছয় বার মুখগহ্বরের মাংসপেশীগুলি বিস্তৃত করিয়া উচ্চহাস্য করিবে। তাহা হইলে চিকিৎসককে বড় একটা অর্থ দিবার প্রয়োজন হইবে না। নিরন্তর চিন্তাক্লিষ্ট থাকিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার সমুদয় নিয়ম প্রতিপালন করিলেও কোন ফলোদয় হয় না; শীঘ্রই দেহ রুগ্ন ভগ্ন হইয়া পড়ে। বিমর্ষ ব্যক্তি যৌবনেই জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যধিক দুশ্চিন্তার শেষ পরিণাম মানসিক বিকৃতি বা উন্মাদ রোগ। অপর পক্ষে সদানন্দে শাকান্ন খাইয়া থাকিলেও শরীর স্বচ্ছন্দে থাকে;—তাহার যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা এই চিন্তাব্যাধির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। আমার জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ। আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের ও সকল সংবাদ রাখি না। তবে রোগের নাম শুনিলেই একটি ঔষধ বলিতে হয়। এটি আমাদের দেশের রীতি। আপনার যদি পেট-কামড়াইতে থাকে; দেখিবেন যাঁহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কেহ কখন চিকিৎসাশাস্ত্র পড়েন নাই, তিনিও দুই চারিটী সদ্যঃফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া দিয়া পরোপকারস্বরূপ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া লইবেন। আমি ত আর দেশের ও দশের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারি না।

চিন্তাজ্বরের একটি মাত্র ঔষধ আমি জানি, তাহা এই:—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে ভগবানেসমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করা ভিন্ন জীবের শান্তি লাভের অপর কোন পন্থা দেখা যায় না। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

হে কৌন্তেয়! তুমি যে কোন কর্ম্মকর, ভোজন কর, হোম কর, দান কর বা তপস্যাই কর, তৎ সমস্তই আমাকেই সমর্পণ কর।

ভোগবাসনার বশীভূত না হইয়া কেবল মাত্র ভগবানের কর্ম্ম করিতেছি বা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছি,—এই বিশ্বাসে সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পরমানন্দ ও পরম শান্তি লাভ করা যায়। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জনই সুখ। কর্ম্মে আমাদের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মফলে আমাদের অধিকার কোথায়?

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অন্তরে অচলা ভগবদ্ভক্তি না আনিতে পারিলে কি প্রকারে সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে সমর্পণ করা যায়? এ কথা সত্য বটে। পণ্ডিত হইবার জন্য, অথবা শিল্পী হইবার জন্য যেমন পাণ্ডিত্যের ও শিল্পের পূর্ব্ব সাধন অভ্যাস করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ অভ্যাস সাপেক্ষ। জীব দেহে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ বিদ্যমান আছে। এই গুণত্রয় বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টি গোচর হয় না। তবে কাহার তিনগুণ সমান নাই; কারণ গুণ-বৈষম্য হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্টি। যাহার দেহস্থলীতে তমোগুণ অধিক জমা আছে, তাহাকে তামস, যাহার রজোগুণ অধিক আছে, তাহাকে রাজস এবং যাহার সত্বগুণ অধিক আছে, তাহাকে সাত্বিক প্রকৃতির লোক বলে। একই বিষয় সকল প্রকৃতির রুচিকর নহে। যাহা রাজসের প্রিয়, তাহা তামসের ও সাত্বিকের অপ্রিয়; আবার যাহা সাত্বিক ভালবাসে তাহা রাজস ও তামসের প্রিয় নহে। যাহাদের শরীরে তমোগুণ অত্যধিক, রজোগুণ তদপেক্ষা অল্প এবং সত্বগুণ নাই বলিলেই হয়, তাহারা অসমহিত বিবেক শূন্য, অনম্র, পরাবমানকারী অনুদ্যমশীল, শোকার্ত্ত ও দীর্ঘসূত্রী হইয়া থাকে। যাহাদের শরীরে রজোগুণের একান্ত আধিক্য আছে, তাহারা পুত্রকলাদিতে আসক্ত, হিংস্র, পরবিত্তাভিলাষী, বিহিত শৌচ-বিবর্জ্জিত এবং লাভালাভে হর্ষ শোকান্বিত

হয়। যে সকল পূত আত্মা ব্যক্তির রজস্তমঃ উভয়বিধগুণ ক্ষুণ্ণ হইয়া সত্ত্বগুণ উন্মেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আসক্তিত্যাগী, গর্ব্বোক্তিরহিত, ধৈর্য্য ও উদ্যম সমন্বিত এবং কৃতকর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষ বিষাদশূন্য। তাঁহাদের মন সর্ব্বদাই আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। সংসারের কোন চিন্তা-দুঃখই তখন তাহাদের মনকে তাপিত করিতে পারে না। তাহারা আত্মাভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকল সংসারিক কর্ম্মকেই সেই ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া ধারণা করেন। আমি নিমিত্ত মাত্র;—এ সমস্তই ভগবানের কার্য্য করিতেছি, মনে এই ধারণা সুদৃঢ় রাখিতে পারিলে আর চিন্তা কিসের? অতএব যাহাতে হৃদয়ে ভক্তি বিবেকাদি সাত্ত্বিক প্রকৃতির পরিদীপনা হয়, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা কর। সত্ত্বগুণের স্বভাব সুখ; সুতরাং এই অমূল্যধন লাভ করিতে পারিলে আমাদের মনের কোন দুঃখ থাকে না। তখন জীবের চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়;—প্রভুত্ব প্রিয়তা, ঋপুবশতা, স্বার্থপরতা এই ঐশ্বর্য্যাদির জন্য ব্যাকুলতা, এ সকল কিছুই তাহার মনকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না।

"যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখঃ।"

সাত্ত্বিক হইতে হইলে বিধিপূর্ব্বক কতকগুলি—কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। সাধন করিলেই সিদ্ধি হইবে। একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—"পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে এরূপ দীর্ঘ হস্ত প্রদান করিয়াছেন যে, তাহা প্রসারিত করিয়া আমরা স্বর্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারি! নিম্ন লিখিত শাস্ত্রোপদেশগুলি প্রতিপালিত হইলে জীবের রজতমোগুণ ক্ষীণ হইয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়।

১। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শরীরে শুক্রধাতু অধিকৃত রাখিবে।

২। নিদ্রা, আলস্য, দেহ যত্ন, কেশ বিন্যাস আসন ও বসনে আসক্তি সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

৩। বিলাসের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবে। কাম্য বস্তুর উপভোগে কখনই কামনার উপশম হয় না, একথা সর্ব্বদা যেন মনে থাকে। নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত না হইয়া প্রিয়তম পুত্র পুরুকে বলিয়াছিলেন;—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহি যবং, হিরণ্যং পশবঃস্ত্রীয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাত্তৃষ্ণং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

৪। অহিংসা পরিত্যাগ করিবে। নিজে প্রাণীবধ করিব না, কিন্তু মাংস ভক্ষণের লোভে অপরের দ্বারা ছাগ বংশ ধ্বংস করিলে চলিবে না।

৫। সদা সত্য পালন করিবে; কথন কুটিল সত্যের অনুষ্ঠান করিও না। মুখে সত্য বলিলাম, অথচ মনোমধ্যে "অশ্বত্থামাহতঃ ইতি গজঃ" রকমের মিথ্যা বা দুরভিসন্ধি রহিল, এরূপ না হয়।

৬। অস্তেয় বা চৌর্য্য ত্যাগ আবাল্য অভ্যাস করিবে।

৭। এই দেহ ভগবানের মন্দির; ইহাকে রক্ষা করাই আত্মধর্ম্ম মনে করিয়া সর্ব্বদা দেহ পরিষ্কার রাখিবে।

৮। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অর্দ্ধপক্ব, বিরসতাপ্রাপ্ত, পর্য্যুষিত, পূতিগন্ধযুক্ত, উচ্ছিষ্ট ও যাহার সার নিষ্পীড়িত হইয়াছে, এমত আহার পরিত্যাগ করিবে। স্বচ্ছ, অকৃত্রিম, আয়ুঃ উৎসাহ—শক্তি—চিত্তপ্রসন্নতা সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধক দ্রব্যই আহার করিবে।

৯। অবসর পাইলেই সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে ভুলিও না। আর সকল সময়েই মনে করিবে,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

মৃত-সৌন্দর্য্য।

কোথায় তাহারে দেখিয়াছি যেন
এমনি মধুর নিশিতে,
এমনি সময় তার প্রাণে যেন
চেয়েছিল প্রাণ মিশিতে।
সে নিশিও যেন এমনি উজ্জ্বল
পরিপূর্ণ ছিল প্রকৃতি।
সেও যেন ছিল এমনি সুন্দর
নিশীথের মত আকৃতি।
যেন সে নিশীথে এমনি ভাবেতে
উজল জোছনা হরিষে।
প্রতি অঙ্গে তার লাবণ্যের মত
অমৃতের ধারা বরিষে।

যেন তারি তরে ফুটেছিল ফুল
চারি পাশে তার ঘেরিয়া,
যেন তারি তরে ব'সেছিল চাঁদ
আকুল নয়নে হেরিয়া।
সেও যেন ছিল এমনি নিশীথে
কুসুমের মত ফুটিয়া,
তারি তরে যেন ব্যাকুল সমীর
যাইত চরণে লুটিয়া।
বৃন্ত হ'তে চ্যুত কুসুমের মত
সে ছিল উপল শয়নে,
ভয়ে ভয়ে যেন চেয়ে ছিল চাঁদ
তাহারি হরিণ নয়নে।
আপনার মনে লাবণ্য ছড়ায়ে
সে ছিল যখন আলসে,
সর্ব্বাঙ্গে তাহার ছুঁয়েছিল চাঁদে
উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য লালসে।
প্রতি তরু লতা চাঁদ সরোবর
তাহারি লাবণ্য মাখিয়া,
স্থাবর জঙ্গম ব্যোম সমীরণ
তাহারি সৌন্দর্য্যে ঢাকিয়া।
তাহারি সৌন্দর্য্যে মগন হইয়া
চেয়ে ছিনু হৃদে রাখিতে,
সে নিশিতে যেন এমনি মধুর
পড়েছিল জল আঁখিতে।
আজ(ও) তেমনি হেরিতেছি নিশি
উজল তাহারি হাসিতে,
কোথায় তাহারে দেখিয়াছি যেন
এমনি মধুর নিশিতে॥

জাত বসন্ত ও মসূরিকায় পার্থক্য কি?

এবং কোন চিকিৎসা ইহাতে অবলম্বনীয়।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা মসূরিকা ও জাত বসন্ত এক কথা, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের মতে, মসূরিকা, কেবল জাত বসন্ত (Small pox) নহে, হাম (রোমান্তিকা) পাণিবসন্ত প্রভৃতিও মসূরিকা। ফল কথা, আয়ুর্ব্বেদে মসূরিকা এমন একটি রোগাধিকার যাহার অন্তর্গত, হাম, (measles) পাণিবসন্ত (Chicken pox) জাত বসন্ত (small pox) প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাধি—ডাক্তারেরা যাহাকে (Infections specific fevers বলেন। স্কন্দ পুরাণ হইতে মহামতি ভাবমিশ্র তাঁহার ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে যে সকল বচন সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা জানিতে পারি, জ্বর যেমন ভূতাভিষঙ্গে বিষমজ্বরে পরিণত হয়, সেইরূপ শীতলার দ্বারা আক্রান্ত হইলে মসূরিকা শীতলায় পরিণত হইয়া থাকে। প্রতীচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেন, যে ভূতাভিষঙ্গে জাতবসন্ত সমুৎপাদিত হয়, পাণিবসন্তের উৎপাদক ভূতগণ তাহা হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন জাতীয়, এবং হামের উৎপাদক ভূত সকলের জাতি আবার এতদুভয় হইতে সম্ভবতঃ অপর। এখন যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের সমন্বয় করা যায় তাহা হইলে আমরা দেখি, মসূরিকা জ্বর পূর্ব্ব সেই সকল ব্যাধি যাহাতে গাত্রে মসূর-সদৃশ পিড়কা সকল সমুৎপন্ন হয়। এই সকল পিড়কা যে জাত বসন্তই হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই;—হাম হইতে পারে, পাণিবসন্ত হইতে পারে, কিম্বা এমন আর কিছু হইতে পারে, যাহার সহিত জ্বর এবং পিড়কা সংযুক্ত। পূর্ব্বে বলিয়াছি মসূরিকা—হাম, পাণিবসন্ত, জাতবসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির সাধারণ সংজ্ঞা, যাহাতে শরীরে মসূর সদৃশ পিড়কা সকল সমুদ্ভূত হয়। কেবল পিড়কায় উদ্ভব নহে,—ইহার পূর্ব্বরূপে জ্বর, কণ্ডু, গাত্র বেদনা, মনের অনবস্থিততা, ত্বকের বিবর্ণত্ব, এবং নেত্রলোহিত্য বিদ্যমান থাকে। ডাক্তারেরা যাহাকে Exanthema বলেন, মোটের উপর তাহাই মসূরিকা। সুতরাং বলিতে হইবে, মসূরিকা;—ভূতবিশেষের অনুবন্ধে হাম পাণিবসন্ত, জাত বসন্তে পরিণত হয়। Proffesor বা Renx অল্পদিন হইল, পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন, "Microti spiecies are capatle of rapid and profound Variaton" অর্থাৎ, কোন এক জাতীয় ভূতাণু হইতে ভিন্ন জাতীয় ভূতাণুর পরিণতি বা অভিব্যক্তি অসম্ভবপর নহে। মসূরিকা হইতে হাম পাণিবসন্ত জাতবসন্তের উৎপত্তি সম্ভবতঃ এই প্রকার ঘটনা। মসূরিকায় সেই জন্য প্রথম

হইতেই জাতবসন্তের চিকিৎসা সমীচীন নহে। মসূরিকার চিকিৎসা এই ভাবে করা উচিত,—যাহাতে তাহা হইতে জাতবসন্ত না আসে। জাতবসন্ত প্রকাশ পাইলে তাহার চিকিৎসাক্রম যদিও স্বতন্ত্র, কিন্তু যতক্ষণ স্থির করিতে না পারা যায়, ইহা হাম পাণিবসন্ত বা জাতবসন্ত—কিসে পরিণত হইবে, ততক্ষণ ইহার চিকিৎসা বাত পিত্ত শ্লেষ্মা ও সান্নিপাতিক ভেদেই হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যাহাতে ইহা শীতলার দ্বারা আক্রান্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করা চাই। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এমন ঘটনাও বোধ হয় কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, যে একই গৃহে, কোন রোগীর হাম হইয়াছে, কোন রোগীর পাণি-বসন্ত হইয়াছে, কাহারও বা জাতবসন্ত—আবার দুই এক জনের সেই সময় বিস্ফোটক বাহির হইয়াছে, কেহ বা (ডাক্তারেরা যাহাকে টাইফয়েড বলেন) তিনি সেই রোগে শয্যাশায়ী আছেন। যদিও এইরূপ স্থল খুব বিরল কিন্তু আমি নিজেই একটি গৃহে এইরূপ এক সময়ে এতগুলি রোগ প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলি-য়াই বলিতেছি। যদি ধরা যায় সকলেরই ব্যাধি মসূরিকা,—ভূতবিশেষের অভিষঙ্গে কোনটি জাতবসন্ত, কোনটি পাণিবসন্ত, কোনটি হামের আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, তাহা হইলেও প্রফেসর রোর অভিমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে; এইরূপ বিভিন্ন ব্যাধির একই স্থলে উৎপত্তি কি করিয়া ঘটে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে কাহাকেও ব্যস্ত হইতে হয় না। যেমন বাত পিত্তাদি ধাতুবিশেষে বাতিক মসূরিকা পৈত্তিক মসূরিকার ভেদ ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ ভূতবিশেষের অভিষঙ্গ ভেদে যে একই গৃহে এক সময়ে এইরূপ রোগ ভেদ ঘটিতে পারে না এরূপ নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি কুমারটোলিতে একটি মহাজনের গৃহে এইরূপ ব্যাধি সাঙ্কর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া এবং আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রতীচ্য বিজ্ঞানবিৎ প্রফেসর রোর আবিষ্কারের অনুরূপ আলোকে গ্রহণ করিয়া, একই ঔষধ সর্ব্ব রোগীকে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। গতবার যখন কলিকাতা মহানগরীতে বসন্তের বহুপ্রকোপ ঘটে সেই সময়ের এই ঘটনা। তার পরও আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি, বসন্ত বা হাম হইয়া সারিয়া গিয়াছে, রোগী ২।৩ সপ্তাহ ভাল থাকিয়া পরে ডাক্তারেরা যাহাকে টাইফয়েড জ্বর বলেন, তাহাতে আক্রান্ত হইল। এ বৎসর এইরূপ একটি রোগী ডাক্তার ব্রহ্মচারী ও আমি একত্রে দেখিয়াছি। বসন্ত যখন বাহির হয়, তখন আমিই তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলাম, এখন ডাক্তার ব্রহ্মচারী তাহার টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসা করিতে-

ছেন। অতি ভয়ঙ্কর কয়েকটি বসন্তরোগী এবারও আমি বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করিয়া যদিও সারাইয়াছি, কিন্তু পূর্ব্ব কথিত,—একসঙ্গে ৪।৫টি ব্যাধি এবার প্রত্যক্ষ করি নাই। করিলে আমি পূর্ব্ব কথিত একই পাঁচন সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিয়া দেখিতাম কিরূপ ফল ঘটে। যাহা হউক,—আমি বলিতে চাই, আয়ুর্ব্বেদের মসূরিকা যদি ডাক্তারদিগের Exanthem বলিয়া ধরা যায় এবং সেই সঙ্গে মনে করা যায় যে, জাতবসন্ত, হাম, পানিবসন্ত, এমন কি টাই-ফয়েড ফিবার সকলই মসূরিকা—কেবল ভূতবিশেষের অভিষঙ্গ ভেদে রূপান্তর গ্রহণ করে মাত্র—এমন কি প্লেগও এক প্রকার মসূরিকা—তাহা হইলে, আমি কথঞ্চিৎ সাহসের সহিত বলিতে পারি, আমি কুমারটোলী মতি মুকুন্দ বাবুর বাটীতে যে পাচন ব্যবহার করিয়া ৪।৫টি বিভিন্ন রোগীকে সেবার আরোগ্য করিয়াছিলাম, সেই পাচনে, এবং এবার ৪।৫টি ভয়ঙ্কর জাতবসন্ত যে পাচনাদির সাহায্যে আরোগ্য করিয়াছি তাহাদের ভিতর একই মসূরিকা নাশক উপাদান আছে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ—মসূরিকা ও জাতবসন্ত এক এরূপ বিবেচনা যে করি-তেন না—তাহা মসূরিকাধিকারে হাম ও পানিবসন্তের অন্তর্ভুক্তিতে সকলেই মনে করিতে পারিবেন। তবে মূলে একই ভূত কিরূপে বিভিন্ন জাতীয় ভূতাভিষঙ্গ আনয়ন করে, তাহা বুঝিবার জন্য আমরা অধ্যাপক Renx এর যে মত উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাও তৎসঙ্গে সকলের শরণ্য, নতুবা আমার পরীক্ষিত ঔষধে পাচনের উপকারিতা আদৌ কাহারও হৃদয়াধিগত হইবে না। কথাটি আবার বলিতেছি—Microfic spieces are capatle of rapid and profound Variaton:" এইরূপ ঘটনা ঘটে বলিয়াই জ্বর যেমন ভূতাভিষঙ্গে বিষম জ্বরে পরিণত হয়, সেইরূপ মসূরিকা শীতলকাদির সক্রমণে শীতলায় পরিণত হয়। অধ্যাপক রেঁা বলেন, মূলে যে ভূতাণুর বিদ্যমানতা থাকে, সেই ভূতাণু কারণ বিশেষে শীতলায় রূপান্তরিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—ক্ষেত্র বিশেষে কারণ যোগে নূতন করিয়া নূতন ভূতের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন মতটি খাঁটী তাহা আমরা যদিও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না—তবে ইহা নিশ্চিত সত্য যে ভূত বিশেষের অভিষঙ্গে মসূরিকা—হাম বসন্তাদির আকার ধারণ করিয়া থাকে। সুশ্রুত সংহিতায় ভূতবিদ্যা তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রহদিগের অপরিসংখ্যেয় অনুচর "অসৃকমাংসভুজঃ সুভীমাঃ" নিশাকালে অশুচি শরীরের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া, ইহারা মাংস শোণিত বসার লোভে মানব শরীরকে আক্রমণ করে। দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব প্রবেশ করে, ইহারাও সেইরূপ অজানিত ভাবে ক্ষতে উপগত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। ক্রমশঃ

তড়া আঁটপুর।*

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরের সমীপবর্ত্তী তড়া আঁটপুরে মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া—চাঁপাডাঙ্গা রেল পথের একটী ষ্টেশন। প্রাচীন কাল হইতে এই গণ্ডগ্রামটীর সমধিক প্রসিদ্ধি আছে। এখানে বহুসংখ্যক তন্তুবায়ের বাস এখানকার বস্ত্রশিল্প অতি সুন্দর। হাওড়ার হাটে আঁটপুরের ধুতি সাড়ির খুব আদর। শ্রীচৈতন্য পার্ষদ পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের বংশধরগণ অদ্যাপি এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহারা বৈদ্য জাতীয়—ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যাম সুন্দর বিগ্রহের সেবা তাঁহাদের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে।

এখানকার মিত্র বংশও অতি পুরাতন এবং প্রসিদ্ধ। কোন্নগরের কন্দর্প মিত্র (১৯ পর্য্যা.) সন ১০৯০ সালে ভুরিশ্রেষ্ঠ (ভুরসুট) পরগণার ব্রাহ্মণরাজার রাজসংসারে একটী চাকরী পাইয়া কোন্নগর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। কন্দর্পের পিতার নাম রামচন্দ্র মিত্র। ১০৯০ সাল বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ২৩১ বৎসর বা ১৬২৯ শকাব্দা বা ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে আওরঙ্গজেব এবং বঙ্গদেশে নবাব সায়েস্তা খাঁ শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন। ইহার ১৪ বৎসর পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই কুঠির অধীনে দামোদর তীরবর্ত্তী রাজবল হাটে ইংরাজ বণিকের একটি মোকাম সংস্থাপিত হয়। রাজবলহাট আঁটপুরের পশ্চিমসংলগ্ন গ্রাম। এই স্থানের কাছাকাছি অনেক গুলি তন্তুবায়প্রধান গ্রাম আছে যথা—হরিপাল, গোবর-ডাঙ্গা, কৈকালা, রামপুর জয়নগর শ্যামপুর প্রভৃতি। ইহা দেখিয়াই ইংরাজ কুঠিয়াল রাজবলহাটে ব্যবসার মোকাম খুলিয়াছিলেন। এইরূপ অধীন কুঠি গুলিতে একজন করিয়া সাহেব কুঠিয়াল এবং একজন করিয়া ইংরাজ ডাক্তার থাকিতেন। এই দুইজন ইংরাজ ব্যতীত অনেক গমস্তামুহুরী প্রভৃতি দেশীয় কর্ম্মচারী থাকিত, তাহারা ক্ষীরপাই রাধানগর, মায়াপুর, বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী পাত্রসায়ের প্রভৃতি

---

* প্রবন্ধ লেখকের রচিত "হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়" নামক পুস্তক আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। তাহাতে আকবর সাহের আমল পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকের শেষার্দ্ধ মোগল এবং ইংরাজ রাজত্বে প্রাদুর্ভূত জমিদার ও রাজা মহারাজ এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন বংশগুলির কিরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—তাহারই নমুনা স্বরূপ তড়া আঁটপুরের মিত্র বংশের পরিচয় লেখক আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদক।

গ্রামে গ্রামে গিয়া তন্তুবায়গণকে দাদন দিয়া সূতা, তসর ও গরদের কাপড় বুনাইয়া আনিয়া দিত, কুঠিয়াল সাহেব তাহা হুগলীশহরের কুঠিতে পাঠাইয়া দিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, হুগলীতে ইংরাজের বাণিজ্যকুঠি সংস্থাপনের সময়েও ভুরস্থটের রাজবংশ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল। এই সময়ের ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৫৮৪ কবি রামদাস আদক শকে অনাদিমঙ্গল নামে ধর্ম্মপুরাণ রচনা করেন, তৎকালে ভুরস্থট পরগণার রাজা প্রতাপ নারায়ণ রায়।

ভুরুস্থটে রাজা রায় প্রতাপ নারায়ণ।
দানে দাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥

অনাদিমঙ্গল।

বেদবসু তিনবান শাল সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য পক্ষ অষ্ট দিবসে তাহার॥

ভুরস্থটে বহুদিন হইতে ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করিতেন। ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে ১৪৯৭ শকাব্দে ভরতমল্লিক চন্দ্রপ্রভা নামে বৈদ্যক কুলপঞ্জিকা রচনা করেন। তিনি ভুরস্থটরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন,—

পরো ভরতমল্লীকো দ্বিজবৈদ্যাঙ্ঘ্রি সেবকঃ।
ভুরিশ্রেষ্ঠ মহীপাল সভাপণ্ডিত বিশ্রুতঃ॥

চন্দ্রপ্রভা ৩২ পৃঃ।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভরতের চন্দ্রপ্রভা রচনাও রাজা প্রতাপ নারায়ণের রাজত্ব কালে হইয়াছিল। রামদাসের অনাদি মঙ্গল এবং ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা রচনার সময় ১৩ বৎসর মাত্র অগ্রপশ্চাৎ অতএব এতদুভয় গ্রন্থ একই ভুরস্থটরাজ প্রতাপ নারায়ণের রাজত্বকালে হওয়ারই সমধিক সম্ভাবনা।*

কন্দর্পনারায়ণ ঐ দুই খানি গ্রন্থ রচনার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আঁটপুরে আসিয়া থাকিলেও সে সময়ে যে প্রতাপ নারায়ণের পুত্র বা পৌত্র রাজত্ব করিতেন সে পক্ষে সন্দেহাভাব।

আমরা ভুরস্থট প্রবন্ধে বলিয়াছি—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রায়ের পিতামহ রামকান্ত রায় ভুরস্থটেরাজ্য অধিকার করিয়া ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে প্রতাপ নারায়ণের নাম না থাকায় মনে হয় রামকান্ত প্রতাপ নারায়ণের কোন বংশধরের জামাতৃ বা দৌহিত্রত্ব সূত্রে ভুরস্থটের রাজ্যাধিকার পাইয়া ছিলেন, কারণ প্রবাদ এইরূপ যে প্রতাপ নারায়ণও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

*অনুসন্ধান পত্রে মৎ প্রণীত "অনাদি মঙ্গল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আঁটপুরের কন্দর্প মিত্র সেকালের সাত্ত্বিক হিন্দু ছিলেন। তিনি কোন্নগর হইতে আঁটপুরে আসিবার সময় শ্রীধর নামে বিষ্ণুশিলা গলদেশে ঝুলাইয়া আনিয়া ছিলেন। আপনার অবস্থা উন্নত না থাকায় আপনি তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে বাস করিয়াও শ্রীধরের থাকিবার জন্য পাকা ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়া ছিলেন। কন্দর্প প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব ও শ্যামা পূজা করিতেন। গোপীনগর গ্রামের শোভাকর ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহাদের কুলগুরু, বৃহৎ বৃন্দিকেশ্বর তন্ত্র মতেই পূজার ব্যবস্থা ছিল। উক্ত ভট্টাচার্য্য বংশীয় ৺ বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা জেনেরল এসেম্বিলির সংস্কৃত অধ্যাপক থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত বহুদিন স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বি, এল, এবং পৌত্র শ্রীমান সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এল, কলিকাতাপ্রবাসী হইলেও স্বগ্রামে গতিবিধি করিয়া থাকেন।

কন্দর্প মিত্র একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, তাঁহার পুণ্যপ্রতাপে আজি তাঁহার বংশ বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে বংশ ধরিয়া এবং তাঁহার পূর্ব্ববৎ দেবকীর্ত্তি ও দুর্গোৎসব শ্যামাপূজা যথা বিধানে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। কন্দর্প মিত্রের তিন পুত্র—১। শোভারাম, ২। কৃপারাম, ৩। রামকিশোর। ইহাঁদের বহু বিস্তৃত বংশতালিকা বিস্তৃতি প্রযুক্ত এস্থলে দেওয়া হইল না। পরিশিষ্টে দিবার ইচ্ছা রহিল। এস্থলে কেবল মাত্র শোভারামের বংশ তালিকার কিয়দংশ দেওয়া হইল।

শোভারামের পুত্রের নাম সুবিখ্যাত কৃষ্ণরাম মিত্র। ইনি বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ৺তিলকচাঁদ বাহাদুরের দেওয়ানী করিয়া বিশেষ সুনাম সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি কেবল অদ্যাপি অবিকৃত থাকিয়া তাঁহার যশোঘোষণা করিতেছে। সন ১১২৫ সালে কৃষ্ণরাম জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় পারদর্শিতা লাভে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃষ্ট হয়েন, এবং অল্প দিন মধ্যেই মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহভাজন হইয়া দেওয়ানের পদ পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম দেওয়ান হইয়া ব্রহ্মোত্তর ভূমি দিয়া ৫০।৬০ ঘর ব্রাহ্মণকে স্বগ্রামে বাস করাইয়া ছিলেন। তদ্ব্যতীত নয়খানি চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়া নয়টী অধ্যাপককে ২৫ বিঘা করিয়া ব্রাহ্মোত্তর ভূমি দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা চতুষ্পাঠী না থাকিলেও পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ব্রহ্মোত্তর অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। বিদেশাগত বিদ্যার্থীগণের আহারাদির জন্যও সুব্যবস্থা ছিল। সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তার তাঁহার বিশেষ অনুরাগ থাকার ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয়

কৃষ্ণরামের কীর্ত্তি অসীম—দেশের জলকষ্ট নিবারণে তাঁহার অসাধারণ মুক্ত হস্ততার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেত জলকষ্ট ছিলই না—কৃষ্ণরাম নূতন পুষ্করিণী খনন এবং পুরাতনের পঙ্কোদ্ধার দ্বারা পানীয় জলের অভাব দূর করিয়াছিলেন। একদা তিনি পাল্কী করিয়া বর্দ্ধমান হইতে বাড়ী আসিতছিলেন, পথিমধ্যে মুজপুর নামক গ্রামে বাহকগণ পাল্কী নামাইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। ভদ্র কুলাঙ্গনাগণ কলসীকক্ষে জল আনিবার জন্য বহুদূর ঘাটতে যাইতে একজন অপর একজনকে বলিতেছিলেন,—"দিদি তুমি যে, সেদিন এক কলসী জল ধার লইয়াছিলে,—আজ আমাকে দিতে হবে,—আজ জামাই আসবে জলের খরচ বেশী হবে, না দিলে বড় কষ্ট পাবো।" জল ধারের কথা কৃষ্ণরামের কর্ণগোচর হইবা মাত্র তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—জিজ্ঞাসায় জানিলেন, সে গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামে এমন কোন জলাশয় নাই যে, তদ্দ্বারা লোকে পিপাসা নিবৃত্তি করে। বহুদূর হইতে জল আনিতে হয়। কৃষ্ণরাম বাড়ী আসিলেন, মুজপুরে জমি ক্রয় করিয়া এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিলেন। কেবল মুজপুরে কেন, বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও কৃষ্ণরামের এরূপ অনেক কীর্ত্তি আছে। কৃষ্ণরামের ন্যায় এতদঞ্চলে ঐরূপ আরও একটী পুণ্যশ্লোক পুরুষের নাম শুনা যায়, তাঁহার নাম—গোবর্দ্ধন রক্ষিত। নিবাস পাতুল সন্ধিপুর। আমরা বাল্যকালে অনেক প্রাচীনকে প্রাতঃকালে তাঁহার নাম করিতে শুনিয়াছি। জিজ্ঞাসিলে উত্তর করিতেন,—"সমস্ত দিন সুখে যাইবে। সকালে গোবর্দ্ধন রক্ষিতের নাম করিলে দিনটা সুখে যায়। তিনি জাতিতে গান্ধিক বা গন্ধ বণিক ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি আছেন বলিয়া শুনা যায়।

কৃষ্ণরাম মিত্র স্বগ্রামে ও গ্রামান্তরে বহু পুষ্করিণী, দেবতা ও দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে আপন বাটীতে যে, শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দজী নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহার মন্দিরের ন্যায় কারুকার্য্য খচিত মন্দির এদেশের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার গাথনি গঙ্গাজল ও গঙ্গামৃত্তিকা নির্ম্মিত ইষ্টকে। গঙ্গা এখান হইতে অন্যূন আট দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী, গঙ্গাজল ও গঙ্গামৃত্তিকা আনাইয়া ইষ্টক প্রস্তুত করা কতব্যয় ও কষ্টসাধ্য। মন্দির গাত্রে অষ্টাদশ পুরাণোক্ত যাবতীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং সমস্ত দেবাসুরের যুদ্ধ বিগ্রহের চিত্র অঙ্কিত ও গঠিত হইয়াছে—মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দে পুলকিত হইতে হয়। দেড়শত বৎসরের অধিক হইল ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও দেখিলে মনে হয় যেন ২।১ বৎসরের রচিত। দেবী পূজার জন্য তিনি যে

এক চণ্ডীমণ্ডপ এবং তৎসম্মুখে যে আটচালা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন তাহার কাষ্ঠ শিল্প প্রায় লোপ পাইয়াছে—নষ্টাবশিষ্ট যাহা আছে তাহার কিয়দংশ খৃঃ ১৮৮৩। ৮৪ অব্দের কলিকাতা অন্তর্জাতিক মহামেলায় যে সকল কাষ্ঠশিল্প ভারতের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাদের সহিত ইহার একখণ্ডেরও তুলনা হয় না। বড় বড় ইংরাজপুরুষ যথা—শ্রীযুক্ত কলিয়ার, রিচি, ডিউর্ক প্রভৃতি সিবিলিয়ানেরা মফঃস্বলপরিদর্শনে আসিয়া ইহাদের কারুকার্য্যদর্শনে বিমোহিত ও বিস্মিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, এরূপ কারিগর অতি বিরল এবং যে দেশে এরূপ শিল্পী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল সে দেশও ধন্য। কারণ এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্য্য সোনারূপার উপর করাও অসম্ভব। এরূপ কার্য্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অদ্যাপি ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্য বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে কত ভদ্র লোক আসিয়া থাকেন বলা যায় না। কত কারিকর আসিয়া ছাঁচ তুলিয়া লইয়া যান। প্রায় দিন ফাঁক যায় না—প্রতিদিনই দর্শক আসিয়া থাকেন। কৃষ্ণরামের দাতৃত্বের কথা বলিয়া ফুরায় না। তিনি গুরুকে হাজার বিঘা নিষ্কর জমি দান করিয়া গিয়াছেন, আপন বাড়ীতে দেবতার নিত্য সেবা ও অতিথি অভ্যাগতের জন্য যে সদাব্রত আছে, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিন হাজার বিঘা ভূমি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটী পয়সায় তাঁহার বংশধরগণের হস্তক্ষেপ করিবার উপায় নাই সমস্তই পূর্ব্বোক্ত পুণ্যানুষ্ঠানে ব্যয় করা হয়। ইহাতেই কৃষ্ণরামের ধর্ম্মপ্রাণতা ও পরোপকারপরায়ণতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বংশধরেরা অধুনা কৃষি বাণিজ্য চাকরী প্রভৃতি জীবিকাবলম্বনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, কৃষ্ণরাম তাঁহাদের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। ধর্ম্মবিপাকের ঘোর দুর্দ্দিনেও তাঁহার বংশধরগণের প্রায় সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ। যাঁহারই শক্তি সামর্থ্য জন্মে তিনিই পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি জাজ্জল্যমান রাখিবার ত্রুটী করেন না। কৃষ্ণরামের প্রপৌত্র ৺প্রসন্ন কুমার মিত্র স্বোপার্জ্জিত অর্থে রাসমঞ্চ, সদর বাড়ীর প্রাচীর ও সিংহদ্বার বড় পুষ্করিণীর পাকা ঘাট এবং কয়েকটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার দ্বারা বংশগৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

আঁটপুরে এখন কৃষ্ণরাম নাই। সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও অধ্যাপক নাই। ৺শ্যামাপদ ন্যায় ভূষণ এবং কালাচাঁদ বিদ্যারত্ন মহাশয়দিগকে দিয়া পাণ্ডিত্যখ্যাতি বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রী৺শ্যামসুন্দরের সেবকগণেরও অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আঁটপুরের কল্যাণকর আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।•একটী

মধ্য শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল অতি কষ্টে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে, মিত্র গোষ্ঠীর অনেক সুশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ হইলেও প্রবাসী।

কৃষ্ণরামের পাঁচ পুত্র—১। রঘুরাম ২। রাঘবরাম ৩। শশীনাথ ৪। বৈদ্যনাথ ৫। রাধানাথ। রাধানাথের পুত্র বীরেশ্বর, বীরেশ্বরের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজ নারায়ণ। ইনি আর্ মিত্র নামে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার—এক সময়ে কলিকাতা হাইকোর্ট আলোকিত করিয়াছিলেন। যথা স্থানে তাঁহার জীবনী প্রকটিত হইবে। তাঁহার একমাত্র কন্যাকে পি, ঘোষ্ বিবাহ করিয়াছিলেন। গণিতে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। রাজ নারায়ণের অন্য অপত্য নাই। লক্ষ্মীনারায়ণের তিন পুত্র করুণাময়, হেমময় এবং আনন্দময়। করুণাময়ের দুই পুত্র শ্রীমান্ হরিচরণ এবং শ্রীমান্ তুলসীচরণ। হেমময়ের ছয় পুত্র গজেন্দ্র নগেন্দ্র, যোগেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, খগেন্দ্র, গবেন্দ্র। আনন্দময়ের দুই কন্যা—সত্যকালী ও কৃষ্ণকালী।

সালিখা হইতে অহল্যা বাঈয়ের যে রাস্তা পূর্ব্বে মধ্যভারতের নাগপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল তাহা আঁটপুরের উপর দিয়া রাজবলহাটে দামোদর পার হইত, এখন দেখা যায় ঐ রাস্তা চাঁপাডাঙ্গা ও পুঁড়শুড়ার উপর দিয়া গিয়াছে। তৎকালে ইংরাজবণিকের ব্যবসায় সৌকর্য্যার্থে উহা রাজবলহাটের উপর দিয়াই লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রাজবল হাট ও আঁটপুরের মধ্যে যে প্রাচীন সেতুর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়—উহাই প্রাচীন রাস্তার সেতু। ঐরূপ কয়েকটী সেতুর ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার জলাতেও আছে। রেনেলের মানচিত্রে প্রাচীন পথ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

অদ্যাপি আঁটপুরে দেশীয় বস্ত্রের কারবার অক্ষুণ্ণ আছে। প্রতি বৎসর অনেক টাকার কাপড় রামকৃষ্ণপুর হাওড়ার হাটে আঁটপুর হইতে চালান হইয়া থাকে।

—•—

'কথা'র কথা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

"এত কথা শিখ্‌লে কোথায় কবি!
　　যখন সখী শুধায় মোরে হেসে,—
আমি বলি 'স্বপন সমান সবি,
　　বল্‌ব তোমা সময় মত এসে।'

"সময় তব হল না কভু আয়"
কয়েন সখী সদায় অনুযোগ,—
অধম দাসে বিষম অবিচার,
অভাজনে দারুণ করম ভোগ!

'কথা'র কথা আজকে তবে বলি
অয়িলো সখী, অয়ি পরাণ প্রিয়া!
যেওনা শুধু যেওনা তুমি চলি'
কঠোর করি কোমলতর হিয়া!

নরের ভাষা, নরের অভিধান,
কথায় খোঁজে হায়রে কত রাখে—
করো না সখী, করোনা অভিমান,
—যেমন তব নয়ন কোণে থাকে!

সুধা কথায় অসীম পারাবার
তোমার ওই গোপন হিয়া খানি,
কবির সেথা নাই কি অধিকার,
ভাবিয়া আজ একটু কহ রাণি!

জীবনে কবে আসিল শুভক্ষণ
সাগরে সেই উঠিনু অবগাহি—
কথায় যেন ভরিল ত্রিভুবন,
বারেক শুধু রহিনু মুখে চাহি'!

নিমেষ পরে টুটিল যবে মোহ,
আঁখিরে তব মানিয়া নিনু গুরু;—
হিয়ার কোণে বসিয়া অহরহঃ
নূতন পাঠ করিয়া দিনু সুরু!

বরষ কত ফুরায় একে একে
কথায় তবু অন্ত নাহি পাই,—
নীরস মম নিত্য কত শেখে,
তোমার সখী, দু'টী আঁখির ঠাঁই!

আজ্‌কে আমি যত-কিছুই কহি,
　　করি না কেন যত মধুর গান ;—
মহাদেবের আশীস্ সম বহি
　　এযে কেবল আঁখির তব দান!

অবাক্ হয়ে শুনছ আজ তা'ই—
　　শুধাও "কবি, শিখ্‌লে কোথা ইহা"—
ধন্য তুমি, তুলনা তব নাই,
　　নিজের কথা জাননা নিজে প্রিয়া!

*

ক্ষান্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দীন দয়ালের বাটী, প্রকাশের শয়ন কক্ষ। ঊষা ও ক্ষান্ত ঝি।

ক্ষান্ত। মেজ দিদিমণি, তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্যে মা'কে কাল চিঠি দেবে বলেছিলে, কই দিলে না?

ঊষা। লিখে রেখেছি।

ক্ষান্ত। দেঁ দাও না! আমি এখনই ডাক ঘরে দিয়ে আসি।

ঊষা। এখন থাক। এর পর দিয়ে আসিস্।

ক্ষান্ত। এখন দিলে মা আজ বিকেলেই পাবে। আর জামাই বাবুর অবধি যখন ইচ্ছে তুমি তার মা বোনের মত কুলী মজুরনীদের কাজ কর তখন—

ঊষা। এরা লোকজন রাখে না কেন জানি না।

ক্ষান্ত। ইঃ! এরা আবার লোক জন রাখ্‌বে। সে অবস্থা কি এদের আছে? তোমার বে'র সময় বাবু একরাশ টাকা দিয়েছিল,—তাই এখনও চাল সেদ্ধ কর্‌তে পার্‌ছে। আক্কেল খাকীরা তোমায় কতই না ছোট কাজ কর্‌তে বলে।

ঊষা। এবার বাড়িয়ে তুলেছে। এর আগে অত বল্‌ত না। হেঁসে হেঁসে কথা কইত মনে হ'ত কতই ভাল।

ক্ষান্ত। ঐ হাসিই যত নষ্টামীর গোড়া। কথায় বলে,—"মুচ্‌কে হেসে, "কাশী দেশে, কাণ তুলসে, খালি কাপাশে এদের সবাই সর্ব্বনেশে"।

[কমলার প্রবেশ।]

কমলা। তোমার কি রকম বল দেখি। বেলা ১টা বাজ্‌তে চল্‌লো একবার নীচে নাম্‌লে না। সকাল থেকে বাপের বাড়ীর ঝিয়ের সঙ্গে মুখোমুখি করে বসে রয়েছ। বাবার আজ অমাবস্যা, তাঁর রুটির ময়দা ডুটো ত মেখে দিতে পার্‌তে।

উষা। আমি ত বলেছি,—আমার দ্বারা ওসব কাজ হ'বে না।

কমলা। ও কথা বল্‌লে কি চলে? মা'র বয়স হয়েছে, একলা কি আর সংসারের সব পারেন?

ক্ষান্ত। তা বলে মেজদিদিমণি কখনও যা করেনি, তা কি করে পার্‌বে?

কমলা। কখনও করে নাই বলে, যে পার্‌বে না, তার কোন মানে নাই। আর, বউ তুমি না কর্‌লে এসব কে করবে? মা'ত চিরদিন পার্‌বে না।

উষা। আমাদের বাড়ীতে চাকর দাসীতেই এসব কাজ করে থাকে।

কমলা। এ ত চাকর দাসীর কাজ নয়। সব বাড়ীতেই বউ ঝিয়ে করে।

ক্ষান্ত। যাদের চাকর দাসী রাখ্‌বার মুরোদ নেই তারাই করে।

কমলা। তোকে আর ফোড়ন দিতে হ'বে না। চুপ করে থাক্‌। [উষার প্রতি] বউ ও সব কথায় কাণ দিও না। আমার কথা শোন, ঘরকন্নার কাজে মন দাও। নিজের সংসার নিজে না দেখ্‌লে কি চলে?

উষা। একশ' বার এক কথা ভাল লাগে না।

কমলা। বউ অবুঝ্‌ হয়ো না। তুমি আর বে'র কনেটি নও, তোমার ও রকম করা ভাল দেখায় না। তুমি ঘর সংসারের কাজ কর্ম্ম করতে চাওনা ব'লে বাবা মা কতই না দুঃখ করেন।

উষা। আমার বাবা মা ও সব ছোট লোকের কাজ ভাল বাসেন না।

কমলা। তোমার বাপ মা কি ভাবেন জানি না। মেয়ে ছেলে যদি সংসারের কাজ না কর্‌বে তা হ'লে কে করবে?

ক্ষান্ত। চাকর দাসী থাকে কি কর্‌তে? তাদের হুকুম কর্‌লে তারা সব কর্‌বে। আমাদের বাবু আমাদের মা বলেন, ছোট লোকেরাই এসব কাজ করে।

কমলা। তোকে কথা কইতে কে বলেছে? চুপ করে থাকৃতে পারিস্‌ না?

[ঊষার প্রতি] মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠানর সময় বাপ মা ঘর সংসারের কাজ কর্‌তে শিখিয়ে দেয়। তোমার বাপ মায়ের দেখ্‌ছি সব উল্টো।

ক্ষান্ত। মেজ দিদিমণিকে কথায় কথায় অমন বাপ মা তুলে গাল দিলে কি করে আর চুপ করে থাকি?

কমলা। তুই মাগী দেখ্‌ছি ত ভারি মরনা।

ক্ষান্ত। কেন গা তোমার কিসের ধার ধারি যে, তুমি আমায় মরনা মরনা বল?

কমলা। খবরদার বল্‌ছি। মুখের উপর চোপরা করিস্‌ নি পাজী মাগী।

ক্ষান্ত। কিসের লেগে পাজী বল। আমি তোমার খাই না তোমার পরি। কথায় বলে "ভাত কাপড় দেবার কেউ নন, গাল দেবার গোঁসাই"।

কমলা। যত বড় মুখ তত বড় কথা ছোটলোক মাগী। ফের যদি চোপরা করবি বাড়ী থেকে দূর করে দে'ব।

ক্ষান্ত। কে তোমাদের আঁস্তাকুড়ে থাক্‌তে এসেছে? মেজদিদিমণিকে তোমরা আন্‌তে গেছলে তাই এসেছি। ভায়ের বে দিয়ে দোতলা বানিয়েছ তাই বুঝি বাড়ী দেখাচ্ছ। বলে, "আদেখ্‌লের ঘটি হ'ল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।

কমলা। ফের পাজী মাগী। বেরো বল্‌ছি। আমাদের বাড়ী থেকে এখনই বেরো। [নিস্তারিনীর প্রবেশ]

নিস্তারিণী। কমলা, কমলা! কি হয়েছে?

কমলা। বউয়ের বাপের বাড়ীর ঝি মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখেছ। বউকে ঘরকন্নার কাজ কর্‌বার কথা বল্‌ছিলাম বলে মাগী আমায় যাচ্ছেতাই শুনিয়ে দিলে। মাগীকে বাড়ী থেকে দূর করে দাও।

নিস্তারিণী। যেখানে কথা থাকে না,—সেখানে তোর বল্‌তে যাওয়াই অন্যায় হয়েছিল। আর বলেই বা কি হ'বে। যতদিন পারি করি, তার পর যা হ'য় হ'বে। [ঊষার প্রতি] বউ মা তোমার ভাত বাড়া হয়েছে, খাবে চল।

ঊষা। [নিরুত্তর রহিল]

নিস্তারিণী। দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা? বেলা হয়েছে, ভাত খাবে চল।

ঊষা। [তথাপি নিরুত্তর রহিল]

নিস্তারিণী। [ঊষার হাত ধরিয়া] দেরী করোনা মা! ভাত বাড়া রয়েছে—জুড়িয়ে যাবে, চল।

উষা। [হাত ছাড়াইয়া] ক্যান্তি, বলে দে'ত আমি এদের ভাত খেতে চাই না।

কমলা। বউ,—বউ, তুমি রাগ করছ কেন? আমি ত তোমায় কিছু বলি নাই। তোমাদের ঝি মাগী বাড়িয়ে তুলেছিল, তাই তাকে বলেছি। এতে কি তোমায় রাগ করতে হয়? অমন ছেলেমানুষি করো না, মা বল্‌ছ খাবে চল। [উষার হাত ধরিয়া] চল।

উষা। অ্যাঃ। [হাত ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।]

নিস্তারিণী। বউ মা, কমলার কথায় কি রাগ করতে আছে। সে কোথাকার কে। দু'দিনের জন্যে এসেছে, দু'দিন পরে চ'লে যাবে। তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তোমার সংসার, তোমারই সব। তার কথায় তুমি রাগ করতে যাবে কেন? [উষার হাত ধরিয়া] পাগ্‌লী মা আমার;—অমন করে কি রাগ করতে আছে? আমার কথা রাখ, খাবে চ'ল।

উষা। অ্যাঃ। ভাল আলাতনে পড়েছি।

নিস্তারিণী। ছিঃ বউ মা। অমন হেঁজলঅবাড়ামী কি করতে আছে? অমন করলে তোমায় আর কখনও বাপের বাড়ী পাঠাব না। [হাত ধরিয়া লইয়া যাবার চেষ্টা করিতে করিতে] চল, বেলা হ'ল পিত্তি পড়্‌বে।

ক্ষান্ত। তোমরা অমন ক'রে মায়ে ঝিয়ে মেজদিদিমণির হাত মুচ্‌ড়ে দিচ্ছ কেন গা?

নিস্তারিণী। ঝি তুই বল্‌ছিস্ কি?

কমলা। ও মাগী ঐ রকম যা তা বলে। বড় বাড়িয়ে তুলেছে।

ক্ষান্ত। তোমরা দু'জনে মেজদিদিমণিকে ক'দিন ধরে কি না করছ। গাল দিতে মারতে অবধি বাকী রাখ্‌লে না। এসব দেখে শুনে কি আর ভাল বলতে ইচ্ছে করে?

নিস্তারিণী। কমলা আর প্রকাশকে ডেকে দি, সে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে খাওয়াতে পারে।

[নিস্তারিণী ও কমলার প্রস্থান।]

ক্ষান্ত। মাগীরা যেন জটিলে কুটিলে। যখন তোমায় অমন করে গাল দিচ্ছিল, মনে হ'চ্ছিল মুখে গোবর পুরে দি।

উষা। দ্যাখ আমার ঐ বাক্সর উপর যে চিঠি খানা লিখে রেখেছি, এখনই পোষ্ট আফিসে দিয়ে আয়।

ক্ষান্ত। এখনই দিয়ে আস্‌ছি মেজদিদিমণি। [প্রস্থানোদ্যত]

উষা। না। চিঠি যেতে দেরী হ'বে। তুই এখনই চলে যা। মা'কে গিয়ে বলিস্ যেন কালই আমায় এখান থেকে নিয়ে যায়।

ক্ষান্ত। এ পোড়া দেশে আবার এবেলা গাড়ী নেই।

উষা। আচ্ছা তা'হলে চিঠি দিয়ে আয়। আর কাল সকালে উঠেই চ'লে যাস্। কালই যেন আমায় নিয়ে যায়।

ক্ষান্ত। তা কি আর তোমায় বল্‌তে হ'বে মেজদিদিমণি! চিঠি দিয়ে আস্‌বার সময় তোমার জন্য খাবার নিয়ে আস্‌ব কি?

উষা। আচ্ছা নিয়ে আয়।

[একদিক দিয়া ক্ষান্তর প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া প্রকাশের প্রবেশ।]

প্রকাশ। উষা তুমি রাগ করেছ কেন?

উষা। (নিরুত্তর রহিল)

প্রকাশ। চুপ করে রয়েছ কেন? বলনা তোমার মনে কি কোন কষ্ট হয়েছে?

উষা। (তথাপি নিরুত্তর)

প্রকাশ। আমার কাছে বল্‌ছনা কেন? (উষার হাত ধরিয়া) বল তুমি খাবেনা বলেছ কেন?

উষা। (হাত সরাইয়া দিয়া) আমি এখানে থাকৃতেও চাইনা, খেতেও চাইনা।

প্রকাশ। ছিঃ উষা ওকথা কি বল্‌তে আছে, তোমার এখানে কিসের কষ্ট, মা তোমায় কত আদর করেন, বাবা তোমায় কত স্নেহ করেন, দিদি যখন আসেন, তখন তোমায় কত যত্ন করেন।

উষা। তাই বুঝি আমায় যখন তখন গাল দেয়।

প্রকাশ। তোমায় ত কেউ কিছু বলেনি উষা, তোমাদের ঝি দিদিকে অপমান করেছিল, তাই দিদি তাকে বোকে ছিলেন।

উষা। আমাদের ঝিকে বলাও যা, আমাকে বলাও তা।

প্রকাশ। তাই কি উষা? তুমি ভুল বুঝেছ, ঝিকে বকা হয়েছিল বলে কি রাগ করতে হয়? [উষার হাত ধরিয়া] ওসব কথায় কিছু মনে কোরো না আমার কথা রাখ, খাবে চল।

উষা। আমি ত বলে দিয়েছি, এ বাড়ীর ভাত খাবোনা।

প্রকাশ। বার বার কি ও কথা বল্‌তে আছে। তোমার ব্যবহারে মা, দিদি মনে বড় কষ্ট পেয়েছেন; তাঁদের মনে কষ্ট দেওয়া কি তোমার উচিত? তুমি না খেলে মা খেতে পার্‌বেন না। অমন করে রাগ কোরোনা চল।

উষা। আমি ত তাঁকে খেতে বারণ করিনি।

প্রকাশ। সকলের না খাওয়া হলে মা কি খেতে পারেন? চল মাকে গিয়ে বল, তুমি ভুল বুঝে অমন করেছিলে, তুমি একথা বললে মায়ের মনে আর কষ্ট থাকবে না।

উষা। আমার অত দায় পড়েনি। যে ছোটলোকের মত ব্যবহার, তাতে—

প্রকাশ। [উষার হাত ছাড়িয়া দিয়া] উষা।

উষা। অত চোখ রাঙানির ধার ধারি না।

প্রকাশ। না না উষা, বল তুমি ভুলে ওকথা বলেছ, বল তুমি আমার কথা রাখবে, বল তুমি মায়ের কাছে দিদির কাছে ক্ষমা চাইবে!

উষা। ভুলে আবার কি ব'লব, যারা ছোট লোকের মত কাজ করে, তারাই ছোট লোক।

প্রকাশ। আবার উষা অনায়াসে ওকথা বললে, যাঁরা তোমার গুরুজন তোমায় এত ভাল বাসেন, যাঁরা তোমার শত দোষ প্রফুল্ল মনে ক্ষমা করে এসেছেন, তাঁদের ওকথা ব'লতে একটুও সঙ্কুচিত হলে না। মনে রেখো উষা যাঁদের তুমি ছোটলোক বলেছ, তাঁদের অনুগ্রহ থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বঞ্চিত হ'লে আমি আমাকে হতভাগ্য মনে করি। এখনও ব'লছি উষা মায়ের কাছে,—দিদির কাছে,— ক্ষমা চাও নইলে—

উষা। নইলে কি? কিসের ভয় দেখাও? আমি ছোট লোকদের বাড়ী থাকতেও চাইনা, তাদের সঙ্গে সংস্রবও রাখতে চাইনা।

প্রকাশ। বেশ তাই হবে। মনে রেখো ছোটলোকরাও তোমার সহিত সংস্রব রাখতে উৎসুক নয়।

[একদিক দিয়া প্রকাশ ও অপর দিক দিয়া উষার প্রস্থান।]

ক্রমশ:।

ধর্ম্মের বিচিত্র গতি।

লেখক—শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী।

(২)

(ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

হরিণী নয়নার প্রায় দুই হাজার টাকা তেজারতে খাটিতেছে। তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজ নিজ কার্য কর্ম্ম করেন, মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুলিন কারবারের

সহায়। হরিণী লেখাপড়া জানেন না, পুলিনই হিসাব পত্র রাখে। পুলিন বিদ্যালয় ছাড়িয়াছে, এখনও কায কর্ম্ম হয় নাই, করিবার বড় চেষ্টাও নাই—ভগিনীর টাকার হিসাব রাখা, বন্ধু বান্ধবের সহিত তাস পাশা খেলা, ও রাত্রে থিয়েটার প্রভৃতি দেখিয়া বেড়ানই আপাততঃ পুলিনের ব্যবসায় ও জীবনের ইতিহাস। পুলিনের দেহের দৈর্ঘ্য অন্যূন ছয় ফুট তিন ইঞ্চি হইলেও প্রস্থে বিস্তারাভাববশতঃ আনম্রাকার বলিয়া বন্ধু বান্ধবগণ তাঁহাকে পুল বাবু বলিয়া ডাকে। ইয়ার মহলে আজ কাল পুলের আদর কিছু অধিক হইয়াছে, তিনি বেশ দুপয়সা খরচ পত্র করিতেছেন, সে টাকা কোথা হইতে আসে, কেহ জানে না, জানিবার প্রয়োজনও নাই। তিনি, যে খরচ পত্র করেন, তাহার সংবাদ বাটীতে কেহ রাখে না। হরিণী অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেন, তবে যে সকল অলঙ্কার আবদ্ধ রাখিয়া অধিক সুদে টাকা ধার দিয়াছেন, সেগুলি কেহ ফেরত লয় নাই, এবং সে সমস্ত প্রায় পুলিন ধার দেওয়াইছে; কে ধার করিয়াছে, তাহারও সংবাদ হরিণী রাখেন না এবং সেগুলি গিল্টি করা কি খাঁটি সোণা, তাহাও যাচাই করা হয় নাই. পুলিন অবশ্য ভালরূপ না জানিয়া রাখে নাই। সৌভাগ্য বশতঃ পুলিন এখনও সুরার আস্বাদন পান নাই, পল্লীগ্রামের ছেলেরা সহজে বড় পায় না, গঞ্জিকাই সচরাচর প্রথম সোপান হইয়া থাকে, সুতরাং পুলিনের মাসিক খরচ পত্র নিতান্ত অধিক হয় না। সহরে, যান-বাহনাদির প্রাচুর্য্য এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ অর্থের গতি যত দ্রুত, পল্লীগ্রামে তত নয়।

আজ পুলিনের কিছু টাকার নিতান্ত প্রয়োজন, কিছু গিল্টীর অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া ভগিনীর নিকট হইতে পঁচিশ টাকা কর্জ্জ করিবার জন্য পুল বাবু উপস্থিত। টাকাটা একজন ভদ্রলোক ধার করিবেন।

এদিকে হরিণী নয়না পরম্পরায় শুনিয়াছেন যে, তাঁহার শ্বশুরের ভদ্রাসন, যাহা জমীদার বাবুরা নিলাম করাইয়া কিনিয়া লইয়াছেন, তাহা তাঁহারা পাঁচশত টাকায় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। হরিণীর হাতে টাকা যথেষ্ট আছে. শ্বশুরের ভিটা, কিছুকাল তথায় বাস করিয়াছেন, একটা মমতা জন্মিয়াছে, তাহা যদি পাঁচশত টাকায় অথবা কুড়ি পঁচিশ টাকা অধিক দিয়াও খরিদ করিতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আপাততঃ স্বামীকে সে কথা না জানাইলেও চলিবে; পরে একদিন হঠাৎ স্বামীকে চমৎকৃত করিয়া দিবেন। এই অভিপ্রায়ে মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া, গোপনে জমীদারের বাটীতে লোক পাঠাইয়াছেন, এবং জমীদার যদি কিছু অধিক চাহেন, তজ্জন্য ও খরচপত্রাদির জন্য হস্তে

ছয় শত টাকা মজুদ রাখিবেন স্থির করিয়া তহবিল মিলাইয়া দেখেন যে, কিছু টাকা কম পড়ে। সুতরাং আর কর্জ্জ না দিয়া সত্বর কিছু আদায় করিয়া লওয়ার প্রয়োজন। অগত্যা ভ্রাতার প্রস্তাবে হরিণীকে অসম্মতা হইতে হইল। পুলিনেরও টাকা নহিলে নয়। ভগিনীকে বিস্তর বুঝাইলেন, অধিক সুদের প্রলোভন দেখাইলেন, বাটী ক্রয়ের অসুবিধা, এবং তাহাকে ভবিষ্যতের আশঙ্কা থাকার কথাও বুঝাইলেন, কিন্তু হরিণী কোনও মতেই সে সকল যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না; বরং ভ্রাতার আগ্রহাতিশয্যে মনে একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল বলিলেন, "তোর এত গরজ কেন?" পুলিন এইবারে গোলযোগে পড়িলেন, পাছে তাঁহার উপার্জ্জনের পথ ভবিষ্যতে বন্ধ হয়, এই ভয়ে কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া হঠাৎ স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে অকুল মিত্র সশরীরে গৃহে উপস্থিত হইয়া পুলিনকে কৈফিয়তের দায় হইতে উদ্ধার করিলেন, কেবল অর্থাভাব রহিয়া গেল।

হরিণী যখন দেখিলেন, যে স্বামী যে অবস্থায় গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন বেশে আসিয়াছেন, তখন আর আহ্লাদিতা না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার পর যখন টাকা দশটি হস্তে পাইলেন, তখন সেই আনন্দ অগত্যা বর্দ্ধিত হইল। পরন্তু উপার্জ্জনের ইতিবৃত্ত শুনিয়া স্বামীকে বুদ্ধিমত্তার জন্য বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিলেন না। স্বামী সরলকে কিছু অতিরিক্ত বিশ্বাস করেন, এমন কি, সে যে অর্থ ভিক্ষা করিয়া আনে, তাহার হিসাব পর্য্যন্ত লন না। বলিলেন, "সে কোথায় কত পাইল, এবং সব তোমায় দিল কি না, তাহার একটা হিসাব মিলাইয়া লও না? সে যদি নিজে কিছু কিছু বাঁচায়?" অকুল হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সেইত—রোজগার করিয়া আনিয়া দেয়।"

"সেত তোমার চাকর, তুমি হিসাব মিলাইয়া লইবে না? এমন বোকা পুরুষও ত কখনও দেখি নাই।"

স্বামী একটু খাট হইয়া গেলেন দেখিয়া হরিণী বলিলেন, "এবার থেকে তার কাছে ঠিক ক'রে হিসাব লইও।" অকুল কোনও উত্তর করিলেন না। তিনি যে একটি ছোট কাঠের বাক্স কিনিয়া টাকা রাখেন, তাহার চাবি সরলের হাতে অনেক সময় থাকে, সে কথা আর হরিণীকে বলিলেন না, তাহা হইলে তাঁহাকে বোকাতম হইতে হইতে হইত।

এবার অকুল একদিন থাকিয়াই বিদায় গ্রহণ করিলেন, বাসায় গিয়া একাকী; তাহার নিকট দু চারি টাকাও আছে, হরিণীও সাদরে স্বামীকে বিদায়

দিলেন, বলিয়া দিলেন, "এত দেরি করে এস না, মাসে দুবার ক'রে এস, আর আস্‌চে বারে কিছু বেশি ক'রে এনো।

অকুল মাসে দুইবার করিয়া এবং প্রতিবারে কিছু বেশি লইয়া, কিরূপে আসিবেন, তাহা বুঝিতে না পারিলেও যাইবার সময় সে বিষয় লইয়া কোন তর্ক উপস্থিত করিলেন না। স্ত্রীর সহিত তর্ক করাকে অকুল বিদ্রোহ অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ মনে করিতেন।

এদিকে পুল বাবু ভগিনীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের পথ একরূপ বন্ধ হইয়া আসিল দেখিয়া, এক নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, "গরজ বড় বালাই।" পুল বাবু নিজে উদ্যোগী হইয়া জমীদারের বাড়ী গিয়া বাড়ী ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিলেন, এবং মায় খরচ খরচা ৫১২৲ টাকার স্থলে ৬১৮৷৷৹ টাকা লইয়া নিজ নামে কোবালা করিয়া আনিলেন। তাহা লইয়া হরিণী আপত্তি উত্থাপন করিবা মাত্র পুল বাবু স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, যে জমীদার অকুল বাবুর টাকা শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাওনার হিসাবে সমস্ত কাটিয়া লইতেন; এখন যে দিন ইচ্ছা তিনি হরিণীকে লিখিয়া দিতে পারিবেন। গোল মিটিল।

দূরদর্শী পুল বাবু দলিলের খসড়া ভগিনীর হস্তে দিয়া মূল দলিল নিজ হস্তে রাখাই বিশেষ বুদ্ধিমত্তার কার্য্য মনে করিলেন। হরিণী ভদ্রাসন কিনিয়াই তাহা মেরামত আরম্ভ করিয়া দিলেন। টাকা অকুল বাবু মধ্যে মধ্যে জোগাইতে লাগিলেন।

অকুল বাবু অর্থাৎ কলিকাতার নকুড় মৈত্র মহাশয় চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দেখিলেন, ক্রমে দুই একটি রোগী ঔষধ লইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন একজন ভাল কবিরাজের নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! আমার পুত্রের জ্বরাতিসার হইয়াছে, একটা ঔষধ অনুগ্রহ করিয়া দিলে বাঁচে।' কবিরাজ মহাশয় অকুলের হীনাবস্থার কথা শুনিয়া এক সপ্তাহের ঔষধ বিনা মূল্যে দিলেন। এইরূপে দুই তিন জন বৈদ্যের নিকট গিয়া দুই তিনটা কঠিন রোগের ঔষধ হস্তগত করতঃ প্রত্যেক মোড়কে ঔষধের নাম লিখিয়া রাখিলেন। সামান্য জ্বরাদিতে তাঁহার টোটকা সেফালীপত্র রসাদি ব্যবহার করিতেন। রোগ প্রায় আপনিই আরাম হয়, কচিৎ কখনও ঔষধের প্রয়োজনও হইতে পারে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অকুলের চিকিৎসাতেও এক আধটি বাঁচিয়া যাইতে লাগিল। কলিকাতার স্থান মাহাত্ম্যে অকুলের পসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে অকুল ঔষধ কিনিতেও আরম্ভ করিলেন, এবং একখানি ক্ষুদ্র বাটী মাসিক

কুড়ী টাকা ভাড়ায় লইয়া তন্মধ্যে নিজ ব্যবহারের দুইটি মাত্র গৃহ বাদে বাকী অংশ ভাড়া দিয়া দুই জনের নিকট মাসিক আঠার টাকা আদায় করিতে লাগিলেন।

সরলচন্দ্রও কলিকাতার পথ ঘাট ক্রমে চিনিতে লাগিল। একদিন নূতন বাজারের হাটে প্রাতঃকালে গিয়া দেখে তরকারি পত্র অত্যন্ত সুলভ। চারি আনার মূলক ক্রয় করিয়া আনিল, নিকটে পয়সা থাকিলে হয়ত আরও কিছু কিনিত। অকুল তিরস্কার করাতে সরল তাহা বিক্রয় করিয়া আট আনা উপার্জ্জন করিল, অধিকন্তু কতকগুলি মূলক রহিয়া গেল। তখন অকুল তাহাকে প্রত্যহ কিছু কিছু কিনিয়া ঐরূপে বিক্রয় করিবার অনুমতি দিলেন, তজ্জন্য সরলকে বাজারে যাইতে হইত না, বাটীর সম্মুখে একটু রোয়াক ছিল, সেইখানে বসিয়াই প্রত্যহ অপরাহ্ণে চারি পাঁচ আনা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। ক্রমে সরলের পরামর্শ মত অকুল তাহাকে ভিক্ষা করার কার্য্যে অব্যাহতি দিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিলেন, প্রত্যহ আট দশ আনার স্থলে দুই এক টাকা উপার্জ্জন হইতে লাগিল। অকুল শ্বশুরালয়ে গেলে সরল ঔষধাদিও বিক্রয় করিত। সামান্য লেখা পড়া জানিত, মোড়কের উপরের লেখা পড়িয়া ঔষধ দিতে পারিত। প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসা বিদ্যায় অকুল ও সরল উভয়েই সমান। সরল অকুলের ন্যায় অতিরিক্ত বুদ্ধিশালী না হইলেও নিতান্ত বুদ্ধিহীন নহে, বিশেষতঃ কলিকাতায় থাকিয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছিল। অকুলের আয় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হরিণী না জানিলেও অকুল সরলকে সকল বিষয়েই বিশ্বাস করিতেন।

ওদিকে হরিণী ক্রমে আয়ের আধিক্য অনুভব করতঃ পতি ভক্তির মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। স্বামী আসিলে অতিরিক্ত আদর করিতে কোন মতে ঔদাসীন্য করিতেন না, এবং প্রতি বারেই বিদায় দান কালে কিছু অধিক অর্থ আনিতে অনুরোধ করিতে ভুলিতেন না। অকুলও প্রায়ই পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন, কখনও সে অর্থের কিরূপ ব্যবহার হইতেছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইতেন না। হরিণীও সে বিষয়ে কিছু বলিতেন না।

পুল বাবুর দিন বেশ কাটিতেছিল, সহোদরার বাটীতে তিন চারিটি পাকা ঘর প্রস্তুত হইতেছে, তাহার তত্ত্বাবধারক তিনি। সমস্ত ব্যয় তাঁহারই হস্ত দিয়া হয়। সুতরাং তিনি বাষ্পীয় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলপথ অবলম্বন করিলেও তাঁহার অনাটন হইল না। সহসা তাঁহার এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ সহোদরেরা বিদেশে কার্য্য উপলক্ষে থাকিলেও মধ্যে মধ্যে বাটী আসিয়া তাঁহার পতিক সুবিধার নহে বুঝিতে পারিলেন। ক্রমে অনুসন্ধানে জানিলেন, যে

হরিণীর অর্থে পুল বিপুল হইয়া উঠিতেছেন। তখন বন্ধকী গিল্‌টীর অলঙ্কারাদিও ধরা পড়িল; ধরা পড়িল না কেবল বাটীর দলিলের কথা। সেখানেও যে গোলযোগ হইয়া আছে, তাহা তাঁহারা মনেও করিতে পারিলেন না।

পুলের সমূহ বিপদ্‌ উপস্থিত হইল। তাঁহার যে ভ্রাতা হাওড়ায় কার্য্য করেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন। তিনিই হিসাব পত্র দেখিতে লাগিলেন। হরিণী মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে গিয়া বাটীখানি চক মিলান করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। পুলের অর্থাভাব ঘটিল। এখন তাঁহার দূরদর্শিতার গুণানুভব করিতে লাগিলেন। জমীদারের বাটী গিয়া একেবারে এক হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া ফেলিলেন। জমীদার বাটী খানি পুনর্ব্বার বন্ধক রাখিয়া এক হাজার টাকা দিতে কোনও আপত্তি করিলেন না। পুল বাবুও টাকা হাতে পাইয়া আপাততঃ খরচের অনাটন উপলব্ধি করিলেন না বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করতঃ একটা উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিলেন। পরিশ্রম করতঃ ব্যবসায় বাণিজ্য করায় তাঁহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু প্রথমতঃ সময়াভাব, তাহার উপর হস্তে যাহা কিছু অবশিষ্ট টাকা ছিল, তাহা ব্যবসায়ে খরচ করিলে, আপাততঃ হাত খরচের অনাটন পড়ে। অগত্যা ভাবিয়া চিন্তিয়া এক অতি চমৎকার সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। উঃ, এমন সহজ উপায় থাকিতে তিনি এতদিন টাকার জন্য এত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন হরি, হরি, অতি সহজ উপায়ত। ক্রমশঃ।

সত্যের জয়।

লেখক,—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন।

সে অনেক দিনের কথা। তখনও সত্য যুগের সুমধুর বংশী ধ্বনি—সত্য ধর্ম্মের পবিত্র মধুর অপূর্ব্ব কাহিনী দূরাগত সুর সঙ্গীতের ন্যায় বিশ্ববাসীর কর্ণে নিয়ত অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। স্মরণাতীত কালের সেই সুবর্ণ যুগে এদেশে সত্যবীর নামক পরম সত্য ধর্ম্ম রত এক জমীদার বাস করিতেন। তিনি প্রাণান্তেও একটি অনৃত বাণী—আপনার যথা সর্ব্বস্বের বিনিময়েও একটি মাত্র মিথ্যা কথা বলিতেন না। এজন্য প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার নাম রাখিয়াছিল, সত্যবীর। নামটি সার্থক হইয়াছিল।

জমীদার আপনার জমিদারিস্থিত-প্রজাগণের হিতার্থে সংস্থাপিত একটা

নব প্রতিষ্ঠিত বাজারের উন্নতিকল্পে প্রচার করিয়াছিলেন যে,—"বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত অবিক্রীত বা বিক্রয়াবশিষ্ট যাবতীয় জিনিস ভূস্বামীর অর্থে ক্রয় করিয়া ভাণ্ডারে রক্ষা করা হইবে। বাজারে আনীত কোন জিনিসই বিক্রেতাকে—বিক্রয় হইল না বলিয়া ফেরত লইতে হইবে না।" এই ঘোষণা শ্রবণে দূর দূরান্তর হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণ বহুবিধ পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক নূতন বাজারের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতে লাগিল। প্রত্যহ অক্ষরে অক্ষরে ভূস্বামীর আদেশ প্রতিপালিত হওয়ায় অল্পদিন মধ্যেই বাজার বিবিধ পণ্য দ্রব্য পরিপূরিত বড় বড় বিপণিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রতিনিয়ত ক্রেতা-বিক্রেতার কথোপকথন জনিত কোলাহল ধ্বনিতে সে স্থান মুখরিত হইতে লাগিল। বাজারের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি ষোল কলায় পূর্ণ হইল।

একদা এক কল্পনাশীল কৌতুকপ্রিয় কুম্ভকার আপনার স্বহস্ত নির্ম্মিত সুগঠিত এক মৃণ্ময়ী অলক্ষ্মী মূর্ত্তি লইয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে উপনীত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। বাজারে কত লোক আসিল, কত লোক চলিয়া গেল; কিন্তু কেহই তাহার অলক্ষ্মী মূর্ত্তি ক্রয় করিল না। অবশেষে ভূস্বামীর বিধানানুসারে সন্ধ্যাকালে জমীদারের লোক আসিয়া কুম্ভকারের সেই অলক্ষ্মী মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া লইল। অনন্তর কর্ম্মচারিগণের কৌতূহলে সেই অপূর্ব্ব মৃণ্ময়ী অলক্ষ্মী মূর্ত্তি জমীদার সমীপে প্রেরিত হইল। সহসা দাঁড় কাক বিকট রবে ডাকিয়া উঠিল—লক্ষ্মীর প্রিয় পেঁচকটা টুঁ টুঁ রবে চীৎকার করিয়া কাঁদিল—আর অলক্ষ্মীর বাহন কাল কুৎসিত বিকটাকার পেঁচকটা 'নিস্—নিস্' শব্দে উচ্চ নিনাদ করিয়া শ্রোতার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিল।

অলক্ষ্মী-মূর্ত্তি দর্শনে জমীদারের মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। সাময়িক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ভূস্বামী সকৌতুকে সেই মূর্ত্তি পূজার অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর সামগ্রী সম্ভারে বহু আড়ম্বরে অলক্ষ্মীর পূজা হইয়া গেল জমীদারের স্কন্ধে অলক্ষ্মী অধিরোহণ করিল। তিনি লক্ষ্মী ছাড়া হইতে চলিলেন।

নিশীথ কাল। ভূস্বামী ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বাহির হইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অন্তঃপুরোদ্যানে কে এক ষোড়শী রূপসী গুণ্ গুণ্ স্বরে ক্রন্দন করিতেছে, ভূস্বামী সেই রোরুদ্যমানা রমণীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচয় ও এরূপ নৈশ রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। অশ্রুমুখী রমণী বলিলেন,—আমি সংসারের লক্ষ্মী। তুমি অলক্ষ্মীর অর্চ্চনা

করিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়াছ। লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর একস্থানে অবস্থান অসম্ভব; তাই আমি তোমার সংসার ছাড়িয়া যাইতেছি।"

ভূ-স্বামী। যাবে তা এত কান্না কেন?

লক্ষ্মী। এতদিন তোমার পুরীতে পরম সুখে বাস করিতেছিলাম, এখন ছাড়িয়া যাইব; তাই মনের দুঃখে কাঁদিতেছি।

ভূস্বামী। তবে থাকনা কেন?

লক্ষ্মী। তা কি করিয়া পারি?

ভূস্বামী। তা বেশ; ইচ্ছা হইলে যাইতে পার।

অন্তঃপুর হইতে লক্ষ্মী দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তাঁহার প্রিয় বাহন মসী বিনিন্দিত কাল-কুৎসিৎ পেঁচকটার প্রাণ ঘাতক অতি বিকট 'টু—টু' রবে ও পক্ষ সঞ্চালন সম্ভূত অস্বাস্থ্যকর বাতাসে ভূস্বামীর প্রাণটা ভয়-বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল। মা লক্ষ্মীছাড়া হইলেন।

লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানের পর মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মীপতি নারায়ণ এবং তাঁহার পশ্চাতে ধর্ম্ম ও অন্তর্হিত হইলেন। গমন কালে নারায়ণের প্রিয় বাহন পক্ষীরাজ গড়ুর একবার 'কট-মট' দৃষ্টিতে স্বীয় বিরাট-বিশাল চঞ্চুপুট বিস্তার করিয়া ভূস্বামীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু পশ্চাতে ধর্ম্ম তাহার বিশাল পুচ্ছ আকর্ষণ করায় পক্ষীরাজের উদ্যম সফল হইল না। নিরীহ ধর্ম্ম বেচারা মনের দুঃখে স্বীয় বাহন ছাড়িয়া পদব্রজে যাইতে ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার প্রাণের বড় টান।

ভূস্বামী স্বচক্ষে সে সব দিব্য মূর্ত্তির তিরোভাব দর্শন করিয়া কাহাকেও একটি মুখের কথাও কহিলেন না। দেবতারা সব আপন মনে লক্ষ্মীপুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ভূস্বামী বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে নির্ভীক অন্তরে সব প্রত্যক্ষ করিলেন। মুহূর্ত্তে যেন একটা অপূর্ব্বদৃষ্ট ঐন্দ্রজালিক ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল। ভূস্বামী কল্পনায় স্বীয় ভবিষ্যত অদৃষ্টলিপির ভীষণ পরিণাম চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া বিষাদিত হইলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

পরিশেষে অমল-ধবল দিব্য কান্তি স্নিগ্ধোজ্জ্বল সৌম্য মূর্ত্তি আর একজন দেব-পুরুষ বিষাদ মলিন বদনে সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। ভূস্বামী বলিলেন,—"তুমি আবার কে?" দেব পুরুষ উত্তর করিলেন,—"আমি সত্য দেব।"

ভূস্বামী। তুমি যাইতেছ কেন?

সত্য। যে স্থানে লক্ষ্মী, সেখানেই নারায়ণ; লক্ষ্মী ছাড়া নারায়ণ থাকা অসম্ভব। আবার যে স্থানে নারায়ণ, সে খানেই ধর্ম্ম; কারণ ধর্ম্মত

শ্রীহরি শ্রীনারায়ণ ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারেন না। আবার যথা ধর্ম্ম তথা সত্য; যথায় ধর্ম্মের অধিষ্ঠান, আমাকেও সর্ব্বদা সেই স্থানেই অবস্থান করিতে হয়। আমায় ছাড়িয়া ধর্ম্ম এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। এজন্য সকলে বলে, 'যথা সত্য তথা ধর্ম্ম।' সুতরাং বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় ও আমাকে ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইতেছে; তাই আমি আমার এ চির প্রিয় পবিত্র নিকেতন—এ রাজপুরী তুল্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

ভূস্বামী। এবার খুব দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"বেশ কথা, আমি যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত অলক্ষ্মী মূর্ত্তি গৃহে আনিলাম, সেই সত্য তুমি; তুমি যাইবে কি দোষে? আমিত একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার অনাদর করি নাই। সত্যই আমার প্রাণ। আমি ত সুখে দুঃখে আজীবন প্রতি নিয়ত তোমায় সযত্নে পূজা করিয়া আসিতেছি; তবে তুমি যাইবে কেন? তুমি যাইতে পারিবে না—এ জীবন থাকিতে তোমায় যাইতে দিব না। এই অধমের গৃহে তোমায় থাকিতেই হইবে। পূর্ব্বে আমার ত্রুটি প্রদর্শন কর—আমার অপরাধ হইয়া থাকেত তুমি যাইতে পার।

সত্যদেব ভাবিলেন, তাইত এ ব্যক্তি একদিনের এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত আমায় লঙ্ঘন করে নাই—আমার অনাদর করে নাই, তবে আমি যাইব কেমন করিয়া? আমি যাইব না; আমার আকর্ষণে ধর্ম্ম অবশ্যই ফিরিয়া আসিবেন।

সত্য পুরীতে দৃঢ় অবস্থিত হইলেন। তিনি—সত্যবাদী প্রিয়তম সেবককে ছাড়িয়া অন্যত্র গমনে সমর্থ হইলেন না। ভূস্বামীর সত্যধর্ম্ম সার্থক হইল।

যথা সত্য তথা ধর্ম্ম। সত্যের মধুর আকর্ষণে ধর্ম্ম আবার ফিরিয়া আসিলেন। নারায়ণও ত ধর্ম্ম ছাড়া নহেন, তিনিও ধর্ম্মের অনুসরণ করিলেন। পতিব্রতা পত্নী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিতে পারিবেন কেন? সুতরাং দায়ে পড়িয়া লক্ষ্মীকেও ভূস্বামীর ভবনে প্রতিগমন করিতে হইল। ভূস্বামী একমাত্র সত্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সব ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহার সংসারে রাজশ্রী পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইল। সত্যেরই জয় হইল।

ভূস্বামী সত্য লঙ্ঘন করিলে—সত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অলক্ষ্মী মূর্ত্তি গ্রহণ না করিলে, তিনি প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হইতেন—সনাতন সত্য উল্লঙ্ঘন করা হইত। সত্যের অবমাননায়, সত্য ধ্বংস মহাপাতকে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইতেন। সত্য, ধর্ম্ম, লক্ষ্মী ও নারায়ণ সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হই-

তেন। লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হওয়ায় ভূস্বামীর সর্ব্বস্ব যাইত—অধর্ম্মের কুবাতাসে তাঁহার সংসার ছারখার হইত। একমাত্র সত্যের পূজা—একমাত্র সত্য ধর্ম্ম রক্ষা করায় ভূস্বামী অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া পরম সুখে সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া অন্তিমে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হইলেন। সত্যেরই জয় হইল।

"সত্যরূপং পরব্রহ্ম সত্যংহি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি॥"

সমালোচনা।

শিবাখ্যা কিঙ্কর কাব্য।—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রাকাশিত মূল্য ১৲ এক টাকা। ১৮।১ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্তপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য। কাব্যখানি ৫১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহা একখানি মহাকাব্য। কাব্যের বৃত্তান্ত এইরূপঃ— পূর্ব্বকালে গৌড় নগরে সুদর্শনসিংহ নামে একজন নরপতি ছিলেন। তিনি লোভ বশত তত্রস্থ কালী বাড়ীর নেতা শিবরাম স্বামীকে বহু যন্ত্রণা দিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন ও কালী বাড়ীর সঞ্চিত ধন রত্নাদি অপহরণ করেন। শিবরাম সেই দুঃখে বন প্রবেশ পূর্ব্বক যোগ সিদ্ধ হন ও দেবী মহামায়ার আদেশে বঙ্গদেশে রাজগণের মধ্যে কৌশলে ঘোর যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করেন। বর্ত্তমান মানকরের সন্নিকট অমরার গড় নামক স্থানের রাজা মহেন্দ্র এই কাব্যের নায়ক। নায়িকা বীরভূমের রাজকন্যা অমরা ও বিষ্ণুপুরের রাজকন্যা গৌরী। রাজা মহেন্দ্রের এই দুই রাজকন্যার পানিগ্রহণ, রাজগণের গোপনে অমরার গড়ে প্রবেশ, রাজগণের পরাজয়। রাজগণের হস্ত হইতে অমরার গড় উদ্ধার। রাজা মহেন্দ্রের সহোদর অমরেন্দ্রের বীরত্ব, শিবরাম স্বামীর অলৌকিক বুদ্ধি কৌশল প্রভৃতি বহু ঘটনাপূর্ণ। কবি এই "শিবাখ্যা কিঙ্কর" কাব্যে বহু চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল চরিত্রই আদর্শ স্বরূপ ও স্বভাবের অনুরূপ। সকল চরিত্র মধ্যে ব্রাহ্মণ কুমার গোবর্দ্ধনের চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে। কাব্য খানি আদিরস প্রধান হইলেও করুণা বিভৎস প্রভৃতি রসের সাময়িক সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা প্রাঞ্জল, ভাবপূর্ণ, উপমা অলঙ্কার সরল ও হৃদয়গ্রাহী। আর এক বিশেষত্ব এই, যাবনিক শব্দের প্রয়োগ নাই। ভাষা বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল। আজকাল কাব্যের শব্দ বিন্যাস অনেক স্থলে শ্রুতি যুগলের তৃপ্তি সাধন করেনা

কিন্তু এই কাব্যের শব্দ বিন্যাস প্রায় সর্ব্বস্থলেই সরলও সুন্দর। সংসারের স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার কোন কোন কবিতায় এরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঐ সকল কবিতা কালে মহাজন বাক্য বলিয়া পরিণত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ছন্দ সকল পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় ও বিবিধ প্রকার। যখন যে বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরাকাষ্ঠায় ত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে একটু দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। বর্ণনায় আতিশয্য বশতঃ ধৈর্য্যচ্যুতি সম্ভাবনা। কারণ অনেক সময়ে ঘটনা জানিবার জন্য পাঠককে ব্যাকুল হইতে হয়। যাহা হউক কাব্য পাঠে আমরা বস্তুতঃই সন্তোষ লাভ করিয়াছি, এমন কি কবিকে আমরা পুরাতন মহাকবিদিগের মধ্যে গণ্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। বারান্তরে এই কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।— প্রকাশক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত শেঠ প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণ, ভাঙ্গামোড়া হুগলী মূল্য।• চারি আনা। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গগত জীবন শ্রীল শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনা নামে একটী প্রবন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপাসনা সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আজিকালি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীগৌরাঙ্গের পৃথক পূজা ধ্যান মন্ত্রাদি লইয়া যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে,—তাহারই খণ্ডন ও মীমাংসা—ইহার বর্ণিত বিষয়। শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার হইতে যে, তাহার পৃথক উপাসনা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই এই প্রবন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমান ও যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপণ্ডিত—এবং প্রকৃত অধিকারী তাঁহার সিদ্ধান্ত অখণ্ডনীয়। তাহার পর প্রকাশকের লিখিত শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার নামে একটী ভাবময়ী কবিতা, পরিশিষ্টে সিদ্ধান্ত সমন্বয় শ্রীগৌরতত্ত্ব নিরূপনম্ নামে যে প্রবন্ধ দুইটী লিখিত হইয়াছে,—তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্বের বহুল প্রমাণ সংগৃহীত—এই প্রমাণ সেবক বৈষ্ণব প্রভু হইতে নহে, পুরাণ ও নানা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। তবে প্রমাণগুলি গ্রন্থের কোন অধ্যায়ে—কত শ্লোক লিখিয়া দিলে খুঁজিয়া লইতে কষ্ট হইত না।

মেডিকেল ডায়েরী।—আমরা সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানির নিকট হইতে ইংরাজী ১৯১৫ সালের মেডিকেল ডায়েরী উপহার পাইয়াছি। উহাতে চিকিৎসকগণের ও গৃহস্থের নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রতিদিনের ঘটনাদি লিখিবার ব্যবস্থাও সুন্দর। ছাপা কাগজ বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

জন্মভূমি

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

২২শ বর্ষ। } ১৩২১ সাল, মাঘ। { ১০ম সংখ্যা।

ক্ষমাপ্রার্থনা।

জন্মভূমির চিরহিতৈষী গ্রাহক-অনুগ্রাহক লেখক পাঠক মহোদয়গণ! আজ আমরা আপনাদের নিকট শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে দৈবদুর্ব্বিপাক নিবন্ধন কর্ম্মচ্যুতি জন্য ক্রটির ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। জন্মভূমির সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া অবধি গত দ্বাবিংশবর্ষ-কাল মধ্যে কদাচ আমরা সেই ব্রতের পালনে শক্তির সঙ্কোচে অবহেলা অথবা অযত্ন করি নাই;—তাহা আপনাদের অবশ্যই অবিদিত নহে। আপনাদের ন্যায় পরমহিতৈষী মহানুভবগণের অনুগ্রহে ও উৎসাহে আমরা নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, যথানিয়মে জন্মভূমির সেবা করিয়া আসিতেছি,—বস্তুতঃ দৈবের উপর মনুষ্যের কর্তৃত্ব নাই। বিবিধ প্রতিকূল ঘটনায় আমাদিগকে মহাবিপদ্‌গ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে।

১৩২১ সালের মাঘ মাসের জন্মভূমি ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়া, আপনাদের সমীপে প্রেরিত হইল। মাতঃ সরস্বতীর শুভাগমন সংঘোষক ঋতুরাজ বসন্ত-মলয়ানিলের মৃদু-মধুর হিল্লোলে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বিমলানন্দ বিতরণ করে; কিন্তু এ বৎসরের শ্রীশ্রীপঞ্চমীর মহামহোৎসবটি যে আমাদের অজ্ঞাত-সারে কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, দেবী বীণাপাণি কখন যে, বঙ্গে শুভাগমন করিয়া কখন যে অন্তর্ধান করিয়াছেন, আমরা চিরদিন তাঁহার শ্রীচরণদর্শনাকাঙ্ক্ষী ও কৃপা প্রার্থী হইয়াও কিছুতেই তাহার উপলব্ধি করিতে পারি নাই। মানুষ—মানুষের প্রতিকূলাচরণে যে সকল বিঘ্ন ঘটায়, সে প্রকার কোন বিঘ্নে আমা-দিগকে অভিভূত হইতে হয় নাই,—তাদৃশ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, আমরা কদাচ এতাদৃশ কর্ম্মভ্রষ্ট হইতাম না। বিধি দত্ত মর্ম্মাঘাত!

আমাদিগের বিষাদের কারণ এই যে, অকস্মাৎ অপ্রতিবিধেয় দৈব-বিপত্তি! বিগত ১৩২১ সালের ২রা মাঘ শনিবার বেলা ৪টা ২০ মিনিটের সময় পুত্র পৌত্র দৌহিত্রী প্রভৃতি আত্মীয়পরিজনমণ্ডলীকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া সংসারের পরমভক্তি-পাত্র আমাদের পরমারাধ্য-পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেব গোপালচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাদিগের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, আমাদিগকে অপার শোক-সাগরে

নিমগ্ন করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। আমরা এতদিন সংসারে মহাকল্পতরুর আশ্রয়ে নিরুদ্বিগ্ন থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে পরমানন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম। এক্ষণে সংসারসমুদ্রের একমাত্র আশ্রয়স্থল পিতৃদেবের অভাবে কর্ম্মাবর্ত্তময় বীচি-বিক্ষোভে আমরা বিপর্য্যস্ত বিক্ষুব্ধ জীর্ণ শীর্ণ নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছি। পিতৃদেবের মহান্ আদর্শজীবন আমাদের সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। কলিকাতা নিমতলা শ্মশানভূমির প্রশস্ত অঙ্কে সুপবিত্র জাহ্নবী সলিলে পিতৃদেবের দেহের পবিত্র ভস্মরাশি বিধৌত হইয়া গিয়াছে। পিতৃদেবের অভাবে আমরা দিশাহারা লক্ষ্যহীন। আমাদের সংসার গাঢ় তমসাচ্ছন্ন! আমরা আজ যেন ছিন্নমূল মহীরুহপল্লব।

জন্মভূমির চিরহিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাহক অনুগ্রাহক, পাঠক, লেখক বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি সানুনয় নিবেদন,— আপনারা আমাদের এই মহাবিপদের সংবাদ অবগত হইয়া, আমাদের সকল বিচ্যুতি ত্রুটীর জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

স্বর্গীয় পিতৃদেব।

স্বর্গীয় পিতৃদেব কলিকাতা হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ-দত্ত-পরিবার-ভুক্ত একজন, স্বধর্ম্মপরায়ণ মহান্ আদর্শচরিত স্বনামধন্য শান্ত-মূর্ত্তি, সত্য-নিষ্ঠ, সংযত-চিত্ত কর্ম্মী-পুরুষ ছিলেন। স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার বহ্বাড়ম্বর তিনি জীবনে আদৌ ভালবাসিতেন না; প্রতিদিন পঞ্জিকা দেখিয়া প্রাচীন ঋষিপ্রণীত ব্যবস্থা মতে সর্ব্ববিধ আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেন,—ম্লেচ্ছাচার ম্লেচ্ছাহারকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; এমন কি আচারভ্রষ্ট স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বিরত হিন্দুর সহিত বাক্যালাপ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেন।

অস্মদীয় পিতামহ স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একমাত্র পুত্ররূপে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের মাতুলালয় কলিকাতা বাহির সিমুলিয়া গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। মাতুল স্বর্গীয় যদুনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম বি, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়, সাহিত্যরথী স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় যদুনাথ বসু উভয়েই বাঙ্গালীর মধ্যে বি, এ. পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম উত্তীর্ণ হন, এবং তদানীন্তন ছোট লাট হালিডে সাহেব পুরস্কার স্বরূপ উভয়কেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদ প্রদান করেন।

পিতৃদেব কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। আমাদের মাতুল বংশের গৌরবও অল্প নহে; আমাদের পঞ্চমাতুল। পাঁচটিই রত্ন বিশেষ—জ্যেষ্ঠ ৺যদুনাথ মিত্র, মধ্যম অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র, তৃয় ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত সেবক ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৪র্থ ৺রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, কনিষ্ঠ ৺গিরীন্দ্রনাথ মিত্র। ইহাঁরা কলিকাতা

সিমুলিয়ার মিত্রবংশের উজ্জ্বলরত্ন সকলেই সুশিক্ষিত ও কায়স্থ সমাজে সুপরিচিত এবং সম্ভ্রান্ত।

শৈশব-জীবনে পিতৃদেব মদীয় পিতামহদেবের অন্ধের একমাত্র যষ্টি স্বরূপ ছিলেন, আদর যত্নের অবধি ছিল না, কিন্তু যার-পর-নাই পরিতাপের বিষয় পিতৃদেব যৌবনে পদার্পণ করিবার প্রারম্ভেই পিতামহদেব নশ্বরধাম পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করেন; তাহার কিছুদিন পরেই পিতামহী ঠাকুরাণীও তাঁহার অনুগমন করেন। পিতৃদেব অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী হইয়া, বৈষয়িক সমুদয় কাজকর্ম্ম নিজেই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এবং সময় সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র "উপন্যাস-মঞ্জরী"—গ্রন্থ-প্রণেতা স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সুপরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এই সময় কোন এক স্বনামধন্য জমীদারের সহিত জমীদারী-সংক্রান্ত এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়; পিতৃদেবের বয়স তৎকালে ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষ সেই মোকদ্দমায় পিতৃদেব স্বনামধন্য জমীদারকে পরাজিত করেন; শেষে সেই জমীদারের সবিশেষ আগ্রহে সেই মোকর্দ্দমা মিটাইয়া লইয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম, আত্মীয় পরিজন সকলেই সম্ভ্রান্ত, তথাপি কি সামাজিক কি বৈষয়িক কোন বিষয়ে সাহায্য গ্রহণে অথবা পরামর্শ গ্রহণে পিতৃদেব কাহারও দ্বারস্থ হইতেন না; নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাই করিতেন। বর্ত্তমান সামাজিক পণগ্রহণ প্রথার তিনি চিরবিরোধী ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত ত্রিপুরাধিপতি মহারাজাধিরাজের পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার বঙ্কুবিহারী মিত্র এম, বি, মহাশয়ের কন্যার বিবাহ প্রস্তাব স্থির হইলে (কন্যাকর্ত্তা বঙ্কুবাবু যথেষ্ট অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন) তিনি পিতৃদেবকে বরপণ কত টাকা প্রদান করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলে, পিতৃদেব অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বঙ্কুবাবুকে বলিয়াছিলেন,—"মহাশয়! আপনার নিকট হইতে বরপণ বাবত অর্থ লইয়া আমি আপনাকে আমার পুত্র বিক্রয় করিব না; যদি একান্ত অর্থের জন্য পুত্রের বিবাহ দিতে হয়, আমি পুত্রের বিবাহ দিব না।" এতৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বঙ্কুবাবু বিমোহিত হইলেন, এবং বিবাহের শুভ দিন স্থির করতঃ পিতৃদেবকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলেন। এইরূপে তিনি কোনও পুত্রের বিবাহে বরপণ বাবত অর্থ প্রত্যাশা করেন নাই; সংসারে আত্মীয় পরিজন মধ্যে বরপণ প্রত্যাশার কথা উত্থাপন হইলে, অন্তরের সহিত এই দূষণীয় প্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন।

সংসারে মানুষ জীবন-ধারণ করিয়া সুখ দুঃখের হস্ত অতিক্রম করিতে

সকলেই অক্ষম। কয়েকটি শোকাবহ ঘটনায় ভগবান্ তাঁহার জীবনকে ভারাক্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণাধিকা একমাত্র কন্যা, এক মাত্র দৌহিত্র "ছায়া" নামক মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তক সম্পাদক ও সত্বাধিকারী ৺গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ও একমাত্র দৌহিত্রী এবং কয়েকটি পৌত্র ও পৌত্রী অতি শৈশবাবস্থায় তাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা শোকাবহ ঘটনা ১৩১৪ সালের ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিয়োগ! শ্রীশ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই মর্ম্মান্তিক ঘটনার পর সংসারকে মায়াময় বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন; শোকে তাপে তাঁহার অন্তরকে বিচলিত করিতে পারে নাই; তিনি সংসারের আশা ভরসা সুখ দুঃখ সমস্তই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেন,—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—এই মহাবাক্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতেন।

বর্ত্তমান সমাজে আত্ম-গরিমা প্রচার করাই কালধর্ম্ম—নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয় পরিজন ব্যতীত পিতৃদেব কাহারও আলয়ে যাইতে ভাল বাসিতেন না। অপার্থিব ভোগবিলাসিতাকে আজীবন অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; সংসারে কোন বিষয়ে আড়ম্বর তিনি আদৌ ভালবাসিতেন না, ধনাভিমান চর্চ্চার আদৌ প্রশ্রয় দেন নাই, সামান্য অবস্থার লোকের সহিত বাক্যালাপ করিতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ করিতে তিনি ভালবাসিতেন না; যে কেহ বিপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তিনি প্রাণপণ যত্নে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন; পরোপকার মহাব্রত পালন করিতে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইতেন না, আমাদের জ্ঞানস্মরণে কত মৃতদেহের তিনি যে সৎকার করিয়াছিলেন, তাহা গণনায় আইসে না। পিতৃদেব সংসার-জীবনে সর্ব্বদাই কাজ কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, পরনিন্দা ও পর চর্চ্চা শ্রবণ করিতে তিনি আদৌ ভালবাসিতেন না; কিন্তু কোন কার্য্যেই তাঁহার সম্পূর্ণ আসক্তি ছিল না, সংসার-জীবনে আসক্তি-ত্যাগেই মনুষ্যের শক্তি ও জীবন। তিনি জানিয়াছিলেন,—নির্ব্বিলাস মিতাচারেই ঋষিত্বের পূর্ণ বিকাশ,—তাই শেষজীবনে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় নিষ্কামভাবে সংসারে অবস্থান করিতেন।

পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি আত্মনির্ভরতা ও প্রগাঢ় ভক্তি পিতৃদেবের জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অচল অটল ভাবে বর্ত্তমান ছিল; মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়তা ও কমনীয়তা নষ্ট হয় নাই; চিকিৎসকগণ উৎসাহের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন; পিতৃদেব কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইতে আর অধিকদিনবিলম্ব নাই

একদিন তিনি গভীররাত্রিকালে পুত্রগণের নিকট হইতে সহাস্যবদনে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন; শেষে বলিলেন,—"তোমাদের নিকটে আমার বিশেষ অনুরোধ—আমি যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিব, তোমরা কেহ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিও না।" কি আশ্চর্য্য তাঁহার এই মায়াময় সংসারের জন্য একবিন্দুও দুঃখের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল না; পুত্রগণের মুখশ্রী ঘন-বিষাদে আচ্ছন্ন হইল, সকলেই গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পিতৃদেব একাগ্রচিত্তে আপন ইষ্ট-দেবীর নাম জপ করিতে লাগিলেন।

পিতৃদেবকে আজীবন কোনরূপ রোগ যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হয় নাই। গত পৌষ মাস হইতে ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে থাকে, আহারে রুচি নাই, নিদ্রা নাই, দেহ যেন দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল। চিকিৎকগণ উৎসাহের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বদাই আমাদের অভয় বাক্যের দ্বারা তুষ্ট করিতেন। পিতৃদেব কিন্তু কর্ম্মময় জীবন হইতে ধীরে ধীরে অবসর লইতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তায় তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন, এবং একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরারাধনায় আত্ম নিয়োজিত করিয়া, যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; পীড়াবস্থায় দিবারাত্র তাঁহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি আত্মীয়পরিজন মণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন; পিতৃদেব ধ্যানাবিষ্ট মহাযোগীর ন্যায় শয়ন করিয়া, আপন ইষ্ট দেবীর নাম সদাসর্ব্বদা জপ করিতেন; তাঁহার চক্ষু নিমীলিত, মুখমণ্ডলে রোগ-যন্ত্রণার চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পাইত না; যেন স্থির ধীর গম্ভীর চিত্তে পিতৃদেব শ্রীশ্রীভগবৎ প্রেমে বিভোর।

মৃত্যুর চারি দিবস পূর্ব্বে মদীয়—জ্যেষ্ঠতাভ্রাতা—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার দত্ত এম, বি, এবং সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ বৈদ্যরত্ন এম, এ, প্রভৃতি চিকিৎসক মহোদয়গণ যখন পিতৃদেবের জীবনের আশা একরূপ পরিত্যাগ করেন, তখন পুত্র পৌত্র প্রভৃতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়গণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে,—তিনি বলিয়াছিলেন,—"আজ পৌষ মাসের ২৭ শে, ১লা মাঘ পর্য্যন্ত আমার জীবন সম্বন্ধে তোমাদের আশঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই; অর্জ্জুনের শরে আহত হইয়া ভীষ্মদেব শরশয্যাশ্রয় করিয়াছিলেন, উত্তরায়ণ ছিল না বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন নাই; আমার বিশ্বাস—ইহজীবনে আমি এমন কোন পাপ করি নাই যে, দক্ষিণায়নে মরিব? অতএব তোমরা ব্যাকুল হইও না।" প্রাচীন কালে মাকরী সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণের ক্রান্তিপাত হইত। এক্ষণে ১০ই পৌষ হইতে সৌরচার অনুসারে প্রত্যক্ষতঃ উত্তরায়ণ হইলেও প্রাচীন সংস্কার অনুসারে মাকরী ক্রান্তিপাতের দিন মাকরী সংক্রান্তি বলিয়া প্রাচীন মহাত্মাদিগের ধারণা,—তাই পরমারাধ্য পিতৃদেব ১লা মাঘের পূর্ব্বে উত্তরায়ণের অভাব বোধ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিবস মধ্যাহ্নে তাঁহার দৌহিত্র টিটাগড়নিবাসী শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ বি. এ, যখন জিজ্ঞাসা করেন,—"দাদা মহাশয়! আপনি কেমন আছেন?" পিতৃদেব সানন্দ চিত্তে উত্তর করেন,—আমি বেশ ভাল আছি; তোমরা কেমন আছ? তোমাদের টিটাগড়ে চুরি ডাকাতি কিরূপ? তাহাই বল।" গল্প করিতে ও শুনিতে চিরদিন তিনি ভাল বাসিতেন। এরূপ বাক্য শুনিয়া কে ভাবিয়াছিল যে, এক দিন পরেই তিনি আমাদের শোক-সাগরে ভাসাইয়া অমরধামে গমন করিবেন।

উক্ত দিবস বেলা ১২টার সময় পৌত্রগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"তোমরা আমার যথেষ্ট সেবা করিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বরের কৃপায় তোমরা আমার মত নিরোগী হও, আর দয়া ধর্ম্মে অতিথি সৎকারে বংশের মুখউজ্জ্বল কর। আগামী কল্য আমার জন্য তোমাদের একটু কষ্ট করিতে হইবে। তোমাদের কাকা বাবুর সহিত তোমরা তিনটি ভায়ে আমায় গঙ্গাতীরে পৌঁছাইয়া দিবে।" শেষে রহস্য করিয়া বলিলেন,—"এই কার্য্য করিতে পারিলে, তোমরা এক একখানি করিয়া লাল-পেড়ে নূতন কাপড় পুরস্কার পাইবে।"

১লা মাঘ রাত্রি ৩টার সময় পুত্র পৌত্র অন্তরঙ্গ আত্মীয় পরিজনকে তিনি প্রস্তুত হইতে অনুমতি করিলেন। ২রা মাঘ প্রাতঃকালে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণকে স্বহস্তে অর্থাদি দান করিলেন; বেলা ৩টার সময় সকলের হস্তে গঙ্গাজল পান করিয়া, ঔষধাদি পান করিতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন; অপরাহ্নে বেলা ৮টা ২০ মিনিটের সময় সকলের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনগণ দীনবেশে পিতৃদেবের পবিত্র দেহ হরিধ্বনি করিতে করিতে নিমতলা শ্মশানক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই পিতৃদেবের নিঃষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দেহ অন্ত্যেষ্টি হোমাগ্নিতে ভস্ম-সাৎ হইয়া গেল। রাত্রি ৮টার সময় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মনে হইল, পিতৃদেব আমাদের ছাড়িয়া যান নাই; তিনি আমাদের করুণার আদর্শ দেবতা এরূপ কঠোর কার্য্য কখনই তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব পর হইতে পারে না; হয়ত তিনি আমাদের অজ্ঞাতসারে কোথায় লুকাইয়া আছেন! আমাদের উপর অভিমান করিয়া তিনি হয় ত কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে ভ্রমণ করিতেছেন! সংসারে আমাদের পরীক্ষা করিবার জন্য হয় ত তিনি আমাদের চর্ম্মচক্ষুর অন্তঃরালে রহিয়াছেন! বাবা! বাবা! বাবা! বলিয়া প্রাণের ডাক ডাকিলেই তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন! নির্ম্মমতার রেখামাত্র যে, সে হৃদয়ে ছিল না! হায়! হায়! কে জানে—কবে আবার পিতৃদেবের পবিত্রাত্মার দর্শন পাইয়া শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করিয়া জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব।

পিতৃদেব যেদিন মদীয় পিতামহ স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একমাত্র পুত্র-রূপে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দিন এবাটীতে কতই না আনন্দ ধ্বনি উঠিয়া ছিল; আজ তাঁহার বিয়োগে পুত্র পৌত্র প্রভৃতি আত্মীয় পরিজন-বর্গের হাহাকার রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, চিত্তবিকার-গ্রস্ত-হৃদয়ে এই কোলাহলের মধ্যেও স্বর্গীয় অমর কবি তুলসী দাস বিরচিত এই দোঁহাটি মনে পড়িল :—

"তুলসী যব্ আবে জগ হাসে তোম্ রোয়।
অয়স্‌ন করম্ কর্ চলো তোম্ হাসো জগ্ রোয়॥"

কবিকে অন্তরের সহিত বার বার প্রণাম করি। কবি অপূর্ব্ব কল্পনা শক্তি বলে পুণ্যবান মানবাত্মার ভবিষ্যৎ যাহা সূচনা করিয়াছিলেন; আজ আমাদের সংসারে কার্য্যতঃ তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়া, সাধকশ্রেষ্ঠ মহাকবির লেখনী-ধারণকে সার্থক জ্ঞান করিলাম।

সংসার-সমুদ্রে পিতার উপদেশ দিগ্‌দর্শনের যন্ত্র স্বরূপ চিরদিন সন্তানকে ঠিক সত্য পথ দেখাইয়া দেয়; সন্তান যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমাজে জ্ঞানী মানী ধনী বলিয়া সুপরিচিত হউক না কেন, পিতা মাতার দৃষ্টিতে সন্তান চিরদিন ক্ষুদ্র শিশুটি মাত্র। নশ্বর সংসারের অধিকাংশ সম্বন্ধই দান প্রতিদানের অপেক্ষা করে, কিন্তু পিতামাতার স্বর্গীয় স্নেহ প্রতিদান প্রত্যাশার অতীত। ভাগ্য-দোষে আজ আমরা পিতৃদেবকে জন্মের মত বিদায় দিয়া গাঢ় বিষাদ সাগরে নিমগ্ন; এক্ষণে "মাতৃদেবোভব, পিতৃদেবোভব" এই মহান বাক্য স্মরণ রাখিয়া আমরা যেন স্বর্গীয় পিতামাতার পবিত্রাত্মার পূজায় ইহ-জীবনে জয়যুক্ত হই, ইহাই মা জগদম্বার শ্রীচরণে কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা!

আমাদের পিতৃবিয়োগে পিতৃদেবের আশ্রিত পরিজনবর্গের ব্যক্তিগত ভাবে কি পরিমাণে ক্ষতি হইল, সে সকল কথা সাধারণ সমীপে আলোচ্য নহে; তবে পিতৃ-বিয়োগে আমরা এক ভীষণ পথে প্রবেশ করিলাম; জানি না, আর কতদিন এই পথে আমাদের ভ্রমণ করিতে হইবে! একজন হিন্দী কবি কহিয়াছেন,—

"মালী আয়ত দেখি কৈ, কলিয়াং করো পুকার।
ফুলে ফুলে চুনি লিয়ে, কালি হামারি বার॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন এক বাগানের মালীকে প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল চয়ন করিতে আসিতে দেখিয়া, উক্ত বাগানের কলিকা সকল (ফুলের কুঁড়ি সকল) এই বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল যে, আজ মালী সমুদয় ফুটন্তফুল চয়ন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আগামী কল্য প্রাতে আমরাও যেমন ফুটিব, আমাদিগকেও এইরূপে চয়ন করিয়া লইয়া যাইবে!

আমাদের পিতৃদেব বর্ত্তমানে তাঁহার নিকটে আমরা ক্ষুদ্র শিশুমাত্র ছিলাম, এক্ষণে আমরা অৰ্দ্ধ ফুটস্তরূপ কলি, অতএব যমদূতরূপ মালী কবে যে, আমাদের চয়ন করিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে এই অবসরে পূর্ব্বাহ্ণে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"পিতাধর্ম্মঃ পিতাস্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

পিতা সদয় না হইলে কোন দেবতাই প্রসন্ন হন না,—তাই কাতর কণ্ঠে স্বর্গীয় পিতৃদেবের করুণা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা দুর্ভাগ্য-বশতঃ পিতৃদেবকে ইহ-জন্মের মত বিদায় দিয়া, সাংসারিক কি বৈষয়িক কোন কার্য্যেই মনো নিবেশ করিতে পারি নাই; সেই কারণেই নিয়মিত "জন্মভূমি" প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। এক্ষণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী মা জগদম্বার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া, আবার কর্ম্মক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারিব, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা ও প্রার্থনা।

আমরা পিতৃবিয়োগে নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া, সাধারণ পাঠক-সমীপে আমাদের অবস্থার বিষয় ও পিতৃদেবের কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনের দুই চারিটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিলাম। কোন শোকাবহ ঘটনায় চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, কেবল আমাদের স্থায় মানুষ কেন নরনারায়ণ অর্জ্জুনেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাই অর্জ্জুন বড় ক্ষোভেই শ্রীশ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন,—

'চাঞ্চলং হি মনঃকৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুস্করম্॥"

হে ভগবন্! মন বড় চঞ্চল, অনায়ত্ত ও অজেয়; সে শরীর ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে, তাহার নিরোধ সাধন করা অসাধ্য ব্যাপার। স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুর গতি যেমন রোধ করা যায় না, মনের গতিও সেইরূপ রোধ করিতে পারি না। অর্জ্জুনের স্থায় মহাপুরুষের যখন চিত্তচাঞ্চল্য-হেতু—এতাদৃশী অবস্থা, আমরা পিতৃবিয়োগে শোকাভিভূত হইয়া পড়িব,—তাহা আর বৈচিত্র্য কি?

বিষপূজা।

কবিরাজ—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ বসু কবিরত্ন।

" পতির গলিত শব বুকে আবরিয়া,
চলিলা বেহুলা সতী ভেলা আরোহিয়া।"

চাঁদ সদাগরের প্রকৃত নাম চন্দ্রধর বণিক্য। তিনি সুপ্রসিদ্ধ চম্পক নগরের অধিপতি। চন্দ্রধর জাতিতে বেণে কার্য্য ব্যবসায় বাণিজ্য; তাই জনসমাজে তিনি চাঁদ সদাগর বলিয়া বিখ্যাত। চাঁদ ধর্ম্মবীর—উদার প্রাণ; ত্রিলোক পূজ্য মহেশ্বর তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা—তিনি শৈব।

শিবভক্ত চন্দ্রধর স্বীয় ইষ্ট দেবতা ব্যতীত অন্য দেবতা মানিতেন না,—পূজিতেন না। এদিকে শিবের কঠোর আদেশে বা অলঙ্ঘ্য অভিশাপে চাঁদ পূজা না করিলে মর্ত্ত্যে শিব পূজা মনসা দেবীর পূজা প্রচার হয় না। দেবীর পূজা পাওয়া আবশ্যক। চাঁদ তাঁহার পূজা না করায় তিনি চাঁদের প্রতি যারপর নাই রুষ্ট, দেবী সুযোগ পাইলেই তাঁহার ক্ষতি করেন; কিন্তু চন্দ্রধরকে প্রাণে মারা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে যে মর্ত্ত্যে তাঁহার পূজা প্রচারের বাধা হয়। তাঁহার ইচ্ছা, চাঁদ অন্য দেবতা মানুক—তাঁহার পূজা করুক। চন্দ্রধরের পূজা না পাইলে দেবীর প্রাণে শান্তি নাই।

বিষহরী দেবীর দারুণ রোষে ক্রমে চন্দ্রধরের ছয়টি পুত্র অকালে কালের গ্রাসে চলিয়া পড়িল। ছয়টি বিধবা পুত্র বধূর উষ্ণ নিশ্বাসে এবং বণিক পত্নী সনকা সুন্দরীর কুররী ধ্বনিবৎ বিলাপ নিনাদে চাঁদের সুখের সংসারে দারুণ দুঃখের অনল জ্বলিয়া উঠিল। একে একে চাঁদের সকল পুত্র গুলি গিয়াছে। এখন বাকী কেবল সর্ব্ব কনিষ্ঠ লক্ষ্মীন্দর। আশার এই শেষ সলিতাটি নিবিলেই তাঁহার সব ফুরাইয়া যায়। দুঃখিনীর ধনের ন্যায় স্নেহময়ী জননী সনকা অতি যত্নে সদা সাবধানে পক্ষিণীর ন্যায় বুকে আবরিয়া এ রত্ন রক্ষা করিতেছেন।

একদা এক বিজ্ঞদৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলিলেন, "মনসা দেবীর ভীষণ ক্রোধে বিবাহ রাত্রে সর্পাঘাতে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হইবে।" এ নিদারুণ কথাটা জননী সনকার অজ্ঞাত থাকিল। চাঁদ ব্যতীত এ নিষ্ঠুর অভিশাপ বার্ত্তা আর কেহ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তথাপি পাষাণ কঠোর প্রাণ চাঁদ অচল—অটল! শিব ভক্ত চাঁদ কিছুতেই শিব সুতা মনসাদেবীর অর্চ্চনা করিলেন না। চাঁদের ঘোর উপেক্ষায় ক্রমে দেবীর দুর্জ্জয় ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িতে লাগিল।

চাঁদের চাঁদপানা ছেলে লক্ষীন্দর কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলেন। নব যৌবন সমাগমে তাঁহার সোণার অঙ্গে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। লখাইয়ের অনিন্দ সুন্দর নবীন নধর দিব্য কান্তি বরবপু দেবকুমারের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নবীন যুবক লক্ষীন্দর পৈত্রিক ব্যবসায় নৈপুণ্যে এবং জ্ঞানে-গুণে ও আপনার অসাধারণ চরিত্র প্রভাবে বিশাল চম্পক নগরীর গৌরবস্থল হইয়া আপামর সাধারণের যার পর নাই প্রীতিভাজন ও আপনার জন হইয়া উঠিলেন। চাঁদের শোক-দুঃখ পূর্ণ আঁধার গৃহ অভিনব আলোকে—নবীন সুখের নব আশায় আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এমন পরম সুন্দর সর্ব্ব গুণাধার পুত্র-রত্নের প্রতিও পাষাণ কঠোর প্রাণ পিতা স্নেহ প্রদর্শন করেন না,—আদর-যত্ন দেখান না, এমন কি একটি বার পুত্রের চাঁদ বদনের দিকে একটুকু দৃষ্টি করিতেও যেন তিনি কাতর। প্রাণাধিক পুত্র নিকটে আসিলে স্নেহময় জনক কি জানি কেন, অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লন—মুখ অবনত করেন। এজন্য অপত্য বৎসলা স্নেহময়ী জননী সনকা বড় দুঃখিতা—পুত্রের প্রতি পতির ব্যবহারে যার পর নাই মর্ম্মাহতা। সনকা মনে করিতেন, পুত্র শোকে সদাগর উদ্‌ভ্রান্ত; তাই একমাত্র স্নেহের ধন লখার প্রতি তিনি এত নির্ম্মম।

জননী সনকা জানিতেন না যে, তাঁহার এ অমূল্য রত্ন শীঘ্রই মৃত্যুর করাল গ্রাসে ঢলিয়া পড়িবে; তাই পতি একমাত্র স্নেহ ভাজন পুত্রের প্রতি এমন নিষ্ঠুর—এত ঔদাসীন। পুত্রের এ অনুপম রূপ-যৌবন শ্রী দর্শনে স্নেহময় পিতা সদাই মনে ভাবিতেন, হায়! এমন অনন্ত রূপরাশি—এমন গুণগরিমা পূর্ণ মূর্ত্তিমান প্রতিভা—এমন সোণার প্রতিমা তিনি কেমন করিয়া মৃত্যুর করাল গ্রাসে ডালি দিবেন।

প্রাণ প্রতিম পুত্রের প্রতি স্বামীর এ উপেক্ষা—অনাদর পুত্র-শোক-কাতরা স্নেহময়ী জননীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ছয় পুত্রের মৃত্যু জনিত গভীর শোক অন্তরের অন্তস্থলে স্ববলে চাঁপিয়া রাখিয়া তাঁহার প্রাণাধিক লখাইয়ের বিবাহের জন্য উতলা হইলেন। প্রাণের এ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আগুন যখন বড় বেশী প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন অশ্রুমুখী জননী পুত্রের বিবাহের জন্য স্বামীর নিকট প্রথমে অনুরোধ উপরোধ, পরে যারপর নাই আন্তরিক দুঃখ জানাইয়া কাকুতি—মিনতি করিতে লাগিলেন।

পত্নীর কাতর প্রার্থনায় দৈবজ্ঞের সেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎবাণী—বাসর ঘরের

সেই ভয়াবহ স্মৃতি সদাগরের মনে জাগিয়া উঠিল। প্রাণাধিক পুত্র লক্ষ্মীন্দরের অমঙ্গল আশঙ্কায় পিতার পাষাণ—কঠোর প্রাণ কি এক অজ্ঞাত বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় পতিব্রতা পত্নীর সুসঙ্গত প্রস্তাবে—তাঁহার কাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। স্বামীর উপেক্ষায় স্ত্রীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

উপেক্ষিতা সনকা স্বামীর নৈরাশ্য পূর্ণ উত্তরে প্রাণের অসহ্য জ্বালায় নিয়ত ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরলোকগত ছয় পুত্রের গভীর শোক আবার নূতন হইয়া যুগপৎ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। প্রৌঢ়ার আরক্তিম গণ্ডদ্বয় অশ্রু প্রবাহে সিক্ত হইল—অতি ক্রন্দনে পদ্ম আঁখিযুগল জবা কুসুমনিভ রক্তিম রাগ ধারণ করিল,—কুররী কণ্ঠে উচ্চ বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার কোকিল কণ্ঠ অবরুদ্ধ প্রায় হইয়া উঠিল। স্বর্ণ প্রতিমা সনকা ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পুত্র শোকাতুরা রোরুদ্যমানা অশ্রুমুখী সনকার সে বিষম শোক বিহ্বলতা দর্শনে চাঁদ-সদাগরের বজ্রময় কঠিন হৃদয় দ্রব হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দৈবজ্ঞের গণনা যে প্রকৃতই সত্য হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি?—জ্যোতিষের অনেক কথা ত মিথ্যা হইতেও দেখা যায়। যাহা হউক, স্ত্রী হৃদয় বড় দুর্ব্বল; পুত্র বিয়োগ বিধুরা স্নেহময়ী সনকা এ নিদারুণ গণনার কথা শুনিলে মর্ম্মাহত হইবেন—তাঁহার কুসুম পেলব হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অতএব ভীষণ অভিশাপের ন্যায় দৈবজ্ঞের গণনার এ অপ্রীতিকর নিষ্ঠুর কাহিনী সনকার নিকট অপ্রকাশ থাকাই ভাল। তবে দৈবজ্ঞের কথাটা একেবারে উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। যাহাতে দেবী বিষহরী প্রতিকূল হইয়াও আমার লক্ষ্মীন্দরের কোনরূপ ক্ষতি করিতে না পারেন, বিবাহের "বাসর ঘর" সেইরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। গৃহ নির্ম্মাণ কৌশলে বা বিষধর ভীতিপ্রদ তীব্রতর অমোঘ ঔষধি প্রভাবে মনসার চেষ্টা ব্যর্থ করিতেই হইবে। এইরূপে চাঁদ দেবীর সহিত ঝগড়া করিয়া "খোদার উপর কারিগড়ি" জুড়িয়া দিলেন। বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য বিধানের খণ্ডন করা মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সদাগর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মীন্দরের জন্য রূপ-গুণশালিনী বধূর অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে ঘটক প্রেরিত হইল। অশ্রুমুখী সনকার শুষ্ক অধর প্রান্তে আবার মধুর হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সায়-সদাগরের বাড়ী নিছনি গ্রামে। তিনি সে গ্রামের অধিপতি—একজন ক্ষুদ্র ভূপতি। তাঁহার স্ত্রীর নাম অমলা। অমলা সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী। সদাগরের তিন পুত্র—হরিহর, সুবল ও শ্রীরাম বিপুলা এই পুণ্যময় জীবন পিতা ও পুণ্যপবিত্রতাময়ী জননীর একমাত্র প্রাণাধিকা স্নেহের দুহিতা। স্নেহময়ী জননী কন্যাকে আদর করিয়া ডাকিতেন বেহুলা।

বেহুলা রূপসি ও বিদুষী এবং চরিত্র প্রভাবে সর্ব্বত্র গরীয়সী। বেহুলা কিশোরী যুবতী হইলেও এখনও অবিবাহিতা। সঙ্গীতে সাহিত্যে, রন্ধনে-গার্হস্থ্যে এবং নৃত্যে ও চিত্রকলায় তাঁহার সম অধিকার। বেহুলা কখনও যোগিনীর ন্যায় যোগনিরতা, আবার কখনও বা বয়ঃসুলভ কেলি কৌতুকে আসক্তা। দেব-দ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি। পরের দুঃখে তাঁহার দুই চক্ষু-বহিয়া সমবেদনার পবিত্র অশ্রু নিয়ত গড়াইয়া পড়িত। বিধবার উষ্ণ নিশ্বাসে তাঁহার কোমল প্রাণ শিহরিয়া উঠিত!—কি এক অজ্ঞাত অননুভবনীয় দুঃখ যাতনায় বেহুলার হৃদয় ফাটিয়া যাইত। পতির সহিত সতীর সহমরণ যাত্রা অনন্ত চিতারোহণ দৃশ্য দর্শনে তাঁহার মানসপটে কি এক স্বর্গীয় ভাবময় অপূর্ব্ব চিত্র প্রতিফলিত হইত। পতি নিন্দা শ্রবণে সতীর আত্ম বিসর্জ্জন, সীতার অগ্নি পরীক্ষাও অলৌকিক পতিভক্তি, সাবিত্রীর মৃত পতির দেহে পুনঃজীবন-সঞ্চার এবং পতির ঋণ পরিশোধার্থে সতী শৈব্যার আত্ম বিক্রয় প্রভৃতি পবিত্র কাহিনী পাঠ করিতে করিতে অশ্রু প্রবাহে তাঁহার করুণ হৃদয় বিগলিত হইত।

বেহুলা মধুর হাসিনী ও প্রিয় ভাষিণী। তাঁহার অমিয় মধুর সরল উপদেশে কত কলহ প্রিয় পরিবারে শান্তি ও প্রীতির অমৃত নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইত—কত দুঃখের সংসারে সুখের মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিত, কত দুঃখ-দগ্ধ মরুময় বিশুষ্ক প্রাণে বিমল সুখের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইত।

বেহুলা পরম ভক্তিমতি কিশোরী যুবতী। বার মাসে বার ব্রতানুষ্ঠান এবং দেবারাধনা ও দেবতার পবিত্র চরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, তাঁহার অবশ্য নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। তিনি প্রত্যহ মনসা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া আন্তরিক প্রীতি অনুভব করিতেন। ফলতঃ জ্ঞানে গুণে এবং খেলা-ধুলা ও ভক্তিতে বেহুলা আদর্শ রমণী।

গৃহে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অরক্ষণীয়া কন্যা; কন্যার বিবাহ যোগ্য বয়স উত্তীর্ণ দেখিয়া স্নেহ প্রবণ জনক জননী কন্যার বিবাহের জন্য বড় চিন্তিত হইলেন। যখন বহু অনুসন্ধানেও বেহুলার উপযুক্ত বর জুটিল না, তখন ঘটক মুখে সংবাদ পাইয়া

তীর্থ যাত্রী অতিথির ছদ্মবেশে চন্দ্রধর কন্যা দেখিতে সায়-বেণের ভবনে উপনীত হইলেন। চাঁদ ভাবী পুত্রবধূকে পরীক্ষার্থ ছলনা পূর্ব্বক লৌহ নির্ম্মিত কলাই রন্ধন করিতে দিলেন, এ অসম্ভব ঘটনা দর্শনে সকলে প্রমাদ গণিল। কিন্তু ভক্তিমতি বেহুলার প্রতি তাঁহার নিত্যারাধ্যা দেবীর বড় কৃপা ছিল; দৈব-শক্তি প্রভাবে মুহূর্ত্তে সে সুদৃঢ় লৌহ কলাই সুসিদ্ধ হইয়া গেল! এ অলৌকিক রন্ধন ব্যাপার দর্শনে সকলে মহা বিস্মিত হইল—অনেকে মনে মনে চিন্তা করিল, বেহুলা মানবী নহেন, শাপ ভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী। চন্দ্রধর ভাবী বৈবাহিকের নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া কন্যা দেখিলেন। সম্বন্ধ স্থির হইল। চাঁদ বেহুলার ন্যায় রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত পুত্রবধূ পাইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে স্বভবনে প্রতিগমন করিলেন।

লক্ষ্মীন্দর-বিপুলার বিবাহ। বিপুল বৈভবশালী চন্দ্রধর পুত্রের বিবাহে মহা আড়ম্বর—অনুষ্ঠান করিলেন। চম্পক নগরের অদূরে সাঁতালী পর্ব্বতে লৌহময় বিরাট বাসর গৃহ নির্ম্মিত হইল। সেই সুদৃঢ় সুবিশাল—

"মাঞ্জসের বাহিরেতে পাইক প্রহরী।
পোষাণীয়া নকুল ময়ূর সারি সারি॥
তার পাশে সারি সারি ঔষধ লাগায়।
দূর হতে নাগগণ গন্ধেতে পলায়॥
তাহার বাহিরে যত হাতী ঘোড়া ঠাট।
তাহার বাহিরে সব দিলেক কপাট॥
তাহার বাহিরে কৈল অগ্নি যে প্রচুর।
নিরবধি জ্বলিতেছে প্রকাশ নহে দূর॥
এইরূপে নানা যত্ন করি চন্দ্রধরে।
হাতে গদা লইয়া আপনি ফিরে দূরে॥"

বিবাহ নিছনি—নগরে সায়-সদাগরের ঘরে। মহা ঐশ্বর্য্যশালী সায়-বেণের গৃহ বিবাহের মহা আড়ম্বরে ও আনন্দ-উৎসবে ভরপুর। আনন্দ-কোলাহলে সে বিরাটপুরী সদা মুখরিত। বিচিত্র স্বর্ণ ছত্রতলে বিবাহ হইতেছিল; মন্ত্র পাঠ-কালে সেই সুন্দর সুবর্ণ ছত্রকে বিশাল ভুজঙ্গ ফণা ভ্রমে সহসা লক্ষ্মীন্দর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এ অভাবনীয় অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে সকলের মনে নব-দম্পতির ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কার ছায়াপাত হইল। ধর্ম্মবীর চন্দ্রধর বেহুলার পিতা সায়-সদাগর এবং মাতা অমলা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ শঙ্কিত মনে

দেবতার চরণে লক্ষ্মীন্দর—বিপুলার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে হর্ষ বিষাদে বিবাহের শুভ মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন হইল।

অনন্তর চাঁদ নব বৈবাহিককে নির্জ্জনে সকল কথা বুঝাইয়া পুত্র পুত্রবধূসহ সাঁতালী-পর্ব্বত গৃহে উপস্থিত হইলেন। নব দম্পতী সেই গিরিবক্ষ বিরাজিত লৌহময় সুদৃঢ় বাসরগৃহে রক্ষিত হইলেন। স্বয়ং চন্দ্রধর হিন্তালের ভীম যষ্ঠি হস্তে দ্বিতীয় ভৈরবের ন্যায় সে গৃহের প্রহরীগণের তত্ত্বাবধান কার্য্যে বিনিদ্রনেত্রে নিশা যাপন করিতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে চাঁদের ভীম হুঙ্কারে দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সেই লৌহ-বাসরে প্রবেশ কালে সহসা নব বধূর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, অসাবধান হস্ত সঞ্চালনে তাঁহার সিঁথির সিন্দুর বিন্দু মুছিয়া গেল। অমঙ্গল আশঙ্কায় বেহুলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল; অনিচ্ছায় নয়ন-প্রান্তে এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বেহুলা গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণ কৌটা খুলিয়া আবার সিন্দুর পরিলেন।

লক্ষ্মীন্দর নিদ্রিত। দৈবজ্ঞের গণনার কথা বেহুলার অশ্রুত ছিল না। তাই সতী নিদ্রিত পতি পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। পতি-কণ্ঠস্থ কুসুম মাল্যটি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিতে যাইয়া বেহুলা আপনার মৃদু সঞ্চালিত কুসুম পেলব করস্পর্শে অনিচ্ছায় লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মীন্দর নব পরিণিতা বণিতাকে বাহু বন্ধনে বুকে আবরিয়া লইতে সাদরে হস্ত প্রসারণ করিলেন। সদ্য পরিণিতা লজ্জাবতী সতী ব্রীড়াবনত বদনে একটুকু দূরে সরিয়া বসিলেন। লক্ষ্মীন্দর পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সাধ অপূর্ণ রহিল—অঙ্কলক্ষ্মীকে আর বক্ষে ধারণ করা হইল না। মানুষের সকল সাধ পূর্ণ হয় না।

লক্ষ্মীন্দর পুনশ্চ জাগিলেন। দেখিলেন, তখনও বেহুলা বিনিদ্র নয়নে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। পতি, পত্নীর নিকট চারিটি ভাত চাহিলেন; তাঁহার বড় ক্ষুধা। কিন্তু এবারও মুখের কথাটি না ফুরাইতে বেহুলা উত্তর দিতে না দিতে তিনি পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বেহুলা প্রথমে স্বামীকে ফলাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সঙ্কল্প করি-লেন। তারপর, একটুকু চিন্তা করিয়া বরণডালার উপকরণ গুলি লইয়া অতি ক্লেশে স্বামীর জন্য চারিটি অন্ন প্রস্তুত করিলেন। তিনি স্বামীকে আহার করি-বার জন্য কত ডাকিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীন্দরের ঘুম ভাঙ্গিল না। বেহুলা অন্ন-ভাণ্ড

সম্মুখে করিয়া বসিয়া রহিলেন, আশা, ঘুম ভাঙ্গিলে স্বামী সে অন্ন আহার করিবেন।

তখনও বেহুলা স্বামী শয্যায় তেমনি ভাবে বসিয়াই আছেন। সহসা সেই লৌহ-বাসরের ঈশান-কোণে সিন্দুর বিন্দু চিহ্নিত স্থানে একটা রন্ধ্র-পথ প্রকাশ হইল। দেবী-ভয়ে ভীত বিশ্বাস ঘাতক কর্ম্মকার গৃহ-নির্ম্মাণকালে সূক্ষ্ম অঙ্গার চূর্ণ পূরিয়া এ রন্ধ্র পথ রাখিয়াছিল। এখন দেবীর ইচ্ছায় ভীষণ বিষধর সর্পের উষ্ণ নিশ্বাসে ছিদ্র পথের সেই অঙ্গার কণাগুলি টুটিয়া যাইয়া এক পরিষ্কার রন্ধ্র-পথে পরিণত হইল। সেই অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে এক ক্ষুদ্রকায় বিষধর সর্প গৃহে প্রবেশ করিল। বেহুলা কৌশল পূর্ব্বক সে ভুজঙ্গকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর রাত্রে আরও দুইটি কাল সর্প সেইরূপভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়াই বন্দী হইল।

বেহুলা পতি পদতলে বসিয়া বসিয়া সেই রন্ধ্র-পথের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। শ্রম, অনিদ্রা, দুঃশ্চিন্তা ও উপবাসক্লিষ্টা ক্ষীণাঙ্গিনী বেহুলা আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন? কাল নিদ্রা তাঁহাকে বড় জ্বালাতন করিতে লাগিল। অনিচ্ছায় অজ্ঞাতভাবে ক্ষণকালের জন্য বেহুলা বিষম ঘুম ঘোরে শুইয়া পড়িলেন। এমত সময় এক অতি ভীষণ কালনাগিনী সে রন্ধ্র-পথে বাসর গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই ভুজঙ্গিনী আপনার ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া সেই কালসাপিনী নিদ্রিত লক্ষীন্দরের পদ-সন্নিহিত হইল। নিয়তির দুর্জ্ঞেয় বিধানে সহসা নিদ্রাঘোরে লক্ষীন্দরের পদ সর্পিনীর দেহ স্পর্শ করিল। আঘাত পাইয়া ভীষণ বিষধর সদর্পে মস্তক উন্নত করিয়া সজোরে তাঁহাকে দংশন করিল। সর্পাঘাতে লক্ষীন্দর চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

স্বামীর চীৎকারে বেহুলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ত্রস্থে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, কালনাগিনী অতি দ্রুত গতিতে রন্ধ্র পথে পলায়ন করিতেছে। বেহুলা ক্ষিপ্রহস্তে কাটারির আঘাতে সর্পিনীর গৃহ-অভ্যন্তরস্থ সুদীর্ঘ পুচ্ছ কাটিয়া ফেলিলেন। পুচ্ছহীন কালনাগিনী দ্রুত গতিতে পলায়ন করিল। সহসা প্রভাতি বায়সকণ্ঠ-ধ্বনির সহিত সে কালনিশার অবসান হইল।

নববধুর অপরিস্ফুট ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণে চাঁদ-সদাগর ও সনকা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণ ত্রস্থে গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বার মুক্ত ছিল। বেহুলা কাল-নাগিনীর অনুসরণ জন্য দ্বার খুলিয়াছিলেন; আর সে মুক্ত দ্বার বন্ধ করেন নাই

গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলে দেখিলেন, নব-বধূ বেহুলা স্বামী-শব ক্রোড়ে করিয়া দেবী প্রতিমার ন্যায় বসিয়া আছেন। গুরুজনেরা গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার সেই অস্ফুট রোদন থামিল। স্নেহময়ী জননী তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র লক্ষ্মীন্দরের 'সোণার বরণ' বিবর্ণ দেখিয়া বাতাহত স্বর্ণলতিকার ন্যায় ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইলেন। আত্মীয় স্বজনের বিলাপ-ধ্বনিতে বিবাহ-বাসর শোক-দুঃখ পূর্ণ শ্মশানে পরিণত হইল।

বেহুলা নির্ব্বাক—নিস্পন্দ; বুঝি বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা। শ্বশ্রূর ক্রন্দন, আত্মীয় স্বজনের রোদন-কোলাহল কিছুই তাঁহার শ্রুতিগোচর হইতেছে না। তিনি তন্ময় হৃদয়ে ভাবিতেছেন, হায়! কেন স্বামীর প্রথম প্রীতি সম্ভাষণে সরমে দূরে সরিয়া গিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত দিলাম? তাঁহার বাসনা অতৃপ্ত রহিল; হায়! তাঁহার প্রার্থনা সত্ত্বেও ক্ষুধার অন্ন আর সে মুখে তুলিয়া দিতে পারিলাম না। শোকে-দুঃখে বেহুলার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল—দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু-পাত হইতে উদ্যত হইল, তিনি চক্ষের সে জলধারা পড়িতে দিলেন না; সযত্নে উষ্ণ অশ্রু নিরোধ করিলেন। একবার চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, শাশুড়ীর অপ্সরা-বিনিন্দিত সুন্দর দেহলতা অযত্নে ভূতলে বিক্ষিপ্ত আছে। শ্বশ্রূর অবস্থা দর্শনে তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল। হায়! অদৃষ্টবশে কর্ম্মদোষে এমন সোণার শাশুড়ীকে লইয়া তিনি শাঁখা সিঁদুর ধারণ করিয়া এক দিনের জন্যও পতির সংসার করিতে পারিলেন না।

সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে লক্ষ্মীন্দরের চিতা প্রস্তুত হইল। আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্বে লখাইর শব-দেহ—দেবদুর্লভ সোণার অঙ্গ শ্মশানের অনলে ভস্মিভূত হইবে—বেহুলার সব ফুরাইবে। তিনি শ্মশানে সম্মুখে-শবের পার্শ্বে যাইয়া করযোড়ে দাঁড়াইলেন। তাঁহার প্রাণে বড় সাধ, স্বামী-সহ এক চিতায় পুড়িয়া সহমৃত হইবেন; অথবা সর্পদষ্ট লক্ষ্মীন্দরের শব-দেহ অনলে দগ্ধ না করিয়া ভেলায় ভাসাইবার জন্য গুরুজনদিগকে অনুরোধ করিবেন। তাঁহার প্রাণে আশা, কোনও শক্তিশালী সর্প-রোঝা কৃপা করিয়া স্বামীর মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতে কিম্বা দৈববশে ভাসমান ভেলা দেব দেশে উপনীত হইলে, দেবতার কৃপায় তাঁহার প্রাণারাধ্য ধন লক্ষ্মীন্দর পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারেন। এইরূপ আশার প্রেরণায় নব-বধূ বেহুলা লজ্জার আবরণ দূরে সরাইয়া ফেলিয়া গুরুজনদিগকে তাঁহার প্রাণের কথা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন আর বেহুলার লজ্জা ভয় নাই; শ্মশানে লজ্জা তিষ্ঠিতে পারে না।

বেহুলা স্বামী-শবসহ ভেলায় ভাসিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার এই ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিলেন। তখন বেহুলা বলিলেন,—

" স্বামী সে নারীর ধন স্বামী সে পরাণ।
স্বামী বিনে জীবন, মরণ সম জ্ঞান॥
আর লোক মুক্তি পায় যোগ তপোবলে।
স্বামীর সেবায় নারী মুক্তি পদ মেলে॥"

বেহুলা এরূপ অনেক কথা বলিলেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ করুণ কথায় সকলে বিস্মিত হইল। আত্মীয়েরা নব বধূর এরূপ সকরুণ মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এক সুবৃহৎ ভেলা প্রস্তুত হইয়া গুঞ্জরি নদীর (গাঙ্গুড় নদীর) জলে ভাসিল। লক্ষ্মীন্দরের শব-দেহ সেই ভেলায় উত্তোলিত হইল। বিবাহের বেশ ভূষায় ভূষিতা বিচিত্র পট্টাম্বর পরিহিতা সিন্দুর চন্দন চর্চ্চিতা সদ্য পরিণিতা বেহুলা স্বর্গভ্রষ্টা দেবী প্রতিমার ন্যায় সেই 'কলার মান্দাসে' চড়িয়া স্বামী-শব পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

সোণার প্রতিমা বেহুলা বান্ধব-শূন্য হইয়া একাকিনী লক্ষ্মীন্দরের শব-সহ ভেলায় ভাসিয়া যাইবেন, ইহা স্নেহময়ী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রাণে অসহ্য হইল। তিনি পুত্রবধূকে প্রবোধিয়া গৃহে ফিরিয়া আনিবার জন্য উন্মাদিনীর ন্যায় ধূলিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বেহুলা কিছুতেই গৃহে ফিরিতে স্বীকৃতা হইলেন না। তিনি শাশুড়ীকে বলিলেন, " মা! তুমি আর কাঁদিও না; তোমার আশীর্ব্বাদে আমি আবার তোমার স্নেহের ধনকে লইয়া গৃহে ফিরিব। বাসর গৃহের যে কক্ষে কড়ার তৈলে দীপ জ্বলিতেছে, সে কক্ষটি যেন আমার পুনরাগমন কাল পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকে; দেবতার কৃপায় আমি স্বামী-সহ ফিরিয়া আসিয়া সে দীপ এমনি প্রজ্জ্বলিত দেখিতে পাইব। বাসর-ঘরে স্বর্ণ থালায় অন্ন রহিয়াছে, উহা দাড়িম্ব তলে পুঁতিয়া রাখিবেন।

কথা শেষ হইতে না হইতে লক্ষ্মীন্দরের শব-দেহ ও স্বর্ণ-প্রতিমা বেহুলাকে বক্ষে লইয়া কদলি-ভেলা ভাসিয়া চলিল। নদী তীরস্থ শত শত নরনারী পুণ্য-প্রতিমা বেহুলার তৎকালীন পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে, দেবী-দর্শনের পুণ্য সঞ্চয় হইল বলিয়া মনে করিতে করিতে অশ্রু প্রবাহে বুক ভাসাইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত প্রায় হইল। তথাপি পুত্র-শোকাতুরা সনকা নদী-সৈকতে ভাসমান ভেলার পশ্চাতে পশ্চাতে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ জগৎ সাঁঝের আঁধারে সমাবৃত হইল। অগত্যা সনকা

প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনেরা পাষাণে বুক বাঁধিয়া মৃতের সহিত জীবন্ত সোণার প্রতিমা গাঙ্গুড়ের জলে বিসর্জ্জন দিয়া অনিচ্ছায় গৃহে ফিরিলেন। কোন্ এক জরা-মরণ-বিচ্ছেদ শূন্য অজানা দেব-দেশের অজ্ঞাত পথে বেহুলা ভাসিয়া চলিলেন। পতি-শব সহ সতীর সে প্রস্থান স্থান মহাতীর্থে পরিণত হইল। গাঙ্গুড়ের সে প্রস্থান স্থান মহাতীর্থে পরিণত হইল। গাঙ্গুড়ের সে প্রস্থান-ঘাটের জল পতিতপাবনী সুরধনীর পবিত্র সলিল জ্ঞানে সকলে মস্তকে স্পর্শ করিতে লাগিল। সকলে সতী লক্ষ্মী পুণ্যবতীজ্ঞানে উদ্দেশ্যে বেহুলার প্রতি প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইল।

অশুভ বার্ত্তা জলে পতিত তৈল বিন্দুর ন্যায় অতি শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের এই শোকাবহ অপূর্ব্ব করুণকাহিনী—বেহুলার এই হৃদয় বিদারক পুণ্যকথা অল্পকাল মধ্যেই দূরদূরান্তরে প্রচার হইয়া পড়িল। যে শুনিল, সে-ই মনে করিল, বেহুলা রমণীরত্ন—বেহুলা এ যুগের সীতা-সাবিত্রী—বেহুলা স্বর্গের দেবী! কত স্থানের কত লোক নদীতীরে আসিয়া বেহুলার দর্শন লাভে দেবী দর্শনের পুণ্য-সঞ্চয়ে কৃতার্থ হইল। ক্রমে কথাটা নিছনি নগরে সায়-বেনের ঘরেও পঁহুছিল। বেহুলার স্নেহময়ী জননী অমলা জামাতা ও কন্যার শোকে উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া উঠিলেন। তিনি শেল-বিদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় প্রাণের জ্বালায় নিয়ত ছট্-ফট্ করিতে লাগিলেন। তখন বেহুলার জ্যেষ্ঠ সহোদর ভগিনীর সংবাদ পাইবার জন্য গাঙ্গুড়ের তীরে তীরে চম্পকনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই ভ্রাতা, ভগিনীর দর্শন পাইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রাণসমা সহোদরা অশ্রুমুখী বেহুলা রম্ভাতরু নির্ম্মিত মান্দাসে বসিয়া আনতবদনে অনিমিষ দৃষ্টিতে পতির মুখপানে চাহিয়া আছেন। কদলি-ভেলা জলে ভাসিতেছে, নাচিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে; উপবাস-শীর্ণা শোক-দুঃখ কাতরা পতি পাগলিনী বেহুলার সে দিকে দৃক্‌পাতও নাই। তাঁহার ললাটে উজ্জল সিন্দুর-বিন্দু শোভা পাইতেছে; পরিধেয় বিচিত্র পট্টবাসাঞ্চল বায়ু হিল্লোলে মনোহর পতাকার ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া উড়িতেছে। নদীগর্ভস্থ জল জন্তুগণ লক্ষ্মীন্দরের মৃতদেহ গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে, বিরাটকায় কুম্ভীরগুলি বিশাল বদন ব্যাদন করিয়া শব সহ সতীর ক্ষুদ্র দেহ স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভেলার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর পতিগত প্রাণা বেহুলার পূত হস্ত সঞ্চালিত সলিল হিল্লোলে সে হিংস্র জন্তুকুল সভয়ে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

ভগিনীর এ শোচনীয় দশা দর্শনে শোক দুঃখে ভ্রাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ভ্রাতা পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য ভগিনীকে অনেক অনুরোধ উপরোধ ও কাঁদাকাটি করিলেন। কিন্তু বেহুলা কিছুতেই সহোদরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "স্বামীর মৃত দেহে জীবন সঞ্চার না হইলে আমি কিছুতেই গৃহে ফিরিব না।"

ভ্রাতার কথার উত্তর দিতে বেহুলা শোকভরে বড় কাতর হইলেন—অশ্রু প্রবাহে তাঁহার গোলাপ রক্তিম গণ্ড প্লাবিত হইল। দেখিতে দেখিতে—ভ্রাতা ভগিনীর কথা শেষ হইতে না হইতেই তীব্র জল-স্রোতে কদলী-ভেলা সুদূরে ভাসিয়া চলিল। তখন স্নেহময় ভ্রাতা বিষাদ ম্লান বদনে অশ্রু মোচন করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। হায়! অপত্য বৎসলা অমলার শিরে যুগপৎ সহস্র বজ্রপাত হইল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে লক্ষ্মীন্দরের শব-দেহ পঁচিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার দেবদুর্ল্লভ সুন্দর শরীর পঁচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। গলিত শবের বিষম দুর্গন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল; সোণার অঙ্গে ক্রিমি-কীট সমূহ কিলিবিলি করিতে লাগিল। বিষাদ প্রতিমা অশ্রুমুখী বেহুলা নিরত স্বহস্তে সেই পূতিগন্ধ গলিত শব মাংস হইতে কৃমি কীট সকল বাছিয়া বাছিয়া ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সেই নিরানন্দ দেবী মূর্ত্তি বেহুলার রূপ-মাধুরী উছলিয়া পড়িতেছিল। তখনও তাঁহার অনিন্দ্য-সুন্দর রূপরাশি দর্শনে দর্শকের প্রাণে পুনঃ পুনঃ সে রূপ-সুধা পানের দারুণ পিপাসা জাগিয়া উঠিত—পথের লোক আপন কর্ম্ম ভুলিয়া মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিত।

"পথের পথিক যত পথ বৈয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়॥
ত্রিজগৎমোহিনী কেন মরা লৈয়া কোলে,
কলার মান্দাসে ভাসে সলিল হিল্লোলে॥"

বেহুলার সে অনন্তরূপ দর্শনে এক দুষ্ট ধীবর মুগ্ধ হইল। সে তাঁহাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিবার জন্য, মৎস্য ধরিবার উপকরণ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া, ভেলা ধরিবার জন্য উন্মাদের ন্যায় নদীর জলে ঝাপাইয়া পড়িল। সহসা এক প্রবল তরঙ্গাঘাতে দুষ্টবুদ্ধি জালিক কোথায় ভাসিয়া গেল। রূপ-মুগ্ধ ক্ষুদ্র পতঙ্গ অনলে পড়িয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিল। সতীর পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা পাইল।

গোদার বাঁকে ধনা মনা বড়শীতে মাছ ধরিতেছিল। তাহারা বেহুলার জন্ম উন্মাদ হইয়া উঠিল। অবশেষে দুই ভ্রাতার মধ্যে তাঁহাকে লইয়া বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। ঘোর তর্ক—বিতর্ক—মারামারি করিয়া উভয়ে নৌকাসহ জলমগ্ন হইল। পতি-শব সহ সতীর মান্দাস তরী তীব্র বেগে ভাসিয়া চলিল।

তার পর এক পাপিষ্ঠ বৈদ্য লক্ষ্মীন্দরের প্রাণদানের মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে প্রলুব্ধ করিয়া সতীকে তীরে আসিতে আহ্বান করিল। বেহুলা তাঁহার অশিষ্ট হাব-ভাব দর্শনে অবনত বদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। খর জল স্রোতে কদলি-ভেলা দূরে ভাসিয়া চলিল। বিধাতার মঙ্গলময় সূক্ষ্ম বিধানে এইরূপে সর্ব্বত্র বেহুলার পবিত্র সতী-ধর্ম্ম রক্ষা পাইতে লাগিল।

লক্ষ্মীন্দরের শব পঁচিয়া ধসিয়া গলিয়া পড়িতেছে, শব-মাংস মধ্যে ক্রিমি-কীট সমূহ ইতস্ততঃ কিলি বিলি করিতেছে, দুর্গন্ধ প্রিয় মক্ষিকাকুল গলিত শবের বিষম পুতিগন্ধে মুগ্ধ হইয়া নিয়ত শববেষ্টন পূর্ব্বক 'ভন্ ভন্' করিতেছে, অসহ্য দুর্গন্ধে নদীতীরস্থ লোকেরা বস্ত্রাঞ্চলে নাসা-রন্ধ্র বন্ধ করিয়া বেহুলাকে মায়াবিনী পিশাচী জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে। কুম্ভীর ও কচ্ছপাদি নানা জাতীয় জলজন্তু সে গলিত শবের পুতিগন্ধে মুগ্ধ হইয়া ভেলার সঙ্গে সঙ্গে মহা আস্ফালন ও মুখ ব্যদন করিয়া বিষম বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে, মাথার উপরে শকুনী—গৃধিনী উড়িতেছে, তীরে ফেরুপাল চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে—ডাকিতেছে, এ মড়াটা পাইলে তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে; কিন্তু বেহুলার সে দিকে ভ্রুক্ষেপও নাই। তিনি ধ্যানস্থা যোগিনীর ন্যায় বসিয়া বসিয়া স্বামী-শবস্থ ক্রিমি-কীট সকল বাছিতেছেন, মক্ষিকা তাড়াইতেছেন, আর কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব অভয় বাণী দুরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় তাঁহার প্রাণে প্রবেশ করিয়া যেন আশার মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিয়া তাঁহাকে কি এক মোহের ছলনায় কোথায়—কোন এক অজ্ঞাত দেব-দেশে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে. বেহুলা তাহা জানেন না, বুঝেন না; অথচ স্বেচ্ছায় মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছেন।

ক্রমে তাঁহার ভেলাখানিও পতি-শবের ন্যায় গলিত দশাপন্ন হইয়া পড়িল। রম্ভা বৃক্ষগুলি সুদীর্ঘকাল জলে থাকিয়া পঁচিয়া খসিয়া যাইতে লাগিল। বেহুলা পতি-শব দেহটীরে আপনার বুকে আবরিয়া রাখিয়া তাঁহার সকল দুঃখের নিদান মনসাদেবীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভেলা সম্পূর্ণ পঁচিয়া গিয়াছে, আর মুহূর্ত্ত বিলম্বে বেহুলা অতল জলে ডুবিবেন—তাঁহার

সকল দুঃখের অবসান হইবে। সহসা দেবীর কৃপায় তথায় এক নূতন ভেলা ভাসিয়া আসিল। পতি-শব সহ সতী তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বেহুলার ভেলা ভাসিতে ভাসিতে মধ্যে মধ্যে নদী-তীরস্থ ঘাটে লাগিল। তখন পর-দুঃখ কাতর সদাশয় গৃহস্থগণ তাঁহাকে ফল-মূলাদি বিবিধ খাদ্য পদার্থ প্রদান করিতেন। শোক-বিহ্বলা অশ্রুমুখী বেহুলা তাহা ভক্তি পূর্ব্বক দেবীর নামে নিবেদন করিয়া আপনি সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। পতি-গত প্রাণা সতী কখন কখন সেই খাদ্য-পদার্থ সকল আপনার মুখে না তুলিয়া ভাববিহ্বলতা বশতঃ মৃত পতির মুখে গুঁজিয়া দিতেন। এবং স্বামীর তাৎকালিক শোচনীয় অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া শোক-দুঃখে অধীরা হইয়া অজস্র অশ্রুপাত করতঃ স্বামীর শব-দেহ সিক্ত করিতেন।

নোয়াদার ঘাটে একটা বৃহৎ জলৌকা লক্ষ্মীন্দরের শব-দেহ দংশন করিল। অশ্রুমুখী বেহুলা প্রাণপণ যত্নে সেই জোঁক ছাড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু পারিলেন না। জোঁক শব-মাংস মধ্যে লুকাইয়া থাকিল। বেহুলা মনের দুঃখে অবিরত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে বুদ্ধিমতী সতী জোঁকের মুখের নিকট আপনার কণক অঙ্গুলী রক্ষা করিলেন নর-শোণিতের গন্ধ পাইয়া শোণিত লুব্ধ জলৌকা বেহুলার হস্তে দংশন করিল। এইরূপে সতী পতি-শব হইতে সেই সুবৃহৎ জলৌকাটারে বহিষ্কৃত করিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিল।

"ধরিয়া মরার গায়ে হানে এক জোঁক।
দেখিয়া বেহুলা কাঁদে পায় বড় শোক॥
ছাড়াইলে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
মরি মরি বেহুলার কি হবে উপায়॥
অবিরত অশ্রুজল নিবারিতে নারি।
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী॥"

প্রায় ছয় মাস হইল, সতী পতি-শব লইয়া ভেলায় ভাসিয়াছেন। শব পচিয়া খসিয়া এখন অস্থি মাত্র সার হইয়া পড়িয়াছে। বেহুলা আশার শেষ শলিতাটির ন্যায় সেই কঙ্কালগুলি বুকে আবরিয়া জলে ভাসিতেছেন। শীত, বাত, তাপক্লিষ্টা অনশন ক্ষীণা বেহুলার অতি শীর্ণ দেহ খানি স্বর্ণ-বল্লরীর ন্যায় কদলি ভেলায় পড়িয়া আছে। এখন আর তাঁহার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই—মরজগতের কোন-রূপ ভাবনা চিন্তাও যেন নাই। এখনও আর বেহুলা এ মর্ত্ত্যের মানবী নহেন, নিরাহারা অভিশপ্তা স্বর্গীয়া দেবী।

একদিন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, যামিনীর নিবিড় অন্ধকারে ধরা সমাবৃত। সেই ভীষণ অন্ধকারে এ বিশ্ব যেন একটা বিরাট রাক্ষসের ন্যায় বোধ হইতেছে। প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিজন নদীবক্ষে উৎকট শব্দ উঠিয়া পিশাচের অট্টহাস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মাথার উপর অনন্ত শূন্যে বজ্রনাদে মেঘ ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে। শোঁ শোঁ রবে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হইয়া সে ভীষণ রজনীকে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। নদী-তীরে ব্যাঘ্র-ভল্লুক ডাকিতেছে, শিবাকুল চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিতেছে। সেই মহা বিভীষিকা পূর্ণ রাত্রিতে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে, সে উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুলা বিজন নদী গর্ভে—মৃত পতির কঙ্কাল বুকে করিয়া বেহুলা একাকিনী ভেলায় ভাসিতেছেন। মানুষের প্রাণ—কুসুম পেলব বালিকা-হৃদয় আর কত সহিতে পারে?—সে বিষম বিভীষিকা দর্শনে ক্ষীণাঙ্গিনী বেহুলা ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছিতাবস্থায় বেহুলা দেখিলেন, তিনি যেন বিগত সাত জন্ম ধরিয়া এমনি বিবাহ রাত্রে বিধবা হইয়া আসিতেছেন। প্রতিবারেই যেন তিনি পতির সহিত সহমৃতা হইয়াছেন—বিবাহের সাজ শাখা সিঁন্দুর পড়িয়া স্বামীসহ চিতার অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সেই পুণ্য ফলে এবার তিনি মৃতের শুষ্ক কঙ্কালে জীবন-সঞ্চার করিয়া—মৃত পতিকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইবেন; তিনি দৈবশক্তি প্রভাবে দেব-দেশে যাইয়া তাঁহার নিত্যারাধ্যা দেবীর কৃপায় স্বামীকে ফিরিয়া পাইবেন।" এই অদ্ভুত স্বপ্নের সহিত বেহুলার সেই বিষম বিভীষিকাময়ী যামিনীর অবসান হইল। মূর্চ্ছা-ভঙ্গে তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, ভেলা কেদারেশ্বর-ঘাটে।

সে ঘাটের অদূরে স্বর্গ-রজকিনী নেতা কাপড়-কাচিতেছিলেন। সে দয়া করিয়া বেহুলাকে স্বর্গে লইয়া গেল। বেহুলা দেব-পুরে দেব সভায় উপস্থিত হইয়া আনত মস্তকে দেবতাদের চরণে প্রণাম করিয়া যোড়-হস্তে দাঁড়াইলেন। তখন বেহুলার প্রতি দেব-সভায় নৃত্য করিবার আদেশ হইল। কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে বেহুলা প্রাণপণ যত্নে দেবতাদের সে নিষ্ঠুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। তাঁহার প্রতি কঠোর দেব-পরীক্ষার অবসান ও দেব-কৃপা বর্ষিত হইল। শিবের আদেশে শিব-সুতা মনসা দেবী স্বর্গীয় অমৃত সেচনে লক্ষ্মীন্দরের কঙ্কাল-দেহে জীবন-সঞ্চার করিলেন। অলকাপুরীর অমৃতময় বায়ুস্পর্শে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিল।

অতঃপর দেবীর কৃপায় বেহুলা তাঁহার সর্প দষ্ট ছয় ভাসুরের প্রাণ ফিরিয়া

পাইলেন। তাঁহারা পুনর্জীবিত হইয়া দেবী-পদে প্রণাম করিলেন। দেবী যত্নে তাঁহাদের মৃত-দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার কৃপায় সে শব দেহ নষ্ট হইতে পারে নাই। তিনি কৃপা করিয়া চাঁদের অনন্ত রত্নরাজি পরিপূরিত "চৌদ্দডিঙ্গা-মধুকর" বেহুলাকে ফিরিয়া দিলেন। বেহুলা দেব সভায় দেবতাদের পায়ে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া—দেবীর রাতুল পদে প্রণাম পূর্ব্বক পতি ও ছয় ভাশুর সহ চম্পক-নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

স্বর্গ-দ্বারে আসিয়া সতী-চরিত্রে সন্দিগ্ধ লক্ষ্মীন্দর চির পবিত্রতাময়ী বেহুলার চরিত্র-পরীক্ষার্থ এক অগ্নি পরীক্ষার অনুষ্ঠান করিলেন। পতিব্রতা সতী সে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মীন্দর আপনার এ অন্যায় সন্দেহের জন্য বিশেষ লজ্জিত হইয়া পতিব্রতা পত্নীকে প্রীতি মধুর সাদর সম্ভাষণে দেবী-জ্ঞানে বুকে আবরিয়া লইলেন। প্রীতি-প্রফুল্ল মনে মাধবী সহকারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সতীর কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইল।

তারপর লক্ষ্মীন্দর পতিব্রতা-পত্নী ও ছয় ভ্রাতা সহ দেবী-দত্ত সেই 'মধুকরে' আরোহণ করিয়া চম্পক-নগরে গাঙ্গুড়ের তীরে—সেই ভেলা ভাসিবার ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। শিবের আদেশে চাঁদ মহা সমারোহে মনসা দেবীর অর্চ্চনা করিয়া পুত্র পুত্রবধূ প্রভৃতিকে গৃহে লইয়া গেলেন। মর্ত্ত্যে মনসা দেবীর পূজা-প্রচার হইল। এত দিনে চির মঙ্গল ময় সদা শিবের অনুগ্রহে চাঁদ-সদাগরের আশিব নষ্ট হইল। অমঙ্গলের গৃহে মঙ্গলময়ের কৃপায় মঙ্গলের হুলু-ধ্বনি ও শঙ্খ-রব প্রতিধ্বনিত হইল। সুদীর্ঘ কাল পরে অশ্রুমুখী সনকা এবং তাঁহার ছয় পুত্র-বধূর শুষ্ক অধরে আবার হাসির মধুর রেখা ফুটিয়া উঠিল। সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিল, "জয় মনসাদেবীর জয়!—জয় বেহুলার জয়!!"

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বড়ই অদ্ভুত! এত সুখ দুঃখিনী সনকার অদৃষ্টে সহিল না। চন্দ্রধরের জ্ঞাতিগণ সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল নিরুদ্দিষ্টা তরুণী বধূ বেহুলার কঠোর পরীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক বোধ করিলেন। স্থির হইল, বেহুলা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে—সতী লক্ষ্মী বলিয়া গৃহলক্ষ্মীর আসন গ্রহণে অধিকারিণী হইবেন। অন্যথা তাঁহাকে চির বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

এ অপ্রীতিকর আলোচনার বিষময়-সংবাদ অন্তঃপুরে পঁহুছিল। অনতি বিলম্বে লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া সতী প্রতিমা বেহুলা সে জ্ঞাতি-সভায় উপস্থিত হইলেন। সতী দেহনিঃসৃত পুণ্য-জ্যোতিঃ প্রভাবে সভা-গৃহ উজ্জ্বল হইল। সতী

সভাস্থ গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া বীণা বিনিন্দিত মধুর স্বরে কম্পিত অধরে যুক্ত করে বলিলেন, "মৃত পতির জীবন লাভই আমার এ কঠোর সাধনার এক মাত্র উদ্দেশ্য। দেব কৃপায় আমার সে মহা সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে—আমি আমার মৃত পতিকে ফিরিয়া পাইয়াছি—আমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর আমার কোন প্রার্থনা নাই; সুতরাং পরীক্ষার ও প্রয়োজন নাই। আমাকে বর্জ্জন করাইত আপনাদের অভিপ্রেত?—তা আমি স্বয়ংই আপনাদের সে অভিলাষ পূর্ণ করিতেছি; আপনারা আমার শেষ অভিবাদন গ্রহণ করুন।" কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। সেই বিপথু-মতী বেহুলার সোণার দেহ হইতে এক অদ্ভুত স্বর্গীয় জ্যোতিঃশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। সে অপূর্ব্ব জ্যোতিতে মুহূর্ত্তে সভাগৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বেহুলা ভূতলে পড়িয়াগেলেন। সহসা কি জানি কোন্ মায়া-মন্ত্রে পরিচালিত হইয়া লক্ষীন্দর ও ভূতলশায়ী হইলেন। উভয়ের দেহ-জ্যোতিঃ এক স্বর্গীয় জ্যোতির সহিত মিশিয়া ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে উঠিয়া অনন্ত স্বর্গে প্রস্থান করিল। দুইটি পুণ্যজ্যোতিঃ একত্র সম্মিলিত হইয়া একবারে এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। এবিশ্বে সতীত্বের বিজয়-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। তখন ভুবন গাহিল—

"পতিব্রতা সতী কন্যা শুদ্ধ হইয়া দেখ,
স্বামী সঙ্গে স্বর্গে গেল না বুঝিল এক।
তারার সঞ্চার হেন উঠিল গগনে,
দেখিয়া সভার লোক ধন্য ধন্য মানে।
আকাশে দুন্দুভী বাজে পুষ্প বরিষয়,
বিস্ময়ে গায়িল বিশ্ব জয় সতী জয়॥"

মান্না।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

সায়ং কাল।—বিপিনের খিড়কী-বাটী সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান।

(সচকিতভাবে, এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে শশীর প্রবেশ।)

শশী। ক'দিন ধরে চেষ্টায় চেষ্টায় ঘুরছি। একদিনও একলা পাচ্ছি না।

মাস্কেলটা সঙ্গে থেকে সব মাটি করে দেয়। নইলে কি আর এখনও আশায় আশায় থাকতে হ'ত। কতদিন আগে মায়া হাতে এসে পড়ত। মায়া! নামটি কি মধুর। নামের চেয়ে চেহারা খানা আরও খাপ্‌সুরত্। ভাল যদি বাসতে হয়ত ঐ রকম মেয়ে মানুষকেই ভাল বাসতে হয়। কিন্তু বড় খেলাচ্ছে। যে দিন প্রথম এখানে দেখতে পাই ঝোঁপের আড়ালে লুকাই বটে, কিন্তু এমন ভাবে—যাতে শুধু মায়া আমায় দেখতে পায় আর আমি তাকে দেখতে পাই। সে দিন মায়া আমায় নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিল, নইলে কি আর ননীকে অত চুমু খায়। ও চুম্বন বর্ষণের লক্ষ্যস্থল যে, আমার সেটা কি আর বুঝতে বাকি থাকে। ভগবান কি চেহারা খানাই দিয়েছিল, আজ অবধি এমন মেয়ে মানুষ দেখলেম্ না যে একবার দেখেই মজে গেছি। যা হ'ক মায়া খেলোয়াড় বটে, ধরা দিয়াও ধরা দিচ্ছে না। বাবার ঐ বেয়াড়া উইল খানা না থাকলে কি আর অত খেলতে দি। ঐ যে, আসছে দেখছি। অ্যাঃ আবার সঙ্গে ননীটাও রয়েছে। এখন ঝোঁপের অন্তরালে লুকাই তার পর সুবিধা পেলেই বা'র হওয়া যাবে। [গুপ্ত ভাবে অবস্থান।]

(মায়া ও ননীর প্রবেশ।)

মায়া। ননী তুমি এই বেঞ্চিতে বসো আর আমি গাছে জল দি।

ননী। আচ্ছা কাকীমা, তুমি গাছে জল দাও। আমি ততক্ষণ মালা গাঁথি।

[মায়া জলপাত্র লইয়া গাছে জল দিতে লাগিল।]

ননী। কাকী মা তুমি রোজ জুঁই গাছে জল দাও কেন?

মায়া। জল না দিলে যে গাছগুলি মরে যাবে।

ননী। অন্য গাছে ত তুমি জল দাও না? সে গাছগুলি ত শুকিয়ে যায় না?

মায়া। অন্য গাছে যে মালিতে জল দেয়।

ননী। জুঁই গাছে মালী জল দেয় না কেন?

মায়া। জুঁই গাছে আমায় জল দিতে হয়।

ননী। কেন?

মায়া। জুঁই ফুল যে বড় সুন্দর।

ননী। গোলাপ ফুলও ত সুন্দর, তাতে ত তুমি জল দাও না।

মায়া। জুঁই ফুলে যে পূজা হ'য়।

ননী। জবা ফুলেও ত পূজা হয়।

মায়া। ঠাকুর যে জুঁই ফুল ভালবাসে।

ননী। তুমি বল্‌ছ না। আমি কিন্তু জানি।

মায়া। কি জান, বাবা?

ননী। তুমি কেন জুঁই গাছে জল দাও।

মায়া। কেন দি?

ননী। তোমায় বল্‌ব কেন?

মায়া। বল না বাবা। লক্ষ্মী ছেলে একবার বল।

ননী। আমার মনে আছে।

মায়া। তবে বল না বাবা।

ননী। সে কাকা বাবু যখন জুঁই গাছ পোঁতে তোমায় রোজ বিকালে জল দিতে বলেছিল।

মায়া। ননী ননী আবার বল।

ননী। দেখ কেমন মালা গেঁথেছি।

মায়া। বেশ মালা; বড় সুন্দর হ'য়েছে।

ননী। এ মালায় কি কর্‌ব জান?

মায়া। কি কর্‌বে?

ননী। কাকা বাবুর ফটোতে পরিয়ে দে'ব। তুমি কাল যে মালা পরিয়ে দিয়াছিলে তা শুকিয়ে গেছে কি না, তাই সে মালা বদলে এই মালা দে'ব।

[মায়া উত্তর দিল না; কেবল ননীকে কোলে লইয়া চুমু খাইল আদর করিল। তাহা দেখিয়া শশী ঝোঁপের অন্তরাল হইতে স্ফুর্ত্তি সূচক অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল।]

ননী। [মায়ার কোল হইতে নামিয়া] আর কি কর্‌ব জান?

মায়া। কি কর্‌বে?

ননী। সেই গানটি গাইব।

মায়া। কোন গানটি?

ননী। সেই যে গানটি কাকা বাবু সন্ধ্যাবেলা গাইত?

মায়া। সে গান তোমার মনে আছে?

ননী। খুব আছে? এই দেখ—

কি মায়া মা মহামায়া, কে বুঝিতে পারে,
বর্ণাতীত অবর্ণা বর্ণিবারে বর্ণ হারে।

ওমা কুল কুণ্ডলিনী, মায়া পদ্ম বিহারিনী,—
বিরাজিছ নাভিপদ্মে প্রসুপ্তভু জগাকারে।
ধ্যান যোগে মুদি আঁখি, মায়া মুগ্ধ হয়ে থাকি,
তোমারে মা নাহি দেখি মায়া অন্ধকারে,
নয়ন মিলিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই,
মায়াতে রেখেছ ঢেকে বিপুল ভব-সংসারে॥

মায়া। আবার সেই গান, সেই স্মৃতি মাখা পরিচিত মধুর গান। কত দিন,— কত দিন আগে প্রথম শুনি। সে দিনও এই বাগান, এই সন্ধ্যাকাল, এই রকমেই চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারছিল। নীরব নির্জ্জনে শুধু তিনি আর আমি। দুজনে কত কথা কহিলাম। তিনি গাহিলেন, মৃদু মধুর স্বরে আস্তে আস্তে গাহিলেন। রেষগুলি এখনও কাণে বেজে আছে। আজ আবার সেই গান। কিন্তু সে কণ্ঠস্বর আর ত নাই। কালের নির্ম্মম তাড়নে সে বীণার ঝঙ্কার আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। আর কি তা শুন্‌তে পাব না? আর কি তাঁকে দেখ্‌তে পাব না? যে যায় সে কি আর ফেরে না। দেবতা আমার কোথায় তুমি? ঐযে চাঁদের কোলে হাঁস্‌ছ। একবার এস, একবার কথা কও। আমি যে বড় অভাগিনী। তুমি গিয়া আমি যে বড় দুঃখে আছি।

[অশ্রুমোচন]

ননী। কাকীমা কাকীমা তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

[ছুটে আসিয়া মায়াকে জড়াইয়া ধরিল।]

মায়া। না বাবা আমি ত কাঁদি নাই। ও গান বড় মিষ্ট বড় মধুর বড় মর্ম্মান্তিক। শুনে আত্মহারা হয়েছি।

[সুরমার প্রবেশ।]

সুরমা। ছোট বউ তোমার বারণ কর্‌লে শুন্‌বে না। জোলো হাওয়া দিচ্ছে তবুও সন্ধ্যাবেলা ননীকে পুকুর ধারে নিয়ে এসেছ।

মায়া। দিদি আমরা ত বেশীক্ষণ আসি নাই।

সুরমা। তুমি ননীকে এনেছ কেন? আমি ত বলেছি ননীকে তোমার অত আত্তি কর্‌তে হ'বে না। গেলে আমারই যাবে, তোমার কি?

মায়া। দিদি দিদি [অশ্রুমোচন।]

ননী। মা তুমি ভারী দুষ্টু। কাকীমাকে বক্‌ছ কেন?

সুরমা। থাম্ জ্যাঠা ছেলে। মাষ্টার এসে বসে আছে, পড়তে যেতে হ'বে না

ননী। কাকী মা, আমি পড়তে যাই।

মায়া। যাও বাবা।

সুরমা। [ননীর হাত ধরিয়া] চ' শীগ্‌গীর চ'।

ননী। কাকী মা, তুমি মালা নিয়ে যেতে ভুল না। [ননীকে লইয়া মায়ার প্রস্থান।]

মায়া। আমি সত্যই রাক্ষসী। নইলে ননী কাছে এলে দিদি রাগ করে কেন?

শশী। [ঝোঁপের অন্তরাল হইতে বাহির হইতে হইতে] মায়া!

মায়া। [চমকিয়া] কে?

শশী। [মায়ার সামনে গিয়া] ভয় নেই, আমি শশী।

মায়া। [অবগুণ্ঠন দিয়া অবনত মস্তকে] দিদি এই এখান থেকে চলে গেছেন।

শশী। মায়া! তোমারই সঙ্গে আমার কথা আছে। অনেক দিন থেকে তোমার আশায়—

[মায়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলে শশী ছুটিয়া তাহার হাত ধরিল।]

শশী। মায়া, প্রাণের মায়া, চলে যাচ্ছ কেন? তোমার ভাল বাসা—

[মায়া সজোরে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময় মঞ্জরীর প্রবেশ করিল]

শশী। আঃ। আবার জঞ্জাল। [মায়ার হাত ছাড়িয়া দিল।]

মঞ্জরী। ছিঃ ছিঃ ছোট বউ দিদি। এর চেয়ে তোমার গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল। [মায়া কোন উত্তর দিল না, দ্রুতপদে চলিয়া গেল।]

শশী। [গমনোদ্যতা মঞ্জরীর প্রতি] মঞ্জরী যাচ্ছ কেন? দাঁড়াও। দুটো কথা কও।

মঞ্জরী। অত আর দরদ দেখাতে হ'বেনা।

শশী। আহা চট্‌ছ কেন? সব শুনে দোষ দিও। তোমাদের মায়ার অমন গায়ে পড়া স্বভাব কেন?

মঞ্জরী। কেন? কেন?

শশী। দিদিকে খুঁজছিলেম। ঝিয়েরা বল্লে এদিকে এসেছে। এখানে এসে দেখি দিদি নাই। ফিরে যাচ্ছি এমন সময় মায়া এসে আমার হাত ধরলে। আমি ত অবাক!

মঞ্জরী। সত্যি বল্‌ছ।

শশী। হাঃ। তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি।

মঞ্জরী। আবার বল সত্যি বল্‌ছ।

শশী। হাঃ। তুমি দেখ্‌ছি পাগল হ'লে। তোমায় কখন মিথ্যা বলি।

মঞ্জরী। আমায় যা বলেছিলে শশী ভুলোনা।

শশী। সময় হ'লে দেখ্‌বে। আমি কি কখনও— কার পায়ের শব্দ হচ্ছে! দিদি আস্‌ছে। আমি পালাই! তাকে আমার কথা বলো না। তা'হলে আমার এখানে আসা বন্ধ হ'বে।

[শশীর প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া সুরমার প্রবেশ।]

সুরমা। কৈ এখানেত শশী নাই। মঞ্জরী তুই কতক্ষণ এখানে এসেছিস্‌?

মঞ্জরী। আমি অনেকক্ষণ এসেছি বড় বউ দিদি।

সুরমা। এখানে কি শশী এসেছিল?

মঞ্জরী। কৈ? আমি ত দেখি নাই।

সুরমা। তুই যখন এখানে আসিস্‌ ছোট বউ ছিল?

মঞ্জরী। হাঃ।

সুরমা। আজ ছোট বউ বল্‌লে কি এখানে এসে শশী তার হাত ধরে ছিল।

মঞ্জরী। ওঃ মা! ছোট বউ দিদি তোমায় বুঝি ওকথা বলেছে। বাবা! মিট্‌-মিটে ডাইনি! দিনকে রাত কর্‌তে পারে।

সুরমা। কেন? কেন? কি হ'য়েছে?

মঞ্জরী। না বড় বউ দিদি। তোমার পায়ে পড়ি। আমি তোমায় সে কথা বল্‌তে পারব না।

সুরমা। কি এমন কথা বল্‌না।

মঞ্জরী। বড় নোংরা কথা বড় বউ দিদি। তোমায় কি করে বল্‌ব।

সুরমা। আ্যাঃ। বল্‌না কি ছাই বল্‌বি?

মঞ্জরী। তোমায় কি আর বল্‌ব বড় বউ দিদি। এখানে এসেই দেখি—

সুরমা। কি? কি?

মঞ্জরী। দেখি ছোট বউ দিদি—কি আর বলি—ঐ ঘোষেদের সেই ছোঁড়াটার —তার নাম ভুপেন না কি—তার কাঁধে হাত দিয়ে কথা বল্‌ছে। আমায় দেখেই দুজনে দুদিকে ছুট্‌ল।

সুরমা। ও হরি! তাই বুঝি আমার কাছে শশীর নামে কলঙ্ক দিচ্ছিল। চল্‌ত একবার দেখি কালামুখী কোথায় গেল।

[সুরমা ও মঞ্জরীর প্রস্থান।]

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

লেখক,—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

(গল্প)

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গ্রামের মধ্যে একজন প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার আদরের কন্যা উষা, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা—অনূঢ়া—শিষ্ট—শান্ত ও সুশীলা। উষার বর্ণ দুধে আল্তা মিশ্রিত; গড়ন এক হারা, চক্ষু দুটী শরতের সরসীবৎ এবং মুখখানিতে মাধুর্য্য ও শৈশব সরলতা যেন সদাই ফুটিয়া আছে। রাজকৃষ্ণ বাবু কন্যাকে একটু বয়ঃস্থা না করিয়া বিবাহ দিবেন না বলিয়াই এতদিন পাত্রস্থ করেন নাই। উষাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। একজন চরিত্রবান শিক্ষকের হস্তে তাহার শিক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। উষা বেশ বুদ্ধিমতী, পাঠেও তাহার যথেষ্ট অনুরাগ। সে ইতি মধ্যেই অনেক বই পড়িয়া ফেলিয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীর পার্শ্বস্থিত পিতৃ উদ্যানে উষা পদচারণ করিত। সে ফুল তুলিত, ফল পাড়িত, মালা রচনা করিত এবং আরো কত কি করিত। আজ শুক্লাপঞ্চমী সন্ধ্যা সমাগত। সূর্য্যদেব শ্রমখিন্ন দেহভার বহন করিয়া বিশ্রাম লাভের জন্য অস্তাচলে গমন করিতেছেন। এ দিকে শশধর ধরণীর ম্লান মুখ সন্দর্শন করিয়া তাহার সেই বিষাদভরা মুখে হাসিরাশি ঢালিবার জন্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন। পুর-নারী উল্লাসে শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। পাখী সব সঙ্গীত বিরত হইয়া নীড়াভিমুখে গমনোদ্যত। যতক্ষণ তাহারা পুনরায় প্রভাত সঙ্গীত আরম্ভ না করে, ততক্ষণ—সুর বজায় রাখিবার জন্য ঝিঁ ঝিঁ পোকা তানপুরা বাজাইতে লাগিল। কুসুম-সুবাসিত উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া উষা শ্রান্তি লাভের জন্য এই সময়ে বাপীতীরে ক্ষুদ্র বেদিকাটীর উপর বসিয়াছিল। তথায় বসিয়া বসিয়া সে দীর্ঘিকার ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ এবং কখন বা সুনীল আকাশে রঞ্জিত মেঘের খেলা দেখিতে লাগিল। আজ তাহার মুখশ্রীতে কেমন একটু বিষন্নভাব। তাহার কোমল হৃদয়ে কি যে, একটু আঘাত লাগিয়াছে, তাহা কেহই জানে না। নিকটে সহসা কাহার পদশব্দ শুনিয়া উষা চমকিয়া উঠিল। সে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—অনু।

অনু দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীর সন্নিকটেই তাহাদের বাড়ী। অনু বাল্য কাল হইতেই রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করে।

উষা তাহার বাল্যসখী। বাল্যকালে উষার সহিত সে একত্র খেলা করিত, গল্প করিত, পাঠাভ্যাস করিত। রামায়ণ মহাভারতের গল্প উষা বড় ভাল বাসিত। সে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া অনুর মুখে ঐ সকল গল্প শুনিত। অনু কোন দিন মহাভারতের "পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসের" গল্প, কোন দিন বা রামায়ণের "রাম বনবাসের" কথা শুনাইয়া উষার কৌতূহলোদ্দীপিত চিত্ত শান্ত করিত। রাজকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী অনুকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তাহার স্বভাব চরিত্রের প্রশংসা তাঁহাদের মুখে আর ধরিত না। গৃহিণী সময়ে সময়ে অনুর সহিত উষার বিবাহের কথাও তুলিতেন। কিন্তু অনুর অবস্থা ও কৌলিন্যের দোষ দেখাইয়া কর্ত্তা সে কথায় অস্বীকার করিতেন। এখন অনু বড় হইয়াছে। সে আর পূর্ব্বের ন্যায় সদা সর্ব্বদা রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে আসে না। উষা সে জন্য বড়ই মনঃক্লেশ পাইত। সে কখন কখন অনুকে ডাকিয়া পাঠাইত, কিন্তু লজ্জা আসিয়া অনুর আগমন পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইত। আজ উদ্যানে উষা অনুর দেখা পাইয়া বলিল,—"অনু দাদা! তোমায় কত দিন দেখি নাই, তুমি আর আমাদের বাড়ী যাও না কেন?"

গ্রাম্য সম্পর্কে অনু উষার দাদা। উষার কথা শুনিয়া অনু ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"এখন ত আমরা ছেলে মানুষ নই; এখন পূর্ব্বের মত সর্ব্বদা তোমার কাছে যাইলে লোকে নিন্দা করিতে পারে।"

উষা।—লোকে নিন্দা করিবে কেন? তুমি আমাদের বাড়ী যাইবে, তাহাতে লোকের কি?

উষার কথা সমাপ্ত হইলে অনু আর কোন উত্তর করিল না; কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সে দীর্ঘ নিশ্বাস উষার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল। সে তৎক্ষণাৎ স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"অনু দাদা! তুমি কি ভাবিতেছ?"

তখন অনু মনোভাব গোপন করিতে পারিল না। তাহার নয়ন কোণে দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সে বলিল,—

উষা! ভাবিয়াছিলাম, তোমার সহিত আর দেখা করিব না; কিন্তু তাহা পারিলাম না। বোধ হয় এই আমাদের শেষ দেখা।

উষা।—অনু দাদা! এমন কথা কেন বলিতেছ? তুমি কাশী যাইবে শুনিয়া অবধি আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।

অনু। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, আমার আর এক্, এ পড়া ঘটিল না।

বাবা কর্ম্মকাজের জোগাড় দেখিবার জন্য আমাকে বেনারসে এক আত্মীয়ের কাছে পাঠাইতেছেন। আবার কবে দেশে আসিব, তাহা বলিতে পারি না। ইতি-মধ্যে হয়ত তোমার বিবাহ হইয়া যাইবে। তুমি ধনবানের কন্যা, ধনবানের পত্নী হইবে। উষা! বলিতে লজ্জা করে, আমি বাল্যকাল হইতে এই রাজোদ্যান প্রসূত একটি সুবর্ণ কুসুমের প্রতি চাহিয়া ছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, দরিদ্রের সে আশা দুরাশা মাত্র। বামন হইয়া চন্দ্রমা স্পর্শের অভিলাষ করা বৃথা। আমার আশাতরু ছিন্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। তুমি সুখী হইও, আর মধ্যে মধ্যে পত্রের দ্বারা স্মরণ করিয়া তোমার দরিদ্র বাল্য সখাকে সুখী করিও।

উষা আবেগ কম্পিত স্বরে উত্তর করিল,—"অমু দাদা! আর হৃদয়ের অনল চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমি দুর্ব্বলা নারী, আমার সে শক্তি নাই। অমু! ভাই! তুমি নিশ্চয় জানিও, উষা তোমারই; তুমিই তাহার আরাধ্য দেবতা। আবাল্য যে মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া আসিতেছি, তাহা কি করিয়া মন হইতে মুছিয়া ফেলিব? যাহাকে একবার মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের জীবনসঙ্গিনী হইতে পারিব না। হিন্দু রমণীর তাহা ধর্ম্ম নহে। পিতাকে অনুনয় করিব, তাঁহার পদে ধরিব,—তাহাতেও যদি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন না হয়—তাহাতেও যদি তিনি দয়া না করেন—তবে হতভাগিনী এই দীর্ঘিকার কাল জলে ——— "

অমু কম্পিত হস্তে উষার মুখ চাপিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল,—"ছি উষা! অমন কথা বলিতে নাই। পিতা পরমগুরু! তাঁহার আদেশ অবশ্যই পালনীয়। তুমি যে, আমাকে ভালবাস ইহাতেই আমি সুখী।"

রাত্রি অধিক হইল; উষা ও অমু ক্ষুণ্ণমনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

(২)

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই অমু কাশী চলিয়া গেল। বালিকা উষা অমুর জন্য নীরবে রোদন করিত। সে চুল বাঁধিত না, সুন্দর বসন ভূষণের প্রতিও আর তাহার লক্ষ্য ছিল না। উষার মাতা ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। হঠাৎ কন্যার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। এক দিন উষার মাতা উষাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা উষা! তোমার কি হইয়াছে? তুমি দিন দিন এমন হইতেছ কেন?" উষা অন্তরের কোন কথাই প্রকাশ করিল না।

তখন মাতা বুঝিলেন—মেয়ে বয়স্থা হইয়াছে, তাহার সমবয়স্কা সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই জন্তই মেয়ের আমার মনঃক্লেশ। তিনি সেই দিনই কর্ত্তাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু গৃহিণীর কথা মত সুপাত্র অনুসন্ধান করিতে ঘটক নিযুক্ত করিলেন। উষার এক বিধবা মাতৃস্বসা কন্তা ঐ বাড়ীতে থাকিত। সে ক্রমে উষার মনোভাব কিছু কিছু জানিতে পারিল। এক দিন উষাকে নির্জ্জনে কাঁদিতে দেখিয়া চতুরা তাহাকে জিদ্ করিয়া ধরিল। কিন্তু প্রথমে বুঝিবার মত কোন উত্তর পাইল না। অবশেষে উষা যে দুই চারি কথা বলিল, তাহাতে মালতীর বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। মালতী কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট এই গুপ্ত কথা অতি শীঘ্রই ব্যক্ত করিল। সুতরাং ক্রমে কথাটি কর্ত্তারও কর্ণগোচর হইয়া পড়িল। কর্ত্তা মেয়েকে ডাকিলেন। উষা লজ্জাবনত হইয়া পিতৃপার্শ্বে গিয়া বসিল। তখন পিতা কন্যাকে বলিলেন,—"ছি মা! এরূপ ইচ্ছা করিতে নাই। আমি কুলীন হইয়া কি করিয়া নিষ্কুলীনকে কন্যাদান করিব? দ্বিতীয়তঃ অনু সুপাত্র হইলেও তাহার পিতার অবস্থা নিতান্ত হীন। তোমার কেমন রূপবান ও ধনবান স্বামী হইবে। তুমি মন হইতে ও কল্পনা একেবারেই পরিত্যাগ কর।"

উষা কোন উত্তর করিল না, অধোবদনেই বসিয়া রহিল।

সে দিন রাত্রিতে উষার আর নিদ্রা হইল না। সে বিনিদ্রিত নয়নে বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল, পরে কাগজ কলম লইয়া পিতাকে একখানি পত্র লিখিল। পর দিন প্রাতে উঠিয়া উষা পত্র খানি খামে পুরিয়া শিরোনামা লিখিয়া পিতার শয়ন কক্ষে তাঁহার টেবিলের উপর রাখিয়া আসিল। যথা কালে পত্র রাজকৃষ্ণ বাবুর নয়ন গোচর হইল। তিনি পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন,—

"বাবা! আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি রূপবান ও ধনবান চাহি না। ধনী অপেক্ষা দরিদ্রই ভাল। দরিদ্র হইতে আমার বড় সাধ করে। ইতি—আপনার অবাধ্য কন্যা,—উষা।

পত্র পাঠান্তে কর্ত্তা গৃহিণীকে ডাকিলেন। উভয়ে বসিয়া অনেকক্ষণ কি কথাবার্ত্তা হইল। শেষে গৃহিণী বলিলেন,—"মেয়ের বিবাহ দিলেই ওসকল ভাব পরিবর্ত্তন হইবে।"

এই কথা শুনিয়া কর্ত্তা বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী উষার কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঊষা তখন বঙ্কিম বাবুর "দুর্গেশনন্দিনী" পড়িতেছিল। সে মাতাকে দেখিয়া বই ফেলিয়া রাখিল। মা কন্যার কাছে বসিয়া তাহাকে বুঝাইলেন; কন্যা ছল ছল নেত্রে মাটীর দিকেই তাকাইয়া রহিল।

(৩)

শীঘ্রই ঊষার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কলিকাতা নিবাসী রাম লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র অসিতকুমারের সহিত ঊষার বিবাহ হইবে। অসিত কুমার কৃতবিদ্য না হইলেও ধনীর সন্তান—রূপবান। রামলাল বাবু মস্তলোক; গয়া সহরে তাঁহার বৃহৎ কারবার। এদিকে বিবাহের দিন যতই নিকটে আসিল, ঊষার হৃদয় চাঞ্চল্য ততই বাড়িয়া উঠিল;—তাহার সেই সুন্দর মুখখানি দিন দিন মেঘম্লান জ্যোৎস্নার ন্যায় মলিন হইতে লাগিল। অনুর বড় কষ্ট হইবে বুঝিয়া সে তাহাকে কোন সংবাদই দিল না। অনু কিন্তু ঠিক সংবাদ পাইল। এই সময়ে অনুর পিতা পীড়িত হইলেন, দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি দেখিয়া মাতা পুত্রকে টেলিগ্রাফ্ করিল। অনু বাড়ী আসিয়াই শুনিল, ঊষার গাত্রহরিদ্রা হইয়া গিয়াছে; আগামী সোমবারে তাহার বিবাহ। আশা মানুষকে পরিত্যাগ করে না। তাই অনু ঊষাকে পাইবার আশা এত দিনও কিছু কিছু করিত। আজ তাহা নির্ম্মূল হইল। সে বাড়ী আসিয়া অবধি এক মর্ম্মভেদী অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। ঊষার হৃদয়ের ভস্মাচ্ছাদিত অনল পাছে তাহাকে দেখিলে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে ঊষার সহিত দেখা করিল না।

সময় কাহার হাতধরা নহে। সে আপন মনে কাজ সারিয়া চলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে সোমবার আসিয়া পড়িল। রাজকৃষ্ণ বাবুর বৃহৎ ভবন কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণের স্বর-তরঙ্গে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। নহবত খানায় টোড়ী ভৈরবী, ইমন—পুরবী প্রভৃতি বিবিধ রাগ রাগিণীর আলাপ চলিতেছে। কিন্তু সে সুমিষ্ট আলাপ শুনিবে কে? সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। ঢুলিরা ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহারা নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাহাদের সেই ছিটের দোলাই জড়ান বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করিয়া পাড়ার ছেলে জোগাড় করিতে লাগিল। বাড়ীর এক সুসজ্জিত সুবৃহৎ বৈঠকখানায় বরাসন ও বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রি-গণের বিছানা হইয়াছে। সেই ফরাসের উপর বড় বড় তাকিয়া বালিশের পার্শ্বে এক এক রূপা বাঁধা হুকা বৈঠকোপরি টোপর মাথায় দিয়া দণ্ডায়মান, যেন কেহ আসিয়া সাদরে তাহাদের মুখ চুম্বন করিলেই তাহারা কৃতার্থ। সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই মহাসমারোহ করিয়া বর আসিল। পুরনারীগণ আনন্দে

শঙ্খধ্বনি—হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল। সুবাস তৈল—সিক্ত কুন্তলা, বস্ত্রালঙ্কার পরিধানা পল্লীললনারা বর দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। স্বয়ং কন্যাকর্ত্তা রাজকৃষ্ণ বাবু দরজায় দাঁড়াইয়া বরযাত্রী মহাশয়দিগকে আপ্যায়িত করিলেন। তখন কিছুক্ষণের জন্য সেই আতোর গোলাপ—ল্যাভেণ্ডার গন্ধামোদিত সভাস্থলে "আসুন," "বসুন," "ব্রাহ্মণে ভ্যো নমঃ" ইত্যাকার চির প্রচলিত শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার চলিতে লাগিল। বরযাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা একটু বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁহারা আসিয়াই এক এক হুকা অধিকার করিলেন। সে সময়ে কেহ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা অমনি হস্তের হুকা মস্তকে ধারণ করিয়াই প্রত্যভিবাদন করিতে লাগিলেন। বর দেখিয়া পুরুষ মহলে একবাক্যে সকলেই বলিল,—

"রাজকৃষ্ণ বাবুর কন্যার যোগ্য বরই হইয়াছে। গ্রামের ন্যায়চঞ্চু মহাশয়ও শ্লোক পড়িলেন,—

"কন্যা বরয়তে রূপং, মাতা বিত্তং পিতা গুণং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

অন্তঃপুরে ডাক্তারের গৃহিণী, উকিলের ঘরণী প্রভৃতি সমাগত বিদুষীগণের নিকট হইতে বর কিরূপ প্রশংসা পত্র লাভ করিলেন তাহা আমরা ঠিক জানিতে পারি নাই।

এই দিন রাত্রিতে বিবাহের দুইটি লগ্ন ছিল; একটি এক প্রহরের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি নিশাবসানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে। প্রথম লগ্নেই ঊষার বিবাহ হইবে। সুতরাং বর আসিলেই বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল। এমন সময় বাড়ীর মধ্যে এক ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। সেই আনন্দময় রাজ্যে সহসা কেন এমন নিরানন্দ উপস্থিত হইল, তাহা প্রথমে কেহই স্থির করিতে পারিল না। বহির্বাটী হইতে রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রতিবেশী, আত্মীয়, বন্ধু অনেকেই অন্তঃপুরে ছুটিয়া গেলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, এক দিব্যালোকিত কক্ষে ঊষা বাত্যাহত ব্রততীর ন্যায় মূর্চ্ছিতা। তাহার নয়ন কোণে কয়েক বিন্দু অশ্রু মুক্তাফলের মত জ্বলিতে ছিল। ঊষার মাতা ও আর আর স্ত্রীলোকেরা তাহার কাছে বসিয়া কাঁদিতেছেন। রাজকৃষ্ণ বাবু বরযাত্রী মহাশয়দিগের জলযোগের ব্যবস্থা করাইতে ছিলেন। তিনি শীঘ্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। এই শুভক্ষণে এই অশুভ ঘটনা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ড দ্রুততর তালে নাচিয়া উঠিল কি একটা বিদ্যুতের স্রোতের মত তাঁহার

মস্তিকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িলেন। গ্রামের ডাক্তার রেবতী বাবু বাহিরেই বসিয়া ছিলেন। একজন দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার বাবু আসিলে স্ত্রীলোকেরা পার্শ্বের ঘরে সরিয়া গেলেন। রেবতী বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া উষাকে পরীক্ষা করিলেন। পরে বলিলেন,—"উষার মূর্চ্ছা হইয়াছে, ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়া অল্পক্ষণ ব্যজন করিলেই তাহার চৈতন্যোদয় হইবে।" রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুরোধে ডাক্তার বাবু রোগীর কাছেই বসিয়া রহিলেন। দুইজন দাসী আসিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করিতে লাগিল। দশ পনের মিনিটের মধ্যেই উষা চৈতন্যলাভ করিল। কিন্তু ডাক্তার বাবু তখন কিছু সময়ের জন্য তাহাকে শয্যাত্যাগ করাইতে নিষেধ করিলেন। কাজে কাজেই প্রথম লগ্নে উষার বিবাহ হইল না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরের মজ্‌লিসে, রান্নাঘরে ভাঁড়ার গৃহে, সকল স্থানেই উষার মূর্চ্ছা ঘটিত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। একজন বর্ষীয়সী পাচিকা তাহার সখী শ্যামাদাসীর নিকটে গিয়া বলিল,—"ভাই! বিবাহ রাত্রে মেয়ের মূর্চ্ছা হয়, ইহা ত কখন শুনি নাই।"

শ্যামা অনুচ্চস্বরে উত্তর করিল,—"দিদি! বড় ঘরের বড় কথা, ঘরে পরে থাকে না মাথা। মূর্চ্ছ না ডাক্তারের মুণ্ড। ডাক্তার এ সকল রোগের কি বুঝবে? নারায়ণ দাস ফকিরকে আনিলে সে সব বলিয়া দিত। মেয়ের দেহে নিশ্চয় উপদেবতা ভর করেছে। দেখ নাই, কয়েক মাস হইতে এমন হাঁদপানা মেয়ে কেমন হয়ে গেছে।"

পাচিকার প্রাণে শ্যামার যুক্তিযুক্ত কথাগুলি ঠিক লাগিল। তখন সে তাহার দন্তহীন মুখে এক টীপ্ তামাক পোড়া নিক্ষেপ করিয়া নথ নাড়া দিয়া ডাক্তারের অজ্ঞতার আরও অনেক উদাহরণ দিতে বসিল।

রাত্রি নয়টার সময় উষার মাতুল ও মাতুলানী আসিলেন। উষার মাতুল সুরেশ বাবু কর্ম্মোপলক্ষে বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহাদের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু ট্রেণ ফেল্ হওয়ায় বিলম্ব ঘটিয়াছে। সুরেশ বাবু গাড়ী হইতে নামিয়াই শুনিলেন, উষা মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল; এই জন্য সন্ধ্যার লগ্নে তাহার বিবাহ হয় নাই। তিনি বাড়ীর মধ্যে গিয়া উষাকে দেখিলেন; তাহার কাছে বসিয়া বসিয়াই ভগ্নীর সহিত দুই চারিটি সুখ দুঃখের কথা কহিলেন। পরে রাজকৃষ্ণ বাবুকে সঙ্গে লইয়া নূতন বৈবাহিকের সহিত আলাপ

করিতে আসিলেন। বৈবাহিককে দেখিয়াই সুরেশ বাবু অবাক্! এ যে, তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত রামলাল রায়! এব্যক্তি কুলীন নহে, বংশজ। দ্বিতীয়তঃ ইহার ত পুত্র ছিল না। এই পাত্রটি দেখিতেছি, ইহার সেই পালন পুত্র। তখন সুরেশবাবু সভাস্থলে কোন কথা প্রকাশ না করিয়া ভগ্নীপতিকে ডাকিয়া লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—

"ভায়া! ঈশ্বর যাহা করেন, সমস্তই মঙ্গলের জন্য। আজ এই বিবাহ হইলে একটি নিষ্কলঙ্ক কুলে কালিমা পড়িত—তোমার জাতি যাইত। আমি গয়ায় অবস্থান কালে এই রামলালকে বিশেষরূপ জানিতাম। এই ব্যক্তি রায়োপাধিক, বিবাহে টাকা পাইবার জন্যই বন্দ্যোপাধ্যায় সাজিয়াছে। আরও ভয়ানক কথা এই যে, এই পুত্রটিও ইহার পত্নীর গর্ভজ নহে দাসীপুত্র।"

রাজকৃষ্ণ বাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রোধে ও ঘৃণায় যুগপৎ তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রামের প্রধান প্রধান ভদ্রলোককে তথায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। সকলে এক বাক্যে এই দুরাচারকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দিল। তখন কর্ত্তা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রোষ কষায়িত লোচনে রামলালের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি জুয়াচোর এই অসৎ কর্ম্মে যাহারা তোমার সহিত যোগদান করিয়াছে, তাহারাও জুয়াচোর। তুমি এখনই পাত্র মিত্রসহ আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাও—আমি কন্যার বিবাহ দিব না।"

উভয় পক্ষে তুমুল বচসা উপস্থিত হইল। হুকুম পাইয়া গ্রাম্য যুবকদল বরকর্ত্তা ও বরযাত্রী মহাশয়দিগকে সরল বংশদণ্ডের স্পর্শ সুখ অনুভব করাইয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর কালে রাজকৃষ্ণ বাবুর দ্বিতলস্থ এক নিভৃত কক্ষে ইতি কর্ত্তব্যতা অবধারণের জন্য এক মন্ত্রণা-সভা আহুত হইল। এই সভায় গুরু, পুরোহিত ও কয়েকজন পরমাত্মীয় ব্যতীত আর কেহ রহিল না। কি উপায়ে সেই রাত্রিতে উষাকে পাত্রস্থ করা যায়—কি উপায়ে গৃহ স্বামীর জাতি মান রক্ষা হয়, তাহাই এখনকার আলোচ্য বিষয়। এই সময়ে গৃহিণী আসিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বাবু উঠিয়া যাইলে গৃহিণী বলিলেন,—"আমি আজই অমুর সহিত উষার বিবাহ দিব। তুমি এখনই স্বয়ং গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আন। আহা বাছা অজ কয় দিন বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু লজ্জায় একদিনও আমাদের বাড়ী আসিতে পারে নাই।

আমি আজ দুইবার তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি, কিন্তু সে পিতার পীড়ার ছল করিয়া আসিতে স্বীকৃত হয় নাই। বিধি লিপি অখণ্ডনীয়—সেই আমার উষার বর।”

গৃহিণীর প্রস্তাব সকলেই সাহ্লাদে অনুমোদন করিলেন, রাজকৃষ্ণ বাবু গ্রামের বিপিন বাবু ও পুরোহিত ঠাকুর অনুর বাড়ীতে যাইয়া তাহার পিতাকে সকল কথা বলিলেন। অনু তখন শয্যায় পড়িয়া বিনিদ্রত নয়নে ছট্ ফট্ করিতেছে। সে এই অবিশ্বাস্য সংবাদ—দরিদ্রের কহিনুর লাভের কথা—কিছু কিছু শুনিতে পাইল। এই শুভ প্রস্তাবে অনুর পিতামাতায় কোনই অমত হইল না। তখন সেই শেষ লগ্নে, শুভ সুতহিবুকযোগে, অনুর সহিত উষার বিবাহ হইয়া গেল। অনু-উষার ম্লানমুখ আবার জ্যোৎস্নাদীপ্ত আকাশের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। গ্রামের লোক সকলেই বলিতে লাগিল,—“ইহাকেই বলে, “প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।”

———*———

যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ।

(বৃহদারণ্যক শ্রুতি)

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য যখন আপনাকে * ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিলেন, জনক প্রতিজ্ঞাত দশসহস্র গোধন আপনার তপোবনে লইয়া যাইবার জন্য ছাত্রকে আজ্ঞা করিলেন, তখন জনক সভায় সমবেত ঋষিগণের মধ্যে একটি অসন্তোষ ভাব ফুটিয়া উঠিল। জনকের হোতা অশ্বল তখন সগর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ত্বং নু খলু যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসি” তুমিই কি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠ?

যাজ্ঞবল্ক্য তখন সবিনয়ে উত্তর দিলেন,—“নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মো গোকামা এব বয়ং স্ম” ব্রহ্মিষ্ঠকে আমরা নমস্কার করি। আমি ব্রহ্মিষ্ঠ নহি, তবে গোধন অভিলাষী বটে। তখন হোতা অশ্বল “জারৎকারব আর্ত্তভাগ ও ভুজ্যু লাহ্যায়নি,” উষস্ত চাক্রায়ন একে একে সকলে যাজ্ঞবল্ক্যকে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যও একে একে সকলকে উত্তর দানে সন্তোষ করিলেন। তখন “উষস্ত চাক্রায়ন” যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য, “যদেব সাক্ষাদ

* অতিশয়েন বৃদ্ধঃ ব্রহ্মা। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

পরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাবক্ষ্ব” যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিতে আমি অভিলাষী।

যাজ্ঞ। যাহা লৌকিকী দৃষ্টির দ্রষ্টা নহে, লৌকিক শ্রবণের শ্রোতা নহে, লৌকিক বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা নহে—তাহাই আত্মা, তাহাই সর্ব্বান্তর, সর্ব্বভূতে ভূত অবস্থিত, অথচ যাহা নিত্যদৃষ্টিস্বরূপ হইয়া দ্রষ্টা, নিত্যবিজ্ঞান স্বরূপ হইয়া বিজ্ঞাতা—তাহাই ব্রহ্ম বা সর্ব্বস্বের আত্মা। এই আত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা, তাহাই কার্য্য, তাহাই বিনাশী।

“ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়া ন মতে মন্তারং মন্বীথা, ন বিজ্ঞাতে বিজ্ঞানং বিজানীয়া। এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরোহতোঽন্যদার্ত্তং।”

দৃষ্টির (লৌকিকী) দ্রষ্টারূপে তাঁহাকে দেখিবে না শ্রুতির (লৌকিক শ্রবণের) শ্রোতৃরূপে শুনিবে না, মতের মনোবৃত্তির (লৌকিকী) মন্তা বলিয়া মনে করিবে না, কেবল বুদ্ধির ব্যাপক বলিয়া বুঝিবে না। কারণ ইহা “গো অশ্বের মত সাধারণতঃ “ইহা এইরূপ” বলিয়া বুঝান যায় না। দৃষ্টি লৌকিকী ও পারমার্থিকা—এই প্রকার চক্ষুঃসংযুক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তিই লৌকিকাদৃষ্টি। লৌকিকী দৃষ্টি দ্রষ্টার কার্য্য, দ্রষ্টা এই দৃষ্টির কর্ত্তা। অতএব ইহা জন্মশীল ও ধ্বংসাদ্বভাবান্বিত। আত্মার দৃষ্টি দ্রষ্টার স্বরূপ মাত্র। অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নির যেমন স্বভাব, আত্মার দৃষ্টিও তদ্রূপ আত্মারই স্বভাব। অতএব এই দৃষ্টি দ্রষ্টার স্বভাব বলিয়া উৎপত্তি বিনাশশীল নহে। আত্মার দৃষ্টি—নিত্য দৃষ্টি। এই দৃষ্টির কর্ত্তা আত্মা নহে। এই দৃষ্টি লৌকিকী দৃষ্টি নহে, ইহা পারমার্থিকী দৃষ্টি। এই নিত্য দৃষ্টি অবিনাশিনী—অতএব পারমার্থিকী।

“ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে বিপরিলোপো বিদ্যতে” দ্রষ্টৃস্বরূপ আত্মার দৃষ্টির কখন বিনাশ নাই। এই নিত্যদৃষ্টি ঘটপটাদি বাহ্যরূপের অভিব্যঞ্জক নহে, এই নিত্যদৃষ্টি ভৌতিক কার্য্য নহে। এই নিত্যদৃষ্টির সামান্য বিকাশই আমাদের অন্তশ্চক্ষুঃ। এই নিত্যদৃষ্টিরই বাহ্য আভাস আমাদের লৌকিক দৃষ্টি। যে নিত্যদৃষ্টির সামান্য বাহ্য আভাস প্রত্যেক জীবের দর্শন শক্তি। সে নিত্য পারমার্থিকা দৃষ্টির কি তুলনা আছে? সে সহস্রসূর্য্যরশ্মিসম তীব্র, সহস্র শশধর কান্তির মত কোমল দৃষ্টির কি বর্ণনা করা যায়। উপনিষদ্ তজ্জন্যই সেই ব্রহ্ম বা পরমপুরুষের—

“প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং “মনসো মনো যৎ”

বলিয়া স্তব করিয়াছেন। যাঁহার দৃষ্টির শততম্ ভাগ পাইয়া মুক্ত জীবের

জ্ঞান চক্ষু যাঁহার দৃষ্টির আলোকে জগতের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্যের রশ্মি, যাঁহার দৃষ্টির সূক্ষ্ম আভাস পাইয়া জীবের রূপোপলব্ধি—সে নিত্যদৃষ্টি তাঁহারই স্বরূপ ব্যতীত আর কি? *

* এই আত্মা বা ব্রহ্ম ব্যতীত যাহা কিছু সমস্তই অনিত্য বিনাশশীল "অতোহন্যদার্ত্তং"

উষস্ত চাক্রায়ন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

সমালোচনা।

পরলোকের পত্র।—শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, ৯৩ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯ নং ঈশ্বরমিলের লেন। গোয়াবাগান হইতে বিষ্ণু প্রেসে শ্রীবিষ্ণুপদ দাস দ্বারা মুদ্রিত মূল্য ১৲ একটাকা।

সম্পাদক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। তিনি পূর্ব্বে মাষ্টারী করিতেন,—তৎকালের এক ছাত্র পরলোক তত্ত্বজ্ঞানে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, শুনিয়া সম্পাদক কয়েকবারে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া পাঠান। ইহলোকে প্রসিদ্ধ কোন সিদ্ধাত্মা পুরুষ তাহার পুত্রের দেহে আবির্ভূত হইয়া প্রশ্নগুলির যথাযোগ্য উত্তর দেওয়ায় সেই প্রশ্নোত্তরগুলি সংগৃহীত হইয়া এই পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। বক্তা নিত্যধামবাসী ইহলোকের অনেকেরই শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তিনি একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তদীয় বহু তত্ত্ব ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইলেও শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্যাদি পঞ্চোপাসক খ্রীষ্টানের খৃষ্ট মুসলমানের মহাম্মদ। প্রভৃতির ঈর্ষা দ্বেষের ত কথাই নাই প্রত্যুত তাঁহাদের লোকান্তে সদ্‌গতি লাভের কথাও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

লোকের সার্থকতা তিনি প্রত্যক্ষদর্শীরূপে জগৎবাসীকে জানাইয়াছেন। নিত্যধামবাসী মহা পুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসক হইলেও প্রত্যক্ষদর্শীরূপে তিনি পরলোকের যেরূপ সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বস্তুতই আমরা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছি, এরূপ পুস্তক সকলেরই পাঠকরা উচিত।

পরলোক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেই "পরলোকের পত্র" পুস্তক খানি পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন এবং অনেক নূতন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

---

* এইরূপ শ্রুতি (শ্রবণ্য, অতি মনোবৃত্তি) বিজ্ঞান ও বুঝিয়া লইবে।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। | ১৩২১ সাল, ফাল্গুন। | ১১শ সংখ্যা।

প্রায়শ্চিত্ত।

লেখক,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।

পাপক্ষয় সাধন কর্ম্মকে প্রায়শ্চিত্ত বলে। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রোক্ত ও লৌকিক যুক্তি সিদ্ধ, শাস্ত্রে পাপক্ষয়ের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লৌকিক যুক্তিতে বুঝিতে পারি যে, কৃত পাপ কর্ম্মের জন্য অনুতাপ, অনুতাপানন্তর পাপক্ষ্যাপণ শারীর ও অর্থ দণ্ড, লজ্জা, অযশ ও অপমান,—এই সকল দ্বারা চিত্তের মলা বিদূরিত হইবারই সম্ভাবনা। পাপ বলবৎ হইলে অবশ্য বলবত্তর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। যে যাহার নাশক হইবে, তাহাকে অধিকতর প্রবল হইতেই হইবে। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সকল পাপক্ষয় না হইলেও প্রায়শ্চিত্তের মর্য্যাদা লাঘব হয় না। পাপ রোগের শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক চিকিৎসা বলিয়াই প্রায়শ্চিত্ত সকলেরই কর্ত্তব্য কার্য্য

ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ পাপ কর্ম্মে এই প্রায়শ্চিত্ত আছে। ঐহিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নাশ হইলে পরে আর কেহই ভবিষ্যতে পাপ পথে অগ্রসর হয় না। কারণ কৃত পাপের প্রতি অনুতাপ, ঘৃণা ও নিবৃত্তিচ্ছা না জন্মিলে লোকে কখন প্রায়শ্চিত্তের ইচ্ছুক হয় না, এবং প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিলে অগ্রসরও হয় না। সমাজের ভয়ে নরকের বিভীষিকাময় গুরুজনের আজ্ঞায়, শাস্ত্রের অনুশাসনে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইতে পারে, কারণ ঐ ভয়, ঐ আজ্ঞা, ঐ অনুশাসন প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তির অনুতাপ জন্মাইয়া দেয়, পাপে ঘৃণা ও নিবৃত্তীচ্ছা আনয়ন করে, গভীর বিশ্বাস ফুটাইয়া তুলে, তবে যদি সমাজ ভয়েই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিবার হেতু হয়,—আন্তরিক অনুতাপ, পাপের প্রতি ঘৃণা পাপের নিবৃত্তীচ্ছার উদয় না হয়, তবে ঐ প্রায়শ্চিত্ত বস্তুতঃ পাপক্ষয়কারী হইবে না। লোক দেখান প্রায়শ্চিত্ত পলিসীমাত্র উহা বরং অধিকই পাতিত করে, পাপের উপর আরও পাপের বোঝা চাপাইয়া দেয়।

প্রকৃত শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নিশ্চিতই পাপক্ষয় হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—

"প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় মুচ্যতে।
তপো নিশ্চয় সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্ত মিতি স্মৃতং॥"

প্রায়ঃ কথাটির অর্থ তপস্যা, চিত্ত পদটির অর্থ নিশ্চয়। দাঁড়াইল নিশ্চয়-যুক্ত তপস্যাবিশেষ প্রায়শ্চিত্ত। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত কখনই বিফলে যায় না।

পারত্রিক কর্ম্মের মধ্যে প্রারব্ধও সঞ্চিত—এই দুই প্রকার বিভাগ আছে। যে সমস্ত পাপ কর্ম্ম ফলই শরীর ধারণের আরম্ভক, যাহার ভোগের জন্য বর্ত্তমান জন্ম, তাহার নামও প্রারব্ধ। প্রারব্ধ অবশ্যম্ভাবী, ইহাই নিয়তি "নিয়োতিঃ কেন বাধ্যতে।" প্রারব্ধ পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নাশ প্রাপ্ত না হইলেও তজ্জন্য দৈহিক অশুদ্ধির নাশ হইয়া থাকে। যাহা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, অথচ যাহার ভোগের জন্য বর্ত্তমান জন্ম নহে—তাহারই নাম সঞ্চিত। এই সঞ্চিত পাপ প্রায়শ্চিত্ত নাশ্য। এতদ্ব্যতীত যথাযথ প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তির আর ক্রিয়মণে পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। প্রারব্ধ পাপ জন্য দেহাশুদ্ধি প্রভৃতি ফলও অল্প নহে। কারণ ঐ দেহশুদ্ধি না হইলে শাস্ত্রীয়দাহ সিদ্ধ হয় না। দাহ সিদ্ধ না হইলে শাস্ত্রাদির অধিকারিতা লাভ হয় না।

প্রায়শ্চিত্ত নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য। বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যহই প্রায়শ্চিত্তের

বিধান আছে, যথা—যথাসময়ে সন্ধ্যাহ্নিকাদি না হইয়া উঠিলে দশবার গায়ত্রী-জপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। নৈমিত্তিক—যাহা কোন নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়া আচরিত হয়, যথা মরণের দিনে বৈতরিণী ইত্যাদি। আর কামনা পূর্ব্বক যে, প্রায়শ্চিত্ত তাহাই কাম্য।

অজ্ঞানকৃত পাপও পাপ। অজ্ঞানতঃ কাহারও সর্ব্বনাশ করা হইলে কি সে সর্ব্বনাশ,—সর্ব্বনাশ হইবে না? অজ্ঞানতঃ বিষ ভোজন করিলে কি বিষের ক্রিয়া হইবে না? তবে জ্ঞানকৃত পাপের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত।

"অজ্ঞানতঃকৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং ন কামতঃ।
স্যাত্বকামকৃতে যৎতু দ্বিগুণং বুদ্ধি পূর্ব্বকে॥"

প্রকৃত কোন ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য বিবেচিত হইলে যাহারা স্নেহ, অনুগ্রহ, উদারতা বা লোভ বশতঃ "প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও চলিতে পারে," এইরূপ ব্যবস্থা দেন, তাঁহারা উক্ত পাপের ফলভাগী হইয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন,—"অনুতাপ জন্মিলে পাপের নাশ হয়"—ইহা ঠিক নহে,—কারণ আমি কাহারোও ভিটাচ্যুত করিয়া তাহার মনে দারুণ ব্যথা দিয়াছি; যতক্ষণ না তাহাকে পুনরায় ভিটায় বসাইয়া তাহার বিষণ্ণ হৃদয় আনন্দিত করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ পাপের কথঞ্চিৎ বিনাশও হইবে না। তবে অনুতাপ না জন্মিলে কেহ সত্যকার প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য হয় না। অনুতাপ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ। অনুতাপ হইলে পরে আর পাপকর্ম্ম করিবে না, এজন্যও অনুতাপের প্রশংসা।

প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে অনুতাপ ত আছেই, উপরন্তু পাপকীর্ত্তন, অর্থদান শিরো মুণ্ডন, উপবাসাদি, সমন্ত্রক বিশুদ্ধি কামনা প্রভৃতিও আছে। পাপকীর্ত্তনের নাম খ্যাপন; দশের কাছে, সমাজের কাছে,—মুক্তকণ্ঠে নিজ পাপ স্বীকারে যে কত লজ্জা, কত অপমান, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। আর এই খ্যাপনে মলা বিদূরিত হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। মুক্তকণ্ঠে পাপ স্বীকার না করিলে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাই সিদ্ধ হয় না। পাপের বিনাশ ত সেই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হয় না।

অনুতাপ অন্তরের, খ্যাপন বাহিরের, পাপকীর্ত্তন করার নামই খ্যাপন। সত্য বটে;—অনুতাপ না হইলে প্রকৃত পাপ খ্যাপন সম্ভবে না। আবার খ্যাপন না হইলে কেহই ত পাপের কথা জানিল না, কাহারও নিকট ত মাথা হেঁট হইল না, তবে প্রায়শ্চিত্ত কি হইল? প্রকৃত চিত্ত মলা কৈ বিদূরিত

হইল? অহঙ্কারের উচ্ছেদ তদ্রূপ হইলে কৈ হইল? অহঙ্কারের নাশ না হইলে চিত্তের কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধি লাভও হইতে পারে না। এই অহঙ্কারও যে অহমিকা দ্বারা মানবের অস্থি, মজ্জা, ইন্দ্রিয় মন, নির্ম্মিত। কাহারও বা সেই অহঙ্কার প্রকট, কাহারও বা প্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে মানব সম্পূর্ণ অপারগ। তবে মহাপুরুষের কথা স্বতন্ত্র।

দান অর্থদণ্ড। তবে সেই দণ্ডিত অর্থ যাহাতে সমাজের উপকারে আইসে, সেই উদ্দেশ্যে সেই অর্থ বিভাগ করিয়া সদ্ব্রাহ্মণগণকেই দান দিবার ব্যবস্থা। সামাজের মহোপকারক নির্লোভ, দরিদ্র, জ্ঞানচর্চ্চা নিরত ব্রাহ্মণই অর্থদানের উপযুক্ত পাত্র। তদ্ভিন্ন এই মন্ত্রদত্ত অর্থ অপর কাহারও লইবার অধিকার কি? যোগ্যতাই বা কি?

"খ্যাপনেমানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ দানেন চাপদি॥"

মনুসংহিতা।

অনেকে কেশচ্ছেদের পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করেন, ইহা অসঙ্গত। শখের জন্য, লজ্জার জন্য, মাথা নেড়া করা ভাল দেখায় না—এই জন্য যাহারা মাথা মুণ্ডন করিতে চাহে না—এরূপ সৌখীন অহঙ্কৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তই বৃথা। প্রকৃত অশক্ত ব্যক্তিরই কেশচ্ছেদনের পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। সধবা স্ত্রীলোকে দুই অঙ্গুলী পরিমিত কেশচ্ছেদন করিলেই শিরোমুণ্ডন সাধ্যস্ত।

প্রায়শ্চিত্তে যে অর্থদণ্ড দিতে হয়, যে অর্থদান উৎসর্গ করিতে হয়, সে দণ্ড বা দান অসদুপায়ে অর্জ্জিত হইলে চলিবে না। এমন পাপ আছে, যাহার প্রায়শ্চিত্তে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। আর সেই ভিক্ষা করিবার সময়ে সেই পাপের উল্লেখও করার প্রয়োজন। প্রায়শ্চিত্তের নিয়মগুলি যথাযথ পালন করিলে বেশ বোধ হয় যে, আদালতে জারিমানা অপেক্ষা এই প্রায়শ্চিত্ত অধিক অপমান কর, ও অধিক উপকারক। জরিমানা ত লোকে হাসিতে হাসিতে দিতে পারে, অনেকে দিয়াও থাকে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তে তাহা হয় না।

প্রাজাপত্য ব্রতে অশক্ত ব্যক্তিরই অনুকল্প ব্যবস্থা। এক্ষণে শক্ত হউক অশক্ত হউক, ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক আর না হউক, সকলেরই পক্ষে অনুকল্প।

প্রাজাপত্য ব্রতাশক্তো ধেনুং দদ্যাবৎ পয়স্বিনীং।
ধেনোরভাবে পাতব্যং তুল্যমূল্যং ন সংশয়ং॥

দুগ্ধবতী গাভী দানই ত অনুকল্প। আবার অনুকল্প—তন্মূল্য দান। পূর্ব্ব-কালে দুগ্ধবতী গাভীর যে মূল্য ছিল, সেই মূল্যই অত্যাপিও অবস্থিত আছে। বলা বাহুল্য বৎস সহিত দুগ্ধবতী গাভী দানই বিধি।

প্রায়শ্চিত্তানন্তর গাভীকে গো-গ্রাস দিতে হয়। গাভী যদি তাহা গ্রহণ করে অর্থাৎ ভোজন করে, তবেই কার্য্য সার্থক। আর শেষে ব্রাহ্মণ ভোজন।

প্রথম অতিপাতক। দ্বিতীয় মহাপাতক। তৃতীয় অনুপাতক। চতুর্থ উপপাতক।

অতিপাতক যথা—মাতৃ, দুহিতৃ, পুত্রবধূ প্রভৃতি গমন। অতিপাতকই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপকর্ম্ম। ব্রাহ্মণেরপক্ষে অজ্ঞান কৃত অতিপাতকে চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিক ব্রত বিহিত। জ্ঞানকৃত হইলে তাহারও দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক ব্রত বিহিত। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে অজ্ঞান কৃত হুতাশনে প্রবেশে মরণ বা চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিত ব্রত (২৪); জ্ঞান কৃত হইলে ঐ হুতাশন প্রবেশে মরণ বা অষ্টচত্বারিংশৎ বার্ষিক ব্রত (৪৮) ব্যবস্থিত। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জীবিত থাকিয়া ঐ কঠোর চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক (২৪)। জ্ঞানকৃত হইলে চত্বারিংশদ্বার্ষিক (৪৮) ব্রত করিতে পারেন বা অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সকল জ্বালা জুড়াইতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে জীবিত থাকিয়াই ঐ কঠোরতম চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রতের, জ্ঞানকৃত হইলে অষ্টচত্বারিংশ-বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। মাতা, দুহিতা ও পুত্রবধূর পক্ষেও এই একই ব্যবস্থা।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণচৌর্য্য গুরুপত্নীগমন ও তাহাদিগের সহিত অধিক দিন সংসর্গ এই গুলিও মহাপাতক।

সাধারণতঃ জ্ঞানতঃ মহাপাতকে চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান। সাধা-রণতঃ অজ্ঞানতঃ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান।

সকলেই দ্বাদশবার্ষিক, চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ও অষ্টচত্বারিংশদ্বার্ষিক ব্রতের অনুকল্প করিতে দেখিয়াছেন; এবং এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লইয়া অর্থ গ্রহণ, সভাসমিতি, বাদানুবাদ প্রভৃতিও অনেক শুনিয়াছেন। কিন্তু দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতটি কিরূপ জানিয়া রাখুন।

দ্বাদশ বৎসর (১২) কুটীর বাঁধিয়া বনে বাস, বন্য ফলমূলে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও কৃত পাপের অনুতাপ ও খ্যাপন ও ভগবৎ সমীপে পাপক্ষালনের প্রার্থনা। বন্য ফলমূলে প্রাণ ধারণ না হইলে গ্রামে আসিয়া ভিক্ষা করার ব্যবস্থা। এই

পাপ চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক (২৪ বৎসর) অষ্টচত্বারিংশদ্বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করা কতবড় কঠিন কার্য্য, তাহা পাঠকগণ কি ভাবিয়া দেখিবেন?

আত্মঘাতীর প্রায়শ্চিত্ত নাই। আত্মহত্যা কারীর দাহ ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। তবে পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যে, আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিরও কঠোর প্রায়শ্চিত্তের সম্বন্ধেও শাস্ত্র ব্যবস্থা আছে। আমি স্মৃতিশাস্ত্রানভিজ্ঞ বলিয়া সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখি নাই। রঘুনন্দন আত্মহত্যাকারীর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেন নাই। এই ব্যবস্থা প্রাচীন গ্রন্থে বর্ত্তমান। তবে উহা বহু ব্যয়সাধ্য, ও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ব্যবস্থাগ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তি আচার্য্য বরের নিকট ব্যবস্থা পাইবেন।

কলিকালে সকল প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্প প্রচলিত আছে, তাই রক্ষা, নচেৎ প্রায়শ্চিত্ত উঠিয়া যাইত। কতস্থলে অর্থদণ্ড অপেক্ষা এই প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড কত কঠোর কতস্থলে অর্থদণ্ড গ্রহণান্তর প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড গ্রহণ। দোষী হইলে সামান্য অর্থ দণ্ড দেওয়ার মত এই প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড নহে।

মায়া।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিপিনের বাটির কক্ষ। বিপিন ও সতীশ।

বিপিন। আপনার স্ত্রীর এরূপ অসুখ শুনে দুঃখিত হলাম। তার উপর আবার পূর্ণ গর্ভবতী—ভাবনারই কথা বটে।

সতীশ। আপনি সবই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছেন। বাড়ীতে অপর একজনও স্ত্রীলোক না থাকায়, বিশেষ অসুবিধায় পড়েছি। যদি মাস কতকের জন্য আমার ভগ্নীকে পাঠাইয়া দেন ত বড়ই উপকার হয়।

বিপিন। এ আর উপকার কি? পরস্পর এরূপ সাহায্য না কর্‌লে কি সংসার চলে।

সতীশ। যদি অনুমতি করেন ত আস্‌ছে শুক্রবার মায়াকে নিয়ে যাই। সে দিন দিন্‌টা ভাল আছে।

বিপিন। যে দিন আপনার সুবিধা হয়, নিয়ে যেতে পারেন। এতে আর কিন্তু হচ্ছেন কেন? তবে বেশী দিন যে ছোট বউমাকে আপনার ওখানে রাখ্‌তে পার্‌ব তা বোধ হয় না। মা এখনও সম্পূর্ণ সার্‌তে পারেন নাই। ছোট বউমাই তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেন। তা বোধ হয়, আপনার স্ত্রী শীঘ্রই আরোগ্যলাভ কর্‌বেন।

সতীশ। সে আশা এক-রকম নাই। ডাক্তারেরা বলেছেন, পাঁচ ছয় মাসের কম লাগ্‌বে না।

বিপিন। তাই ত। পাঁচ ছয় মাস। কি করি, তাই ভাব্‌ছি। ননী আবার ছোট বউমার নেওটো। তা দিন পনের কুড়ি অপেক্ষা করতে পারেন কি?

সতীশ। আমার যেরূপ অবস্থা, আজ দিন ভাল থাক্‌লে আজই পাঠানর কথা বল্‌তেম্। তবে আপনার যদি নিতান্ত অসুবিধা হয়, অগত্যা অপেক্ষা কর্‌তেই হ'বে।

বিপিন। বিলক্ষণ। শুধু আমার নিজের সুবিধা দেখ্‌লে ত হ'বে না। আপনার সুবিধাও দেখ্‌তে হ'বে। আমারও অসুবিধা না হয়, আপনারও অসুবিধা না হয়, পোনের কুড়ি দিনের জন্য এরূপ কোন বন্দোবস্ত করা যায় না?

সতীশ। আমি ত আর অন্য উপায় দেখি না।

বিপিন। আমি ভাব্‌ছিলেম আপনার জ্যেষ্ঠতাত ভায়ের স্ত্রীকে যদি দিন কতকের জন্য আন্‌তে পারেন।

সতীশ। তা উপস্থিত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চিটাগঞ্জে বদ্‌লী হ'বার পর থেকে দাদা নিজেই ব্যায়রামে ভুগ্‌ছেন। বোধ হয়, তাঁকে ছুটি নিয়ে পশ্চিমে যেতে হ'বে।

বিপিন। তাইত। যখন অন্য উপায় নাই, তখন শুক্রবারেই ছোট বউমাকে পাঠিয়ে দোব। তবে আমার ছেলে গিয়ে মাঝে মাঝে আপনাদের বিরক্ত করে তুল্‌বে। ছোট বউমা না দিলে ননী খেতে চায় না। সে বায়না ধর্‌লেই আপনার বাড়ী তাকে পাঠাতে হ'বে। এ অসুবিধা থেকে আপনার কিন্তু নিষ্কৃতি নাই।

সতীশ। বিলক্ষণ। এতে আবার অসুবিধা কি? আমিই আপনাকে ওকথা বল্‌ব বলে ভাব্‌ছিলেম। সাহস করে বল্‌তে পারি নাই। উঃ বেলা একটা বাজে, আমি এখন যাই।

বিপিন। তা কি হয় ? জল টল খেয়ে যেতে হ'বে।

সতীশ। আজ মাপ করবেন। আমায় এখনই ডাক্তারের বাড়ীতে যেতে হ'বে।

বিপিন। যখন দরকার রয়েছে, তখন আর কি বলি বলুন।

সতীশ। তা হ'লে শুক্রবার আমি এসে মায়াকে নিয়ে যাব।

বিপিন। আচ্ছা।

সতীশ। এখন আসি। নমস্কার।

বিপিন। নমস্কার।

[সতীশের প্রস্থান।]

বিপিন। ছোট বউমার বিষয় সম্বন্ধে কোন মতলব করেছে বলে ত বোধ হয় না। তবে এত দিন—

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।]

কি রে ?

ভৃত্য। আজ্ঞে মল্লিক বাড়ীর ছোট বাবু এসেছেন।

বিপিন। বাবুকে এখানে ডেকে দে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

স্বগতঃ—না। বেশী দিন রাখা হবে না। যদি——কোন রকমে

[হরেনের প্রবেশ।]

কি হে হরেন ! এসো। দুপুর বেলা কি মনে করে।

হরেন। বিপিন তোমায় ভাই একটা উপকার কর্‌তে হ'বে।

বিপিন। কেন হে ? কি ব্যাপার ?

হরেন। মেজ বউয়ের সেই দানপত্রের কথা জান ত ?

বিপিন। হ্যাঃ।

হরেন। আমি সে দান পত্র নাকোচ কর্‌বার জন্য নালিশ কর্‌ছি।

বিপিন। নাকোচ করতে পার্‌বে কি ? তোমার বাবা যা উইল করে যান তাতে ত তোমাদের মেজবউ বিষয় দান বিক্রি কর্‌তে পারে।

হরেন। তা ঠিক বটে। কিন্তু আমি এক নূতন চাল চাল্‌ছি। আর সে বিষয়েই তোমায় উপকার কর্‌তে হবে।

বিপিন। কি মতলব করেছ।

হরেন। এড্‌ভোকেট জেনারেলের Opinion নিয়ে জেনেছি যে, আমাদের স্ত্রীলোক অসৎ চরিত্রা হ'লে বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়। মেজবউয়ের স্বভাব চরিত্র ইদানীং খারাপ হয়েছে। আমার ছেলের ভাতের দিন জমিদার স্ত্রী

মেজবউয়ের চরিত্র হীনতার পরিচয় পায়। তোমার স্ত্রীও এ বিষয় জানেন, কমিশনে যদি তাঁকে এজাহার দিতে দাও। বড় উপকার করা হয়।

বিপিন। ও মতলব ছেড়ে দাও। বাড়ীর কুৎসা নিয়ে আদালতে যাওয়া আমার ভাল মনে হয় না। এরকমে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে কেবল একটা কলঙ্ক মাথায় তোলা বই ত নয়।

হরেন। কি আর করি বল। বিষয়টা যে একেবারে বংশ থেকে বেরিয়ে যায়। তা ছাড়া তুমি যা বলছ আমি তা ভাল করে বিবেচনা করে এ কাজে নাম্‌ছি। মেজ বউ আমাদের বাড়ীর মেয়ে নয়, কাজেই আমাদের আঁচে লাগ্‌বে না।

বিপিন। ও সম্বন্ধে বাড়ীর মেয়ে আর বউয়ে তফাৎ নাই। দুয়েই সমান কলঙ্ক আসে। হরেন বলি শোন ও রাস্তায় যেওনা।

হরেন। অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি আর পেছুবার উপায় নাই।

বিপিন। এখনও ত নালিশ রুজু কর নাই।

হরেন। না। তবে উকিল বাড়ী টাকা দেওয়া হয়েছে। আর্জী লেখাও হয়েছে। তা ছাড়া এতে আর বেশী লোক জানাজানি কি হ'বে। ও সব কথা চাপা থাকে না। এরই মধ্যেই লোকে কানা ঘুসা করে। ও কথা যাক্। তোমার স্ত্রীর সাক্ষী দেওয়ার বিষয় কি কর্‌বে বল! [হাতে ধরিয়া] তোমার এ উপকার কর্‌তেই হ'বে। তাঁর সাক্ষ্য বড় দরকার হ'বে।

বিপিন। এখনও ত দেরী আছে। তোমার যদি নিতান্ত দরকার কমিশনের বন্দোবস্ত করো। আচ্ছা দেখ, তোমাদের মেজবউ এরূপ কর্‌লেন কেন? তুমি ত বল্‌তে তোমাকেই তিনি বিষয় সম্পত্তি সব দেবেন।

হরেন। সেত আগে তাই মনে হ'ত। আমার বোধ হয় ভায়ের পরামর্শ শুনে তাকে বিষয় দান কর্‌বে।

বিপিন। কি করে তাঁর ভাই তাঁর মন বদ্‌লে দিলে?

হরেন। সে অনেক কথা। আর একদিন বল্‌ব। এখন একবার রাজেনের কাছে যেতে হ'বে। তার স্ত্রীও দেখেছিল। ২ টার পর তার আর দেখা পাওয়া যায় না। এখনই যাই।

বিপিন। আচ্ছা। একদিন তোমার কাছে সব শুনব।

[সুরেনের প্রস্থান।]

বিপিন। ভায়ের পরামর্শ মেয়েরা প্রায়ই শুনে থাকে। এখন করি কি? ছোট বউমাকে পাঠাব কি? তাঁর ভাই যেরূপ বল্লে তাকে না পাঠানও ত ভাল দেখায় না। কিন্তু যদি কোনরূপে ছোট বউমার মন বিগড়ে দেবার চেষ্টা করে, [ভাবিয়া] ননীকে ত মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিলেই বোধ হয় ঠিক হ'বে।

[সুরমার প্রবেশ]

বড় বউ এসেছ। ভালই হয়েছে। ননীর নামে বিষয় লিখে দেবার কথা ছোট বউমা'কে বলেছিলে?

সুরমা। তুমি কেবল বিষয় বিষয় কর্‌ছ। এদিকে ছোট বউমা যে একেবারে মুখ পুড়িয়ে দিলে তার একটা বিহিত কর।

বিপিন। ছিঃ বড় বউ ওকথা বলো না। ছোট বউমা সে রকম নন। তাঁর দ্বারা কখনও মাথা হেঁট হবে না।

সুরমা। মঞ্জরী যতক্ষণ বলে নাই, আমারও ত তাই মনে হ'ত।

বিপিন। মঞ্জরী নিশ্চয়ই ভুল দেখেছিল। নয় ত মিথ্যা বলেছে।

সুরমা। তার মিথ্যা বলে লাভ? আর শুধু ত সে একলা নয়। ক্ষীরি ঝিও মায়ের কাছে বল্‌ছিল। সেও নাকি আর একদিন দেখেছিল। ভয়ে এতদিন বলে নাই।

বিপিন। সর্ব্বনাশ! দাসী মহলেও কাণা ঘুষো হচ্ছে, তারা কখনও মনিবের সুখ্যাতি করেনা, মিথ্যা অপবাদ দিতে ভাল বাসে। আর সেই মিথ্যা সমাজ বড় আনন্দের সহিত সত্য বলে গ্রহণ করে। চল মা'কে এখনই বলিগে যেন এ কথার কোন আন্দোলন হয় না, কারুকে এ বিষয়ে যেন প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, ছোট বউ মা আমাদের সতী লক্ষ্মী কলঙ্ক তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

[উভয়ের প্রস্থান।]

একাগ্রতা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ কাব্যবিনোদন।

স্বর্গদ্বার হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী নীরব-কানন। শ্বাপদ সঙ্কুল জীব সংস্থের বসতি-ভূমি। তরুশীরে পক্ষিকুল সুমধুরস্বরে কাননের সজীবতা সংরক্ষা করিতেছে। দূরে,—অতিদূরে ক্ষুদ্রকায়া তটিনী স্বর্গগঙ্গা—মন্দাকিনীর ত্রিলোক পুত শ্যাম-স্নিগ্ধ শীতল অম্বুরাশিরসহ মিশিয়া কুলু কুলু রবে প্রবাহিত। তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর সমূহের উপরিভাগে কানন-সুলভ তৃণরাজী দ্বারা বিরচিত শাল-পত্রের কুটীর মধ্যে সংসার-বিরাগী ব্রহ্মোপাসক সম্প্রদায় নীরব নিথরভাবে উপবিষ্ট।

একটি সুদীর্ঘ ঘনপত্রাচ্ছাদিত তরুতলে ঋষি "সাণ্ডিল্য" ধ্যানস্তিমিত নেত্রে পরমব্রহ্মের চিন্তায় হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তিকে ডুবাইয়া জড়-প্রকৃতির সত্ত্বা ভুলিয়া স্থির-ভাবে বসিয়া আছেন।

দূরে—প্রায় ঋষির যোগমন্দিরের নিকটে একটি উদ্দাম প্রকৃতি ব্যাধ যুবক "সাতনলায়" তীব্র তীর সংযোগ করিয়া বৃক্ষ শাখার উপরিস্থ একটি সুচিত্রিত শোভন দৃশ্য ময়ুর-দম্পতীকে বিদ্ধ করিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

ব্যাধ অতি সন্তর্পণে অতি ধীরে ধীরে পাদক্ষেপ করিতেছে। পাছে পদসঞ্চালনে তাহার উৎকট লক্ষ্যের শিকার উড়িয়া যায়। ব্যাধ বাহ্যজ্ঞান শূন্য। তাহার চিত্তবৃত্তি শিখী পক্ষ ভেদ কার্য্যে নিযুক্ত, নিঃশ্বাস অতি ধীরে বায়ুতরঙ্গে ভুলিয়া যাইতেছে। শরীরের শিরা মণ্ডলীর ক্রিয়া একত্রিত হইয়া ব্যাধের হস্তের শক্তিতে পূর্ণ পর্য্যবশিত হইয়াছে। চক্ষু নিমিষ শূন্য। দেখিলে চিত্রার্পিত বলিয়া জ্ঞান হয়। একপদ অগ্রসর হইতে তাহার যেন একযুগ অতীত হইয়া যাইতেছে। শ্বাস নিরুদ্ধ। প্রশ্বাস স্তম্ভিত সুধীর পাদক্ষেপে ব্যাধ পরমাত্মার অনুসন্ধানে নিরত তন্ময়চিত্ত ব্রাহ্মণের অঙ্গে—একেবারে ক্রোড়দেশে পদসংযোগ করিয়াছে। মনুষ্যের অঙ্গস্পর্শে দীর্ঘদিনের বাহ্যরহিত ব্রাহ্মণ চক্ষুরুন্মিলন করিলেন। দুই চক্ষু রক্তজবা সন্নিভ মুর্ত্তিমান ক্রোধ ঋষি নয়নে সমাধিষ্ঠিত। ব্যাধ কিন্তু অবিচলিত চিত্তে স্বকার্য্য সাধনে রত। দূরে একটি ব্যাঘ্র ও একটি সর্প তাহার প্রতি ধাবমান। ক্রোধমূর্ত্তি ঋষি এই ব্যাপার দেখিয়া হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাব প্রবণতা লইয়া মুগ্ধনেত্রে একবার তীরদ্বয়ের প্রতি চাহিলেন। তাহারা দূরে গেল।

স্বগত চিন্তায় ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—আ—কি একাগ্রতা! কি অপূর্ব্ব নিষ্ঠা! এইরূপ একাগ্রতা এইরূপ তন্ময়ত্ত লইয়া ভগবদ্‌চিন্তায় রত হইতে হয়। ধন্য ব্যাধ! ধন্য তোর শিক্ষাকে, কোটী ধন্য তোর জীবনকে তোর নিকট আজ

শিক্ষাভিমানী চির সুসংস্কৃত হৃদয় ব্রাহ্মণকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইল। আমি সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারি নাই—তোর শিক্ষায় আজ তাহা পূর্ণ হইবে। এইরূপ একাগ্র হইয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই ডাক শুনিবেন। ব্যাধরে তোর ন্যায় একাগ্র না হইলে সেই—"অনোরনিয়ান্ মহত মহিয়ান্" মহা পুরুষের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় না।

ঋষি অন্তরের মহাভাব গোপন করিয়া বাহ্য ভাবমুগ্ধ জিহ্বায়র জবা নেত্রে ক্রোধ কম্পিত কর্কশ স্বরে কহিলেন,—"নরাধম চণ্ডাল! ব্রাহ্মণের অপমান? জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণের অঙ্গে পদক্ষেপ? তোর রসনা ছিঁড়িয়া না দিলে অথবা তোকে ভস্মস্তূপে পরিণত না করিলে তোর শিক্ষা হইতেছে না।"

ব্যাধ শিহরিয়া উঠিল,—ব্রাহ্মণের তীব্র কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ-মাত্র শিকার মুগ্ধ হৃদয় ব্যাধ—ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহার শরীর উৎফুল্ল কদম্ব কুসুম তুল্য উৎকীর্ণ হইল। কণ্ঠ আকুলিত, ভয়ে স্তম্ভিত—মাত্র প্রথম রুদ্ধ হৃদয় বেগ অতি কষ্টে অতি আতঙ্কে ধারণ করিয়া কহিল,—"গোঁসাই মাপ কর"।

ব্রাহ্মণ অরণ্যচারী নিকৃষ্ট চরিত্র অপূর্ণ হৃদয় ব্যাধের আকুল কণ্ঠের ভীতি নম্র স্বর শুনিয়া কহিলেন, "নরাধম,—দুরাচার—তোর এত বড় স্পর্দ্ধা? এতবড় অহঙ্কার? চণ্ডাল হইয়া ব্রাহ্মণের অঙ্গে পদাঘাত? তাহার উপর আবার বাক-স্ফূর্ত্তি। তোর জিহ্বা ছেদন না করিলে তোর কটিভাগ কর্ত্তন না করিলে তোর শিক্ষা হইবে না।"

আরক্ত নেত্র উগ্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের কর্কশ স্বর শুনিয়া ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যাধ আবার বলিল,—"দয়াল ঠাকুর অবুঝ চাঁড়ালের অপরাধ ক্ষমা কর, তুমি ব্রাহ্মণ—দেবতা। দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা তোমার জাতির গহনা আমি চণ্ডাল ব্যাধ, পশু হত্যারূপ নির্ম্মম কার্য্য আমার জাতীয় বৃত্তি। আমার তুল্য অধম জগতে নাই, আমায় মাপ কর।"

এই সময় তেজঃপুঞ্জ কান্তি সাণ্ডিল্য ঋষি বাহ্য ক্রোধের বিকাশ আর মহা সাম্যময় করুণা লইয়া সাধন পথের একটী অতি গুহ্যতম পন্থা অনুসন্ধান করিতে করিতে কহিলেন, "রে মূর্খ! তোকে ক্ষমা করিতে পারি,—যদি আমার একটা কার্য্য করিতে পারিস্। কিন্তু অগ্রে তাহার জন্য তোর এই জীব হিংসার উপকরণ গুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেমন সম্মত কি?"

এইবার ব্যাধ কিছু আশ্বস্ত হইল। হৃদয়ে ব্রাহ্মণ অবমাননার গুরুভারে যে,

মহা সন্তাপ পড়িয়াছিল, তাহা শিথিল হইল। নিজকৃত কুকার্য্যের ক্রিয়া তাহার উদ্দাম শুষ্ক হৃদয়ে শ্লথ হইয়া গেল। চিরদিনের সহায় তীর, কামটা দীর্ঘকালের জীবিকা উপার্জ্জন করিবার অভ্যস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণ গুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া ব্যাধ কিছু বিমর্ষ হইল। আবার ব্রাহ্মণ ক্রোধে উদরের উপায় চিন্তা আর না ভাবিয়া জড়িত স্বরে কহিল,—"ঠাকুর!" সাণ্ডিল্য তখন ক্রোধপূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিলেন। ব্যাধ সহসা ভস্মস্তুপে পরিণত হইবার ভয়ে অতি মৃদুভাবে কহিল,—" প্রভুর আজ্ঞা।"

ঋষি-প্রফুল্ল হইলেন,—মুহূর্ত্তে চিন্তা করিয়া লইলেন। এরূপ একাগ্রতা না হইলে সেই সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র অবলম্বন শ্রীহরির সাক্ষাৎ মানুষে পাইতে পারে না। আমি জাতি বিচারে শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়াও সাধন মার্গে সুদীর্ঘ সময় যে পন্থা অবলম্বন করিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় কাননাশ্রয়ে একস্থানে একভাবে যাঁহার প্রাপ্তি আশায় জীবন প্রায় অতীত করিয়া আসিলাম,—তাঁহার শুভ সম্মিলন এই মানব সমাজের ঘৃণিতাচারী নিষাদের আচরিত, "একাগ্রতা" ব্যতীত লাভ হইবে না। এইরূপ একাগ্র হইয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারিলেই মুহূর্ত্তে সেই হৃদয় আসনে উপবেশিত নিত্য জাগ্রত চৈতন্যময়ের দর্শন লাভ হইবে। নতুবা চঞ্চল চিত্ত লইয়া চিত্তময়ের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র, ব্যাধ! তুই সুখী, সংসার সুখের অবান্তর স্পৃহাময় বাসনার প্রণোদন। তোর হৃদয়ে প্রস্ফুটিত তথাপি তোর অবলম্বিত অনুষ্ঠিত দেবদুর্লভ হৃদয়বৃত্তিকে দিয়া—তোরি দ্বারা সেই অব্যয়, অক্ষয়, শাশ্বত পুরুষকে আমি আয়ত্ব করিব। তোকে দিয়াই সংসারকে শিক্ষা দিব যে, হে অনন্ত কার্য্যময় মায়া মুগ্ধ ভ্রান্ত জীব! দেখ তোমার নিকটেই অতি সংগোপনে নিভৃত কোণে তোমার মেদ মজ্জা শোণিত তণ্ডুর শক্তির অভ্যন্তরে সেই মহা লক্ষ্য লাভের একটী অতি মধুরতম উজ্জ্বল মাধুর্য্য আছে। শক্তি আছে, তদ্দ্বারা তাঁহাতে আর জগতে বিভেদ বিহীন দীনদয়াল জীবের নিজ জনকে পাওয়া যায়।

ক্ষণেক চিন্তার পর ব্রাহ্মণ ব্যাধের দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন,—"নিষাদ! তোমার তীর ধনুক অস্ত্র শস্ত্রপরিত্যাগ কর! ঐ স্থানে উপবেশন কর। আমি যাহা বলি, শুনিয়া যাও!"—ভীত ত্রস্ত ব্যাধ তাহাই করিল।

ঋষি বলিলেন,—"আমি তোমাকে আমার যে কার্য্য করিতে বলিব, তাহা তোমার সাধ্যের বাহিরে নয়। সহজে তাহা পারিবে। তুমি এখন ঐ স্রোত-স্বতীর সলিলে অবগাহন করিয়া এসো। তোমাকে কার্য্য করিবার শক্তি দিতেছি।"

নিরুত্তর যন্ত্রচালিত ব্যাধ তীর ধনুক রাখিয়া গিরিতরঙ্গিনীর ক্ষুদ্র গর্ভে উৎক্ষিপ্ত বিচিত্রবীমালা উত্তীর্ণ করিল। কোটী জন্মের কোটী কোটী পাপ তাপ বিনাশক গঙ্গাজলে ব্যাধের আজন্ম আচরিত জাতীয় মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইল।

দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে একটা জ্বালাময়ী জ্যোতি রেখা ফুটিয়া উঠিল। সেই দিব্য জ্যোতিঃকান্তির মধ্যে একটী অতি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ শান্তি ভাব জাগিয়া উঠিল। চণ্ডালের স্নাতদেহ পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিনিভ ভাবে ঋষির নিকট উপস্থিত হইল।

(২)

জগতের দীক্ষা গুরুর জাতি ঋষি কহিলেন "কালকা! তুমি পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন কর। আমি আমার কার্য্য করি। কালকা অস্তগমনোন্মুখ সবিতার দিকে পৃষ্ঠ দিয়া উপবেশন করিল। ঋষি তাহার কর্ণে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করিলেন। ব্যাধের শরীর তুলা হইতেও লঘু হইয়া গেল।

ব্যাধ কালকা প্রাবিটের সলিল-সিক্ত কদম্ব কুসুম তুল্য শরীরে শিহরিয়া উঠিয়া আভূমি লম্বিত হইয়া গুরুপদে লুণ্ঠিত হইল। দীক্ষার শক্তিতে তাহার ব্যাধ মূর্ত্তি পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কণ্ঠের ভাষা পর্য্যন্ত ভদ্রাভিমানী জাতির ভাষায় সুসংস্কৃত চারি বেদের সার মর্ম্মে বিরচিত সেই—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥"

বলিয়া প্রণাম করিল। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহার সেই দিব্যমূর্ত্তি কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া না সভ্য না অসভ্য ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল।

সাণ্ডিল্য কহিলেন,—"শিষ্য! শোন আমার একটী মাত্র পুত্র। সে বড় কুহকী বড় ভেল্‌কী বাজ। উৎকৃষ্ট বহুরূপী আমি তাহার বিরহে মর্ম্মান্তিক কষ্টে কালাতিপাত করিতেছি, তাহাকে পাইলে আমি শান্তি পাই,—জীবন ধন্য হয়। সে আমাকে ফেলিয়া জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে ঘুরিয়া বেড়ায়। তোমার যেরূপ শক্তি বুঝিতেছি,—এবং তোমার দেহের যেরূপ লাবণ্য বাহির হইতেছে, তাহাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, তুমি তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে। আমি তোমার কৃত পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলাম যে, তোমাকে তাহাকে ধরিতেই হইবে কেমন প্রস্তুত আছ কি? না ব্রাহ্মণের কোপানলে ভস্মীভূত হইবে? বল ইহার কোন্‌টী তোমার অভিপ্রেত?"

কালকা উত্তর করিল,—"সম্মত হইলাম, আপনার পুত্রকে ধরিয়া আনিতে সম্মত হইলাম। আপনি তাহার নাম এবং রূপের পরিচয় করিয়া দিন। আমি তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া আপনার নিকটে উপস্থিত করিতেছি। ঋষি কহিলেন, তাহার নাম অসংখ্য। কেননা আমার একটিমাত্র পুত্র, আমি তাহাকে যে নাম যখন মনে আসে, সেই নামে ডাকি। তবে তাঁহার কয়েকটি চল্‌তি নাম আছে, শ্রীহরি নামটী তাঁহার রাশী নাম। আমি তাঁহাকে অনেক সময়—

হরে নারায়ণ, বামন, রাম, মধুসূদন।
মুকুন্দ, মাধব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, জনার্দ্দন॥
শ্রীনাথ, শ্রীপতি পদ্মনাভ সুরেশ।
অচ্যুত, কেশব, মুরারী, মোহন হৃষিকেশ॥

এই কয়েকটী নাম ধরিয়া ডাকি। আবার কোন সময়—

"গোপেশ, গোপিকাকান্ত, রাধাকান্ত, যোগেশ্বর
নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন নিত্যানন্দ, নবঘন"* ইত্যাদি বলিয়াও

ডাকিয়া থাকি, তোমার যেটি ইচ্ছা সেই নামে তাহাকে ডাকিবে। তাহাতেই আমার সেই প্রাণ জুড়ান পুত্রটীর ডাকা হইবে। তাঁহার রূপের পরিচয় কি দিব কালকা! ছেলেটী আমার জগতের সকলের মন প্রাণ ভুলান রূপের আধার! তবে সাধারণত তাঁহার রূপটী বড় মধুর—বর্ণ উজ্জল শ্যামল। পীতাম্বর পরি- হিত গুঞ্জ মালায় কণ্ঠ বিলম্বিত। বক্ষে কোন ব্রাহ্মণ বিশেষের পদচিহ্ন, হস্তে বাঁশরী, তাহার সুরে জগৎ স্তম্ভিত। অধিক সময় ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে দাঁড়িয়ে থাকে। কর ও পদতল অলক্ত রঞ্জিত। ওষ্ঠাধরে উদ্দাম বিদ্যুৎ চমকিত। আবার কোন সময় তাহার রূপে——

সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সরসিজাসন কনক কুণ্ডল কেয়ুরবান কীরিটিহারী হিরণ্ময়বপু ধৃত শঙ্খ চক্র।

ভাব ও জয়। এই রূপটী কিন্তু তাহার নিত্যধ্যেয় রূপ অধিকাংশ ব্রাহ্মণেই তাঁহার এইরূপ দেখেন,—আমি এইরূপ দেখিতে দেখিতে "শ্যাম রূপের সাগরে ডুবিয়াছি। পুত্রটী আমার নিত্য নবনব রূপ নবনব ভাব ধরিয়া থাকে। স্থূল কথা শিষ্য, পুত্রটী আমার বহুরূপী বিদ্যায় মহা প্রাজ্ঞ। এইজন্য অনেকে তাঁহাকে অনেক নাম ধরিয়া ডাকে। আমি কিন্তু অধিক সময় তাঁহার ভুবন মোহন শ্যাম রূপের চিন্তায় উপরের কথিত নামগুলি ধরিয়া ডাকি। তবে প্রাণের মধ্যে

* রাগিনী হাম্বির একতালা।

আমার 'শ্রীহরি শ্রীহরি' নাম সর্ব্বদা উঠিতেছে। ডাকিতে ডাকিতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, চক্ষু জ্যোতি হীন হইল, তথাপি আমার নিকট তাহার আগমন হইল না। যদিও দুই এক সময় আমার আকুল ডাকে নিকটে আসিয়া উপস্থিতির ভাব করে, তথাপি পরিষ্কার দেখা দেয় না। ধরিতে গিয়া "ধরি ধরি ছুঁই ছুঁই" করিয়া পারিয়া উঠি না।

এই জন্য তোমার সাহায্য লইতেছি। তুমি অতি ক্ষমতাশালী শক্তিবান পুরুষ। তুমি নিশ্চয় তাঁহাকে ধরিতে পারিবে।

"একশতবার পারিব,"—বলিয়াই নূতন সাধক কালকা বলিল,—"তিনি সর্ব্বদা কোথায় থাকেন।" এই সময় আপনা হইতেই তাহার চক্ষু চারিদিক ঘুরিতে লাগিল। কি যেন মদিরা মুগ্ধ হইয়া ব্যাধের চক্ষু মুদ্রিত হইল। সাধক কালকা দেখিল, তাহার হৃদয় পদ্মে এক অতি উজ্জ্বল ছায়াপাত হইয়াছে, সেই বিমুগ্ধ ছায়া একবার নড়িতেছে, একবার স্থির হইয়া তাহার দেহের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। কখন কালকার ন্যায় মূর্ত্তি বিশিষ্ট হইয়া উঠিতেছে, কখন বিশ্বময় হইয়া যাইতেছে। এই মহাভাব ব্যাধের হৃদয়ে উপস্থিত হইলে পঞ্চভূতের সম্মিলিত ভাবে কালকার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইল। ঋষি তাহা দেখিয়া মহাসমাধিস্থ কালকার শরীরে হাত দিয়া ডাকিলেন,—"শিষ্য! আমার স্থূল শরীরের গুরু কালকা! জাগরিত হও—আমার পুত্রকে কখন ধরিয়া আনিয়া দিবে? বল—বল কালকা এই রক্ত মাংসের দেহে থাকিয়া তাঁহাকে কখন দেখিব?"

গুরুর স্পর্শে শিষ্যের হৃত বাহ্য শক্তি পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠিল,—জিহ্বা আপন হইতেই বলিয়া উঠিল, "হরে নারায়ণ" কই বলিলেন না, গুরু আপনার পুত্র সর্ব্বদা কোথায় থাকেন?

সাধুর অঙ্গস্পর্শী মুক্তকামী ব্রাহ্মণ কহিলেন, "প্রিয় শিষ্য! তোমাকে বলিয়াছিতো—পুত্রটী আমার বহুরূপী, সুতরাং দেশের সর্ব্বত্রই তাঁহার অবাধ গতি। তবে সাধারণত শ্রীধাম বৃন্দাবনে, হরিদ্বারে পুরীতে, কাশী, গয়া, মথুরা, অযোধ্যা পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, পঞ্চবটী তাহার বসতি স্থান।

এই স্থান গুলির মধ্যে আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রটী অধিকংশ সময় শ্রীধাম বৃন্দাবনে খেলা ধুলা করিয়া বেড়ায়। যাও কালকা তুমি তাহাকে লইয়া এসো।

(৩)

কালকা উঠিল—তাহার দীর্ঘ দিনের জীবন উপায় তীর ধনুর দিকে একবার চাহিল। ব্যাধ পরিবারের ক্ষুধা পিপাসা নিবারণের উপায় অর্থ উপার্জ্জনের এক

মাত্র অবলম্বন ধনুক বাণ ঋষির নিকটে পড়িয়া রহিল। যাইবার সময় একবার তাহার দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া একটা ক্ষীণ ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। পরক্ষণে তাহার মনে নবদীক্ষিত ভাব জাগিয়া উঠিল। হৃদয়ে দুইটী মহাভাব আসিয়া নবীন সাধককে বাহ্যজ্ঞান শূন্য করিয়া দিল।

কালকা চিন্তা করিল—এই যে, ব্রাহ্মণের পুত্রটী এটি কি সত্য সত্যই ব্রাহ্মণের কথিত চরিত্রের বালক? প্রকৃতই কি সে পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বহুরূপী সাজিয়া লোকের নিকট ভেল্‌কী খেলাইয়া বেড়ায়? একথা যদি প্রকৃত হয়, তবে তো তাহার ক্ষমতা খুব বেশী। যথেষ্ট শক্তি তাহার আছে, অর্থ আছে। আমি পাপ করিয়াছিলাম, ঋষি বড় দয়াল—তাহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য আমাকে তাঁহার পুত্রটীকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিয়া প্রকৃতই ক্ষমার আধার হইলেন। এমন হতভাগা নচ্ছার ছেলেতো বাবা কখনো দেখি নাই। বৃদ্ধ পিতার দিকে চায় না, কেবল নিজের খেয়ালেই বিভোর। আমি নিশ্চয়ই তাহাকে পাকড়া করিব, গুরুদক্ষিণা দিব।

এই চিন্তার পর আবার ব্যাধের মনে দীক্ষা জনিত একটা শুভাবের উদয় হইল। ভাল ব্রাহ্মণ যে, সকল পরিচয় দিলেন,—তাহাতে বোধ হচ্ছে সে প্রকৃত মানুষ নহে।

এক ব্যক্তির কি এত নাম, এত বসতি স্থান, এতরূপ চেহারা হইতে পারে? আবার পরক্ষণেই চিরদিনের প্রকৃতিগত চিন্তা জাগিয়া উঠিল,—ভাবিল, নাই বা হবে কেন? গরীবের ঘরের ছেলের নাম যখন "রাজকুমার", "নৃপেন্দ্রকুমার" হইয়া থাকে এবং দশ বারোটী গ্রামে তাহার থাকিবার স্থান পর্য্যন্ত হয়, পোষাক পরিয়া লোকে যখন নানারূপ ধরিতে পারে, তখন ঠাকুরের কথা মিথ্যাই বা হবে কেন?"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কালকা সে স্থান পরিত্যাগ করিল। উচ্চস্বরে ঊর্দ্ধমুখে শাণ্ডিল্য কথিত নামাবলি গান করিতে করিতে চলিতে লাগিল। মুখে আর অন্য শব্দ নাই,—অনবরত "হরে নারায়ণ বামন রাম মধুসূদন" ইত্যাদি নাম মালা তাহার হৃদয় বৃত্তি উদ্বেলিত করিয়া মুখের পথে স্বরের আবেগে কাননতল মুখরিত করিয়া বহিয়া বহিয়া যাইতেছে। তাহার তাৎকালিক মূর্ত্তি এক দিব্য ভাব ব্যঞ্জক। ব্রহ্ম সৌন্দর্য্যের একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ রেখা ব্যাধের সর্ব্বশরীরে আবৃত। অধ্যাত্ম জগতের একটা দুরলক্ষ্য চিন্তাভাস তাহার প্রশান্ত নয়ন কোণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্য চিন্তা তাহার নাম সঙ্কীর্ত্তনের আবেগে শক্তিতে

তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। ব্যাধ জিহ্বা অনবরত ভগবন্নাম উচ্চারণে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। সে হৃদয়ে আর তাহার নিত্য অনুষ্ঠিত কার্য্যের কিছুমাত্র ভাব নাই। ব্যাধ যেন সুশিক্ষিত সাধক ব্রাহ্মণ; বস্তুত ব্রহ্মসত্বাকৃত উদ্ভাসিত ছায়া যাহার হৃদয়ে পতিত হয়, তাহার নিকট ব্রাহ্মণ, শুদ্র, আর্য্যানার্য্য ভাব থাকে'না, এ রাজ্যের প্রজা সকলি একি সাম্য তন্ত্রের তুল্য মূর্ত্তি। এস্থানে বিদ্বান মূর্খ নাই, জাতি বিচার নাই, স্ত্রী পুরুষ নাই, সতী অসতী নাই, অতএব ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরই বা ভেদাভেদ থাকিবে কেন?

বাহ্যজ্ঞান, বাহ্যভাব, বাহির দৃষ্টি কালকার একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র আর নামাঙ্কিত সাণ্ডিল্য প্রদত্ত একখণ্ড জীর্ণ বসন এবং গুরু প্রদত্ত একছড়া তুলসী মালা ব্যতীত তাহার দ্বিতীয় সম্বল নাই। আহার, নিদ্রা, পিপাসা, ক্লান্তি, এমন কি জীবের প্রকৃতিগত মলমূত্র নিঃসরণ ক্রিয়া পর্য্যন্ত তাহার দূরে গিয়াছে। পূর্ব্বের শিকারী কালকা আর বর্ত্তমানের সাধক কালকার পূর্ণ পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে। কেবল নাম সঙ্কীর্ত্তনের গীতি ঝঙ্কার সুরের পর সুরের গ্রাম, আর তাহার মধ্যে সেই শ্রীগুরুর প্রদত্ত প্রদর্শিত চিহ্নিত রূপের জলন্ত আধার "হরে নারায়ণ" গীতি ব্যঞ্জক সুরযুক্ত ভাব ভিন্ন ব্যাধ আর সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছে।

কালকার কণ্ঠস্বরে সমগ্র কাননভূমি মুখরিত হইল। বনজ লতা গুল্মে আর পর্ব্বত গাত্রে সেই শব্দ সম্ভার প্রতিধ্বনিত হইয়া জীব সংজ্ঞ্য বসুধাকে নিরবচ্ছিন্ন হরিনামের সুর আন্দোলনে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। ব্যাধের সঙ্গে বনের পাখি "হরে নারায়ণ" গীত গাহিল। গিরিতরঙ্গিনী কুলকুল রবে "হরে নারায়ণ" গাহিল। শাখীর শাখা বায়ু তরঙ্গে দুলিয়া গাহিল, "হরে নারায়ণ" পশুকুল ক্ষুধা পিপাসা ভুলিয়া স্ব স্ব রবে গাহিল, "হরে নারায়ণ" বস্তুত সাধকের ভাবে সাধ্য বস্তুর মাধুর্য্যে বাহ্য প্রকৃতি পর্য্যন্ত নাম গানে তন্ময় হইয়া যায়। পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ভগবন্নাম শক্তিতে বিভোর হয়। তাই ধ্রুব "পদ্ম পলাশ লোচন" বলিয়া ব্যাঘ্রকে আলিঙ্গন করিলে ব্যাঘ্র তাহার পশু প্রকৃতি ভুলিয়া ধ্রুবের নব নধর শরীর লেহন করিয়াছিল। ব্রহ্মসত্ত্বা পূর্ণ প্রকাশ হইলে জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার ভাব সাকার হইয়া সাধকের বাহ্য চক্ষুর দৃশ্য হইয়া থাকে।

কালকার ঐকান্তিক সাধনায় অভুত পূর্ব্ব একাগ্রতার আকর্ষণে জগৎ জগন্নাথ হইয়া গেল।

বাহ্যজ্ঞান রহিত নাম সঙ্কীর্ত্তনকারী নব্যসাধক কালকা এইরূপে হরিদ্বারের

জাহ্নবী নির্গম স্থানের প্রত্যেক পর্ব্বত, প্রতি কানন, প্রত্যেক গুল্মস্তূপ, প্রতি-বৃক্ষ শীর্ষ গুহা, কন্দর, আশ্রম, দেব-মন্দির পর্ণ কুটীর এমন কি প্রতি বৃক্ষের পত্রাচ্ছাদিত পক্ষীকুলের কুলায়, পশুকুলের বসতি স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনু-সন্ধান করিতে করিতে গাহিয়া যাইতে লাগিল, " হরে নারায়ণ " ইত্যাদি।

সাধক সাধ্য বস্তুর এইরূপ ধ্যান ধারণা করিতে পারিলেই সাধনা সিদ্ধ হয়। সাধনার পথে বিঘ্ন বিপত্তি থাকিলেও তাহাকে সাধ্য জ্ঞানে সাধনা করিতে হয়। ব্রাহ্মণের দীক্ষা সংস্কারে অসভ্য ব্যাধ এই মহাশিক্ষা লাভ করিয়া তন্ময় চিত্তে গাহিতেছে, " হরে নারায়ণ "।

গীত গাহিতে গাহিতে নবীন সাধক একটী অত্যুচ্চ-শৈল-শিখরের পাদদেশে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ের উদ্দাম আবেগ যেন কতকটা থামিয়া গেল। শ্রীগুরুর নির্দ্দেশিত রূপ এবং নিথর, নিশ্চল, সুস্থির অবস্থানে কাহাকে যেন সাধকরাজ একবার বাহ্যাভ্যান্তর চক্ষে দেখিতে পাইল। কিন্তু উর্দ্ধে অতিউর্দ্ধে দৃষ্টি সুন্দর প্রতি ফলিত হইলেন; বলিয়া সাধক নিম্নস্থ গঙ্গার চঞ্চল লহরী লীলার মধ্যে চাহিয়া দেখিল। হাঁ সমস্তই এক, সমস্তই সেই মহা ছায়া।

(৪)

" ডাকার মত ডাকতে পাল্লে ডাক না শুনে রন্ কি তিনি ?"—এই মহা বাক্য যে কবির হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার হৃদয় কত উচ্চ! কত মহৎ! এই কথার আদেশে যাহারা পরিচালিত তাহারাই সাধনার পথে সত্বর অগ্রসর হয়। ইহা কিন্তু প্রকৃত-মুক্ত সম্বোধন নহে। শিক্ষা জনিত ডাকে মুক্ত ডাক আইসে না। কালকা ঋষির নিকট হইতে ডাকিতে শিখিয়া "তাঁহাকে" ডাকিতে ছিল। ভগবান তাহা শুনিয়াও শুনেন নাই যেই হৃদয় খুলিয়া আপনি ডাকিতে আরম্ভ করিল, অমনি শ্রীহরি তাহার নিকটে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

সাধকতো অনবরতই তাঁহার সাধনা করিতেছেন,—কিন্তু সাধ্য শ্রীহরি পূর্ণ পরীক্ষা না করিয়া সাধকের আয়াত্ত হইবেন না। কালকার এই অপ্রমেয় সাধনায় শ্রীভগবান পরীক্ষার ইচ্ছায় ব্রহ্মর্ষি নারদকে ডাকিয়া কহিলেন, "নারদ! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি! তুমি আমায় এই সময় কিছু সাহায্য কর।"

নারায়ণের এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি কহিলেন, "ঠাকুর ইহাকেই বলে বহুরূপী হওয়ার কথা। তুমি বিপদে পড়িয়াছ, তাহার সাহায্য করিব কি না রক্ত মাংস দেহধারী আমি?"

নারায়ণ কহিলেন,—"তুমি ব্রহ্মর্ষি তোমার মুখে এরূপ উক্তি মানায় না। আমার লীলার কুহকে অসম্ভব কি সম্ভব নহে নারদ!" নারদ উত্তর করিলেন না, নীরব রহিলেন। কিছু পরে কহিলেন—"আজ্ঞা করুন!" হাস্য মুখে শ্রীহরি কহিলেন,—"ব্যাধ কালকা আমায় বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মুক্ত আহ্বানে আমি আর স্থির হইতে পারিতেছি না, দর্শন দিতেই হইবে। কিন্তু একটা কথা আছে,—তাহার এই আহ্বান শিক্ষাজাত বাহ্যিক আভ্যাসিক না দীক্ষা শিক্ষার নিশ্চিত কল মুক্ত হৃদয়ের আহ্বান। এই ভাবটী জানিয়া আমি তাহার দৃশ্য হইব। তুমি ইহা পরীক্ষা করিয়া আইস।"

দেবর্ষি শ্রীমধুসূদনের বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর! তোমার কোন্ রূপ হৃদয়পটে আঁকিয়া লইয়া তোমাকে সে ডাকিতেছে? হে অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ! তাহার অন্তরের এই ভাবটী আমাকে জানাইয়া দিন!"

শ্রীহরি বলিলেন,—"কৃষ্ণরূপ—বৃন্দারণ্য বিহারী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই তাহার ধ্যেয়; নারদ যে মূর্ত্তির আভায় জগৎ মুগ্ধ। যে মূর্ত্তির মোহনরূপের ছায়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অণুতে অণুতে প্রধূমিত—সেই ভুবনমোহন রূপ নূতন সাধকের ধ্যেয়।" দেবর্ষি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না,—কালকার ভগবৎ সাধনা মুখের না হৃদয়ের তাহাই পরীক্ষা করিতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। নিকটের একটী শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ত্রিভঙ্গিম ঠামে দণ্ডায়মান হইলেন। দূর হইতে কালকা সেই মূর্ত্তি দেখিল; আর অমনি তাহার কণ্ঠ হইতে সেই অভ্যস্ত গীতের ঝঙ্কার বাহির হইল,—"হরে নারায়ণ" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণরূপী নারদ সাধকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া নাম সংকীর্ত্তনের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়া ভাবিলেন,—ধিক্ আমার দেবর্ষি নামে—শত ধিক্কার আমার ব্রাহ্মণ জীবনে! চণ্ডালের এমন আকুল শ্রীহরি সম্বোধন! আর একে বলে সহস্রার মধ্যে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন! একেই বলে তন্ময় হৃদয় হইয়া শ্রীহরির আহ্বান।

এই সময় কালকা অতি উৎসাহে অতি আগ্রহ সহকারে পার্ব্বত শৃঙ্গে উঠিতে লাগিল। তাহার চক্ষু সেই "নীলোৎপল শ্যাম" রূপের দিকে। হৃদয় পূর্ব্ব-শ্রুত রূপজ্যোতি সাগরে নিমজ্জিত। কেবল বাহিরের গতি শক্তিটী—পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর। উঠিতে উঠিতে অনেকবার তাহার পদস্খলন হইল। অতি কষ্টে উঠিয়া ব্যাধ তাহার কুলিশ কঠিন হস্তে শ্রীকৃষ্ণ রূপী নারদের হাত ধরিয়া বলিল,—"আর কোথায় যাবে দুষ্ট ছেলে,—তোমার ন্যায় বেল্লিক তো কখন দেখি

নাই,—তোমার পিতা তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে প্রাণশূন্য হলেন,—বুড়ো বামুনের আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিন রাত হরে নারায়ণ বলিয়া ডাকিতেছেন! আর তুমি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করিতেছ, এখন চল, পিতার নিকট,চল।" উত্তর হইল,—"কই বাপু তিনিতো আমায় ডাকেন না,—আমিতো শুনিতে পাই না!"

ব্যাধ।—তা পাবে কেন? তোমার কি কাণ আছে? এত করে ব্রাহ্মণ তোমাকে ডাকিতেছেন,—তুমি তাহার নিকটে গেলে তো শুনিবে? এতদূরে কি করিয়া শুনিবে?"

শ্রীকৃষ্ণরূপী নারদ।—প্রকৃতই তিনি আমাকে ডাকেন না,—মাত্র ডাকিবার দরকার মনে করেন, আর ইচ্ছা করেন।

ব্যাধ। তা বুঝেছি—তোমার ও সকল আলগা কথা রাখ—যাবে কিনা স্পষ্ট বল।

শ্রীকৃষ্ণরূপী নারদ।—না বিনা আহ্বানে যাবনা বিনা নিমন্ত্রণে কে কবে কাহার বাড়ী গিয়া থাকে?

ব্যাধ।—বা,—বা কি মানী ছেলে গা—বাপের কাছে যেতে আবার নিমন্ত্রণ, ওসব রাখ,—যাবে কিনা বল?—নতুবা এই লতা দিয়ে বেন্ধে নিয়ে যাবো।

যেমন বলা অমনি কার্য্য,—লতা লইয়া বন্ধন করিবার উদ্যোগ মাত্র, মনে মনে বলিল,—মারে তাড়ান বাপে তাড়ান ছেলেগুলো এইরূপই হয়।

সম্মুখে একটী বনজলতা পাইল, তাহা দিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপী নারদকে বান্ধিয়া লইল। বলিল,—আজ ৪ দিন জলটুকু পর্য্যন্ত খাই নাই। এই গাছের সহিত বান্ধিয়া ঝরণা হইতে জল খাইয়া লই। বলিয়াই কালকা যেমন মুখ নত করিল, অমনি এক অপূর্ব্ব কৌশলে শ্রীকৃষ্ণরূপী নারদ বন্ধন মুক্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন ব্যাধ! তোর সিদ্ধিলাভের আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব আছে। প্রকৃত দীক্ষা প্রাপ্ত সাধকের সাধনা অতি সহজ অতি সরল।

জলপানে উদ্যত কালকা তাহার গুরুপুত্রের অন্তর্ধ্যান দেখিয়া বিস্মিত হইল,—"হরে নারায়ণ বামন—ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে তাহার পশ্চাদ্ পশ্চাদ্ ছুটিল। হৃদয়ের একটা নিভৃত কোণে একটা ভাবের আভাস ফুটিয়া উঠিল। ভাবিল, প্রকৃতই ছেলেটা বহুরূপী। ব্যাধ আবার গিরিকানন-তল মুখরিত করিয়া পাপিয়া কণ্ঠকে পরাজিত করিয়া, গাহিতে গাহিতে চলিল। হরিদ্বার শ্রীকৃষ্ণরূপী নারদ কোন পথে কোন দিকে চলিয়া গিয়াছেন,—কালকা তাহা স্থির করিতে

না পারিয়া ভাবিল, "গুরুদেব বলিয়াছিলেন,—ছেলেটা অধিক সময় শ্রীবৃন্দাবনে থাকে,—তা আমি সেই স্থানে যাই। এবার দেখা পাইলে শক্ত করিয়া বান্ধিব—জল খাইবার দরকার নাই। এইরূপ স্থির করিয়া কালকা নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে লাগিল। মুখে সাণ্ডিল্য কথিত নামাবলি,—হৃদয়ে "নীলোৎপলদলশ্যাম" রূপের আভা বাহ্যগতি ধরণীর উপর অভ্যন্তর গতি অনির্দ্দিষ্ট পথে না হইলেও উদ্‌ভ্রান্ত। কালকা চলিতেছে, কিন্তু পদ সঞ্চালন গতির দিক আদৌ লক্ষ্য নাই—যন্ত্র চালিত পুত্তলিকা গমনের সহিত তাহার পূর্ণ সাদৃশ্য। শ্রীভগবান নির্ব্বিকার—নিরাকার হইয়াও যখন সাধকের সুবিধার জন্য সাকাররূপে এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিত্যগোপাল রূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তখন নবীন সাধক ব্যাধ কালকা তাহাকে বৃন্দাবনে পাইবে—ইহা ধ্রুব সত্য। প্রকৃতই ব্যাধ বৃন্দাবনে উপস্থিত।

৫

উৎফুল্লকলনাদিনী স্নিতজলা যমুনাতীরে শ্যাম স্নিগ্ধ পাদপ। তমালতল বিহারিণী লতা হেলিয়া দুলিয়া পর্ণকুটীরের গাত্রে সৌন্দর্য্য সোহাগে বিজড়িত। কুসুম-কুঞ্জ মহিরূহ আশ্রয়ে বাসন্তিউষা প্রভাত বায়ুর সহিত সোহাগে স্বর্ণবর্ণ ছড়াইয়া নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে;—সেই শ্রীধাম বৃন্দাবনে—সেই ভূলোক স্বর্গ পতিতপাবন তীর্থে কালকা উপস্থিত হইয়া হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গাহিল, "হরে নারায়ণ বামন" ইত্যাদি।

আর অমনি শ্রীবৃন্দাবনের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত গাহিয়া উঠিল,—হরে নারায়ণ ইত্যাদি। শ্রীধামের জড় প্রকৃতি যেন কতকটা অবসাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনামে মাতিয়া উঠিল। কালকা উদাস দৃষ্টিতে গাহিতে গাহিতে বৃন্দাবনের প্রত্যেক "কুঞ্জ" ঘুরিতে ঘুরিতে পরিশেষে সেই ভক্ত নয়ন শোভন রাধা-কুঞ্জের একটী নিভৃত কোণে গিয়া দেখিল,—এক বৃদ্ধা আর এক নবীনা পুরী ভাজিতেছে। দূর হইতে একটী হৃদয়মন ভোলান নীলোৎপলদল আভা সেই কামিনীদ্বয়ের গাত্রে আসিয়া লাগিতেছে। কামিনীদ্বয় কার্য্যে ব্যস্ত—কিন্তু তাহাদের ভর্জ্জিত পুরী যে, কত চুরি হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ছায়া, দেখিয়া কালকা স্থির করিল,—এইতো সেই রূপের আভা। এই আভার মধ্যে আরেকটি যে সুমধুর সুশীতল জ্যোতি আছে, সেইটিই তো আমার হৃদয়ে মিশিয়া যাইতেছে। এইবার,—এইবার ধরিব,—শক্ত করে ধরিব। দৃঢ় করে ধরিব। আর আল্‌গা হইতে দিব না,—একেবারে আটকাইব।

মৃদুপদ সঞ্চালনে কালকা ব্রজাঙ্গনা দ্বয়ের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। কামিনী-দ্বয় নিজ কার্য্যেই ব্যস্ত। ভর্জ্জিত পুরী কম পড়িতেছে, তাহা তাহাদের লক্ষ্য নাই। একবার দুইবার তিনবার কানাইয়া লাল পুরি চুরি করিল। এই-বার নবীনা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। চতুরালিতে শিক্ষিত কানাইয়ালাল আবদ্ধ হইলেন,—কালকা এই সময় গোপিনীর হাত হইতে চোরকে দৃঢ়রূপে গ্রেপ্তার করিল। বলিল;—"দুষ্ট চোর এবার ?"

আবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বোধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন.—কালকা বলিল,—চুরি শিখিয়াছ,—তোমার ন্যায় হতভাগা ছোড়া তো জগতে নাই! হরিদ্বার হইতে পালাইয়া এখানে আসিয়া স্ত্রীলোকের সহিত মিশিয়াছ! চুরি শিখিয়া পেট ভরিতেছ,—জুয়াচোর,—পিতার প্রতি দৃষ্টি নাই—ব্রাহ্মণের ছেলে আহার বিহারে সংযম নাই। গোপের পুরী প্রাতঃকালেই খাইতেছ! এবার পালাতে পাবে না। আমি এবার তোমাকে সাণ্ডিল্য আশ্রমে লইবই লইব।"

কানাইয়ালাল কহিলেন,—"তুমি বারে বারে বলিতেছ, পিতা আমাকে ডাকিতে-ছেন—আমি বলিতেছি না—তথাপি আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে! কি করি বাপু, তোমার সহিত পারিলাম না,—যা তোমার ইচ্ছা কর! শ্রীহরি অবনত হইলে কালকা তাহাকে বস্ত্রদ্বারা নিজের পৃষ্ঠের সহিত বান্ধিল। আহ্লাদে গাহিতে গাহিতে চলিল। "হরে নারায়ণ বামন" ইত্যাদি।

জানিনা—কি শক্তিতে শ্রীহরিস্কন্ধ ব্যাধ মুহূর্ত্ত মধ্যে ঋষির নিকট উপস্থিত হইল। সাণ্ডিল্য সেই স্থানে এক আসনে যে কত কাল আছেন, তাহা তিনি আর তাহার পুত্র ব্যতীত অপরে জানিত না। ব্যাধ উপস্থিত হইয়া কহিল,—"এই লও গুরুদেব তোমার পুত্র, আমায় অভয় দাও, আমি তোমার ছেলে এনে দেব বলিয়া ছিলাম, এই এনেছি লও।"

ঋষি সাণ্ডিল্য ধ্যান-স্তিমিত মুর্ত্তি ত্যাগ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ব্যাধ কালকা দূরে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, আর পৃষ্ঠের আবদ্ধ বন্ধন খুলিতেছে। সাণ্ডিল্য কহিলেন,—"কই কালকা আমার পুত্র কই ?" উত্তর হইল—"এই তো গুরুদেব ?" এই সময় ব্যাধ বন্ধন মুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সাণ্ডিল্যের বাহ্য চক্ষুর নিকটে রাখিয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইল। কিছু পরে বলিল,—বা রে ছেলে! যদিও বহুদিন পরে বাপের কাছে এলে,—কথা বল্‌ছনা কেন ?—এই সময় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"দাদা! আমিতো নিরতই বাবাকে ডাকৃছি, এমন মুহূর্ত্ত নাই যে, আমি ডাকি না,—প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে উত্তর দিচ্ছি, বাবাই আমাকে ডাক্‌ছেন না,—অথবা ডাকের সুর বা ভাব বুঝিতে পারিতেছি না!"

শ্রীকৃষ্ণের এই গভীরভাব ব্যাঞ্জক কথা কালকা কিছু বুঝিল না,—মাত্র বলিল,—"ওসকল বহুরূপীর ভাষা ছাড়, ডাকিয়া কাছে যাও।"

ঋষি এই সময় একেবারে স্তম্ভিত, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত,—হৃদয় মস্তিষ্ক অবনমিত। চিন্তার আবেগে মস্তিষ্ক যন্ত্রে পরিচালিত হইয়া—সাণ্ডিল্যের ব্রহ্ম প্রাপ্তির আশা-মুগ্ধ বুদ্ধিকে একেবারে বিপর্য্যয় করিয়া দিয়াছে! সাক্ষাৎ শ্রীভগবান তাহার সম্মুখে মহাএকাগ্র ব্যাধ তাহার সাকার মূর্ত্তি প্রকৃতই ধরিয়া আনিয়াছে, জানিয়া ব্রাহ্মণ মানব চিন্তার অতীত চিন্তায় আবেশিত হইয়াছেন।

সহসা একটা উজ্জ্বল জ্যোতি ব্রাহ্মণের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। ঋষি দেখিলেন—অসীমবিশ্ব—সসীমে আসিয়া তাহার যোগযুক্ত হৃদয় দর্পণে এক শ্যাম শীতল জ্যোতিকে স্থির ভাবে অন্তর বাহির ব্যাপিয়া ফুটাইয়া দিয়াছে। অমনি সাণ্ডিল্যের নয়ন প্রান্তে অজস্র অশ্রুপাত হইতে লাগিল। হৃদয়ে কিন্তু সেই শ্যাম শীতল জ্যোতির এক অভূতপূর্ব্ব—আনন্দ জাগিয়া উঠিল। বাহ্যশূন্য ব্রাহ্মণ সেই আনন্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ছায়া মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন,—"শিষ্য! (অন্তরে বলিলেন গুরু) তুমি যাহাকে ধরিয়া আনিয়াছ,—তাঁহার দেখা আমি পাইতেছি না—আমার কিন্তু শরীরের স্বাভাবিক শোণিত স্রাব রোধ হইয়া আসিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া বাহ্য-মুগ্ধ কালকা বলিল,—কি হিজি বিজি বলিতেছেন? আপনার পুত্র আপনার সম্মুখে দাঁড়ায়ে দেখিতেছেন না? আর এই ছেলেই বা আপনার সহিত কথা বলেনা কেন? আমিতো আপনাদের—পিতা পুত্রের এ ভেল্‌কী বুঝিতে পারিতেছি না। যাওনা ছোক্‌রা তোমার বাপের গলা জড়ায়ে ধরগা—বৃদ্ধ মানুষ, বহুদিন তোমার অদর্শনে কেন্দে কেন্দে অন্ধ হইয়া গিয়াছেন।"

সরল সাধক ব্যাধের মুক্ত আলাপে মুক্তির ধন শ্রীকৃষ্ণ আর লীলাচাতুর্য্য প্রহেলিকা না করিয়াই কহিলেন,—"দাদা! সত্যই বাবা অন্ধ হইয়াছেন,—এ পথের অনেক পথিকই এইরূপ অন্ধ-বিশ্বাসে মুগ্ধ। আমি এত নিকটে থাকিতে আমাকে দূরে ভাবিতেছেন! আচ্ছা, পিতা তোমার দক্ষিণ অঙ্গস্পর্শ করিয়া একবার চাহিয়া দেখুন দেখি?

আ-একেই বলে দয়াল হরি—একেই বলে কাঙ্গালের ঠাকুর—প্রাণের সঙ্গে একাগ্র হইয়া একবার ডাকিলেই যাহাকে পাওয়া যায়,—তাঁহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল না হইবে কেন? সাধু সংসর্গ ভিন্ন প্রাণের মাঝে প্রাণময়ের দর্শন বাসনা এবং প্রাপ্তি সংঘটন হয় না। এই জন্যই সাধ্যবস্তু আপনিই সাধনার অঙ্গ দর্শাইয়া

থাকেন। এই দর্শনেই মহা দর্শনের সরল সহজ পন্থা। তাই ব্রাহ্মণ সাধককে সরল সাধকের অঙ্গস্পর্শ করিতে আদেশ দিলেন।

সুশিক্ষিত সাধক সাণ্ডিল্য বুঝিলেন, সাধু সংসর্গ ভিন্ন আমার ন্যায় একাগ্রতা বিহীন মনুষ্য ভগবান দর্শন করিতে পারে না। তাই তিনি কালকার দক্ষিণাঙ্গ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইলেন। আর অমনি দেখিলেন,—তাঁহার হৃদয়ের সেই শ্যাম শীতল জ্যোতি যেন অঙ্গপরিগ্রহ করিয়া মুরলিমুখে ত্রিভঙ্গ—ভঙ্গিমে শিখিপুচ্ছ শিরে হেলাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

ঋষি যুক্তকরে ভূমে জানু পাতিয়া আবেগ কণ্ঠে গাইলেন,—

জয় নিত্য নির্ব্বাকার—
সত্য সুবিমল মুকুন্দ মাধব হরে,
জয় নিত্য নিরঞ্জন,
সত্য সনাতন,
কেশব বাসব মুরারে।
জয় জগদীশ,
তার ভব পাশ,
শ্রীনাথ শ্রীপতি কংশারে।
নমামি নরোত্তম
হে নিত্য নিরুপম
বিতর করুণা কিঙ্করে।*

ঋষি আর গাহিতে পারিল না,—কণ্ঠ জড়িত হইল। নেত্র জ্যোতিহীন হইল। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইল,—দেহ ভূমিতলে লুটিয়া পড়িল। তাহার ব্রাহ্মণ শরীরের সমস্ত জ্যোতিঃ পরমজ্যোতিতে মিশিয়া গেল। মাটির শরীর মাটিতে পড়িয়া রহিল।

কালকা এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইল। তখনো তাহার হৃদয় পরিষ্কার হয় নাই। বলিল, "ওহে ছোক্‌রা একি ব্যাপার,—ঠাকুর তোমাকে দেখিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন? প্রকৃতই উনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তোমার এই ভেল্‌কীর এই যাদুগিরির ভাবটা আমায় বুঝাইয়া দেও দেখি।"

নারায়ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"শোন আমার একনিষ্ঠ সাধক শোন,—আমি কে কেন সর্ব্বত্র বেড়াই, কি জন্য তুমি আমাকে ধরিয়া আনিয়া এই ব্রাহ্মণের চির

* দেশমল্লার—কাওয়ালি।

উপকার করিলে,—এই সকল জানিতে চাহিলে তুমি এই ব্রাহ্মণের নিকট যে, মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলে, তাহা একবার অনন্যমনস্ক হইয়া হৃদয়ে জপকর,—আর আমাকে ডাকিবার ন্যায় এবং ধরিবার ন্যায় একাগ্রতা সঙ্গে আমার মুর্ত্তি ধ্যান কর, দেখিবে আমি কে?"

কালকা অবিকল তাহাই করিল,—আর অমনি আত্মানুলম্বিত হইয়া বলিল—"তুমি তাই" আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—যাও সাধক! তোমার চির দিনে স্বভাব সিদ্ধ "একাগ্রতা" বলে, জগতের লোকের নিকট "ব্রহ্ম লাভের মহা মন্ত্র" শিক্ষা দিতে যাও, আমি চলিলাম,—বুঝিলেতো আমি কে? তুমি চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা মহা সাধক,—মহা তপস্বী, তোমার শিক্ষায়, আমাতে আর জগতে অভিন্ন হইয়া যাইবে। আমাকে লাভের মহা উপায় "একাগ্রতা!"

অতীত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রসময় লাহা।

১

ভুলিবে কি তুমি সে সুখের রাতি—
প্রেমকুঞ্জে যার দিয়েছি সমাধি?
যার হিম দেহ রেখেছি চাপিয়ে
মাটির বদলে ফুল পাতা দিয়ে!
ফুলগুলি সেই অতীত হরষ
পাতাগুলি এই বাসনা সরস।

২

সে অতীত তুমি ভুলিবে কি হায়—
নিতে প্রতিশোধ প্রেতাত্মা হোথায়!
রাজে স্মৃতিচয় মানস মন্দিরে
ধীরে বহে শোক হৃদয় তিমিরে!
কি ভীষণ মুখে কহে মন্দ মন্দ
দুঃখে পরিণত অতীত আনন্দ।

মানস নূপুর।

ঐশ্বর্য্যশালী যদি ধন পায়, আর দরিদ্র ব্যক্তি যদি ধন পায়, বেশী আদর যত্ন দরিদ্রই করিয়া থাকে, দরিদ্রের ধনে—আর ধনবানের ধনে এইমাত্র প্রভেদ; যেমন চক্ষুষ্মানের লাঠি, আর অন্ধের লাঠি, যিনি অন্ধ নহেন, খঞ্জ নহেন, ক্ষমতাশালী, তাঁহার লাঠি কেবল হাত সাজান সখের জন্য, কিন্তু যাঁর দুটী চক্ষু অন্ধ, তাঁর নিকট লাঠি বড়ই আদরের বস্তু, সদা মনে,—"হারাই হারাই" তাই প্রচলিত কথায় বলে,"অন্ধের নড়ি" আর "দরিদ্রের ধন" সদা হারাইবার ভয় থাকে। তাই সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন,—"দরিদ্র পাইলে ধন সেকি অন্ধের কাছে রাখে?"

দরিদ্রের ধন পাওয়া যে, কি সুখ, তাহা সেই বলিতে পারে। তাই একটী জীবনকাহিনী আজ এই ক্ষুদ্র গল্পচ্ছলে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহার নাম দিলাম "মানস নূপুর"। যদি কেহ কখনও আমার মানস নূপুরধ্বনি শুনিতে ইচ্ছুক হন ও দরিদ্রের সুখে সুখ অনুভব করেন, তবেই ইহার সার্থকতা। আমার ক্ষুদ্র কুটীর খানি দেখিলেই লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে, ইহা দরিদ্রের কুটীর।—সেই কুটীর মধ্যে আছি একমাত্র আমি সর্ব্বদা আপন চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। ২৫ বৎসর কুটীরবাসী হইয়া আছি, এই সময় আমার পূর্ব্ব জন্মের সৌভাগ্য ক্রমে এক দেব মূর্ত্তি হঠাৎ অযাচিত অনুগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার দেহখানি শ্বেতবর্ণ, শ্বেত বস্ত্র, শ্বেত চন্দন ও শ্বেত মালা দ্বারা সুশোভিত। কৃপা-মকর-ন্দান্বিত পদ পঙ্কজং। তিনি জলদগম্ভীর ও স্নিগ্ধ স্নেহাসিক্ত স্বরে আমায় বলিলেন, "কেন বৃথা ধনের চিন্তায় কাল কাটাইতেছিস্ তোর নিজ কুটীরে তোর অজানিত মহারত্ন মৃত্তিকা নিম্নে রহিয়াছে—উহা উদ্ধার করিয়া, রত্নের যত্ন কর, কোন অভাব থাকিবে না।" আমি বলিলাম, "বাবা!" আমি অসহায়, অস্ত্র কোথায় পাইব, যে, সেই রত্ন উদ্ধার করিব?" তিনি বলিলেন, "তোর কুটীর মধ্যে বিবেক নামে একটী অযত্নে রক্ষিত মহাস্ত্র আছে, তাহা তুই দেখিয়াও দেখিস্ না, জানিয়াও ব্যবহারের চেষ্টা একদিনের জন্য করিস্ নাই, এখন তাহা অযত্নে মৃত্তিকা মাখা হয়ে বিনা ব্যবহারে কার্য্যাক্ষম শক্তি নষ্ট হইতেছে। তোকে সেই সন্ধান দিতে আসিয়াছি,—এই যে দুইটী হ্রদ তোমার নিকটে রহিয়াছে, একটীর অবিরত ঢেউ খেলিতেছে, কদাচ উহাতে নামিওনা, আকর্ষণে পঙ্কিল গর্ত্ত মধ্যে পড়িবে, উহার নাম "প্রবৃত্তি"। অপর যেটী দেখিতেছ, সচ্ছ নির্ম্মল জল স্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়া আছে, উহার নাম "নিবৃত্তি"। ঐ জলে বিবেক অস্ত্র ধৌত কর, অভ্যাস

নামে প্রস্তর খানিতে অস্ত্র সানাইয়া লইয়া কার্য্যে তৎপর হও, রত্নের উদ্দেশ ও পাইবার সন্ধান বলিয়া দিলাম, রত্ন লাভ করিস না করিস, আমি তো বলিলাম, এখন মন তোর।" এই মন তোর, শব্দটী আমি মহামন্ত্র বলিয়া জানিলাম, তখন অন্ধকার মধ্যে পতিত রত্নের উদ্ধারের পথ প্রদর্শক যিনি তাঁহাকে কোটী কোটী প্রণাম করিলাম। অজ্ঞান তিমিরান্ধ আমাকে যিনি জ্ঞান চক্ষু দান করিলেন, সেই জ্ঞান দাতা পিতাকে প্রণাম করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। শুভ্রবর্ণ সর্ব্ব-দেবময় পিতার কৃপায় লুপ্তধন প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু আমি নিজে দরিদ্র, রত্নের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। দেখিলাম রত্নে অনেক ময়লা মাটি; এখন খাঁটি করিবার উপায় কি, না পোড়াইলে সোণা খাঁটি হয় না, ইহা আমার জানা ছিল, কিন্তু অগ্নি অভাবে তাহা কি প্রকারে হয়!—দৈব কৃপা বলে আমার সুদিন আসিল,—তিন রূপেই অগ্নি আমার সহায় হইলেন। সাধারণতঃ অগ্নি তিনটী নামে তিন স্থলে অবস্থান করেন,—বনে দাবানল,—সমুদ্রে বাড়বানল, গৃহে গৃহে অনল নামে খ্যাত; এস্থলে আমি পূর্ব্ব ঘটনা একটি বলিয়া রাখি;—আমার ক্ষুদ্র কুটির খানি লোকালয়ে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে আমি একটি গুহা মধ্যে একাধি-ক্রমে দশ মাস চক্ষু মুদে, জোড় হাত করে, একটি মহাযোগীর ন্যায় ধ্যানে মগ্ন ছিলাম, দশমাস গত হইলে চক্ষু মেলিয়া অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় একজন বিরাট পুরুষকে দেখিতে পাইলাম, আমি ভয়ে জড়বৎ হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি,—বিরাট পুরুষ অন্তর্হিত হইয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে একটি আমার ন্যায় আকার একজন মনুষ্য মূর্ত্তি অতি মধুর হাস্য করিতেছেন ও আমাকে ভীত দেখিয়া অভয় দিয়া বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই আমি সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করিতেছি। তোমার সময় উপস্থিত, শীঘ্র কর্ম্মক্ষেত্রে উদিত হও। আমি তথায় তোমার আহারের জন্য যোগীর ভক্ষণীয় যাহা সেই অমৃত দুটি অক্ষয় ভাণ্ডে পূর্ণ রাখিয়াছি, তাহাই তোমার আহারের জন্য পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত করিয়াছি, এই উদ্ধ দেশ হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া যাও।"

আমি তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যে আশ্বস্ত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই-লাম; "হে প্রভো চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আপনি কে? আমার আহারের জন্য চিন্তা করিয়া যাহা পূর্ব্ব হইতে সঞ্চয় রাখিয়াছেন, আপনার পরিচয় দানে চিরকৃতার্থ করুন,—তিনি সেইমত ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"আমি ত্রিলোকের সর্ব্বপ্রাণির জন্য এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকি, তাই লোকে আমায় চিন্তামণি বলিয়া থাকে—আমার নাম ত্রিলোক সখা শ্রীকৃষ্ণ—

তুমি আত্মা আমি পরমাত্মা দশমাস একযোগে ছিলে,—তোমার নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত, সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র শীঘ্র অগ্রসর হও, আমায় ভুলনা,—তিনি অযাচিত কৃপা পূর্ব্বক বলিলেন,—আর একটি মূর্ত্তি চিনিয়া রাখ, এই বলিয়া অতি অপরূপ একটি মূর্ত্তি আমায় দেখাইয়াছিলেন, অতি অপরূপ শ্রীমূর্ত্তি কটিতটে পীতধড়া মস্তকে মোহন চূড়া চরণের উপর চরণ দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়াইয়া হাস্ত করিতে করিতে অতি মধুময় বাক্যে বলিলেন, "দেখ দেখ চিনে রাখ, আমি তোমার কৃষ্ণ সখা। যদি কখনও ভয় পেয়ে কাতর হয়ে আমায় ডাক, এই মূর্ত্তি দেখা পাবে, সহসা তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন; সেই মুহূর্ত্তে আমিও এক অজানা দেশে কুটীর মধ্যে চলিলাম, কৃষ্ণ সখার অদর্শনে আর্ত্তনাদে করুণ স্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম, অমনি সখা দত্ত অমৃত আমার মুখে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম—আহারে এমনি তৃপ্ত হইলাম যে, ক্রমে ক্রমে সখাকেও বিস্মৃত হইলাম। ২৫ বৎসর এই ভাবে কাটিল,—গুপ্ত ধনের সন্ধান দাতা পিতার দর্শনে ও গুপ্তধনের উদ্ধারে সহসা কৃষ্ণ সখার স্মৃতি মনে হইল। তখন বিচ্ছেদ যাতনা অসহ্য হইতে লাগিল—প্রাণ সখার বিচ্ছেদে অবসন্ন হইলাম—পাগলের মত হইলাম—লোকে বলে ধন পাইলে পাগল হয়, আমারও কি তাই হইল,—ভাবিলাম, গৃহে কি কার্য্য, বনে যাই, যদি সখার দেখা পাই,—সখার মাথায় ময়ুর পাখা দেখিয়াছি,—গলে বন ফুলের মালা, সখা—আমার নিশ্চয়ই বনে থাকেন,—এই বন চিন্তা করিতে করিতে সখার বিচ্ছেদানল—দাবানলে পরিণত হইল—পেয়ে হারাইয়াছি, এই শোকে অধৈর্য্য হয়ে—শোক সমুদ্রে এখন বাড়বানল দেখা দিল,—আর ক্ষুদ্র কুটীরে নানা দুঃখ হতাস আঘাতে সর্ব্বদা দুঃখানল অনলরূপে জ্বলিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তিন মূর্ত্তি অনল মূর্ত্তিমান হইয়াছে,—দেখিয়া ময়লা সোণাকে ৫ বৎসর ধরিয়া দগ্ধ করিলাম, মাটি ঘুচে সোনা খাঁটি হইল, এখন দরিদ্র কুটীরে রত্ন কি উপায়ে রক্ষা করিব, দস্যুর বড় ভয়, সহসা দেখি, আমার কুটীর মধ্যে ছয় জন দস্যু প্রবেশ করিয়াছে ও আমার এত কষ্টে উদ্ধারিকৃত স্বর্ণের উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে, এখন উপায় কি, আমি একলা, অসহায়, আর ছয় জন দস্যু, কি করে ধন রক্ষা করি—এই ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সখা দেখা দাও, বলিয়া ডাকি ও ভয়ে কাঁদি, সখা আমার এমনি দয়াময়, তৎক্ষণাৎ দরিদ্র কুটিরে আসিয়া দর্শন দিলেন, তাঁর রূপে অন্ধকার কুটির আলো হইল,—দস্যুগণ ভয়ে লুকাইল, তখন সখা আমায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এতদিন পরে কাতর হয়ে ডাকিতে পারিয়াছ, বড় ভয় পেয়েছিলে,—আর তোমায় কোন ভাবনা নাই, যে, আমায়

সখা বলে ডাকে,—আমি তাকে সখা বলে, আদর করে অভয় দিয়া থাকি। আমি আনন্দে একবারে আত্মহারা হইলাম ও সখার চরণে স্মরণ লইলাম। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, কারণ সখাটি আমার বড় চঞ্চল, সে কি মন্ত্র জানে,—এই আছে এই নাই। যদি কখনও অন্তর্হিত হন, তা হলে আমার স্বর্ণ টুকরা কে রক্ষা করবে, অতএব ইহা সখাকে অর্পণ করে, চিরনিশ্চিন্ত হইব। যদিও সখা আমাকে ত্যাগ কখনও করেন, কিন্তু আমার প্রদত্ত রত্ন উহাঁতে সংলগ্ন থাকিয়ে ছাড়িতে পারিবেন না।

এই ভাবিয়া সেই স্বর্ণে একটি অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইবে, ঠিক করিলাম। কিন্তু সামান্য স্বর্ণ সখার আমার সর্ব্বাঙ্গে তো সাজান হইবে না, যে স্থানে হউক এক অঙ্গে ভিন্ন অধিক হইবে না, সে জন্য অঙ্গের মধ্যে উত্তম অঙ্গ যাহাকে বলে, সেই অঙ্গে অলঙ্কার দিতে হইবে,—সাধারণতঃ উত্তম অঙ্গ মস্তক, কিন্তু সখার সকলি অন্যরূপ লোকে বলে, তাঁর মস্তক অপেক্ষা চরণের গুণ অধিক, তাঁর না কি চরণ উত্তম আর তাঁর প্রেয়সী গোপীগণ বৃন্দাবনে আছেন, প্রধানা প্রেয়সী মান করিলে চরণে মস্তক বিক্রিত করিয়া মান ভঙ্গ করেন, মোহন চূড়া চরণে অর্পণ করেন, এই তো তাঁর মস্তকের অবস্থা ভাবিলাম, অলঙ্কারের অবস্থা সেইরূপ হইবে, পর অধিকারে ধন থাকিলে তাহা কখন আছে, কখন নাই, তবে ত আমার সখাকে চূড়া দিয়ে সাজান হইল না, তবে কি কর্ণের মকর কুণ্ডল করিব; না তাহাতেও নিশ্চিন্ত নাই, তার কারণ শুনেছি, তিনি না কি, ভক্তের নিকট চির পরাজিত, কিন্তু সখাটি আমার বড় কপটি, তিনি যেন শুনেও শুনতে পান না, ভক্তগণ, যখন ডাকেন, তখন উত্তর প্রথমে দেন না, ভক্তের জোর বেশী কি জানি কে কখন ক্রোধে অধির হয়ে বলবে যে কানে সোণা পরেছ, তাই শুনতে পাচ্ছনা, এই বলিয়া তাহা কর্ণ হইতে কাড়িয়া ফেলিবে। ভক্তের জোর বেশী তাই ভয়, তবে কি গলার হার করিলে আর কোন ভয় থাকিবে না, কিন্তু দেখিতেছি, তাহাতেও নিশ্চিন্ত নাই—কারণ হার তো বক্ষের শোভা বর্দ্ধন করে, কিন্তু আমার সখার বক্ষটি সর্ব্বদাই মুনি ঋষিদের ইচ্ছামত ব্যবহার স্থল, একবার না কি ভৃগুমুনি ক্রোধ পরীক্ষার জন্য অতিশয় শক্তির সহিত বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করেছিলেন, অদ্যাবধি মুনির মান বাড়াইতে পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। কি জানি সেই চিহ্ন দেখে আবার কোন মুনি কোন দিন কি করিবে, সেখানে রত্নের স্থান নহে, তাই সখা আমার বিনা মূল্যের বন ফুলের মালা, বক্ষের শোভার জন্য ধারণ করিয়া থাকেন—হাতের গহনা তাহাতেও তো বিপদ শূন্য নহে, কারণ

তিনি নাকি বৃন্দাবনে গোপীদের ঘরে ননী চুরি করে খাইয়া ছুটি করে বাঁধা থাকেন,—যদি কঠিন বন্ধনে হস্তের অলঙ্কার স্থান ভ্রষ্ট হয়, সে জন্ত নিশ্চিন্ত হইবার উপায় দেখিতেছি না, একটি জিনিষ সখা আমার বড় ভাল বাসিয়া তাহা ব্যবহার করেন, সেটি মোহন মুরুলিই তাহা কি স্বর্ণে বাঁধাইয়া দিব কিন্তু তাহাতে বিশেষ ভয়ের কারণ বিগুমান আছে,—আমার সখাটি বড় রহস্তপ্রিয় তিনি কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করে, সুমধুর বংশীর ধ্বনি করেন, তাহাতে ব্রজ গোপীগণের মন চুরি করা বিগা আছে,—আর কুল বধূর নাম ধরে বংশীধ্বনি করেন, তাহাদিগকে মনে আকর্ষণ করেন, এই জন্ত ভয় পাছে কেহ ক্রোধে সখার বাঁশীটি কাড়িয়া লয়, তখন আর আমি তাঁর ক্ষুদ্র সখা কি করিতে পারি, কি করিব? কোন অঙ্গে অলঙ্কার দিয়া সাজাইলে আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না, রত্নেরও সার্থকতা হয়, আমিও চির নিশ্চিন্ত হইতে পারি, বাকি—কেবল চরণ যুগল।

শুনেছি তাঁর মস্তক হতে চরণের মহিমা অধিক, আর আমার কৃষ্ণ সখার অপেক্ষা তাঁর নাম বড়। তাঁর চরণের পরশে পাষাণ মানবী হয়, কাষ্ঠ তরী স্বর্ণ হয় গয়াস্থরের মস্তকে পাদপদ্ম দিয়ে তাঁকে কৃতার্থ করেছিলেন ও অগ্যাবধি সেই চরণে পিণ্ডপাইয়া জীবগণ পরমগতি লাভ করে থাকে। হরিপাদপদ্মে তরঙ্গিনী —গঙ্গে পতিতপাবনী নামে ত্রিলোকে তাঁর চরণের মহিমা গাহিয়া কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন—চরণের গুণ বর্ণনায় কেহ সমর্থ নহেন। যোগীর যোগী, দেবের দেব, মহাদেব চরণের গুণ জানেন,—আর নামের গুণও তিনিই জানেন.— আর সত্যভামার ব্রতচ্ছলে নাকি—নাম মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। দেখিলাম যে, সর্ব্বত্যাগ করে, তাঁর চরণ যুগলকে সার করে, তার আর ত্রিলোকে কোন অভাব থাকেনা। তাই বড় সাধ এক জোড়া নূপুর গড়িয়া অভয় চরণে পরাইয়া সমন ভয়ে নিশ্চিন্ত হই,—দশ ইন্দ্রিয় অস্ত্র হইল,—সংযম অগ্নির তাপে ও সখ্যভাব টুকুর সোহাগাতে গলাইয়া সরলতার ছাঁচে ঢালা হইল ও অনুরাগ রসান দিয়া রং করিয়া নূপুর জোড়াটি বড়ই সুন্দর হইল। মন সোণা পুড়িয়া খাঁটি হইয়া নূপুরে পরিণত হইল,—যিনি দুর্য্যোধনের ধন,—রত্নাদি দ্বারা পূজার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অর্জ্জুন সখার সারথী হইয়াছিলেন, বৃন্দাবনে শ্রীদামাদি সখাগণের উচ্ছিষ্ট ফল অতি আগ্রহে ভক্ষণ করিতেন, সুদাম সখা দরিদ্র ব্রাহ্মণ—কেবল মাত্র খুদ্ কণা তাঁর পুঁজি—অতি আনন্দে তণ্ডুলের খুদ্ কণা যিনিভোজন করিয়াছিলেন,— সেই সখা বৎসল হরি এখন দয়া করে, আমার মন সোণার নূপুর চরণে রাখিলেই ধন্ত হই, যখন তাঁর চরণে নূপুর পরাইয়া চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হইব তখন

নূপুরকে তিনি ছাড়িতে চাহিলেও নূপুর তাঁর চরণ ছাড়িবেনা। তখন সে বলিবে—

"ধীরে ধীরে যাওহে সখা আমি তোমার সঙ্গে যাব।
চরণে নূপুর হয়ে গমনে সুখে বাজিব"—

যোগ্য পাত্রকে প্রাণের জিনিসটি উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। এখন আমার মরিতেও আর ভাবনা নাই—শান্তি সুখ অনুভব করিতেছি। আর শ্রোতা ও পাঠকগণ আপনারাও দরিদ্রের ধনের গতি কি হইল? দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া দরিদ্রবর্দ্ধকে ধন্যবাদ দেন, ইহাই প্রার্থনা।

ইতি ক্ষুদ্রাদপী ক্ষুদ্র—
জনৈক ক্ষণঃস্থায়ী।

সমালোচনা।

প্রাচীন ভারত।—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। সুরভি সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক ঢাকা হইতে প্রকাশিত। জগৎ আর্ট প্রেসে শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত, ২৬ নং বেচারাম দেওয়ারি ঢাকা। ইহাতে ভারত-মহিমা ভারতবিবরণ, হিরওটাস, টিসিয়াস আলেকজন্দরীয় যুগ, মেগাস্থিনিস্ প্লীনি, ভারত বাণিজ্য, ষ্ট্রাবো, টলেমি, বৈদেশিক সাহিত্যে—ভারতবর্ষ, ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, হিউয়েন্থসঙ্গ, কাশ্মীর ও পঞ্জাব, আর্য্যাবর্ত্ত, বৌদ্ধ তীর্থ—মগধ সাম্রাজ্য, দুইটী রাজ্য, বঙ্গদেশ, উড়িয়া ও গঞ্জাম, দক্ষিণে ভারত, সিন্ধুদেশ, ভারতীয় সভ্যতা আই ও সঙ্গ, আরব্য বিবরণী,—অলবেরুণী এবং উপসংহার এই কয়েকটী পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে একটী সুললিত কবিতায় ভারত মাতা বন্দিত হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতের গৌরব গরিমা গুপ্ত মহাশয়ের আবেগময়ী ভাষায় সর্ব্বত্র সুপ্রকটিত। রামপ্রাণ বাবু এক জন বঙ্গের সুপ্রতিষ্ঠিত সুলেখক, প্রাচীন ভারতে তাঁহার ঐতিহাসিক প্রতিভা অসাধারণ সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। লেখকের ঐতিহাসিক তথ্য লিখিবার বেশ হাত আছে। পুস্তক খানি লেখার গুণে পাঠকের মনকে মাতাইয়া তুলিতে সক্ষম। ভাষা প্রাঞ্জল ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ত। বঙ্গবাসী মাত্রেই ইহা পাঠ করা উচিত। আমাদের অনুরোধ গুপ্ত মহাশয়ের প্রাচীন ভারতে বারান্তরে যেন ষড়্দর্শন সম্বন্ধে কিছু দেখিতে পাই। ছাপা কাগজ বাঁধান অতি সুন্দর।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত।



"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী

২২শ বর্ষ। } ১৩২১ সাল, চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা।

স্মৃতিচিহ্ন।

পৃথিবীতে নিত্য নিত্য কত শিশু জন্মিতেছে, নিত্য নিত্য কত নরনারী কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, কে তাহা গণনা করিতে চায়? কেহই চায় না। সাধারণ জন্ম মৃত্যুর সংবাদই বা কে রাখে? কেহই রাখে না। তবে বিশেষত্বের মধ্যে এই যে, দেশের মধ্যে যাঁহারা ধনে মানে গুণে খ্যাত বলিয়া গণ্য, সংবাদ-পত্রে তাঁহাদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হয়, পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাহাও হইত না, ইংরাজী সংবাদপত্রের পদ্ধতি দেখিয়া সেই অনুকরণে আজকাল এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রে বড় লোকের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হইতেছে। সাধারণ ঘোষণাও নয়, ইংরাজী অনুকরণে শোক সংবাদের চারিধারে মোটা মোটা কৃষ্ণ রেখা অঙ্কিত হইতেছে। কৃষ্ণবর্ণটি পাশ্চাত্য জাতির শোকচিহ্ন প্রকাশক। পরিবারের মধ্যে কোন লোকের মৃত্যু হইলে—বিশেষতঃ মাতৃ পিতৃ বিয়োগ হইলে পাশ্চাত্য

লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করেন, তাঁহাদের মতে কৃষ্ণ বসনের নাম শোক বসন। বাঙ্গালিরা শোক সংবাদের চারি ধারে কৃষ্ণ রেখা দিয়া সংবাদ পত্র উজ্জ্বল করেন, কিন্তু পিতৃ মাতৃ বিয়োগে গলায় কাছা না দিয়া কৃষ্ণ বসন পরিধান করেন না। অধুনা যে প্রকার অনুকরণের ধূম তাহাতে বোধ হয়, কিছুদিন পরে তাহাও আরম্ভ হইবে। মূল প্রসঙ্গ হইতে আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি ; এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। সংবাদপত্রে বড় লোকের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়, কেবল তাহাই আজকাল পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। সাহেবেরা আমাদিগকে সভা করিতে শিখাইয়াছেন, কোন একটা উপলক্ষ পাইলেই স্থানে স্থানে সভা করা হয়, কোন দেশ প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইলে, শত শত শিক্ষিত বাঙ্গালী একত্র হইয়া সভা করেন। সভা হয় কিসের জন্য ? দশজনে মিলিয়া বক্তৃতা করিয়া কাঁদিবার জন্য, আর মৃত ব্যক্তির আত্মার মঙ্গল কামনায় তাঁহার পরিবারবর্গের নিকটে সান্ত্বনা সূচক সহানুভূতি প্রেরণের জন্য।

বেশ কথা।—ঘরে বসিয়া একা একা কাঁদিলে অন্য লোকে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায়না, দশজনে এক জায়গায় একত্র হইয়া কাঁদিলে শ্রোতা লোকেরাও শোকচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, অনেকটা আরাম আছে। রীতিটা মন্দ নয়। একদিকে খবরের কাগজ, অন্যদিকে শোক সভা। ইহাই কি যথেষ্ট ? তাহা কি কখন হইতে পারে ? সভ্য সমাজে কোন বড়লোকের মৃত্যু হইলে সভ্য লোকেরা শোকসভা করিয়া মৃত ব্যক্তির স্মরণ চিহ্ন রাখিবার ব্যবস্থা স্থির করেন, অবস্থা বিশেষে প্রস্তরময়ী প্রতিমা অথবা পূর্ণ অবয়বের চিত্রপট ব্যবস্থা হয়, সেই সভাতেই চাঁদা স্বাক্ষর ও চাঁদা সংগ্রহ হইয়া থাকে। আমরা এখন শোকসভা করিতে শিখিয়াছি, বক্তৃতার ছন্দে বন্দে কাঁদিতেও শিখিয়াছি, তবে স্মরণ চিহ্ন রাখিবার অঙ্গটা ছাড়িব কেন ? আমরা সভ্য হইতেছি, সভ্য লোকের অনুকরণে সকল অঙ্গ বজায় রাখিলেই সভ্য নামের গৌরব বাড়িবে, তাই এখন প্রত্যেক শোকসভায় লোকান্তর্গত পুরুষের স্মরণ চিহ্ন রাখিবার প্রস্তাব হয়, অনুমোদন হয়, তর্ক হয়, মঞ্জুর হয়, চাঁদার খাতায় দস্তখত হয়, তাহার পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

ফল হয় কিরূপ ? প্রস্তাব থাকে, কাহার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তর মূর্ত্তি, কাহার অর্দ্ধাঙ্গ, কাহার বা কেবল মুখ খানি স্থাপন করা, কাহার বা পূর্ণাবয়বের ছবি ঝুলাইয়া দেওয়া। প্রস্তাবও এই রকম হয়, কতক কতক চাঁদাও উঠিয়া যায়, কিন্তু শেষকালে

দাঁড়ায় কি? আমরা ত তাহা ঠিক স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রমাণ স্বরূপ ঠন্‌ঠনীয়ার চৌমাথার উপর স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের একটি শ্বেত প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বারাণ্ডায় স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের অর্দ্ধ মূর্ত্তি, বিডন বাগানের মধ্যস্থলে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পূর্ণমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি পটল ডাঙ্গার গোলদীঘির তীরভূমিতে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্ত্তি বসিয়াছে, ইহা ভিন্ন কতিপয় মান্য গণ্য ব্যক্তির এক এক খানি তৈলচিত্র আছে, এই পর্য্যন্ত আমরা অবগত আছি, অপরাপর শোকসভার চাঁদায় যত টাকা স্বাক্ষরিত হইতেছে, তাহা কিরূপ ব্যবহার হইতেছে, এখনও পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত সংবাদ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

অনুষ্ঠান ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়া যদি বিচার করা করা যায়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, উদ্দেশ্যটি ভাল, কিন্তু আমাদের মতের সহিত বর্ত্তমান অনুষ্ঠান পদ্ধতির অনুকূল পক্ষের মতের ঐক্য হয় না। মাননীয় ব্যক্তিগণের স্মরণ চিহ্ন রাখা উত্তম কার্য্য, কিন্তু এক একটা পাথরের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই উত্তমতার সাক্ষ্য রাখা আমাদের অনুমোদিত নহে, ময়দানে উদ্যানে অথবা রাস্তার ধারে এক এক প্রস্তর মূর্ত্তি খাড়া করিলে বায়সাদি বিহঙ্গেরা সে সকল মূর্ত্তির মস্তকে কি কি কার্য্য করে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন, যে, সকল মহাপুরুষ আমাদের অর্চ্চনীয় তাঁহাদের মূর্ত্তির সেইরূপ দুরাবস্থা কদাচ দর্শনীয় হইতে পারে না, অধিকন্তু এক একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতে ব্যয়ও প্রচুর। আমরা শুনিয়াছি বাবু কৃষ্ণদাস পালের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ব্যয় অন্যূন চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রা।

এতাধিক ব্যয় করিয়া এক একটি মূর্ত্তি স্থাপন করা আমাদের মতে অনাবশ্যক। বাঙ্গালী এখন ঘোরতর সভাভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বৈষয়িক, সামাজিক, ও পারমার্থিক বিষয় উপলক্ষে প্রায়ই সভা করিতে হয়। দারুণ আক্ষেপের বিষয় এই যে, সভা ভক্ত বাঙ্গালী জাতির সাধারণ সভা করিবার একখানি বাটী নির্দ্দিষ্ট নাই, টাউন হল ভাড়া লইয়া অথবা কোন গৃহস্থ লোকের সদর বাড়ী কিম্বা লাট মন্দির কয়েক ঘণ্টার জন্য চাহিয়া লইয়া সভা করিতে হয়, সত্য কি ইহা লজ্জাকর কথা নহে?

আমাদের পরামর্শ এই যে, স্মরণচিহ্ন রাখিবার জন্য এ লজ্জার পরিহার করা কর্ত্তব্য; দেশের মহৎ লোকদিগের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ চাঁদায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যত টাকা সংগৃহীত হয়, কোন একটি ব্যাঙ্কে তাহা জমা রাখিয়া সুবিধামত স্বতন্ত্র একটি সাধারণ সভামন্দির নির্ম্মাণ করা হউক; বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-

সিয়েশন সভাগৃহে রাজা রামমোহন রায়, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতির যেমন এক এক খানি চিত্র পট রক্ষিত আছে, এক্ষণে যে সকল মহাত্মার সভা হয়, ও চাঁদা আদায় হয়, আমাদের প্রস্তাবিত সাধারণ সভা মন্দিরে সেই সকল মহাত্মার এক এক খানি তৈল চিত্র রক্ষা করিলে বাঞ্ছনীয় স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হইতে পারিবে। সাধারণ সভা মন্দিরের নাম দেওয়া উচিত মাননীয় পুরুষগণের স্মৃতি-মন্দির।

মায়া।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চমদৃশ্য।

দীন দয়ালের বাটীর কক্ষ। প্রকাশ ও রমেন।

রমেন।—এইতে তুমি এত অধীর হয়ে পড়েছ। এতে বিমর্ষ হ'বার কি আছে? আমি হ'লে ত বেঁচে যেতাম। সত্যি কথা বল্‌তে কি—তোমার দিদি যখন রাগ করে তোমাদের বাড়ী আস্‌তে চায়, আমি ত আহ্লাদে আট খানা হই। জানি তাতে দিন কতক সংসারে আধ কুন্‌কে করে চাল বাঁচ্‌বে তার পর বিরহ পরিপক্ক গাঢ় ভালবাসায় জমে থাক্‌ব।

প্রকাশ। সব সময় তোমার বিদ্রূপ আমার ভাল লাগে না।

রমেন। তোমার দেখ্‌ছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার কথার কোনখানে বিদ্রূপের সংস্পর্শ দেখ্‌লে? সকলেই জানে স্ত্রীলোক অবলা—কাজেই রাগ্‌লে বেশী কথা কইতে পারে না, হয় বাপের বাড়ী, নয় গলায় দড়ি, এ দুয়ের একের আশ্রয় গ্রহণ করে; তবে পাটে শাল আলোয়ান হওয়ায়, দড়ির দর বেড়ে যাওয়ায়, আজকাল কেরোসিন তেলের রেওয়াজ হচ্ছে।

প্রকাশ। তুমি কোন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝ্‌তে পার না?

রমেন। সব বিষয় থেকেই যদি গুরুত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা কর, শেষে শরীরটা এত লঘুত্ব প্রাপ্ত হ'বে যে, আর কিছুই দেখ্‌তে পা'বে না। মিছে মন খারাপ করো না, যে বাড়ীতেই উঁকি মারবে, ঐ একই রকম দেখ্‌বে। সব

সংসারেই অমন মাঝে মাঝে কাল বোশেখী উঠে থাকে, তার পর ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রকাশ। রমেন,—রমেন! তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। মা'কে ব'ল পাঠিয়ে কাজ নাই।

রমেন। ওঃ! দরদ্ বুঝেছি। আচ্ছা না পাঠিয়ে লাভ কি?

প্রকাশ। এখানে থাকলে শুধ্‌রে যাবে।

রমেন। তোমরা না পাঠালেই যে, এখানে থাক্‌বে, তার কি কোন ঠিক আছে?

প্রকাশ। কেন?

রমেন। অভিমানীনির জেদ বজায় না থাক্‌লে, যদি কেরাসিন তেলের আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্রকাশ। না, না,—তা কি সম্ভব?

রমেন। অসম্ভবই বা কিসে? প্রায়ই এ রকম হোচ্ছে। মিছে কেন একটা বিপদ ডেকে আন্‌বে। আমি ত বলেছি দুদিন পরে সব খোলোসা হয়ে যাবে।

প্রকাশ। রমেন,—রমেন! তুমি সত্য বোল্‌ছো! তা কি হবে? আমার যে আর সে আশা নাই।

রমেন। অত ভাবুক হোও না, তা হলে কি সংসার চলে! সকলের জীবনেই জুয়ার ভাঁটা খেলে যায়। যে স্রোতে গা ঢেলে দেয়, শেষে সে কিনারায় গিয়ে উঠে। স্রোতের টান বাঁধ দিয়ে আটকান যায় না। আটকাতে গেলেই সর্ব্বগ্রাসী বন্যা এসে সব ভাসিয়ে দিয়ে যায়।

প্রকাশ। না রমেন পারবো না। দুঃখের ছায়া জীবনটাকে চিরকালের মত ঢাকতে আস্‌ছে। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো, তাতে যা হয় হবে।

রমেন। গুচ্ছের কবিতা ও নভেল পড়ে তোমার বুদ্ধিটা দেখ্‌ছি উপে গিয়ে কল্পনার সঙ্গে মিশে গেছে। যা হয়েছে এতে দুঃখটাই বা কই, আর তার ছায়াই বা কই? মোটামুটি কথা হোচ্ছে এই, শালাজ মহাশয়া ঘর কন্নার কাজ কত্তে নারাজ, তোমরাও নাছোড় বন্দ। কাজেই তোমার প্রেমের সামনে এক কুয়াসা এসে পড়েছে। এ কুয়াশা কি আর চিরকাল থাকে। একটু বিরহের তাত লাগ্‌লেই কোথায় চলে যাবে।

প্রকাশ। তোমার কি সত্যই তা মনে হয়?

রমেন। কতবার আর বোল্‌ব বল, না শোন, তোমার বুদ্ধি খাটিয়ে দেখো।

শেষে দেখবে হয় গলায় দড়ি না হয় কেরাসিন তেল। (রাস্তার দিকে চাহিয়া-) এদিকে একখানা মোটর আসছে না ?

প্রকাশ। হ্যাঁ।

রমেন। তোমাদের দরজায়ই ত লাগ্‌লো দেখ্‌ছি।

প্রকাশ। হুঁ।

রমেন। নিতে এসেছে, না ? ও লোকটি নাব্‌লো কে ?

প্রকাশ। আমার বড় ভায়রা ভাই।

রমেন। নিশ্চয় ঘর জামাই।

প্রকাশ। কেন ?

রমেন। নইলে সকলের পাশে বসে।

(মহেশের প্রবেশ)

মহেশ। এইবার যোগবল কি বুঝ্‌তে পার্ব্বে। কোন চালাকি খাটবে না। আমি এখনি ঠাকুরঝিকে নিয়ে যাবো।

প্রকাশ। কি দাদা তুমি এসেছো, বসো।

মহেশ। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। পাঠাবে কি না ? এখনি বলো।

রমেন। প্রকাশ তুমি ত তোমার বড়দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না। আমি নিজেই করি। (মহেশের প্রতি) মহাশয়ের নাম কি ?

মহেশ। আমার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছেন। জানেন আমি কে ?

রমেন। অত চটেন কেন মহাশয়, জানিনা বলেই ত জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

মহেশ। আমি ওসব কথা শুন্‌ছি না। এখন বলো ত পাঠাবে কি না ?

রমেন। (প্রকাশের প্রতি জনান্তিকে) তুমি বাড়ীতে খবর দাওগে। আমি ততক্ষণ এ রত্নের সহিত আলাপ করি।

[প্রকাশের প্রস্থান।]

মহেশ। [প্রকাশের প্রতি ধাবিত হইয়া] পাঠাবে কি না ? না বলে কোথায় যাবে ?

রমেন। [মহেশের সম্মুখে গিয়া] আহা করেন কি মশাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ্দুরে এতটা রাস্তা এসেছেন, একটু বিশ্রাম করুন।

মহেশ। আমি কারুর কথা শুনতে চাই না। পাঠাবে কি না বল ?

রমেন। কে বলছে পাঠাবে না ?

মহেশ। তা হ'লে পাঠাবে ?

রমেন। তাই ত মনে হয়।

মহেশ। বেশ তা হ'লে ঠাকুরঝির জিনিস পত্র গাড়ীতে তুলে দিক্।

রমেন। অমন ব্যস্ত হ'লে কি করে পাঠাবে?

মহেশ। আপনি ত এই বল্‌লেন পাঠাবেন।

রমেন। এখনও ত তাই বল্‌ছি। তবে আপনি যদি অত তাড়া দেন বোধ হয় পাঠাবে না।

মহেশ। পাঠাবে না:? সাধ্য কি? জানেন আমি ইচ্ছা কর্‌লে এখানে অষ্ট বজ্রের সমাবেশ কর্‌তে পারি।

রমেন। সেই জন্যই ত বল্‌ছি আপনাকে কিছু কর্‌তে হ'বে না। আপনি এখানে চুপ করে বসে থাক্‌লেই পাঠিয়ে দেবে।

মহেশ। আপনি ঠিক বলেছেন। আমি যখন এসেছি, পাঠাতেই হ'বে।

রমেন। তা হ'লে একটু উপবেশন করুন।

মহেশ। বেশ।

রমেন। কিছু নেশা টেশা করে থাকেন কি?

মহেশ। জীব মাত্রেই নেশায় বিভোর। জগৎ সংসারই একটা নেশার বিকার।

রমেন। কোন্ নেশায় আপনি অনুরক্ত অনুমতি কর্‌লেই বন্দোবস্ত করি।

মহেশ। আপনি ব্যাতুল নইলে আমার নেশার বন্দোবস্ত কর্‌তে চান! আমি দিনরাত নেশায় মসগুল হয়ে আছি। আমার নেশার বিরাম নাই, খোয়াড়ি নাই, সদাই ভরপুর রয়েছে।

রমেন। হার মানলেম্। ও বাদসাহী নেশার লাইসেন্স আমাদের এ গ্রামে নাই। এখন মহাশয়ের নামটা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?

মহেশ। ভগবান আমায় মনুষ্যরূপে সৃজন করিয়াছেন। সেই আমার শ্রেষ্ঠ নাম।

রমেন। এতক্ষণে একটা সন্দেহ ভাঙ্গলেন। কি কাজ কর্ম্ম করা হয়? জান্‌তে পারি কি?

মহেশ। জ্ঞান অর্জ্জন, করাই মনুষ্যের মুখ্য কর্ম্ম। আমি সেই কাজই করে থাকি, ভগবান স্বয়ং বলেছেন, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মানি ভস্মাৎ" কুরুতে যথা, ন হি জ্ঞানেন সদৃশং "পবিত্রং বিস্থাতে"।

রমেন। এই বারেই মুস্কিলে ফেল্‌লেন। সংস্কৃত আমি বুঝিনা।

মহেশ। আপনাকে উপবীত ধারী দেখিতেছি। এই সামান্য কথার মানে

বুঝ্‌লেন না। এর ভাবার্থ এই ;—জ্ঞানে আগুন লাগিয়ে, সমস্ত কর্ম্ম পুড়িয়ে দিয়ে জ্ঞান লাভ কর।

রমেন। এরূপ জ্ঞান লাভ কিরূপে হ'তে পারে ?

মহেশ। কেন ভগবান স্বয়ং বলেছেন—তৎ স্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ "আত্মানং নিঃবন্দতিঃ। অর্থাৎ যোগের দ্বারা আত্মার মিবন্ধনে কি না মুক্তি হয়।

রমেন। ওঃ। আপনি একজন যোগী। বোধ হয় যোগবলেই আত্মার উন্নতির জন্য নিথরচায় শ্বশুরের স্কন্ধে গ্রাসাচ্ছাদনটা সেরে নেন।

মহেশ। যোগ বলের অসাধ্য কিছুই নাই।

রমেন। নিশ্চয়ই। আপনার যোগবল অদ্বিতীয়। সত্য ত্রেতা দ্বাপরে কোন যোগীই আপনার ন্যায় দেহপুষ্টির উপায় কর্‌তে পারেন নাই।

মহেশ। তাঁদের তুলনায় আমি নগণ্য। আমি তাঁদেরই পথ অনুসরণ করিতেছি।

রমেন। বিলক্ষণ আপনি বিনয়ী তাই একথা বোল্‌ছেন। দেখুন ছেলেবেলা থেকে আমার যোগ অভ্যাস করার ইচ্ছা, কিন্তু শিখিবার সুবিধা পাইনি ; আপনি যদি আমাকে সাকরেত করে নেন ?

মহেশ। বেশ এ ত ভাল কথাই। তা আপনি যখনই প্রস্তুত হবেন—তখনি আমি এখানে এসে আপনার শিক্ষা আরম্ভ কর্‌বো।

রমেন। কষ্ট করে এতদূর আস্‌তে হবে না। আমার বাড়ী কলিকাতাতেই।

মহেশ। কল্‌কাতার কোথায় থাকেন ? আপনি ঠিকানা দিলে আমি কালই আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

রমেন। কাল সুবিধা হবে না। পরশুই আরম্ভ করা যাবে। প্রথমে কুম্ভ যোগ থেকে সুরু না ?

মহেশ। আপনার দেখ্‌ছি কতক কতক জানা আছে।

রমেন। কিছুই নয়। শুনেছি কুম্ভের পর অর্দ্ধোদয়।

মহেশ। তা ঠিক বটে।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। জামাইবাবু জলখাবার দেওয়া হয়েছে।

রমেন। তা হলে উঠুন এখন একটু জলযোগ করবেন চলুন।

(সকলের প্রস্থান।)

চরিত্র।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ রায়।

জগতে "ঈশ্বর এক" সকলেই জানে।
মর্ম্ম বুঝি মানে প্রাণে কর্ম্ম গুণে টানে॥
"শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম শান্তি" বহু ভাগ্যে মিলে।
ভব রোগ আরোগ্য হয় "বৈরাগ্য" হইলে॥
নিশ্বাস প্রশ্বাসে চিন্ত হও সুচতুর।
"বিশ্বাসে" পাইবে তাঁরে তর্কে বহু দূর॥
বিরাজেন হৃদি মাঝে অন্তর্যামি যিনি।
পাপ পুণ্য দর্শী দণ্ডী পুরস্কর্ত্তা তিনি॥
জ্ঞানে নিজ প্রাণে "ইষ্টদেব" দরশন্।
"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ধ্যানে পরশনে॥
"বিবেক কর্ণে" এক মনে "আদেশ" শ্রবণ।
সমগ্র শক্তিতে তাহা জীবনে পালন॥
"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু"—নির্ম্মল ভজন।
কর্ত্তব্য জীবের সেবা "শিবের" বচন॥
"ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন"।
ইহাই প্রকৃত পূজা—ধর্ম্ম সনাতন॥
"সুনীতিই" ধর্ম্মের ভিত্তি সর্ব্বোন্নতি মুল।
দুর্ম্মতির অধোগতি! যাতনা অতুল!!
বি, এ, এম্ এ, ল, পাস আদি বিদ্যাও যথেষ্ট!
কেবল বুদ্ধির দোষে দেশে এত কষ্ট!!
জ্ঞানবান সাবধান পূর্ব্বে হওয়া ভাল।
সঙ্গদোষে রঙ্গরসে পাছে গ্রাসে কাল॥
"ধর্ম্মবুদ্ধি-চিত্তশুদ্ধি" তাই যদি যায়।
পাঠ, গান, বক্তৃতায়, কিবা ফল তায়॥

চরিত্রই জীবের প্রাণ, পবিত্রতায় পরিত্রাণ,
তাই চাই "চরিত্র গঠন।"
অগ্রে মাটি পরিপাটী, তাহে "বীজ-মন্ত্র" খাঁটি,
ভক্তি-জলে ফলে "মুক্তি" ধন।

• বালকবৃন্দের ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ব্রত গ্রহণ ও প্রতিজ্ঞা :—

"মিথ্যা ছল, চাতুরি, চুরি, হিংসা না করিব।
বাবুগিরি ছাড়ি, মোটা খাইব পরিব॥
আলস্য ও বাক্য ছাড়ি কার্য্যে দক্ষ হব।
আত্মশ্লাঘা পরনিন্দা বিষবৎ ত্যজিব॥
অসৎ সঙ্গে "জুয়া খেলা" ধূলায় ফেলি দিব।
"রঙ্গালয়-কুসঙ্গালয়" জীবনে না যাব॥
চা, তামাক, তাড়ি, বিড়ি, সিদ্ধি, কোকেন, নস্য।
বৃথা কু অভ্যাস সব ছাড়িব অবশ্য॥
আফিম্ চরশ, চণ্ডু, সুরা, গাঁজা গুলি।
প্রতিজ্ঞা,—গেলেও প্রাণ ছোঁবনা এ গুলি॥
বিক্রেতা চতুর বটে! ক্রেতা যে কতুর!!
সঙ্গদোষে বঙ্গদেশে, ক্লেশ এত দূর!!
অর্থ ও সামর্থ নষ্ট কষ্ট দেহে ব্যাধি।
রুগ্ন, ভগ্ন, দুঃখে মগ্ন, অকাল মৃত্যু আদি॥
বয়োজ্যেষ্ঠে ভক্তি হবে কনিষ্ঠে মমতা।
দেখিব পবিত্র চক্ষে "পরস্ত্রী-মাতা"॥
রাজদণ্ড ভয়ে শুধু সাধু হয়ে থাকি।
হৃদয়ে; "ধর্ম্মের জ্যোতিঃ!" কভু নাহি দেখি!!
ভজনে ভোজনে জ্ঞানে ধ্যানে শুদ্ধ হব।
শয়নে স্বপনে মনে "ঈশ্বর" চিন্তিব॥
ইহলোক "কর্ম্মভূমি"—"ফল ভূমি" পরে।
"মৃত্যু" মাত্র ব্যবধান জানিয়া অন্তরে॥
অদম্য উৎসাহে খাটি, খাঁটি করি মন।
প্রিয় "জীবের" সেবায় জুড়াব জীবন॥
চরিত্র গঠনে ধন নহে প্রয়োজন।
ইন্দ্রিয় দমন চাই শুদ্ধ দৃঢ় মন॥
হব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বিশ্ব হিতে রত।
"ঈশ্বর" সহায় হউন্! লইনু এই ব্রত॥"
হাজারে জনেক যদি ফিরে হয় ফল;
"ঋষি ভক্তাশ্রম" শ্রম হইবে সফল!!

ভক্তের ভগবান।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন।

(পৌরাণিক গল্প)।

"জ্ঞান পদে পদে পতঙ্গের মত
যেখানে যাইতে চায়,
ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে
উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।"

পল্লীগ্রামে চণ্ডীমণ্ডপের উচ্চ বেদার উপর উপবিষ্ট হইয়া পাঠক পুরাণ পাঠ করিতেছেন। পল্লীবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রোতারূপে চতুর্দ্দিকে সমাসীন। পাঠক পুঁথির ভাবে বিভোর হইয়া কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখনও বা হাত-মুখ নাড়িয়া নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেছেন। ভাবুক শ্রোত্রীবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পাঠকের হাসি-কান্নার আংশিক পুনরাভিনয় করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। শিশু ভোলাদাস মাতৃ-ক্রোড়ে বসিয়া পাঠকের সে অঙ্গভঙ্গী দর্শনে কখন বিরক্ত এবং কখনও বা পুলকিত হইতেছে। এমত সময় কথা-প্রসঙ্গে পাঠক বলিলেন, " তিনি আর কাহারও নহেন, তিনি ভক্তের ভগবান।"

"ভক্তের ভগবান" কথাটা শিশুর-সরল প্রাণের অন্তস্থলে প্রতিধ্বনিত হইল। শিশু মনে মনে কেবলই ভাবিতে লাগিল "ভক্তের ভগবান।" বালক বাড়ী আসিয়া মাতার নিকট ভগবানের কথা, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তির কথা—অপূর্ব্ব দয়ার প্রসঙ্গ প্রভৃতি শুনিয়া আত্মহারা হইল। ক্রীড়াশীল খেলনা প্রিয় সরল শিশু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল, 'ভক্তের ভগবানকে একবার দেখিতেই হইবে।"

দিনের পর দিন যায়, আর বালক ভোলাদাস কেবলই ভাবে, কোথায় গেলে কেমন করিয়া সে তাহার প্রাণপ্রিয় ভক্তের ভগবানের দর্শন পাইবে। ক্রমে বিরহ বিধুরা নায়িকার ন্যায় ভক্তের ভগবানের জন্য শিশুর কোমল প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ভক্ত বালক অন্তরে বাহিরে প্রতিনিয়ত তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিল। তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধও যেন লোপ হইবার উপক্রম হইল। তাহার প্রাণাধিক ধনের জন্য প্রাণের পিপাসা যখন বড় বেশী হইল, তখন একদিন অতি প্রত্যূষে শিশু ভোলাদাস ভক্তের ভগবানের অন্বেষণে বাহির হইল। বালক জানে না, কোন্ পথে কোন্ দিকে গেলে ভক্তের ভগবানের দর্শন পাইবে। বালক এক অপার্থিব অমূল্য রত্নের অন্বেষণে কোন এক অজানা দেশের অজ্ঞাত

পথে প্রয়াণ করিল। ভক্তি উৎসৃষ্ট পবিত্র কুসুম দেব-পদে স্থান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উত্তাল তরঙ্গ-মালা সঙ্কুল সাগর জলে—বিরাট মহা সমুদ্রের অনন্ত বক্ষে তীব্র স্রোতবেগে ভাসিয়া চলিল। বালক,—"ভক্তের ভগবান" দর্শনের আকুল আকাঙ্ক্ষায় যে দিকে দুই চক্ষু যায়, সেই দিকেই যাইতে লাগিল। ভাব তরঙ্গে ভক্তি-গঙ্গা সাগরাভিসারিনী হইয়া ছুটিয়া চলিল। সংসার বালুর বাঁধ—জনক-জননীর স্নেহ-শৃঙ্খল সে গতি পথ রোধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। যে স্বর্গীয় ভাবের মহা প্রেরণায়,—যে, অনুপম মহাসাধনায় বালক ধ্রুব ধ্রুবলোক লাভ করিয়াছিলেন; যে, মৃতসঞ্জিবনী ত্রিদিব সুধাপানে ভক্তবীর প্রহ্লাদ অনলে-অনিলে-জলে এবং মত্তমাতঙ্গের পদতলে পড়িয়াও প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন, যে, তীব্র হৃদয়াবেগে উন্মত্ত হইয়া শচী-নন্দন প্রেমানন্দে দেশ ভাসাইয়াছিলেন, বালক ভোলাদাস সেই ভাব বন্যায় ভাসিয়া চলিল।

পথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, বালক তাহাকেই ভক্তের ভগবানের সন্ধান জিজ্ঞাসা করে। বালককে উন্মাদ মনে করিয়া কেহ তাহার কথায় হাসিল, কেহবা আপন মনে গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। ভক্তভোলাদাস কাহারও নিকট তাহার "ভক্তের ভগবানের" সন্ধান পাইল না। সে আপন মনে অবিরত পথ চলিতে লাগিল।

গ্রীষ্ম কাল। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়। প্রখর সূর্য্য কিরণে জীব-কুল আকুল। এমত সময় ক্ষুৎপিপাসাতুর বালক ভোলাদাস কুশ-কণ্টক-কঙ্কর-ময় এক প্রান্তর-পথে দাঁড়াইয়া কাতরভাবে ডাকিতে লাগিল, "কোথায় ভক্তের ভগবান, মা'র মুখে শুনিয়াছি, তুমি বড় দয়াবান, তুমিই সকলকে সব দিয়া থাক, এস প্রভু! ভক্তের ভগবান, আমায় পিপাসায় জল ও ক্ষুধায় অন্ন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।"

কি জানি কোন দিক হইতে কেমন করিয়া তথায় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। তাঁহার পুরোহিতের বেশ। ব্রাহ্মণের বামহস্তে চা'ল-কলা ও দিব্য মণ্ডা এবং দক্ষিণ হস্তে একটি শালগ্রাম চক্র। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বৎস! ধর এই দেবতার প্রসাদ, নিকটে ঐ পুষ্করিণী আছে, উহার জলে স্নান করিয়া—ঐ বৃক্ষ তলে শীতল ছায়ায় বসিয়া ইহা আহার কর; তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূর হইবে। ছিঃ বৎস! এ প্রখর রৌদ্রের ভিতর এমন করিয়া কি পথ চলিতে আছে?" বালক বলিল, "ঠাকুর তুমিই কি ভক্তের ভগবান?—ভক্তের ভগবান কোথায় আছেন বল? পরে স্নানাহার করিব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি

ভক্তের ভগবান নহি; তবে আমার নিকটেই ভক্তের ভগবান আছেন, এই দেখ, ভক্তের ভগবান!" এই বলিয়া তিনি তাহাকে হস্তস্থিত শালগ্রামচক্র প্রদর্শন করাইলেন। বালক বলিল, "এমন ভগবান আমাদের বাড়ীতে দুই চারিটি আছেন, আমি উহা চাই না। যিনি ভক্তের ভগবান, আমি তাঁহাকেই দেখিব।" এই বলিয়া বালক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপন মনে পথ চলিতে লাগিল।

সম্মুখে এক উত্তাল তরঙ্গমালা শঙ্কুল ভীষণ নদী। নদীতে পরপারে যাইবার নৌকা নাই; নিকটে মনুষ্য মাত্র নাই। সেই বিজন নদী প্রান্তে দাঁড়াইয়া বালক ডাকিতে লাগিল. "কোথায় ভক্তের ভগবান! আমায় পার কর দেব!" ক্ষণকাল পরে একজন পাটনী তাহাকে পার করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। বালক বলিল, "তুমিই কি ভক্তের ভগবান? আমায় পার করিতে আসিয়াছ?" পাটনী মৃদু হাসিল। উত্তর না পাইয়া বালক বলিল. "তুমি দূর হও; আমি পার হইব না।" পাটনী নীরবে চলিয়া গেল। বালক নদীর তীরে তীরে আপন মনে কোথায় "ভক্তের ভগবান" "কোথায় ভক্তের ভগবান" বলিয়া পথ চলিতে লাগিল।

বৈশাখ মাস। সন্ধ্যা অতীত প্রায়। সহসা গগনপট ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল। ঝড় উঠিল, মুষলধারে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। এ মন সময় এক বিজন প্রান্তরে বালক একাকী চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কোথায় ভক্তের ভগবান! আমায় রক্ষা কর।" এমত সময় কোথা হইতে এক ব্যক্তি একটা আলো হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বালক তাহাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, "তুমিই কি ভক্তের ভগবান?" উত্তর হইল, "না, আমি ভক্তের ভগবান নহি; আমি সন্ন্যাসীর অযোগ্য শিষ্য মাত্র। ঐ বন প্রান্তে আশ্রমে আমার গুরুদেবের কুটীর আছে, তুমি ইচ্ছা করিলে অদ্য রাত্রে অনায়াসে তথায় থাকিতে পার।" বালক বলিল, "না, তুমি চলিয়া যাও; আমি যেখানে ভক্তের ভগবান আছেন, তথায় যাইব।" দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বাত্যাঘাতে আগন্তুকের হস্তস্থিত আলো নিবিয়া গেল। পথিকের আর সন্ধান মিলিল না। লক্ষ্যভ্রষ্ট বালক, "কোথায় ভক্তের ভগবান, কোথায় ভক্তের ভগবান," এই বলিয়া প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল। দৌড়িতে দৌড়িতে বালক এক মহাবনে প্রবেশ করিল। জনহীন অতি নিবিড় ভীষণ বন। শোণিত পিপাসু হিংস্র পশুগণ সর্ব্বদা তথায় বিচরণ করে। পথ-ভ্রষ্ট বালক বুদ্ধি-ভ্রষ্ট উন্মাদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নিশীথ কাল। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। ক্ষুৎপিপাসাতুর ভক্ত বালক ভয় বিহ্বল কম্পিত স্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কোথায় ভক্তের ভগবান?— কোথায় আমার প্রাণের ঠাকুর? আমায় রক্ষা কর।" সহসা অত্যুজ্জ্বল আলোক হস্তে জটাজুট সমন্বিত শ্বেতশ্মশ্রু বিমণ্ডিত শুভ্র বসন পরিহিত এক সন্ন্যাসী মূর্ত্তি তথায় উপস্থিত হইল। বালক বলিল, "ঠাকুর! তুমিই কি আমার পিপাসার ধন, আরাধনার রতন, ভক্তের ভগবান? সন্ন্যাসী বলিলেন, "না, বৎস! আমি ভক্তের ভগবান নহি।" সন্ন্যাসী আরও বলিলেন, "বৎস! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এত কাল এত স্থানে ঘুরিতেছি, কত তপ জপ ও ভক্তি আরাধনা করিতেছি, তবু তাঁহার দর্শন পাইলাম না, তুমি শিশু হইয়া তাঁহার সন্ধান পাইবে কিরূপে? দেখিতে পাইতেছি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তুমি বড় কাতর হইয়াছ, এ হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল গহন বনে তোমার একাকী থাকিয়া কাজ নাই; ঐ অদূরে আমার পর্ণ কুটীর দেখা যাইতেছে, আশ্রমে সুমিষ্ট ফল ও সুশীতল জল আছে, আহার ও পান করিয়া শ্রম দূর করিবে ত আমার সঙ্গে চল।"

সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভক্ত বালক বলিল, "না, যাঁহার জন্য এত স্থান ঘুরিলাম, আমি সেই ভক্তের ভগবানকে না পাইলে আর জল গ্রহণও করিব না।" কি অনির্ব্বচনীয় ভগবৎ প্রেম—কি অদ্ভুত চিত্ত দৃঢ়তা!

সন্ন্যাসী উপেক্ষার সহিত বলিলেন,—"বোকা ছেলে! সেই অতি প্রাচীন 'ভক্তের ভগবান' কি আজিও বাঁচিয়া আছেন? তিনি জীবিত থাকিলে অতি বৃদ্ধ আমি—মহাতাপস আমি, এত দিনের এত কঠোর উপাসনায় অবশ্যই তাঁহার দর্শন পাইতাম; বৃথা তোমার এ আকিঞ্চন—অযথা তোমার এত ক্লেশ ভোগ করা; চল, আমার কুটীরে চল। আমার পুত্রসন্তান কিছুই নাই; আমি তোমাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিব। আমার গুপ্ত ধনরাশি—অসংখ্য সুবর্ণ মুদ্রা সকল সব তোমার হইবে, তুমি আজীবন রাজভোগ খাইবে—রাজার ন্যায় সুখে থাকিবে। অথবা এস, কিছু আহার করিয়া এ রাত্রি এস্থানে বিশ্রাম কর, তুমি ইচ্ছা কর ত রজনী প্রভাতে তোমাকে তোমার বাড়ীতে রাখিয়া আসিব।"

সন্ন্যাসীর কথায় বালক কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে আপন মনে পথ চলিতে লাগিল। আর চীৎকার করিয়া—ডাকিতে লাগিল, "কোথায় ভক্তের ভগবান! পিপাসায় আমার বুক ফাটিয়া যায়,—ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়, তুমি এস।"

সন্ন্যাসী তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বৎস! আমি রাজগুরু; ঐ নিকটেই রাজধানী, রাজা পুত্র হীন। তাঁহার একমাত্র কুমারী কন্যা,—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আর সঙ্গীত নৈপুণ্যে স্বর্গীয়া বিদ্যাধরী,—চল, তোমাকে রাজ-জামাতা করিয়া দিব; রাজা অভাবে এ বিপুল রাজত্ব—এ অনন্ত রাজ-ঐশ্বর্য্য সব তোমার হইবে। সন্ন্যাসীর উক্তি শুনিয়া বালক বিরক্তির সহিত তথা হইতে তীব্র গতিতে প্রস্থান করিল।

গহন বনে একভীম দর্শন ভীষণ শার্দ্দূল, বালককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। বুঝি বা মুহূর্ত্ত মধ্যে বালক সেই শোণিতপিপাসু হিংস্র পশুর ভীষণ কবলে কবলিত হইবে। বালক হাসিয়া বলিল, "তুমিই কি ভক্তের ভগবান? তবে এস, আমি তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিব।"

সহসা সে ভীষণ সিংহ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। তখন এক অপূর্ব্বদৃষ্ট দিব্য কান্তি জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ আসিয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন! তিনিই ভক্তের ভগবান। কঠোর সাধনায় যাহা না হয়, শুধু সরল ভক্তি বিশ্বাস প্রভাবে শিশু ভোলাদাস তাহার প্রাণের ঠাকুরের—ভক্তের ভগবানের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইল; তাঁহার মানব-জন্ম সার্থক হইল। ভগবৎ অঙ্গের মধুর স্পর্শে—শ্রীঅঙ্গের পদ্ম গন্ধে ভক্ত বালকের প্রাণ-মন অনন্ত উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহার ভবক্ষুধা দূরে গেল। কি জানি কি এক স্বর্গীয় ভাবে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইল। বস্তুতঃ ডাকিবার মত ডাকিতে পারিলে—শিশুর ন্যায় সরল প্রাণের আকুল আহ্বানে ভগবৎ প্রেমরূপ স্বর্গীয় অমৃত নির্ঝরিনী আপনি প্রবাহিত হয়। সত্য সত্যই তিনি আর কাহারও নহেন, তিনি ভক্তের ভগবান. —ভক্তই তাঁহার প্রাণ।

ধর্ম্মের বিচিত্র গতি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস গোস্বামী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩

নকুড় মৈত্র মহাশয় ধনঞ্জয় বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। শ্বশুরালয়ে অকুল মিত্র, কলিকাতায় নকুড় মৈত্র, এবং রোগী মহলে কবিরাজ মহাশয়, এই ত্রিনামধারী ব্যক্তি শ্বশুরালয়ে গিয়া একবার নিজবাটী প্রস্তুতের সংবাদ

পাইয়া আসিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হৃদয়ে উৎসাহের সহিত ব্যবসায় চালাইতেছেন, এবং কলিকাতাতেও ক্রমে পরিচিত হইয়া উঠিতেছেন।

ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ীতে অনেকগুলি লোক নিমন্ত্রিত ও সমাগত। নকুড় সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে——সর্ব্বনাশ! তাঁহার মধ্যম শ্যালক! উপায়? এক মুহূর্ত্তে সব কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে ত। নাম পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন,—তাহার দুইটি নাম ছিল বলিয়া চালাইলে চলিতে পারিত; চিকিৎসা ব্যবসায়—তাহাও চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়া! এটি বড় ভয়ঙ্কর কথা। কোন্ ব্রাহ্মণ, হিন্দু হইয়া, মিত্রকে মৈত্র স্বরূপে স্বীকার করতঃ তাহার সহিত একত্র আহার করিবে? নকুড় মহা বিপদে পড়িলেন। মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, আর অগ্রসরও হইতে পারেন না, সহজে ফিরিয়া যাইতেও পারিলেন না। ধর্ম্মের কল, আপনা আপনিই ধরা পড়িবার পথ করিয়া দিতে হয়। তদীয় সেই নব যৌন তস্থো ভাব সহজেই গণ্ডগোলে উপস্থিত করিল, শ্যালকের দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় শ্যালক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও, অকুল বাবু যে—" অকুলবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল, অ্যাঁ অ্যাঁ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। অবিলম্বে সমস্ত কথা প্রকাশ পাইয়া গেল। তখন ধনঞ্জয় বাবুর বাটীতে একটা গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় অকুল বাবুকে প্রস্থান করিতে হইল। ধনঞ্জয় বাবু তাঁহাকে স্বতন্ত্র আহার করাইয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু অপরাপর নিমন্ত্রিতগণের ভাব ও ভাষায় ভীত ও লজ্জিত অকুল তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বাটীর বাহিরে চলিয়া গেলেন; এমন সময়ে —এ আবার কি!' এ যে আরও ভয়ঙ্কর। নূতন বিপদ্! সম্পৎ ও বিপৎ কেহই একাকী আসে না। পূর্ব্বদিন কবিরাজ মহাশয় এক রোগীকে তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত কয়েকটি বটিকা সেবন করিতে দিয়া আসিয়াছিলেন; তাহার একটি মাত্র সেবন করিয়াই রোগী অতি অল্পকাল মধ্যে স্বীয় কর্ম্মদোষে মানবলীলা সংবরণ করে। কিন্তু রোগীর তত্ত্বজ্ঞান বিহীন আত্মীয়বর্গ পরীক্ষা দ্বারা বটিকা বিষযুক্ত জানিতে পারিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া ধরিতে আসিয়াছেন। বাটীর ভিতরের গোলযোগ থামিতে না থামিতেই বাহিরে গোলযোগ উপস্থিত। সকলেই অকুলের উপর খড়্গহস্ত। কিন্তু অকুলের শ্যালক, ভগিনীপতির বিপদে, স্থির থাকিতে পারিলেন না। উপস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আদালতে গিয়া নকুড়কে জামিনে খালাস করাইয়া বাটী লইয়া গেলেন। সরলকে সংবাদ দিবার অবসর বা প্রয়োজন হইল না। সরলকে এসকল কথা জানাইবার ইচ্ছাও

অকুলের ছিল না। মনে করিলেন, গোলমাল মিটিলে কলিকাতায় গিয়া যাহা হয় করিবেন।

একদিন যায়, দুই দিন যায়, প্রভুভক্ত সরল প্রভুর কোনও সংবাদ না পাইয়া বড়ই দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইল। বিপুল সহর কলিকাতা; কে কাহার সংবাদ রাখে? অনেকে পার্শ্বের বাটীর সংবাদ জানে না; বড় বড় রাজপথে পিপীলিকার সারির ন্যায় জনস্রোত নিয়ত চলিতেছে, কোথাকার নকুড় মৈত্র? কে সে? কে তাহাকে জানে? তথাপি সরল যতটুকু পারিল চেষ্টা করিয়া দেখিল। কিছুই ফল হইল না। কোথায় নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাহা জানা থাকিলেও বরং কথঞ্চিৎ উপায় হইতে পারিত, কিন্তু কবিরাজ মহাশয় সে কথাও সরলকে বলেন নাই। সরল তাঁহার বাসস্থানাদিরও কোনও সংবাদ পায় নাই। যতই দিন যায়, সরল ততই হতাশ হইয়া উঠে, একাকী রোদন করে, এমন স্নেহশীল প্রভু কোথায় পাইবে? বাস্তবিক অকুল, সরলের উপার্জ্জিত ধন সংগ্রহ করিত বলিয়াই হউক, আর নিজ স্বভাব বশতঃই হউক, সরলের প্রতি কখনও অসদ্ব্যবহার করে নাই। যাহার রুক্ষ প্রকৃতি সে উপকৃত হইলেও ব্যবহার কালে নিজ স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। অকুল সে প্রকৃতির লোক ছিল না। মাতুলানীর ব্যবহারে পীড়িত উত্যক্ত সরল অকুলের নিকট আসিয়া শান্তি পাইয়াছিল, অর্থই সংসারে সর্ব্বে সর্ব্বা নহে। সংসারে আর এক পদার্থ আছে, যাহা পরকে আপন করে, শত্রুকে মিত্র করে, যাহার জন্য লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, এবং যাহার খাতিরে লোকে অনেক অত্যাচার উপদ্রব হাস্য মুখে সহ্য করিয়া থাকে। সে পদার্থের নাম ভালবাসা। তাহা জগতে দুর্লভ হইলেও এখনও তাহা সংসারে আছে। যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভাল বাসিতে জানে, সে সেই ভালবাসা দিয়া লোককে কি না করাইতে পারে?

অকুল সরলকে ভাল বাসুক না বাসুক, সরল জানিত অকুল তাহাকে ভাল বাসে। সরল অকুলের জন্য প্রত্যহ কাঁদিত। উদরের চেষ্টায় ব্যবসায় বন্ধ করিতে পারে নাই। নিজে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতেই দিন চালাইত। কিন্তু বাটী ভাড়া অনেকগুলি টাকা জমিয়া গিয়াছিল। হরিণী নয়নার নিদারুণ শোষণে অকুল অনেক দিন বাটী ভাড়া দিতে পারেন নাই। এখন গৃহস্বামী আর অপেক্ষা করিতে চাহেন না। সরলের নিকট অকুলের বাক্সের চাবি ছিল, খুলিয়া দেখিল, তাহাতে অনেকগুলি টাকা আছে, বোধ হয়, দুই এক দিনের মধ্যে অকুলের বাটী যাইবার ইচ্ছা ছিল, এখন প্রভুর বিনা অনুমতিতে তাঁহার সংগৃহীত

অর্থ হইতে বাটী ভাড়া দেয় কিরূপে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক মাসের ভাড়া দিয়া সরল সেস্থান হইতে প্রস্থান করতঃ অন্য পল্লীতে একটু বড় রাস্তার ধারে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া নিজ ব্যবসা চালাইতে লাগিল, এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে একমাসের ভাড়ার টাকা পূরণ করিয়া প্রভুর বাক্সে রাখিল। মনে করিল, প্রভু আসিলেই তাঁহার টাকাসহ বাক্স বুঝাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু প্রভু যে এই সহরের মধ্যে তাহার নূতন আবাস কোথায় খুঁজিয়া পাইবেন, সে কথা সরলের মনে উদিত হইল বলিয়া বোধ হয় না। সরলের ব্যবসায়ের যতই উন্নতি হইতে লাগিল, তাহার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের, কায়িক লাবণ্যের ও পরিচ্ছদাদির যতই পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল, ততই তাহার প্রভুর পক্ষে তাহাকে চিনিয়া লওয়ার প্রতিবন্ধক অধিকতর হইতে লাগিল। কিন্তু সরল কি করিবে? ভগবান্ যেরূপ করাইবেন তাহাকে অবশ হইয়া সেইরূপই করিতে হইবে।

এদিকে অকূল উকীলাদির পরামর্শে বিচারপতির নিকট, ভ্রমক্রমে ঔষধ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে বলায়, সামান্য দণ্ডে অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু হরিণী-নয়নার উপার্জ্জিত বাটী খানি ভোগ করা অদৃষ্টে ঘটিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের উৎপীড়নে ও দণ্ডবিধি আইনের ভয়ে পুল বাবু হরিণীর বাটী হরিণীকে খোষ কোবালা দ্বারা ফেরত দিতে বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু অর্থাভাবে জমীদারের নিকট দুইবার উহা আবদ্ধ রাখিয়া পুল যে, পরিমাণে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল, স্বামীর মোকদ্দমায় প্রায় সর্ব্বস্বান্তাহরিণীর সে টাকা সুদ সহ পরিশোধের শক্তি আদৌ ছিল না! বাটী যথাকালে নিলাম হইয়া গেল।

পুল বাবু, হরিণীর টাকার দায়ে, অতি সামান্য মূল্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়কে নিজ বাটীর অংশ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইল, রোষে ক্ষোভে গৃহত্যাগ করতঃ গ্রামান্তরে একখানি বাসাঘর ভাড়া করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল; অর্থাগমের যে সহজ উপায় স্থির করিয়া আনিয়াছে, তাহাতে অল্পকাল মধ্যেই বিপুল ধনাধিপতি হইবার আশায় গৃহ-তাড়িত হইয়া কিছুমাত্র কাতর হয় নাই। কেন হইবে? যে ডার্বি লটারির একখানি টিকিট কিনিয়াছে, যে দুই এক মাসের মধ্যে আট দশ লক্ষ টাকার অধিপতি হইয়া প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করিবে, সে সামান্য পৈতৃক জীর্ণাবাসের জন্য কাতর হইবে? স্ফূর্ত্তির টিকিট কিনিয়া প্রথমেই ত পুল বাবু স্থির করিয়াছিল, যে ভদ্রাসন বাটীর সম্মুখে ব্রাহ্মণদের যে প্রকাণ্ড একখণ্ড ব্রহ্মোত্তর জমী পড়িয়া আছে, তাহা ক্রয় ও যত শীঘ্র সম্ভব

তদুপরি একখানি ত্রিতল অট্টালিকা প্রস্তুত করতঃ এমন একটি সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত কক্ষে নিজ বাসগৃহ করিবে, যে বাক্যবাণ বিদ্ধকারিনী ভাতৃজায়াদ্বয় অনবরত দেবরের ঐশ্বর্য্য রাশি দর্শন করতঃ ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে; এমন রূপসী রমণী বিবাহ করিবে, যে তাহার রূপের জ্যোতিতে ও অলঙ্কারস্থ রত্নরাজির কিরণে ভ্রাতৃজায়াগণ অন্ধ হইয়া যাইবে, এবং তাহার সুমধুর সঙ্গীতে বধির হইয়া অথবা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবে।

হরিণী নয়নার অনেক কটু কথা বলিলেও তাহার উপর তত ক্রোধ ছিল না, বরং যত টাকা দিয়া হউক, তাহার বাটী খানি ফেরত লইয়া তাহাকে দিবার সংকল্প একবারও ত্যাগ করতে নাই, কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়কে একবার শিক্ষা দিতে হইবে, ইহা নিশ্চয়। দুঃখের বিষয় পুলের মাতা অল্পদিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিজ বাটীতে আনিয়া তাঁহার দ্বারা দুর্গোৎসব করাইয়া পুত্রগণের ঐশ্বর্য্য ও মাতৃভক্তির তারতম্য দেখাইবার অবকাশ পাওয়া গেল না।

এ ত গেল সঙ্কল্পের কথা; কার্য্যতঃ ও পুল নিশ্চিন্ত ছিল না। যে ব্রাহ্মণদের জমীতে বাটী হইবে, তাহারা এখন পাঁচ ছয় জন অংশীদার হইয়া পড়িয়াছে, এমন, কি একজন অংশীদারের অংশ অল্পদরে ঠিক হওয়ায়, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা বায়না দিয়া তিন মাসের মেয়াদে এক বায়না নামা পর্য্যন্ত লেখা পড়া হইয়া গিয়াছে। সুধু তাহাই নহে, জমী কিনিয়াই বাটী প্রস্তুত করিতে হইলে পাছে ইষ্টক প্রস্তুতের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, এই আশঙ্কায় একটা পাঁজা পর্য্যন্ত বায়না করা হইয়াছে। তথাপি পুলের হস্তে প্রায় দুইশত টাকা মজুদ, সুতরাং একদিন প্রায় পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করতঃ বন্ধু বান্ধবদিগকে একটা ভোজ দিয়া ফেলিল। বাকী টাকায় স্থরতির টাকা পাওয়া পর্য্যন্ত বেশ কাটিয়া যাইবে; স্থরতির সংবাদ বাহির হইবার আর একমাস বিলম্বও ত নাই।

কিন্তু এ একমাস আর কাটে না। শীতকালে রাত্রি বড় হয়, গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়; কিন্তু পুল দেখিল, এমাসে দিন ও রাত্রি দুই ই কিছু অস্বাভাবিক রকম বড়; শীতকালে রাত্রে সুনিদ্রা হয়, গ্রীষ্মে দিবসে আলস্য জনক নিদ্রা আসে, পুলের এমাসে রাত্রেও নিদ্রা নাই দিনেও নিদ্রা নাই। তথাপি দিনের পর রাত্রি, এবং রাত্রির পর দিন আসিয়া মাসটা কাটিয়া গেল। আজ স্থরতি খেলা হইবে। প্রথম তিনটা ঘোড়ার মধ্যে প্রথমটাই পুলের উঠিবে; ইহা ত স্থির হইয়াই আছে, কেবল সংবাদ আসার অপেক্ষা মাত্র। তাহা আজই রাত্রে তার যোগে আসিবে। আজ আর সন্ধ্যার পর বাটীর বাহিরে থাকা হইবে না।

যাহার বাটীতে পুল ঘর ভাড়া লইয়াছিল, তাহারাই মাসিক কিছু লইয়া পুলের আহার যোগাইত। সেদিন সন্ধ্যার পরই যৎকিঞ্চিৎ আহারাদি পর পুল নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে বলিয়া রাখিল, "রাত্রে তার আসিবে, আমি যদি ঘুমাইয়া পড়ি, আমাকে তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দিও।" গৃহস্বামীকে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না। রাত্রে পুলের নিদ্রা হইবে না একথা পুলের জানা থাকিলেও একটু অতিরিক্ত সতর্ক হওয়াই ভাল মনে করিয়াই বলিয়াছিল। পুল একবার শয়ন করে, একবার বসে, একবার বেড়ায়, একবার "Bee" ঘড়িতে সময় দেখে। রাত্রে পথ দিয়া একজন কে গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছে, পুল দৌড়িয়া জানেলার কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কেও, তার ওয়ালা?" কেহ উত্তর দিল না। পুল গান শুনিয়া বিরক্ত হইয়া শয়ন করিল। আবার একটু পরেই একটা শব্দ হইল, এ নিশ্চয় দ্বারে করাঘাত; পুল তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ঘরের বাহির হইয়া দরজা খুলিতে গেল। একস্থানে দুইটি ধাপ নামিয়া দরজার কাছে যাইতে হয়, পুলের তাহা তাড়াতাড়িতে মনে পড়ে নাই, একটি বিষম আছাড় খাইল। মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলেও খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। এদিকে বাড়ীর লোক পতন শব্দে চোর মনে করিয়া "কেও, কেও" করিয়া গোলমাল উপস্থিত করায় সেই যন্ত্রণার উপর পুলকে সাড়া দিতে এবং একটা কৈফিয়ত দিতে হইল। দক্ষিণ পদে আঘাত একটু গুরুতর হওয়ায় যন্ত্রণা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে রাত্রিও ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে। তখন পুল তারের পেয়াদাকে, গৃহস্বামীকে, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-জায়াদিগকে একত্রে এবং পৃথক্‌ভাবে মনে মনে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে—একি! এযে সত্য সত্যই দ্বারে আঘাত। "দরজা খোল বাবু তার আছে," একথা স্পষ্ট পুলের কানে গেল। একবার নয় দুইবার নয়—থাকিয়া থাকিয়া "তার আছে বাবু" শব্দ হইতে লাগিল। পুল কষ্টে বিছানায় উঠিয়াছে, কিন্তু নামিবার শক্তি নাই। গৃহ হইতে চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে গৃহস্বামী নামিয়া আসিয়া তার গ্রহণ করিতে থাকুন, পুলের ধৈর্য্য কোন মতেই থাকে না। অথচ পুলকে কেহ কোনও কথা বলেও না। পুল উত্থান শক্তি রহিত হইয়া গৃহ হইতে "কিসের তার" বলিয়া বার বার চীৎকার করিয়াও কোন উত্তর না পাইয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল। মনে করিল, গৃহস্বামী কিছুর টাকার লোভে সংবাদ গোপন করিতেছে; করুক্, টিকিট ত আর গৃহস্বামীর নিকট

নাই; তথাপি মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ক্রমে দ্বার রুদ্ধ হইল, ডাৱের পেয়াদাও নিশ্চয় চলিয়া গেল। পুলকে কেহ কিছুই বলিল না। গৃহস্বামীর এক ভ্রাতা বিদেশে থাকেন, তিনি কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া ভ্রাতাকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছেন। সে সংবাদে সকলেই বিষণ্ণ, কেহ পুলের চীৎকারে কর্ণপাতও করিল না। গৃহাবরুদ্ধ পুল যখন বুঝিল, সকলে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহে চলিয়া গেল, তখন পিঞ্জরনিরুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল মাত্র। হায়! তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পা না ভাঙ্গিলে, এমন করিয়া ডাৱের খবর কি চখের উপর দিয়া চুরি যাইতে পারে?

পরদিন বিপন্ন গৃহস্থ সস্ত্রীক ভ্রাতৃ শুশ্রূষায় গেলেন। আহত পুল স্থানান্তরে গমনে অসক্ত, গৃহস্থের প্রতি সন্দিহান ও ক্রমে হতাশ হইয়া যথাকালে অত্যাচারী ভ্রাতৃগণের আশ্রয়ে, দুর্ম্মুখ ভ্রাতৃজায়াদিগের ও ভগিনীর সেবায়, আরোগ্য লাভ করিতে বাধ্য হইলেন। অসময়ে কেবল স্বজনবর্গই ত্যাগ করিতে পারে না।

জাত বসন্ত ও মসূরিকা।

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী।
বি, এ, এল্, এম্, এস্।

জ্বর ভূতাভিষঙ্গে যেমন বিষমজ্বরে পরিণত হয়,—পূর্ব্বে বলিয়াছি মসূরিকা সেইরূপ শীতলার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বসন্তে হামে, পান বসন্ত প্রভৃতিতে পরিণত হয়। বসন্তের গুটি বাহির হইবার পূর্ব্বে, রোগীর দেহে ডাক্তারেরা যাহাকে rash বলেন, সেই লাল লাল মশা কামড়ান দাগ (মিন্‌মিনে) পৃথক্ পৃথক্ কিম্বা একসঙ্গে "ছাপা" বাহির হয় বোধ হয় ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আমি এবার একটি স্ত্রীরোগী দেখিয়াছি, তাহার শরীরে এইরূপ rash বাহির হওয়ায় তাঁহার আত্মীয়েরা পিত্ত বা আমপিত্ত মনে করিয়া ৬ দিন পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসক ডাকা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আমি গিয়া ইহাকে মসূরিকা মনে করি এবং আমার মনে হয়, ইহা Hœmorrhagie form of small pox এর পূর্ব্বরূপ বা আয়ুর্ব্বেদ যাহাকে রক্তজ মসূরিকা বলিয়াছেন তাহাই। ফলে, ঔষধ দিতেই প্রত্যেক লোম কূপে কূপে বসন্তের গুটি বাহির হয়, এবং স্থান বিশেষে রক্ত ও নিঃসৃত হইতে থাকে। সৌভাগ্য স্ত্রীলোকটির এই সময়ে ঋতু

হওয়ায় অন্য স্থান দিয়া আর বেশী রক্ত নিঃসৃত হয় নাই। এমন ভীষণ আকৃতি এ বৎসর আর দেখি নাই। গৃহে প্রবেশ করিতে ভয় হইত। কিন্তু সৌভাগ্য রোগীনীটি ক্রমে সুস্থ হইতে থাকে। এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে।

মসূরিকা ও বসন্তে যে পার্থক্য তাহা ব্যাধির অগ্র, পশ্চাৎ লইয়া, প্রথমে মসূরিকা—পরে তাহা হইতে বসন্তের উৎপত্তি, কেবল এই একটি রোগীতে নহে এমন—এবার আমি অনেক বসন্ত রোগীতেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রোগী ভয়ানক অস্থির কিন্তু তাহাতে দুই এক স্থানে লাল লাল মসূরি সদৃশ দাগ ভিন্ন আর কিছুই বাহির হয় নাই, অথচ বসন্তের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ঔষধ দিতে এমন হইয়াছে যে সমস্ত লোমকূপ গুটিতে পূর্ণ হইয়া গেল, একটি বালকের ভয়ানক জ্বর অজ্ঞানতা অস্থিরতা ঠিক বিকারের লক্ষণ। গায়ের ২।১ টি স্থানে মসার কামড়ের দাগ। মশা-কামড় বলিয়া গৃহস্থেরা উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ঔষধ দিতে এমন একটি স্থান রহিল না যেখানে গুটি বাহির হয় নাই। এখানে বলিয়া রাখি আমার ঔষধের এই এক বিশেষত্ব যে, ইহা মসূরিকা অধিকারের ঔষধ—গুটি বাহির হইলে অনেক স্থলে ৫০ হইতে ১০০। আর যেখানে সমস্ত দেহ পূর্ণ করিয়া গুটি বাহির হইয়াছে সেখানে সেই সকল গুটির মধ্যে তিন ভাগ abortive এইরূপ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমি এবার ২২টি অতি কঠিন রোগী আরোগ্য করিয়াছি। অনেক স্থলে প্রথম হইতে এ সকল রোগী তৈলাদি প্রয়োগ বিশারদ অন্যের চিকিৎসার অধীনে মৃত প্রায় অবস্থায় উপনীত হইলে শেষ আমার হাতে আসে। কিন্তু বলিতে কি আমরা ঔষধ প্রয়োগের ২।৩ দিনের মধ্যে গৃহস্থ মনে করিবার অবসর পাইয়াছে যে, আর ভয় নাই। এ যাত্রা রোগী বাঁচিয়া গেল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—এইরূপ সুফল আমাদের পুণ্য আয়ুর্ব্বেদের বিজয়-ব্যঞ্জক।

দেবী শীতলা জল পড়া তৈল প্রয়োগে রোগীর চিকিৎসা করিতে আদেশ করেন ইহা অশাস্ত্রীয় কথা। শীতলার চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ইহাতে অন্ধকার নাই। ফল হাতে হাতে আয়ুর্ব্বেদ আপনায় পুণ্য বক্ষে এই শীতলা ও মসূরিকা চিকিৎসা অতি প্রাচীনকাল হইতে সংগ্রহ করিয়া সুরক্ষিত করিয়াছেন। যে জানে সে দেখে মসূরিকা ও শীতলার চিকিৎসা ইহাতে কত উচ্চ; আর যে জানে না তাহারা তৈল বইচির কাঁটা নিমপাতা এবং জলপড়া দিয়া মনে করে তাহারাই বসন্তের চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত। এবার বসন্তে যে এত মৃত্যু সংখ্যা ঘটিয়াছে, যদি কেহ কষ্ট স্বীকার করিয়া Statistics গ্রহণ করিয়া দেখেন—

দেখিবেন, শীতলার ব্রাহ্মণ ইহার মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের মৃত্যুর জন্ম দায়ী। মসূরিকা ও শীতলার চিকিৎসা কি করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও শীতলার অনুগ্রহে সম্পাদন করিতে হয় আগামী বারে তাহা প্রকাশ করিবার অভিলাষ আছে অথচ দেরী। যদি পাঠক আগ্রহ করিয়া এ বিষয় জানিতে চাহেন তবে তাহাতে অগ্রসর হইব। এখানে এইমাত্র জানাইয়া রাখিতেছি যদি কেহ বসন্ত পীড়ায় বিপন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যেন অবিলম্বে রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া ২৮ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে পত্র লেখেন বা সংবাদ দেন, দেবীর পূজা ১৲৹ এবং মাত্র পাঁচ টাকার ঔষধ ও পথ্যে এ দারুণ রোগের আরোগ্য পক্ষে যথেষ্ট।

——*——

মনে পড়ে।

মনে পড়ে, ছল ছল আঁখি,
  মনে পড়ে সেই মুখ খানি,
হৃদে পশে, মরম ভেদিয়া,
  প্রেমের সে পবিত্র কাহিনী!
সারা নিশি জাগি, দুজনার।
  মনে পড়ে-আকুল-ক্রন্দন!
বিদায় কালীন ফিরে এসে,
  করে ছিলে মধু সম্বোধন;
"প্রিয়তমে! ভুলোনা আমায়"
  মনে পড়ে থাকিয়া থাকিয়া।
প্রিয়তম! ভুলিনিক' আমি,
  যাপি দিন তোমারে স্মরিয়া।
পথ চাহি বসিয়া রয়েছি,
  এস সখা! এস গো ফিরিয়া
তোমারি লাগি' যতন করি'
  এ হৃদয় রেখেছি পাতিয়া।

ধর্ম্মের ধাঁ—ধা

লেখক,—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী পল্লীগ্রামের গৃহস্থ ব্রাহ্মণ—মৃত্যুকালে প্রতাপ ও সুতাপ নামে দুইটী পুত্রকে রাখিয়া যান, তৎকালে জ্যেষ্ঠ প্রতাপের বয়স কুড়ি এবং সুতাপের বয়স চারি বৎসর মাত্র। এই দুই পুত্রের ব্যবধানে বিশ্বম্ভরের আরও দুই তিনটী পুত্র জন্মিয়া অকালে কালকবলিত হয়। বিশ্বম্ভরের অনুজ পীতাম্বর, অগ্রজের পুত্র দুইটীর অভিভাবক হইয়া তিন চারি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, তাঁহার একটী মাত্র পুত্র ছিল সে প্রতাপ সুতাপের বয়ঃ কনিষ্ঠ। তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণের ভার প্রতাপের উপরেই পড়িল। পিতৃপুরুষের বিষয়বৈভব না থাকিলেও প্রতাপ তাহাতে কাতর বা কুণ্ঠিত হইল না। কয়েক বিঘা জোতজমি ছিল, তাহার উৎপন্ন ফসলে অন্নসংস্থান হইত, আর কয়েক ঘর যজমানের বাড়ীতে নিত্যসেবা ছিল, তাহাতে যে আয় হইত তাহাতে মোটাভাত মোটাকাপড়ের জন্য ভাবিতে হইত না। প্রতাপ মাতা ও পিতৃব্যপত্নীর নিকট ভাই দুইটীকে রাখিয়া চাকরীর জন্য কলিকাতায় আসিল,—তখনও কেবল বাঙ্গালা হিসাব পত্রে জ্ঞান থাকিলে জমিদারী সেরেস্তায় ও মহাজনদের কারবারে ভাল ভাল চাকরী মিলিত—আজিও যে তাহা না মিলে এমন নয়, তবে সকলেই ইংরাজী জ্ঞানের একটু বেশী আদর করিয়া থাকেন। প্রতাপ ইংরাজী জানিত না, যাহা হউক কলিকাতায় তাহার চাকরী জুটিল। চারি পাঁচ বৎসর চাকরী করিয়া সহস্রাধিক মুদ্রার সঞ্চয় হইল। পল্লীগ্রামে সুদের কারবারে বেশ লাভ। প্রতাপ সেই টাকা গুলি লইয়া দেশে গেল, এবং মহাজনী করিতে লাগিল। এই সময়েই তাহার বিবাহ হইল, বিবাহের কিছু দিন পরেই মাতৃবিয়োগ। নববধূর সহিত বেশ বনিবনাও না হওয়ায় প্রতাপের খুড়ী মা পুত্র অতাপকে লইয়া পৃথক হইলেন, সুতাপ তখনও স্কুলে লেখা পড়া করে—একান্নে থাকিবার কালে অতাপও স্কুলে যাইত, লেখাপড়া শিখিত, কিন্তু পৃথকন্নে থ কিয়া তাহা হইয়া উঠিল না। অতাপের মাতা পুত্রের বিবাহের জন্য লালায়িত হইলেন—তখনকার পিতামাতা পুত্রের মাথায় এক গণ্ডুস জল না দিয়া অর্থাৎ সংসারী করিয়া দিয়া পরলোক না যাইতে পারিলে পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যতা পালন হইল না বলিয়া মনে করিতেন, এখনও এমন অনেক পিতামাতা আছেন যাঁহারা পুত্রকে লেখা পড়া শিখান অপেক্ষা তাহার বিবাহ দেওয়াকে একটা দায় বিবেচনা করেন।

অতাপের মাতা বৃদ্ধা হইয়া ছিলেন, দেহের কথা বলা যায় না—কোন দিন কি হয়, অতএব যথাসত্বর তাঁহার পুত্র দায়ে নিষ্কৃতি লাভ হয় তাহারই জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অতাপের লেখাপড়া বন্ধ হইয়াছে—সে এখন তামাকু খাইতে শিখিয়াছে, সকালে উঠিয়া প্যাড়ার মুদিখানার দোকানে, কর্ম্মকারশালায়, স্বর্ণকারের কারখানায়, তন্তুবায়ের তাঁতশালায় বসিয়া স্নানকাল পর্য্যন্ত তামাক ধ্বংস; রাজা উজির মারে—স্নান করিয়া ঘটি গামছা লইয়া যজমান বাড়ী যায়, নিত্য সেবা সারিয়া গামছায় চাউল কলা বাঁধিয়া আনে, ফলার করিয়া দক্ষিণা পায়, তাহাতেই তাহার মাতা সন্তুষ্ট এবং পুত্রকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন। ইহা ছাড়া অতাপের আরও অনেক কাজ ছিল, গ্রামে বরোয়ারী পূজার সময় বাড়ীবাড়ী চাঁদা আদায় করে, যাত্রা পরব হইলে পাইক খাটায়, রোসনাই প্রস্তুত করে, দশজনের এক জন হইয়া কর্ত্তা সাজে, সজাতীয়ের শবদাহ করিয়া বেড়ায়। এই সকল কাজ করিয়া সে দিন কাটায়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেটা "নয়শ রূপেয়ার"* আমল—ব্রাহ্মণের কন্যাপণ তখন আট নয় শত টাকায় উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণের বিবাহ ও বংশরক্ষা এক বিষম দায় ছিল—অর্থাভাবে অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানকে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিতে হইত। ব্রহ্মদৈত্যের ভয় খুবই বাড়িয়া উঠিয়া ছিল—সঙ্গে সঙ্গে গয়ার রেলপথ পড়িয়া গেল তাই রক্ষা, নতুবা এতদিন ব্রহ্মদৈত্যের জ্বালায় লোকের তিষ্ঠনা ভার হইয়া উঠিত। ফলে অতাপের অদৃষ্টে তাহা ঘটে নাই। তাহার কয়েকজন সাম্র যজমান ছিল—তখনও ব্রাহ্মণের বিবাহ দেওয়াকে লোকে ব্রহ্মস্থাপন বলিত, অতাপের মাতার অনুরোধে যজমানেরা চাঁদা করিয়া তাহার বিবাহ দিল, কন্যাপণ দিতে হইল ছয়শত টাকা—যে পিতামাতা ছয়শত, আটশত টাকা পণে কন্যা বিক্রয় করিতেন, তাঁহারা আর অলঙ্কারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারিতেন না। আট নয় শত টাকার মধ্যেই অতাপের বিবাহ দায় মিটিল। অতাপের মাতা নিশ্চিন্ত হইলেন, অতপর তিনি নির্ভাবনায় দেহ ত্যাগ করিতে পারিবেন—একথা সকলে বলিতে পারিল। সে আজ বছর পঁচিশ ত্রিশের কথা এই সময়ের মধ্যে হিন্দুসমাজে কি অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। এখন আর কন্যাপণের সেরূপ তীব্রতা নাই। তখন সুপাত্র হইলেও, কুলের গন্ধ না

* কন্যাপণের তীব্রতা সম্বন্ধে এই নামে সুন্দর একখানি নাটক প্রস্তুত হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বাবু ইহার ৭।৮ পাত সমালোচনা করেন।

থাকিলে, বিনাপণে বিবাহ হইত না। এখন ধন ও জ্ঞানের গন্ধের আদর বাড়িয়াছে।

অতাপের বিবাহের পূর্ব্বে তাহার মাতা প্রতাপের নিকট পণের টাকা চাহিয়াছিলেন—প্রতাপ একটী শ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিল কিন্তু খুড়ী মা তাহা এই বলিয়া গ্রহণ করেন নাই যে "আমার অতাপের জন্য যদি যজমানের কাছেই হাত পাতিতে হইল, তবে তেমন টাকায় কাজ কি—প্রতাপের প্রতি অতাপেরও আর পূর্ব্ব ভাব রহিল না। বস্তুগত্যা প্রতাপকে সেজন্য দোষী করা যাইতে পারে না। প্রতাপ মাতৃদায়ে পাঁচ ছয় শত টাকা ব্যয় করিয়াছিল, আজি বাদে কাল অনুজ সুতাপের বিবাহেও সহস্রাধিক টাকা খরচ না করিলে চলিবে না, এরূপ স্থলে অতাপের মাতা ভুল করিলেন, প্রতাপের শত মুদ্রা লইলে সদ্ভাব থাকিত, ইহাতে তাঁহার ততটা দোষ ছিল না, তিনি স্ত্রীলোক। দোষ অতাপের। সে দেখিত সকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত প্রতাপের বাড়ীতে খাতকের আমদানি, টাকার ঝঞ্ঝানানি—ভাবিত রোজ না জানি কত টাকাই আসে যায় তাহার বিবাহে প্রতাপ সমস্ত টাকা না দিবে কেন? ফলে এখন প্রতাপের ধনগৌরব খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রতি বৎসর নূতন খাতার দিন প্রত্যেক খাতকের এক টাকার মহরতে সহস্রাধিক টাকা জমা হইত।

(২)

প্রতাপ ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই বলিয়া বড় সাধ করিয়া সুতাপকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য কলিকাতার ভাল স্কুলে পড়িতে দিল,—স্কুলের বেতনে পুস্তকে কাগজে কলমে মাসিক ১০।১৫ টাকা ব্যয় করিত, কিন্তু সুতাপ এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে পারিল না, কলিকাতা হইতে পীড়িত হইয়া সার্শা প্যারিলার শিশি লইয়া বাড়ীতে গেল, বর্ষকালে পল্লীগ্রামের পথঘাট জলে কাদায় ভরিয়া যায়, সুতাপ মোজা জুতা না পরিয়া পথে বাহির হইতে পারে না। প্রতাপ অনুজের ভবিষ্যতের দৌড় বুঝিয়া লইল। তাহার বিবাহ দিতে বিলম্ব করিল না। বিবাহে কন্যাপণ চারি পাঁচশত এবং অলঙ্কারের জন্যও তদনুরূপ ব্যয় হইল।

প্রতাপ বাল্যাবধিই কষ্টসহিষ্ণু—আপনাকে আপনার অদৃষ্টমন্দির গাঁথিয়া লইতে হইয়াছে। পল্লীগ্রামে তেজারতী করিয়া অদালতের দ্বারে দাঁড়ান নাই এমন মহাজন প্রায় দেখা যায় না—প্রতাপ একদিনের জন্য একটী মুহুরী রাখে নাই—চাসবাস জমি জায়গা অনেক—কতক নিজ-জোতে, কতক বা

ভাগ জোতে আবাদ হয়—সমস্তই অপনাকে দেখিতে হয়। অনুজের উঠিতে বেলা হয়, প্রাতঃক্রিয়া সমাপ্ত করিতে, চা খাইতে সকাল বেলা কাটিয়া যায়। মাঠে বাহির হইতেও কষ্ট হয়—সকাল সকাল আহার না করিলে মাথা ধরে। শীতগ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই কামিজে না গা ঢাকিলে সর্দ্দি লাগে—আহারের পর দুই তিন ঘণ্টা যায় বিশ্রাম করিতে—তাহার পর তাহারই মত দুই চারি জন বন্ধুবান্ধব আসিয়া বৈঠক খানায় বসে, তাহাদিগকে আপ্যায়িত না করিলে নয়, করিতে হয়। সন্ধ্যার পর কোন দিন গীত বাদ্য কোন দিন বা তাস পাশায় মনোনিবেশ না করিলে মনের স্ফুর্ত্তি জন্মে না। প্রতাপের ইহার কিছুতেই আপত্তি ছিলনা, সে ভ্রাতার জন্য একটী পৃথক বৈঠকখানা করিয়া দিয়াছিল; আপনি অতি প্রত্যুষে কাক কোকিল ডাকিতে না ডাকিতে উঠিত, চাকরদিগকে জাগাইত, হালহেলে সঙ্গে দিয়া মাঠে পাঠাইয়া দিত, তাহার পর খাতকেরা আসিয়া কেহ টাকা লইত, কেহ শোধ করিয়া যাইত, তাহাদের হিসাব নিকাশ করিতে প্রায় স্নানকাল হইত। স্নানের পর সন্ধ্যাহ্নিক বিষ্ণুসেবা না করিয়া জল-গ্রহণ হইত না।

সুতাপ বাল্যাবধি ইংরাজী স্কুলে যাতায়াত করিয়াছিল ইংরাজী ভাষার সদুপদেশে যতটা মন মজুক না মজুক হিন্দুর আচার ব্যবহারে বিলক্ষণ অনিচ্ছা জন্মিয়াছিল। অগ্রজের জন্য অনাচারে অভ্যস্ত না হইলেও আমাদের সকলই যে কুসংস্কারে পূর্ণ তাহা সকলেই তাহার মুখে শুনিতে পাইত। হিন্দুর অনুষ্ঠানে কোন কাজেই প্রতাপের অযত্ন অনাদর ছিল না।

যদিও মহকুমার দেওয়ানী আদালতে প্রতাপকে প্রায়ই যাতায়াত করিতে হইত, কিন্তু কোন দিন কাহার বাস্ত ভিঠায় ঢোল পিটাইতে হইত না, কিম্বা কাহার থালা ঘটী বাটী ক্রোক করিতে হইত না—খাতকের সহিত রফা নিষ্পত্তিই হইয়া যাইত। প্রতাপের খাতককে কোন দিন বাস্তভিটা ছাড়িয়া পলাইতে হয় নাই। এজন্য খাতকেরা সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। প্রতাপের সততায় হাকিমেরাও পরিতুষ্ট ছিলেন। প্রতাপ মিথ্যা মোকদ্দমা করে না বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রতাপের বেশ সুনাম সুখ্যাতি জন্মিয়া ছিল। আমরা যতই কেন সংসারতত্ত্বজ্ঞ হই না কেন—ইহার গূঢ় রহস্য কেহই উচ্ছেদে সমর্থ নহে। সংসারসুখ যে ধর্ম্ম পথেই সুলভ আর অধর্ম্মের পথেই কষ্টকর একথা কেহ বলিতে পারেন না, কিন্তু ধার্ম্মিক দুঃখে পড়িলেও তাঁহার অধর্ম্মের আশ্রয় না লওয়া জন্য একটা সান্ত্বনা থাকে, কিছুরই সহিত-

তাহার তুলনা হয় না। তাহাতে যে অনুপম আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা ধার্ম্মিক বই আর কাহার উপলব্ধি হইবার নহে। অধার্ম্মিকের অসদনুষ্ঠানজনিত সুখের মধ্যে তাহা মিলিবার নহে। অধর্ম্মের আপতঃ সুখের স্বাদ যতই মধুর হউক না কেন—পাপের পরিতাপ অপরিহার্য্য।

সংসার বড় বিষম স্থান—আর মানবজীবন এক কঠোর পরীক্ষা! চরিত্র গুণে মনুষ্য দেবতা এবং চরিত্র দোষে সেই মনুষ্য পশু অপেক্ষাও হীন। চরিত্র সৃষ্টি এক অসাধারণ সাধনা—সেই সাধনা সংসার ত্যাগী জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসে নাই, ফল মূলাশী তপস্বীর তপস্যায় পাওয়া যায়না। এজন্য শাস্ত্রকার সংসারাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠাশ্রম বলিয়া গিয়াছেন। সংসারে আসিয়া যে চরিত্রবান হইতে পারিল না—তাহার মনুষ্যজন্ম বিফল হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। এখানে নানা প্রলোভনে পড়িয়া যে আপনার চরিত্রকে রক্ষা করিতে না পারিল, সেই ঠকিল—পুনরায় নরজন্ম লাভে বঞ্চিত হইল, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গাদি নীচ যোনি ভ্রমণ করিয়া আবার হয়ত কত জন্ম পরে মনুষ্য জন্ম পাইতে পারে, নাও পারে। এজন্য সংসারে অন্যান্য যত শিক্ষাই থাকুক চরিত্রজ্ঞান, চরিত্র শিক্ষা সর্ব্বোপরি—ইহাতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জন্মে, পরিণামে দেবত্ব লাভের অধিকারী করে। এ চরিত্র সহজে গড়া যায় না—সন্ন্যাসীর ন্যায় ত্যাগস্বীকার চাই যতির ন্যায় সংযমী হইতে হয়। এই জ্ঞান লেখাপড়ার মুখ চায় না, পাণ্ডিত্যের ধার ধারে না—ইহার পৃথক দাঁড়া। জন্মান্তরীন্ সংস্কার মনুষ্যকে এই পবিত্র পথের পথিক করিয়া দেয়! এক এক জন অশিক্ষিত কৃষককে যেমন ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্ম্ম ভীরু দেখিতে পাই, অনেক কৃতবিদ্যের মধ্যে সেরূপ খুজিয়া মিলে না। সংসারের পথ বড়ই পিচ্ছিল—পা পিছলাইলে পতন অবশ্যম্ভাবী, সে পক্ষে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক নাই। পাপ করিলে ভুগিতে হয়। পাপপুণ্যের খাতায় জমা ওয়াশীল বাকীর হিসাব হয় না, বাদ বাকী বরফা-নিষ্পত্তি নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পুণ্যের পুরস্কার দুই আছে। এত কথা কেন বলিতেছি পরে বুঝাইব।

(৩)

প্রতাপ সুতাপের সকল আবদারই সহ্য করে, খরচ পত্রের দিকে লক্ষ্য করে না, সুতাপ ভাল খায়, ভাল পরে—সংসারের কাজকর্ম্মে বড় একটা মনোনিবেশ নাই—বিলাসব্যসনেই ব্যস্ত। গান বাজনা, তাস পাশা প্রায় চৌদ্দ পনর ঘণ্টার সহচর, কোন কোন দিন বন্দুকে পাখী মারাও আছে। এই সকল আমোদে আহ্লাদে সুতাপের যে টুকু সুখ, ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়া,

অতিথির সৎকার করিয়া, পরের দায়ে মাথা পাতিয়া প্রতাপ তাহা অপেক্ষা সুখী।

প্রতাপের মন উচ্চ, হৃদয় প্রশস্ত, দুইটী বধূকে মাস মাস চারিটী করিয়া টাকা পান. ছোট বধূর তাহাতে কুলায় না—বড় বধূর টাকা সুদে খাটে, বার ব্রতের জন্য স্বামীর নিকট হাত পাতিতে হয় না, সুদের টাকায় তাহার খরচ চলিয়া যায়। এমন সুখের সংসারে অশান্তির সুত্রপাত হইল। ছোট বধূর বয়স যতই বাড়িতে লাগিল ততই তিনি কর্ত্তৃত্বাভিলাষিনী হইতে থাকিলেন—বড় বধূর সকল কথা মানিয়া চলিবার ইচ্ছা রহিল না, ক্রমে সে কথা প্রতাপের কাণে উঠিল। প্রতাপ পত্নীকে সতর্ক করিয়া দিল যাহাতে ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ না ঘটে, সহিষ্ণুতা থাকিলে সকলই সহিয়া চলা যায়। বড় বধূ দ্বিরুক্তি করিলেন না, পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহা হইতে সঙ্কল্প করিলেন।

পিতৃব্য পুত্র অতাপ সুতাপের একটু বেশী সংস্রব রাখে—তাহার বৈঠক খানায় বসে, তানপুরার কাণ মোচড়ায়, তবলায় চাটি দেয়, খেলার উপর চাল বলে, শীকারের সময় বন্দুক বহিয়া সঙ্গে যায়। অতাপের মাতাও সুতাপের পত্নীর নিকট আসা যাওয়া করেন, চুল বাঁধিয়া, গা মুছাইয়া দেন, কারণ না থাকিলেও তাঁহার অসুস্থতার আশঙ্কা করেন, মুখের পূর্ণ প্রফুল্লতা স্বত্বে "মুখ খানি যেন শুকাইয়া গিয়াছে" বলিয়া আত্মীয়তা প্রদর্শন করেন। প্রতাপের উপর ততটা রাজি নয়, কারণ প্রতাপ অতাপের বিবাহে একশত টাকার বেশী দিতে চাহে নাই।

প্রতাপের মত অগ্রজ অতি অল্পই মিলে—কিন্তু সংসার অতি বৈচিত্র্যময়, অনুজের মন অগ্রজের প্রতি অনুরক্ত রহিল না, অগ্রজের অন্নে অনুজের অরুচি জন্মিল। সে আর দাদার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে না, সময়ে স্নানাহার করে না, বৈঠকখানায় আমোদ উল্লাসের উচ্ছ্বাস নাই—বন্ধু বান্ধব বসে না—তবলায় চাটি পড়ে না, তানপুরায় সুর বাঁধে না। বসন্তের বাগানে যেন শীতাগম হইল, এইরূপে দুই চারি দিন গত হইলে প্রতাপ পরের মুখে শুনিল—সুতাপ আর একান্নে থাকিতে রাজি নহে, বিষয়বৈভব বন্টন করিয়া লইতে চায়। প্রতাপ তাহাতে নারাজ নহে, কেবল জ্যেষ্ঠত্বের সম্মান স্বরূপ কিছু বেশী চায়।

শালিশ বসিল—খাতাপত্র দেখা চলিতে লাগিল, না যাই বাদ দিয়াও মজুত রহিল খতপত্রে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার কারবারে খাটিতেছে দেখা গেল।

সমস্তই প্রতাপের উপার্জ্জিত। প্রতাপ চাহিল দশ আনা, সুতাপ তাহাতে সম্মত না হইয়া সমান অংশের দাবি করিল। সালিশেরা প্রতাপের নয় আনা আর সুতাপের সাত আনা সাব্যস্ত করিল, আর এক দিন বসিয়া খাতক ভাগ করিয়া দেওয়াই ঠিক হইল।

কবি বলিয়া গিয়াছেন—ভাল বাসিলেই যদি ভালবাসা পাওয়া যাইত, যদি চন্দনে ফুল ফুটিত, ইক্ষুতে ফল ফলিত, কমলে কণ্টক না থাকিত, তাহা হইলে কতই সুখ হইত। আকাশ নির্মেঘ নির্ম্মল, গাছে পাতাটী নড়ে না, জলে তরঙ্গ উঠে না—হঠাৎ একবারে নবীন নীরদে আকাশ ঢাকিল, হায়—বাত্যাবিতাড়নের বিকট বজ্রধ্বনি ও অশনিপাত হইলে যেমন হয়,—তেমনি হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাকালে খিড়কীর পুষ্করিণী ঘাটে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রতাপের শিরশ্ছিন্ন হইল। প্রতিবেশিদের কেহ শুনিল তৎপূর্ব্বে প্রতাপ চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—"অতাপ আমায় খুন কল্লে, কেহ অতাপের নাম শুনিতে পায় নাই কেবল শুনিয়াছিল—"আমায় খুন কল্লে।"

পুলিশ আসিল, অতাপকে বাঁধিল, চালানও দিল, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিলেন, কিন্তু প্রমাণ অভাবে অতাপ খালাস পাইল।

অতাপের মুক্তির জন্য কোন ত্রুটী হয় নাই—ভাল ভাল উকীল মোক্তারের অভাব হয় নাই, খরচ পত্রের জন্যও কিছু আঁটকাইল না। অতাপ ভ্রমেও ভাবে নাই তাহার বেকসুর খালাস ঘটিবে, তাহা ঘটিয়া গেল। অতাপের আনন্দের সীমা রহিল না, মহা সমারোহে অতাপ বাড়ী আসিবার কালে, তাহার শরীর খারাপ হইল, অত্যন্ত হর্ষে অত্যন্ত দুঃখে অনেক সময়েই মানুষ প্রাণ হারায়, বিসূচীকার্ত্ত হইয়া সে বাড়ী ফিরিল, চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন—অতাপের ঘোর গাত্রদাহ—ডাক্তার গ্রামের লোক—তিনি সমস্তই জানিতেন, বুঝিতেন, অতাপ যখন তাঁহাকে বলিল—" ডাক্তার বাবু যেন হাজার হাজার গোক্ষুরা সাপে আমাকে দংশন করিতেছে, এ যাতনা কিছুতেই সহ্য হইতেছে না।"

ডাক্তার বলিলেন—"ঈশ্বর স্মরণ কর।"

রোগী উত্তর করিল—তাঁহাকে স্মরণ করিতে গেলেই ভয় পাই। তিন দিন এই দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগের পর অতাপের প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল।

প্রতাপের দুইটী অপোগণ্ড পুত্রকে কে দেখে? কে তাহাদের বিষয় বৈভব রক্ষণাবেক্ষণ করে।

প্রতাপের পত্নী বুদ্ধিমতী তিনি ভাবিলেন, দেবরের অবিভাবকত্বায় পুত্র দুইটীর জীবন হানির সমধিক সম্ভাবনা—অতএব তাঁহার স্বামীর সঞ্চিত অর্থ প্রায় দুই হাজার টাকা এবং খাতকদের নিকট প্রাপ্য তের হাজার টাকা, কারণ, সুতাপ অগ্রজের অপমৃত্যুতে তুল্যাংশ লইতে ছাড়িল না। প্রতাপ পত্নী গ্রামের অপর এক মহাজনকে ছয় হাজার টাকা ছাড়িয়া দিয়া পুত্র দুইটীকে লইয়া সহরে পলাইয়া আসিলেন। পুত্র দুইটী বড় সুবোধ এবং সচ্চরিত্র— বিশেষতঃ তাহাদের জননী বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা পিতৃহীন, আপনারা যত্ন করিয়া লেখাপড়া না শিখিলে শিখাইবার লোক নাই। বালক দুইটীর মনে এই উপদেশ বাক্য প্রস্তরাঙ্কের ন্যায় রহিয়া গেল। অল্পকাল মধ্যেই তাহারা কৃতবিদ্য হইয়া উঠিল।

(৪)

সুতাপ প্রভূত অর্থ হাতে পাইয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল, পুত্র দুইটী যাহাতে ভ্রাতুষ্পুত্র অপেক্ষা বেশী বিদ্বান, বেশী অর্থবান হইতে পারে তাহার ত্রুটী করিল না—পল্লীগ্রামে সুশিক্ষার সুবিধা অল্প, অতএব তাহাদিগকে সহরে রাখিয়া দিল, কিন্তু তাহাদের পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারের আশা তাহাদিগকে অলস ও অমনোযোগী করিয়া তুলিল—অচিরকালমধ্যেই তাহাদের বিলাস বিভ্রম জুটিল। পিতার নিকট হইতে তাহারা মাস মাস যে টাকা পাইত তাহা বিলাসব্যসনেই ব্যয় করিত। পিতার নজরের উপর না থাকা প্রযুক্ত তাহারা তাহার ঘোর অবাধ্য অবশীভূত হইল। তাহা হইলেও জ্যেষ্ঠের প্রতি পিতার স্নেহাধিক্যের পরিচয় পাইয়া কনিষ্ঠের মনে একটা বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার হইল।

সুতাপ আপনার উদ্যোগ অনুষ্ঠানে প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠিল, তেজারতীর ধান দুই চারিটী মহল কিনিয়া জমিদার হইল, সহরেও দুই তিনটী বড় কারবার খুলিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য লাভ করিল। সুতাপের চরিত্রতত্ত্ব গ্রামের কাহার অবিদিত ছিল না, অগ্রজের অপমৃত্যুর প্রধান অনুষ্ঠাতাই সুতাপ। সকলেই কানাঘুষা করিত—বলিতে অধর্ম্মেরই প্রাধান্য ধর্ম্মপথে যাহারা চলে তাহাদেরই দুঃখ। সুতাপের মুখেও ইহাই শুনা যাইত, সে বলিত—ধর্ম্মপথে থাকিলে অতি কষ্টে খাওয়া পরা চলে মাত্র। অধর্ম্মের আশ্রয় বই ধনবান হওয়া যায় না। পাপের পথে চলিয়া তাহার সুখ সমৃদ্ধিও ঘটিয়াছিল সে না বলিবে কেন? ফলে এটা ধর্ম্মের ধাঁ-ধাঁ মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে সে সব কিছুই নহে—ধর্ম্মের মাহাত্ম্য চিরদিনই অক্ষুণ্ণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সুতাপের পুত্র দুইটীর সুশিক্ষা হয় নাই—তাহারা কেবলই কুপথগামী, সুতাপ তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টা পায় নাই—পুত্রদিগকে শাসন করিলে পত্নী বলেন—"কেমন বীজে জন্ম, আমজ আঁটীতে কি আমের গাছ হয় ?"

কথাটা নিতান্ত অযোগ্যও নহে—সুতাপ তাহার সদুত্তর করিতে পারিত না। পুত্র দুইটীর মধ্যে কনিষ্ঠ ভয়ানক দুর্দ্দান্ত, জ্যেষ্ঠটি ততটা নয় বলিয়া পিতার প্রিয় হইতে পারিয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের মনে তাহা বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় যন্ত্রণা দিতে লাগিল। মনুষ্য যে, বৃত্তিকে যত পোষণ করে, ততই তাহা পরিপুষ্ট হইতে থাকে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই হইতে লাগিল। পিতা ভাবিল, এক—হইল আর—কনিষ্ঠ পুত্রের মনে পিতৃপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিবার জন্য পিতা যাহা করিলেন তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। ঘরে শাণিত কাটারি ছিল, তাহার দ্বারা একদিন অগ্রজের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিল, এক চোপে তাহাকে ধরাতলে ফেলিল—দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। পিতা ছুটিয়া আসিয়া কিছুই করিতে পারিল না, পুত্র কাটারিখানি জলে ফেলিয়া দিয়া নিকটেই পুলিশ থানা—তথায় উপস্থিত হইয়া আপনি অপরাধের কথা স্বীকার করিল। থানার দারোগা তাহার হাতে হাত কড়ি দিয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত। সুতাপ বহুবিধ চেষ্টায় পুত্রকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল—কিছুতেই কিছু হইল না। পুত্র আপনার অপরাধ অস্বীকার করিতে নারাজ—অগত্যা পুলিশ তাহাকে বিচারের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে বাধ্য। সুতাপ উকিল ব্যারিষ্টার লইয়া পুত্রের উন্মত্ততা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পুত্র কিছুতেই রাজি হইল না—দায়রার জজের কাছেও অপরাধ গোপন করিল না, যে জন্য যে প্রকারে সে জ্যেষ্ঠের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে, সমস্তই খুলিয়া বলিল। জজ ফাঁসির হুকুম দিলেন—ফাঁসি হইয়া গেল। সুতাপ পুত্রশোকে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইল, বৎসর মধ্যেই প্রাণ হারাইল। তাহার বিষয় বৈভব যাহা ছিল, সমস্তই প্রতাপের পুত্রগণ পাইল, তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দতায় তাহা ভোগ করিতে লাগিল।
